প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক :
শ্যামলী ঘোষ
যোগমায়া প্রকাশনী
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২১৯-৭৯৭০

বর্ণ সংস্থাপন :
জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়
প্লট নং-২৭০, মিলন নগর,
সল্টলেক, সেক্টর-ফোর,
কলকাতা-৯১
দূরভাষ : ২৩৩৫-৩১৭৬, ৯৮৩১১৯৩২৯৮

মুদ্রাকর :
চারু প্রেস
১০৩বি, ধনদেবী খান্না রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
সিতাংশু শেখর ঘোষ

প্রচ্ছদ :
সুদীপ মুখোপাধ্যায়

নির্দেশিকা

বাবা

ও

মা'কে

অনেক দিনের শূন্যতা মোর
ভরতে হবে

কৈফিয়ৎ

সারাজীবন অনধিকার চর্চা করে গেলাম—কিছুটা ইচ্ছায়, কিছুটা অনিচ্ছায়, অনেক সময় বাধ্য হয়ে। বুঝতে পারছি—এইভাবে বাকি জীবনটাও এইভাবে চলবে। গান শিখেছি, আজও গান করার চেষ্টা করে চলেছি।

কিন্তু আমার স্বর্গত পিতৃদেব, সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাঝে মাঝেই বিরক্ত হয়ে বলতেন—'এসব গানটান তোমার কম্মো নয়, অন্য কিছু করো।' তবু সেই অপটুত্ব নিয়ে গান গাইছি। এক এক সময় ভাবি—কেন, বাবা যেমন চেয়েছিলেন, সেরকম করে গাইতে পারলাম না ? এটাও যে আমার অপটুত্ব, নিজেই বুঝতে পারি।

এই অবস্থায় আমায় আরো মুস্কিলে ফেলে দিয়ে গেল অনুজপ্রতিম গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ—একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, যে আমাকে ভীষণ ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। আমার কাছে প্রায়ই আসতো, আমার প্রিয় দোকানের মিষ্টি হাতে নিয়ে। জমিয়ে আড্ডা মারত, আমার গান শুনতো। আবার মাঝে মাঝে আমাকে দিয়ে জোর করে আমার কিছু কিছু অতীত স্মৃতি লিখিয়ে নিয়ে, সত্যি সত্যি ছাপিয়েও দিত। আমি তো লজ্জায় মরি, আমি বকতুম—'অ্যাই গৌর, এসব কী হচ্ছেটা কী ?' গৌর হেসে মাথা ঝাঁকাতো—তোমার কথায় পুরোন দিনের স্মরণীয় মুহূর্ত, হারানো গানের সব কথা, যা অন্যরা জানে না—এসব তো ধরে রাখতে হবে, নাহলে সব তো হারিয়ে যাবে। তারপর একদিন আবার হাজির—হামলা বললেই হয়। সঙ্গে ওর স্ত্রী, আমার কন্যাপ্রতিম শ্যামলী আর সেই সঙ্গে ধরে এনেছে, আমাদের দুজনেরই বন্ধু পরমবিদ্বান, সুরসিক সিতাংশু শেখর ঘোষকে—

যার কোন্ বিষয়ে যে জ্ঞান নেই, তা বলতে পারব না। সেই সরল হাসি, গল্প-গান কিন্তু শেষকালে আমার মাথায় যেন বজ্রপাত। গৌরাঙ্গ বললে—বিমানদা, আপনি তো বহু বিরাট মাপের মানুষের সঙ্গ পেয়েছেন, কাছ থেকে দেখেছেন, মিশেছেন —আপনার অভিজ্ঞতা বিপুল, ভাণ্ডার অফুরন্ত, আমি সেসব ধরে রাখতে চাই। কতো অজানা কথা, লোকে জানবে, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে শিখবে। যতটা পারা যায় আপনার সে সব কথা, আমি একটা বই-এ, সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমি চিৎকার করে বলেছিলুম—এসব বুদ্ধি ছাড়ো। আমি গান শিখিয়ে সামান্য দুচার পয়সা রোজগার করি—আর তাই নিয়ে দিব্যি শান্তিতে আছি। আমাকে কেন ঝামেলায় ফেলতে চাইছ ? আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না, শরীর নড়বড়ে, লিখতেও পারি না। কোনওদিন যে লিখব কখনো কল্পনাতেও ভাবিনি। তাছাড়া আমি, এমন কে বটে হে! আমাকে কে চেনে ? আমার লেখা পড়বেই বা কে ? তাই বই ছেপে আর পয়সা নষ্ট করতে হবে না। আমার কাছ থেকে তাড়া খেয়ে, গৌরাঙ্গ সেদিনের মত চলে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে আবার আবদার জানালো যে বইমেলায় ছবি বিশ্বাসের স্মরণে একটা বই বেরুবে—ওর খুব ইচ্ছে, আমার হাত দিয়ে সেই বই-এর উদ্বোধন করাবে। গেলাম বইমেলায় —ভালই লাগল। সেখানে জমায়েত হয়েছে সাহিত্যিক, পণ্ডিত, অভিনেতা, শিল্পী! জমজমাট ভীড়। মনে মনে বড় আনন্দ হল যে গানের গণ্ডীর বাইরে, গৌরাঙ্গ বই-এর জগতে আমায় নিয়ে এল, বই-এর জগতের মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সেখানে আবার গৌরাঙ্গ হঠাৎ দুম করে ঘোষণা করে দিল যে এরপর আমরা বিমানদার একটা স্মৃতিকথা প্রকাশ করব। বন্ধুবর সিতাংশুও তাতে গলা মেলালো। এমন মুস্কিলে কদাচিৎ পড়েছি। গৌরাঙ্গ তারপর থেকে প্রায়-পাওনাদারের, মত প্রায়-নিত্যদিন আমায় তাগাদা মারছে। কি যে বিপদ। আমিও কোনক্রমে এড়িয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করছিলাম। কিন্তু এবার সত্যিই বজ্রাহত হলাম। খবর পেলুম গৌরাঙ্গ আর নেই। মর্মান্তিক এই আকস্মিক ঘটনা বিশ্বাস করতে পারছিলুম না, এমনটা কি করে হয়? কেনই বা হয় ?

সিতাংশুও তখন কলকাতার বাইরে ছিল। সেও এসে পড়ল। আমরা দুজনে গৌরাঙ্গর বাড়িতে গেলাম—শ্যামলীর সামনে দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছিল। তবু কর্তব্য বড় দায়, এড়ানো তো যায় না। ওই অবস্থায় শ্যামলী যখন বললে—যে দাদা, ওঁ-র অসমাপ্ত সব কাজ আমি সম্পূর্ণ করবই, বারবার আপনার ওই বই-এর কথা ও আমায় বলছিল।—তাই দাদা, এবার আমি আপনার বইটীর কাজ হাতে নিতে চাই। এর ওপর আর কিইবা বলা যায়। আমি কথা দিলুম।

কিন্তু আবার সেই সমস্যা কি করে লিখব, কখন লিখব। তবে এবারেও সেই সর্বকর্মের উদ্ধারকর্তা সিতাংশু শেখর ঘোষ এগিয়ে এল। গৌরাঙ্গ আর তার শোকাহত স্ত্রীর প্রতি ভালবাসায়—সে আমায় বাঁচাল, বললে—ঠিক আছে আমি লেখার ভারটা নিলাম। প্রাথমিক বাধাটা কাটল কিন্তু এবার ভাবনা কি লিখব, আমার আবার জীবনী কি ? আমার সম্বন্ধে কারই বা আগ্রহ ? শ্যামলী একনাগাড়ে

আমাকে বোঝাতে লাগল—জন্ম থেকে যে কলকাতা দেখছেন—অর কতো পরিবর্তনের আপনি সাক্ষী, কতো সান্নিধ্য পেয়েছেন, কতো গুণী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন কত ছাত্র-ছাত্রী আপনার আপনার কাছে শিখে, গানের জগতকে মাতিয়েছেন—বেডিও, রেকর্ড, টিভি সব জায়গায় আপনার উজ্জ্বল উপস্থিতি, বাংলা গানের কতো পালাবদল—এসব তো আমাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের অঙ্গ। তাই এসব নিয়ে আত্মগোপন করে থাকলে চলবে না, আমাদের সারস্বত জীবন আলোকিত করতে হবে আপনাকে, আত্মপ্রকাশ করতে হবে। অবশেষে আমাকে, আত্মপ্রকাশ কি না জানি না—অন্তত আত্মসমর্পণ করতেই হল শ্যামলী আর সিতাংশুর কাছে। সিতাংশু দীর্ঘদিন ধরে আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, এক প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গেছে। তাঁরও অভিজ্ঞতা কম নয়, পুরোন দিনের গানবাজনা, সাঙ্গীতিক পরিবেশ, গানের সংগ্রহ, সাহিত্য বিজ্ঞান বা শিল্পকলার অলিগলিতে নিরন্তর বিচরণ—আমার কাজটাকে এমনভাবে সুগম করে ফেলল যে আমি যেন আবার নতুন করে আমার সেই ফেলে আসা জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে, নিজেকে জড়িয়ে ফেললুম। আর তার ফলে, একটু একটু করে আমার স্মৃতি থেকে, বিস্মৃতি থেকে কতো কথাই যে প্রস্রবনের মত উঠে আসতে লাগল! আর সেই স্মৃতি মন্থন থেকে যেমন, অমৃতের গল্প উঠে এসেছে—তেমনি কোথাও কোথাও হয়ত গরলের অস্তিত্বকে এড়ানো যায় নি।

তবে এর জন্যে সিতাংশুকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছে—তা সম্ভব হয়েছে স্রেফ, ওর আমার আত্মিক সম্পর্কের জন্যে। দীর্ঘদিন ধরে, ধৈর্য ধরে ধরে সিতাংশু যেভাবে শিশিরের ফোঁটা জমিয়ে জমিয়ে, বাংলা গানের 'মাহোলের' সামনে বসার মতো রঙ বাহারি গালিচা পেতে দিয়েছে—তার জন্যে তাকে, আর তার গিন্নি মীরাকে, আমি কী বলে যে আমার ভালবাসা জানাব তা জানি না। প্রতিদিন আমাদের কথাবার্তার দুর্গম খসড়া থেকে মীরা যে কি ক্লান্তিহীন নিষ্ঠা ভরে, দুরূহ পাণ্ডুলিপি খাড়া করে দিয়েছে—তা সত্যিই ভাবা যায় না।

আমি যখন যেমন মেজাজে থেকেছি, যখন যা মনে এসেছে—আগেরটা পরে বা পরেরটা আগে, কোনওটা আধাখ্যাঁচড়া—সব সিতাংশু সেইভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। যতটা পেরেছে আবার ঠিকঠাক করে সাজিয়েছে। সব জায়গায় হয়ত বা হয়নি। তবে স্পষ্ট করে বলে রাখা দরকার যে, খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা টুকরো টুকরো স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এ বইটিকে, বস্তুত আমার জীবনের এক খণ্ডচিত্র বা জীবনাংশ বললেই সঠিক হবে!

সমপ্রাণ দোসরের সঙ্গে কথায় কথায়, গল্পে আড্ডায়, সিতাংশু 'বিমানে বিমানে আলোকের গানে' যে রসের খোঁজাখুঁজি করছিল—তা থেকে সিতাংশু নিজেই বইটির নামকরণও করেছে। এর অন্তর্লীন ব্যাপকতর ভাব গরিমার প্রসাদে, আমি কিন্তু একটু সঙ্কোচবোধ করছি। সেইজন্যে আমি মুক্ত মনেই বলে দিচ্ছি যে—বহু ভাবনা চিন্তা, কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে, এত পরিশ্রমে, ভালবাসায় সিতাংশু

যেভাবে বইটিকে সম্পূর্ণ করেছে—বাংলা গানের ইতিহাসে মগ্ন, ঐতিহ্যের সক্রিয় চিন্তাবিদ—সেই গান-অন্তপ্রাণ, সিতাংশু শেখর ঘোষই, সর্বোতভাবে বইটির প্রকৃত লেখক। বিষয়টা শুধু, আমার জীবনের, খণ্ড খণ্ড অংশ বা খণ্ড চিত্র অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে যা, আমি কেবল আমার মন থেকে বলে গেছি। কোনও কাগজপত্র দেখিনি বা কোনও রকম প্রণালী শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে হাঁটি নি।

তাই এখন মনে হচ্ছে, অনেক মানুষের কথা বা অনেক বাড়ির কথা হয়ত বলা হয়নি। অনেক ভালবাসা, অনেক প্রত্যাখ্যান, কতো স্নেহ বা অপমান, অথবা বিশ্বাসঘাতকতা, জীবনের রক্তঝরা সংগ্রাম—এমনি বহু কথাই বোধহয় অকথিত রয়ে গেল। অবশ্য, সব মানুষের সমস্ত কথা এই একটিমাত্র আধারে গ্রথিত করা কোনমতেই তো সম্ভব নয়। বই প্রকাশের পর হয়ত দেখব হঠাৎ হঠাৎ করে এ-ও-সে অনেক বন্ধুর, অনেক ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যা আগেই মনে পড়া উচিৎ ছিল। তবে সবটাই যেন ইতস্ততঃ, বিক্ষিপ্ত গোছের। সময় সরণীর অনুক্রম মেনে বলা হয়ে ওঠেনি—ওসব আমার এলোমেলো স্বভাবটাকেই চিনিয়ে দেয়। তাই এটাকে শোধরাতেও চেষ্টা করিনি। তবু যাঁদের কথা হয়ত বাদ গেছে—সে সবই আমার এই বৃদ্ধ বয়সের অনবধানতা বা স্মৃতি বিচ্যুতি ছাড়া যে অন্য কিছু নয় সেটুকু যদি পাঠকবর্গ মনে রাখেন তাহলেই আমি কৃতার্থ হব। বয়েস অনেক হল, জীবনের পর্বে পর্বে পরিবর্তনও অনেক দেখলুম। জীবনে অভিজ্ঞতার ঝুলিও ভারী হয়ে উঠেছে আর সেই ভার বইবার ক্ষমতাও দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। এ ত্রুটিটুকু আমি আগেভাগে স্বীকার করে রাখছি। শুধু কি ইতিহাসের পরিবর্তন বা পরিস্থিতির পরিবর্তন এত দ্রুত লয়ে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—পরিবর্তনগুলো ঘটে চলেছে যে তার হিসেব রাখাটাও যেন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই তো সেদিনের ওই সাধারণ 'রেডিও' থেকে বর্তমানের 'আকাশবাণী', বায়োস্কোপ থেকে সিনেমা, জলসা থেকে বিচিত্রানুষ্ঠান, এর যেন শেষ নেই। অতএব যা সুরু হয়েছে—যা চলছে তাকে একদিন আবার থামতেও হয়। আমিও তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।

তাই শেষ করার আগে জ্ঞানীগুণীজনদের কাছে নিবেদন যে এই বইয়ে তথ্যগত ভুলভ্রান্তি যদি কিছু চোখে পড়ে—তা সংশোধন করে দিলে বা আমার জীবনের সঙ্গে জড়ানো যদি কোনও নাম বা বিশেষ কথা বাদ পড়ে থাকে তা যদি এই গ্রন্থের প্রকাশককে লিখে জানিয়ে দেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

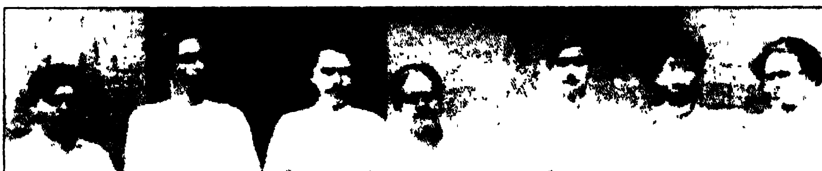
এ বইটি কারুর এতটুকু ভাল লাগলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। তবে বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যোগমায়া প্রকাশনীর শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ, চারু প্রেসের নিরঞ্জন পাল আর এই বইখানির প্রকৃত রচয়িতা আমার দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু সিতাংশু শেখর ঘোষের কাছে—সৌজন্যমূলক ঋণ স্বীকারের কথা উল্লেখ করে, এদের আমি ছোট করবো না। এ বই-এর যা কিছু ভাল—তা সবই এদের ঐকান্তিকতার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। আর যা কিছু ত্রুটি তার দায় আমি আর সিতাংশু দুজনেই ভাগ নিতে অঙ্গীকার বদ্ধ। পাঠকরাই বিচারক—আমি আগে থেকেই আসামী কাঠগড়ায় হাজির রইলাম।

এখানে আমার স্নেহভাজন শ্রী অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই। নানা ব্যস্ততার মধ্যে উনি যেভাবে আমার অতীত দিনের সাঙ্গীতিক প্রশিক্ষণের তথ্য আমাকে জোগাড় করে দিয়েছেন তার জন্যে কোনও সাধুবাদই যথেষ্ট নয়।

আর সবশেষে আমি আমার ভগ্নীসমা শ্রীমতী মীরা ঘোষকে আন্তরিক স্নেহাশিষ জানাই কেননা ওঁর সযত্ন সাহায্য না পেলে বইটি শেষপর্যন্ত ছাপার জন্যে প্রস্তুত করা যেত কিনা, সন্দেহ।

বিমান মুখোপাধ্যায়





উপরের ছবি ঃ বাঁদিক থেকে, ধীরেন দাস, কাজী নজরুল, ভগবতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, তুলসী লাহিড়ী।

নীচের ছবি ঃ বাঁদিক থেকে প্রথম রাজেন সরকার, চতুর্থ ধীরেন দাস, পঞ্চম কমল দাশগুপ্ত, সপ্তম রঞ্জিত রায়।

মুখবন্ধ

আমাদের, বেলা যে যায়। অতএব এই সাঁঝবেলাতে বসে পড়তেই হল—বিমান মুখোপাধ্যায়ের সুরে সুর মেলাতে, তালে তাল মেলাতে। বিশ্বহৃদয়ের পারাবারে, ওর মনের জমানো কথায়, কাছের সুরে—ওরই জীবনবীণার, তার বাঁধতে।

কেননা বিমান নামক একতারাটির একটিমাত্র তারে—ওর সুদীর্ঘ, গোটা জীবনের গানের বেদন—সে যে আর বইতে নারে!

আমরা দুজনেই বেশ বুঝছিলুম। বাংলা গানের ভুবনের ঠিক এখনকার সময়ের, এই 'ছত্রপতি'র নিত্যদিনের গানে, অফুরন্ত গল্পে মশগুল—অগণিত ছাত্রছাত্রী, শ্রোতা, সাঙ্গীতিক সংগঠকরা, অনেক দিন ধরেই চাইছিলেন যে তাঁদের বিমানদার গানগপ্পোগুলোকে ধরে রাখতে হবে—হারিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু বিমান ওসব কথায় কান দিচ্ছিল না—এড়িয়ে যাচ্ছিল। নিজের কথা, সাতকাহন করে বলতে, নিজেকে মেলে ধরতে, চিরদিনই ওর অনীহা। ওর স্বভাবই এই। ঢাকঢোলের প্রচার থেকে লুকিয়ে তো ওর জীবনের চোদ্দ আনাই কেটে গেছে। অথচ সারা জীবনভোর শুধু গান নিয়ে পড়ে থেকেও, নিজের ভেতরকার নিরন্তর সংগ্রামের অবসরে, তার জীবনপাত্র থেকে যে গীতসুধারসের মাধুরি উছলে—পড়ছিল তা অন্তত ভীরু বাসনার অঞ্জলিতেও—ক'জনই বা ভরে নিতে ভিড় করে এসেছে ?

তবে স্বীকার করতেই হবে, যে ভাবেই হোক এই শেষ পারানির কড়ি গোনবার সময়ে, বিমানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ওই দূরের হাওয়া, আজকে, অগণিত গানের

সুরের পাগলাকে, সত্যিই ডাক দিয়েছে। বেতার, দূরদর্শন, পত্রপত্রিকার প্রচার, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণদান বা বর্ষে বর্ষে দলে দলে ছাত্রধারার ঢল—বিমানের কথা ও গানকে আজকে বাঙালি জীবনের যে দৈনন্দিন উপকরণ করে তুলেছে, সেটা আর হেলাফেলা করার নয়।

মনে হল এবার মনে জোর পাচ্ছি। অজয় ভট্টাচার্য-পঙ্কজ মল্লিকের জুটিতে, যে সুর বেজেছিল—তাও আমায় নাড়া দিল। শেষ অভিযানের বেলায়, সোনার গাছে, হীরের ফসল ফলিয়ে, বিমানের হরিৎসাগর যখন এত মুগ্ধমন-প্রাণকে ভুলিয়ে দিচ্ছে—তখন সেই রত্নরাজির যতোটা পারি—এবার ঘরে তুলবোই। বাঁধব আঁটি—বাকি যা নেবার নয়, তা মাটিতে, না হয়, হোক না মাটি! আজ দেবতার আসিশধারা যখন রৌদ্র হয়ে দিচ্ছে সাড়া, তখন বিমান আপন হতে বাহির হয়ে, বাহিরকে কেনই বা ঘরে আনবে না ? তারপর যা হল—তা বিমান মুখোপাধ্যায়ের 'কৈফিয়ৎ'-এই সব বলা আছে। আমার আর বাড়তি বলার কিছু নেই।

তবে এ বইটি লেখার ব্যাপারে—না, না—লেখা নয়, নির্মাণের ব্যাপারে অনেকের কাছ থেকেই আগাম উৎসাহ, সাহায্য পেয়েছি, শুভেচ্ছা পেয়েছি। কারুর কারুর কাছ থেকে, আমিও নিজে সাহায্য চেয়ে নিয়েছি—ফোনে, আলোচনায় বা লেখা থেকে। তাঁদের সকলের কথা, সেভাবে বলা হয়ত মুস্কিল। তবু কয়েকজনের কথা বলতেই হবে। যেমন বিদগ্ধ সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী সুধীর চক্রবর্তী বা সাংস্কৃতিক সাংবাদিক-প্রবর শ্রী স্বপন সোম প্রভৃতি। যেখানেই আটকেছি সেখানেই ওঁদের উপদেশ, আলোকপাত আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ বাড়িয়েছে। তাছাড়া আগাগোড়া আমার বন্ধু পঙ্কজ মল্লিক-বিশেষজ্ঞ শ্রী পরিমল দে, শ্রী অশোককুমার বসু, ডঃ প্রভাতকুমার ঘোষ, শ্রীমতী সুজাতা মিত্র, নীলাক্ষী ঘোষ, ডাঃ আরাত্রিকা রায়, অভিনন্দ ঘোষ, হীরেন্দ্রকুমার মিত্র বা বিশিষ্ট রেকর্ড-সঙ্গীত গবেষক সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় আমাকে যেভাবে উৎসাহিত বা সাহায্য করেছে তা তাদের ভালবাসার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। আমার পক্ষে তাই এদের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার প্রশ্নও নেই।

বিমান আর আমার কথোপকথনের ওপর ভর করে, সমস্ত বইটার গড়নের নির্মিতি। সব ক্ষেত্রে যে বিমানের কথা বা মতামতের সঙ্গে আমার মতের মিল, তাও নয়—বরং সেটাই স্বাভাবিক। কি, কে—ঠিক কোন্ কথাটা বলছে তা পাঠকদের যাতে বুঝতে অসুবিধে না হয়, তার জন্যে বিমানের কথাগুলো তার নামেই চিহ্নিত হয়েছে। আর বাকি যা কিছু আমার নিজের কথা—তার দায়দায়িত্ব যাতে বিমানের ওপর না বর্তায়, সেই কারণে নামবিহীন হেলানো অক্ষরে (ইটালিকস্), আমার বক্তব্য মুদ্রিত হয়েছে। পড়বার সময়ে একথাটা পাঠকদের মনে থাকলে ভাল।

এবার বানান সমস্যা নিয়ে, একটা ব্যাখা দিয়ে রাখা দরকার। তবে, দুর্বল হলেও, অজুহাতটাকে ইচ্ছে করেই নস্যাৎ করিনি। মাঝেমাঝেই দেখা যাবে— একই নামের দুরকম বানান বা একই শব্দের বানান—সাবেকী কিংবা আধুনিক, দুরকমই। বলা বাহুল্য গানের ভুবনের এই গল্পকথা অনেক পুরোন কাল থেকে টেনেছি। তাই

পুরনো বইপত্র, প্রচার পুস্তিকা, রেকর্ড কভার ঘাঁটাঘাঁটি করে—বানানের তারতম্য যা দেখেছি, তাকে গুঁড়িয়ে ফেলে, আধুনিকতার রোলার চালাতে আর চাইনি।

শ্রীমতী আঙুরবালার নামের—আঙ্গুরবালা বানান যেমন অজস্র সূত্রে দেখেছি তেমনি ওঁদের কথার প্রসঙ্গে ওঁদের সময়ের বানানও অনেকক্ষেত্রে অপরিবর্তিত রেখেছি। তবে এই শৃঙ্খলাহীনতা নিশ্চয়ই দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা হবে না, এই ভেবে সমীকরণের পথে আর হাঁটিনি। এখানে আর একটি নিবেদন যে, আমার দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে বিমান আমার সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গে, অনেক ভাল ভাল এবং ভীষণ গুণবাচক বিশেষণ, তার বাচনে ব্যবহার করেছে—আমি বিন্দুমাত্র যার একটারও যোগ্য নই। এমন অনেক বিশেষণের বাহার আমি বহুক্ষেত্রে বাদও দিয়েছি। তবু বিমানের কথার ভাব, ভঙ্গি বা চলন যতোটা সম্ভব বজায় রাখার জন্যে—অনেক জায়গায় তা রাখতেও হয়েছে। এরজন্যে আমি অবশ্যই লজ্জিত, সঙ্কুচিত। তবে, তা থেকে একটা কথা পরিষ্কার হবে যে, মানুষ হিসেবে বিমান কতো উদারচিত্ত, অন্যের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসে কতো মুক্তকণ্ঠ, অন্যের প্রশংসায় কতো অকুণ্ঠিত।

এমনকি অপাত্র হলেও, বিমানের প্রশংসার প্লাবনে ভাঁটা পড়তেও বিশেষ দেখিনি। অভিজ্ঞতার নিরিখে আমি নিজেই তো, আমার সাক্ষী!

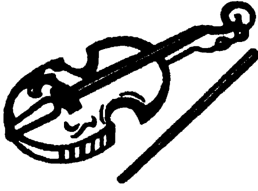
নিরহঙ্কার, আত্মপ্রচারে নিরাসক্ত প্রবীণ মানুষটির এই দুর্লভ চরিত্রগুণের মর্যাদা দিতে তাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু শ্লাঘার কথা আমায় রাখতে হয়েছে। এর জন্যে কুণ্ঠিত হলেও বিমানকে যথাযথ প্রকাশ করার তাগিদে আমাকে হাত গুটিয়ে থাকতে হল বলে, আমি মার্জনাপ্রার্থী।

বিমান মুখোপাধ্যায়ের একক ও লেখকের সঙ্গে ছবিগুলি তুলেছেন শ্রী সলিল দেব, যিনি একজন শারীর-শিক্ষক ও সমাজসেবীও বটে। তাছাড়া পঃ ভাতখণ্ডেজীর পদ্ধতি অনুসারে চারটি গানের স্বরলিপি তৈরি করে দিয়েছেন, ওস্তাদ সাগিরুদ্দিন খাঁ, ধীরেন দাস এবং মুকুন্দ ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র শ্রী দিলীপ বসু। এঁদের দুজনকেই' আমি ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে যাদের অনেক উৎসাহ, তাগাদা আর ভালবাসার দাবীতে—এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হল সেই যোগমায়ার শ্যামলী ঘোষ, সচেতনের নিরঞ্জন পাল বা বর্ণ বিন্যাসের জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা।

১৮৮/১, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড
লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫
দূরভাষ : ২৪১৭-৯৩১৭
২৫-০১-২০০৩

সিতাংশুশেখর ঘোষ



প্রথম পরিচ্ছেদ

গান দিয়ে, বিমান মুখুজ্জের ভুবন জোড়া আসনখানি পাতা রয়েছে। শোভাবাজার পাড়ায়—কলকাতার প্রাচীন বনেদী বাড়ির বিমান মুখোপাধ্যায়। তাই নিরন্তর বেতার, দূরদর্শন, রেকর্ড, ক্যাসেট, টেপ বা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি তার সেই ভুবন খানি—'তখন তারে চিনি, তখন তারে জানি।' একুশ শতাব্দীর গোড়ায় দাঁড়িয়ে এই কথাটাই কত লোকে ভাবে! কিন্তু শিল্পী, শিক্ষক, মজলিশী গানের ভাণ্ডারী বিমান, সব ছাপিয়ে যে অফুরন্ত গল্পেরও ভাঁড়ারী—সেই দিগন্তের ব্যাপ্তিও সীমাহীন। সেখানে কত যে বিচিত্র রঙ-রসের নিবিড় সমারোহ!

সেই নীল দিগন্তে ওই সুরের আগুনে, সৌরভের শিখায়—আকাশেরও ধাঁধা লাগে। আর তাতে অনেক কালের মনের কথা যে জেগে ওঠে—তা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শুনে, মনে হত, বিমানেরও ওই দিগন্ত এখন উন্মোচনের সময় হয়েছে। নিজেকে নিয়ে জাল বোনারও সময় এসে গেছে। মনে হত, যত বড় সুরের গুরু বা বাংলাগানের ধারক, বাহক, প্রচারক হোক না কেন—যারা বিমানকে ঘরোয়াভাবে জেনেছে—তারা জানে যে মানুষ হিসেবে বিমান আরও অনেক বড়, অনেক ব্যাপক। জলসা, আসর মাৎ করার ওস্তাদিতে তাকে হয়ত বা কখনও কোন প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার একটু মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু হার্দিক রসায়নের পাঠশালায় তার অনাবিল প্রাণসম্পদ যে বাজীমাৎ করতে একেবারে অবারিত, অপ্রতিরোধ্য-তাতে কোনও তর্ক নেই, না, তার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই।

ইদানীং এখানে-ওখানে অবরে-সবরে কোথাও যে এলোমেলো আলাপ আলোচনা হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো মনিমুক্তোও কুড়িয়ে বাড়িয়ে এক সূতোয় না গেঁথে সাজালে তার ঔজ্জ্বল্য তো সবটা ছড়ায় না বা তার নিজস্ব রূপ, অন্তর্নিহিত সত্যও সেভাবে বিকশিত হয় না। তাই অনেক দিন থেকেই ভাবনা চিন্তা চলছিল। দুজনের মধ্যে বয়সের অল্প স্বল্প কম বেশি থাকলেও, সৌহার্দ্যের সূত্রে কথাটি কিভাবে পাড়ব ভাবছিলাম। একদিন সুযোগ পেতে কথাটা বিমানের কাছে ঝপ করে পেড়ে ফেলতে আর আটকালো না; সতেরই মে, দু'হাজার এক।

বিমানের ঘরে অনেক দিনের দুই বন্ধু—একজন স্বনামখ্যাত প্রবীণ অন্যজন খ্যাতিবিহীন কিন্তু প্রবীণতর। বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয়, 'পুরাতন প্রসঙ্গ'—গ্রন্থের অবিস্মরণীয় কথাকার বিপিন বিহারী গুপ্তের স্টাইলে শুরু করাটাই নিরাপদ বোধ করলাম। যেমন ২৪শে আশ্বিন ১৩১৭ সালের তারিখ দিয়ে বিপিন বিহারী লিখছেন— ''বীডন উদ্যানে একখানি বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়কে দেখিয়া তাহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—'বসো।' আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। দু একটি কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আপনার কখনও কোন বিষয়ে 'Controversy হইয়াছিল কি ?' তিনি বলিলেন, —'হ্যাঁ, হইয়াছিল।' একথা আজ কেন জিজ্ঞাসা করিলে বল দেখি ?'' আমাদেরও এইভাবেই শুরু হয়ে গেল।

এইরকম আমি বিমানের ঘরে উপবেশন করিয়া, দু একটি কথার পর তাহাকে বলিলাম—*দেখ, শোভাবাজার উত্তর কলকাতার এক সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রাচীন অঞ্চল। তুমি এখানে জন্মেছ—এখানেই তুমি এতদিন বসবাস করে আজ প্রবীণ নাগরিকদের পালে ঢুকে পড়েছ। আজ তোমার সাঙ্গীতিক ছটায় ছেলে বুড়ো সবাই মুগ্ধ—। শিল্পীমহলে বা সাধারণ মানুষের কাছে তোমার কত জনপ্রিয়তা, কত নাম। তাই, সেকালের মানুষ হিসেবে তোমাদের সেই ছোটবেলার শোভাবাজারের কথা, কলকাতার কথা,-এই শোভাবাজারে বা যেখানে যেখানে থাকতে—সেসব জায়গার পরিবেশ কি রকম ছিল বা গান বাজনার পরিমণ্ডল কেমন ছিল, কার কার কাছ থেকে গান শিখেছিলে বা গান শেখার প্রেরণার বীজ কোথায় কি রকমভাবে ছড়িয়ে ছিল, মানুষ জন কেমন ছিল—সেই পুরানো দিনের প্রায় হারিয়ে যাওয়া গল্প-ঘটনা কিছু বলো না। এখনকার ছেলেমেয়েরা সেসব জানতে পারলে পুরনোকে ভালবাসতে শিখবে আর তার ফলে পুরনো কালের সম্পদকে আঁকড়ে ধরে বাঁচিয়ে রাখতেও আগ্রহী হবে। যার একটা হল, তোমার ওই পুরনো দিনের বাংলা গান—যা নিয়ে তোমার জীবন।*

শুরু হল জবাব, বিমানের।

বিমান—শোন ভাই সিতাংশু—তোমার সঙ্গে আমার বহুদিনের সম্পর্ক। যোগাযোগ, জানাজানি, মানামানি, টানাটানি, কানাকানি যা কিছু বলো। তুমি আমার অনেক কিছু জানো—তবে জানি আমার মুখ থেকে শুনলে তুমি আরো খুশি হবে। তুমি আমার বাড়ির উল্টোদিকে—গঙ্গার অপর পারে, শালকের ছেলে। তুমি গঙ্গার ওপারে শালকে থেকে গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতা আসতে—কতোদিনের যোগাযোগ রয়েছে—তুমি যা কিছু শুনতে চাও—তা নিশ্চয় বলব।

আমি একেবারে সেই পুরোনো কলকাতার।—সেতো তুমি জানোই। আমাদের এই বাড়িটাকে বাহ্যিক দেখেও বুঝতে পারছ-- বহু প্রাচীন, প্রায় ৩০০ বছরের। এই যে ঘর—যেখানে আমরা বসে রয়েছি—আগে সিমেন্টের ছিল না, কাদা, চুন, বালী

ঘেঁষের গাঁথুনি ছিল পরে সিমেন্টের হয়েছে। এ বাড়িটা ক্রয় করেছিল আমার কোন এক পূর্বপুরুষ—তবে আসলে এর পাশের বাড়িটা অরিজিন্যালী আমাদের ছিল। এ কথাগুলো আমার অবশ্য শোনা। আমার জন্মাবার বা আমার বাবার জন্মাবারও আগে (আমার বাবার জন্ম ১৯০৪ সালে) আমার এক পূর্বপুরুষ তখনকার দিনের এক 'সুবর্ণবনিক' ব্যবসায়ী বৃন্দাবন বসাকের কাছ থেকে এ বাড়িটা কিনেছিলেন। এখন আমরা আগেকার কালের অনেক মুখের ভাষা, নিত্য ব্যবহারের শব্দ হারিয়ে ফেলেছি বা ফেলছি। অনেক সব নামটাম পাল্টে দিয়েছি—যেমন সোনার গয়না গড়ার স্যাকরা কে বলছি স্বর্ণশিল্পী। বেঁশ্যাকে যৌনকর্মী নাম দিয়েছি। এত সব নামটাম, সব কিছুর সাথে কি রকম পাল্টে যাচ্ছে!

আচ্ছা বৃন্দাবন বসাকের নামে একটা রাস্তা আছে না ?

বিমান—হ্যাঁ। আবার এই অংশটা নতুনকরে সারিয়ে ঠিকঠাক করেছিলেন আমার ঠাকুর্দা ৺গোকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শুনেছি, মনে আছে সে প্রায় ১০০-র বেশি বছর আগেকার সেই ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ সালের কথা। আমাদের বাড়িতে গান বাজনার পাঠ শুরু হয়েছিল, যতদূর জানি, আমার ঠাকুরদার বাবা ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সময় থেকে। তবে এরও আগে ছিলেন ৺রামহরি মুখোপাধ্যায়—আমার প্রপিতামহর ঠাকুরদা। বিষ্ণুপুরের 'মদনমোহন' মন্দিরে গান করতেন।

বাগবাজারের গোকুল মিত্র স্বেচ্ছায় বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহের কাছ থেকে 'মদনমোহন' বিগ্রহ কলকাতায় এনে বাগবাজারের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তারই সমসাময়িক কালে—একই সঙ্গে বিষ্ণুপুর থেকে রাধা মূর্তিটি নিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে এই গোপীনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল—গৃহদেবতা হিসেবে আজও আমাদের বাড়িতে যার নিত্য সেবা পূজাপাঠ হচ্ছে। গৃহদেবতা কৃষ্ণ—তাই পাঠ, কীর্ত্তন, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অনুষ্ঠান—আমাদের বাড়িতে বরাবর লেগেই থাকে। আগে অবশ্য বর্তমানের ঘরটাতে উনি ছিলেন না—এর পাশের একটা ঘরে ছিলেন। এই ঘরটাতে, আমার ঠাকুরদাদার বাবা ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় একটু সাজিয়ে গুছিয়ে, ডেকরেশন করে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যাই হোক আমার ঠাকুরদার বাবা ভক্তিমূলক গানটান গাইতেন তবে নিতান্ত ভক্তসুলভ ভাবে ওই কীর্ত্তন গানে মগ্ন হতেন। অভ্যাস ছিল। কিন্তু আমার ঠাকুরদা তখনকার দিনে গালার ব্যবসা করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে মোটামুটি ভালোই অর্থ উপার্জন করেছিলেন। সেযুগে তিনি কিন্তু একটা বড় অর্গ্যান কিনে ছিলেন। সেই অর্গ্যান বাজিয়ে তিনি রীতিমত গানটান গাইতেন। আর আমার ঠাকুরদাদার সহকর্মী বন্ধু ছিলেন সেকালের বিখ্যাত গায়ক এম. এন. ঘোষ....

মন্তাবাবু ? যার গানের অনেক জনপ্রিয় রেকর্ডও ছিল।

বিমান—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই মন্তাবাবু। আমাদের বাড়িতে সবাই তাঁকে মন্তাবাবু বলেই ডাকতো......

তাঁর গানের ডালিতে যে কতো বিভিন্ন জাতের গান ছিল তা ভাবলে অবাক লাগে।


এম এন ঘোষ (মন্তাবাবু)

আর কি সব জনপ্রিয় গান। ভক্তিমূলক গান যেমন-—কোলে তুলে নে মা কালী, কি ধন তোমারে দিতে পারি শ্যামা, ভবে সেই যে পরমানন্দ, সদানন্দময়ী কালী। আবার কমিকগান যেমন—ওই পয়সা উড়ে যায়, এই সহর কলকাতায়; দিবসে নিশিতে নিয়ত ভোজনে, পাঁঠা খেতে কেন পাই না; কেন বঞ্চিত হব ভোজনে। আবার কি গভীরতম চেতনার গান-—'বৃথা ভবে খেলতে এলি তাস/এমন কাগজ পেয়ে অলপেয়ে কেন ডাকলিনি ইস্ত ছক পঞ্চাশ। হাতের রঙ থাকতে, এ তুই খেললি এ কিরূপ/এবে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে, মারবেরে তুরুপ/কি সে বলরে এবার, পিট পাবিরে আর, হাতের সকল ফেরাই তুই, দিলি যে রে পাশ'। এই হল মন্তাবাবু, সেকালে যার জুড়ি ছিল না।

বিমান—তখন আমাদের বাড়িতে প্রতি শনিবার, রবিবার গানের আড্ডা বসত এবং আমাদের ঠাকুরের রাসে, দোলে আর জন্মাষ্টমীতে বেশ হৈ চৈ করে উৎসব হত। তাছাড়া আমার বাবার এক মামা মানে আমার ঠাকুরদাদার এক শালা, আসলে ঠাকুরমার সেজভাই, ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সঙ্গীত জগতে, নাট্যজগতে উৎসববাবু নামেই যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন।

আরে এঁরই লেখা সেই বিখ্যাত গান রয়েছে—আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা—যা আজো সিনেমা, রেকর্ডে খুবই জনপ্রিয়, তাই না ?

বিমান—হ্যাঁ, তিনি ছিলেন তখনকার দিনের গ্র্যাজুয়েট আবার গান বাজনার ব্যাপারেও যথেষ্ট জমাটি। তিনি আসতেন প্রতি শনিবার রবিবার গানের আসরে। ওই রকম বহু বন্ধু গায়ক গায়িকা এসে আমাদের বাড়িতে গান করত। ওই আসর জমাতো।

মান্তা বা মন্তাবাবু ছিলেন বিশ্বনাথ রাও-এর চেলা, ছাত্র। বিশ্বনাথ রাও সে সময়ের একজন বড় হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক। লালচাঁদ বড়ালও এঁর একজন শিষ্য ছিলেন। খুব পুরোনো দিনের রেকর্ডে তাঁর গান এখনো শোনা যায়। খেয়াল, ঠুংরী, ধ্রুপদই তিনি বেশি গাইতেন। কয়েকটা গান তো খুব বিখ্যাত হয়েছিল—'হর হর ব্যোম শিবশংকর', 'শশধর তিলকধারী'—'এমন দিন কি হবে তারা'। আমার ঠাকুরদা অর্গানে কতো সময় তাঁর গানে সঙ্গ দিতেন। ওঁরা সব এলে বাড়ির আসর খুব জমত। আমাদের ঠাকুরের রাসে, দোলে, জন্মাষ্টমীর উৎসবে খুব গানটান হত। এই রাস দোলের গান, এখান থেকেই আবার যাত্রা থিয়েটারও হত। আমার বাবার আমলেও আমি দেখেছি ছোট বেলায় অর্থাৎ আজ থেকে ৬০/৬৫ বছর আগে নিজেরা মঞ্চ বেঁধে—সকলে মিলে নিয়মিত যাত্রা থিয়েটার নামানো হত। তবে আসরে যাত্রাই বেশি হত। সারা বছর রিহার্সাল গান—বিভিন্ন জায়গায় অ্যামেচার পার্টির মত এই যাত্রা হত। এর-ওর বাড়িতে, বড়লোকের

বাড়িতে, শোভাবাজারের রাজার বাড়িতে, সিমলের নানেদের বাড়িতে, কেষ্ট সরকারের বাড়িতে এরকম সব। তখনকার দিনে আমি শুনেছি স্বর্ণবাঈ নামে একজন বিখ্যাত বাঈজি ছিলেন। আর একজন খুব নামকরা বাঈজি ছিলেন—পিঠজান বাঈ—তিনি গহরজানের সঙ্গে পাল্লা দিতেন, পাল্লা দিতেন গানে কিন্তু গহরজানের কাছে তিনি হেরে যেতেন একটা জায়গায়—গহরজানের মত রূপসী তিনি ছিলেন না। বহুজায়গায় গহরজানের কাছে তাঁর পরাজয়ের একটাই কারণ ছিল—গহরজান রূপে আক্কেক মেরে দিতেন। আমি শুনেছি তাঁর নাকি অপূর্ব রূপ ছিল। বাবার এক ঠাকুর্দাদা–ছোটঠাকুর্দা ত্রৈলক্য মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তখনকার দিনে ওরকম বাঈজি বাড়িতে....

ইনিই কি ওই কঙ্কাবতীর বিখ্যাত লেখক ত্রৈলক্যনাথ ?

বিমান—না, না। উনি আমার বাবার ছোট ঠাকুর্দা। আজ থেকে প্রায় চারপুরুষ আগেকার কথা। তাঁর সঙ্গে স্বর্ণবাঈ-এর খুব হৃদ্যতা ছিল। সেই সূত্রে উনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। যার ফলে উনি বলে দিলে, অন্যান্য দুচারজন ছোটখাটো বাঈজিও আমাদের বাড়িতে চলে আসতেন। স্বর্ণবাঈ দুএকটা আসরে, আমাদের বাড়িতে এমনই গান করে গেছেন যে তৎকালীন লোকেরা মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর রূপ দেখে বা 'ভাওবাৎলান' দেখে—তখনকার দিনে অবশ্য যেরকম ছিল, মাইকও ছিল না, কিছুই না—তার সঙ্গে একজন, তাঁদের বলা হত 'ভেড়ো' তারা হারমনিয়ামের সঙ্গে থাকতেন। আর একজন সঙ্গতদারদের সঙ্গে থাকতো, মাঝে মাঝে একটা করে তান মারা হত, ওই গানের সঙ্গে সুরটা ধরে ধরে রাখতো, তাদের বলা হতো 'পোঁ ধরা'। মাঝে মাঝেই তাদের বলা হত আমার সঙ্গে পোঁ ধরবি, মানে আমার সঙ্গে একটু গলা মেলাবি। এই গাওনার ভাষাগুলো আজকাল সব লোপ পেয়ে গেছে—যেমন এই 'ভেড়ো, পোঁ-ধরা'। অবশ্য এগুলো আমি যা বলছি এ সব আমার শোনা। কিন্তু আমার দেখা যেটা, যা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম.........

—কিন্তু তোমরা এখানে আসার আগে, কোথাকার মানে তোমাদের দেশ কোথায় ?

বিমান—হ্যাঁ, এটা একটা ভাল প্রশ্ন করেছ। আমাদের অরিজিনাল দেশ হল খড়দা। আমরা হলাম আসলে খড়দার লোক। তখন দুজায়গায় মুখুজ্জেদের খুব নাম-ডাক ছিল। জনাই-এর মুখুজ্জে—ওরা গঙ্গার ওপারে আর এপারে আমরা খড়দার মুখুজ্জে। অনেকদিন আগেই আমরা এখানে চলে এসেছি। খড়দায় জমিজায়গা কিছু ছিল। তা, পরে সেগুলো বেহাত হয়ে যায়, না দেখাশুনার ফলে। আমার জ্যেঠামশাই খুব চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে সব কিছু উদ্ধার করতে পারেন নি। সে যাই হোক, এই হচ্ছে আমাদের আদিকালের কথা।

আচ্ছা আহিরীটোলার দিকেও তো তোমাদের আরো কিছু বাড়িটাড়ি ছিল বলে শুনেছিলুম--তাই কি ?

বিমান—সে আর একটা কথা। আহিরীটোলা নয়, বেনেটোলার দিকে, ওইটা হল আমাদের আর এক শরিকদের। সে যুগের সশস্ত্র বিপ্লবীদের দলের সঙ্গে

ওতোপ্রতোভাবে জড়িত, তখন যাদের বলত অ্যানার্কিস্ট। এঁদের একজন হলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

উনিই কি সেই বাঘাযতীন, অরবিন্দ ঘোষ, মানবেন্দ্র রায়ের সহকর্মী, যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির নেতা, সমাজসেবী ডাক্তার, বিখ্যাত সাহিত্যিক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়েব অগ্রজ ?

বিমান—হ্যাঁ ঠিক ধরেছ। যাদুগোপাল, রামহরি মুখুজ্জে, এঁরা বেনেটোলায় ছিলেন। আমাদের আর এক শরিক। এঁদের মধ্যে শেষ শরিক ছিলেন দুলীচাঁদ মুখার্জি। ইংরেজরা রাজনৈতিক কারণে যাদুগোপাল মুখার্জিকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করার পর উনি রাঁচীতেই পাকাপাকি ভাবে, থেকে যান। ওঁর লেখা কয়েকটি বই যেমন, 'ভারতের সমরসঙ্কট', 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' বেশ নাম করেছিল, তেমনি দরদী চিকিৎসক ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশারদ হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। আমাদের বাড়ির সঙ্গে এখনো যোগাযোগ আছে। ওঁর দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে 'নীলেন্দু' এখন রাঁচীর নামকরা ডাক্তার, ছোটছেলে 'শীলেন্দু' অবশ্য এখনো বাগবাজারেই থাকে। আমাদের বাড়ির প্রতি কাজে আসে, দেখা সাক্ষাৎ হয়। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের কাছে যে কালীবাড়ি আছে ওটাই আমার ঠাকুমার বাপের বাড়ি। আমার ঠাকুর্দার কথা এইখানে একটু বলি।

আমার ঠাকুর্দা ৺গোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খুবই সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তখনকার দিনে আর্টিষ্ট বা শিল্পীদের কোন টাকাপয়সা দেওয়া হতনা। আর্টিষ্টদের অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে তখন কেউ বলত—কজ্জী ডুবিয়ে খাব, কেউ আবার বলত ভরপেট্টা খাব। তা শনিবার রবিবার গানের আসর বসত—সেখানে বাজনাও হত। পরিতোষ শীল যে-বিখ্যাত বেহালা বাদক ছিলেন এঁর এক কাকা ছিলেন সুরেন্দ্র নাথ শীল দর্জিপাড়ায় ব্যণ্ড মাস্টার ছিলেন, ডাইরেক্টর এস.এন.শীল—তাঁর পুরোনো দিনের রেকর্ড পাওয়া যায়। অর্থাৎ সুরেন্দ্র নাথ শীল। আমার ঠাকুর্দা অনেক রকম বাজনা বাজাতে পারতেন। তা আমাদের বাড়িতে আমার ঠাকুরদাদার সঙ্গে বিখ্যাত ধনী হরেন শীল—যার বাড়িতে এখন ওই লোহিয়া হাঁসপাতাল হয়েছে গনেশ টকীর কাছে, তার বাড়ির গেটের মাথায় সিংহ রয়েছে.......

একেবারে লাটসাহেবের বাড়ির গেটের মত—এইরকম করেছিলেন। এনিয়ে মামলাও হয়েছিল। সে এক গল্প বটে—মামলায় বলা হল যে তুমি ওই লাটসাহেবের বাড়ির মত গেটের মাথায় সিংহ রাখতে পারো না। হরেন শীলের পক্ষে সে যুগের খুব বিখ্যাত এক আইনজ্ঞ দাঁড়ালেন—তার নামটা ঠিক মনে পড়েছে না।

শেষকালে রফা হল—আচ্ছা একটু অন্ততঃ, অন্যরকম করে দাও। রাজভবনের সিংহের ল্যাজটা যে দিকে ঘোরানো আছে—তোমার সিংহের ল্যাজটা উল্টো দিকে অন্য রকম মুড়ে দাও। আর থাবাগুলো, ডান পা বাঁ পাগুলো অন্যভাবে করে দাও—তাহলেই চলবে। তখনকার দিনের বড়লোকদের এরকম সব অনেক গল্প ছিল। তা এই, হরেন শীল খুব ভাল বীণা বাজাতেন। এবং একটা কথা বলি, এই

উত্তর কলকাতায় গানবাজনার প্রচারে হরেন শীলের খুব অবদান ছিল। আজকের বিখ্যাত মান্না দের কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে হরেন শীলের আত্মীয় ছিলেন। হরেন শীলের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আনুকূল্যে কেষ্টবাবু সঙ্গীত জগতে অনেকটা প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিলেন। এই কেষ্টবাবু অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র দে—অন্ধ গায়ক বলা হত সেকালে।

ব্লাইন্ড সিঙ্গার লেখা থাকত রেকর্ডে কাগজপত্রে।

বিমান—এই হরেন শীল ভাই, আমাদের বাড়িতে এসে গান বাজনা করতেন। ঠাকুরদাদার সঙ্গে জানাশোনা ছিল। পরে আমার বাবা ওঁর খুব ঘনিষ্ঠ হন। যখন ওঁর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে গিয়েছিল তারও পরে তাঁর ছেলে, পরবর্তী কালে উমাপতি শীল মস্তবড় সঙ্গীত পরিচালক হয়েছিলেন। তিনি সম্প্রতি ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। প্রথমে সুবল দাশগুপ্ত, কমল দাশগুপ্তের সহকারী ছিলেন।

কানন দেবীর তো খুব ফেবারিট ছিলেন, ওঁর অনেক ছবিতেই কাজ করেছেন।

বিমান—হ্যাঁ পরে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেক কাজ করেছেন এবং বেশ কিছু ছবিতেও কাজ করেছেন।

তার মানে উমাপতি শীল সেই ঐতিহ্যবাহী হরেন শীলের ছেলে। এতো সব একেবারে গল্প!

বিমান—না। ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে বউবাজারের বড়াল বাড়ির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথাটা বলি অর্থাৎ রাইচাঁদ বড়ালদের বাড়ি বা লালচাঁদ বড়ালদের বাড়ির কথা।

কৃতী অ্যাটর্নী নবীন চাঁদের ছেলে লালচাঁদ (১৮৭০-১৯০৭) সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজেই পিয়ানো শিখেছিলেন। পরে মুরারী গুপ্তের কাছে মৃদঙ্গ, বিশ্বনাথ রাও কাশীনাথ মিশ্রের কাছে ধ্রুপদ আর নন্দে খাঁ গুরুপ্রসাদ মিত্রের কাছে খেয়াল শিখে পরিবারে একটা গানের পরিমণ্ডল গড়ে ফেলেছিলেন। অন্যদিকে কাষ্টমস্ হাউসের ট্রেজারারের কাজও করে, সমাজে একজন ধনী, গান বাজনার পৃষ্ঠপোষক, সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। রেকর্ডে তাঁর অনেক গান তো এখনো প্রবাদের মত হয়ে আছে যেমন—ধিনতা ধিননা পাকানোনা, কাদের কুলের বৌ, অনুগতজনে কেন—এমনি সব কতো। তার তিন ছেলেও তাই গানবাজনার জগতে ঢুকে পড়েছিল। কিষণচাঁদ, বিষণচাঁদ (বাঙ্গুবাবু), রাইচাঁদ মিলে বড়াল বাড়ি গানবাজনার আখড়া হয়ে উঠেছিল। বিষণ চাঁদ তো দারুণ সরোদ বাজাতেন। ওস্তাদ আলি খাঁ সাহেবের একেবারে ডান হাত।

বিমান—রাইচাঁদ বড়ালের ভগ্নীপতি আমাদের পাড়ায় থাকতেন। তার নাম যুগল কিশোর সেন। যুগল সেন, খুব ধনী, রাইচাঁদের এক দিদির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এই যুগল সেন আমার বাবাকে খুব স্নেহ করতেন—বাবা তাকে যুগলদা বলতেন। রাইচাঁদ বড়াল এই যুগল সেনের বাড়িতে এসে থাকতেন এবং তবলা টবলা প্র্যাকটিস করতেন। মজিদ খাঁর কাছে এই বাড়িতেই তালিম নিতেন। এই যুগল সেনের বাড়িতে তখন মীনা পেশোয়ারী নামে এক অত্যন্ত সুপুরুষ মুসলমান ভদ্রলোক



রাইচাঁদ বড়াল

আসতেন তাঁর ব্যবসা-ট্যাবসা বা টাকা পয়সা যথেষ্ট ছিল (ফলের ব্যবসায়ী)। তিনি যুগল সেনের বাড়িতে শাহানশা নামে একটি রেকর্ড কোম্পানীও খুলেছিলেন। আর সেই রেকর্ড কোম্পানীর রিহার্সালরুমও এই যুগল সেনের বাড়িতেই হয়েছিল। কিছুদিন হয়ত চলেও ছিল। আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে, ওয়েলসলি স্ট্রীটে ক্রাউন সিনেমার পাশে একটা রেকর্ডের দোকানের কাঠের দরজার গায়ে আমি শাহানশা রেকর্ড কোম্পানীর একটা সাইনবোর্ড দেখেছি—পুরোনো মরচে ধরা, একটা টিনের সাইন বোর্ড, রঙচটা—পেরেক ঠুকে তখনো লাগানো ছিল।

এই শাহানশা রেকর্ড কোম্পানীতে, আজ আমি তোমাকে বলে রাখছি, সুবল দাশগুপ্ত মাত্র ১০-১১ বছর বয়সেই কয়েকটা রেকর্ডে তবলা বাজিয়েছিলেন। সুবল দাশগুপ্তের জন্ম ১৯১৪ সনে। যতদূর মনে পড়ছে সেই ১৯১৪ সালে তিনি রাইবাবুর পিয়ানোর সঙ্গে ওই শাহানশা রেকর্ডে তবলা সঙ্গত করেছিলেন। হয়ত রাইবাবুই ছোটছেলে সুবলের জন্য এই সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তখন রাইচাঁদের অনেক রেকর্ড বেরোতো. লেখা থাকত Piano-R.C. Boral। এরকম আমি বাবার মুখে শুনেছি। রাইবাবু খুবই ভাল পিয়ানো বাজাতেন। পরে লেখা থাকত রাইচাঁদ বড়াল নিউ থিয়েটার্স। তখন তো রেকর্ডে কে কি সঙ্গত করত এসব কারুরই নাম থাকত না। তবে হ্যাঁ, এখন অবশ্য অনেক কিছু বদলেছে—কিছু কিছু অন্য নাম থাকে, যার জন্য আমরা অনেকের নাম জানতে পারছি। তখন আমাদের পাড়াতে অনেক মাঠ-ঘাট ছিল। নিয়মিত ফুটবল খেলা, ক্যারাম কম্পিটিশন খুব হত। কিন্তু পুজোর সময় মানে দুর্গাপুজো, দোলহোলি এই সব সময় চারধারে গানবাজনাটা একেবারে বাঁধা ছিল। মানে খুব গানবাজনা এবং নাটকের, যাকে বলে একটা পাড়া ছিল। নাটকের, তখন খুব চলও ছিল। আমার বাবা যখন যুবক, তখনকার দিনের পক্ষে বাবা খুব আধুনিক ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ি তখন বাবার খুবই যাতায়াত।

তা, ওখানে উনি যেতেন কি সূত্রে ? ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের সঙ্গে অমন যোগাযোগ—এসব তো দারুণ গল্প। এই প্রসঙ্গে তোমার বাবার বিষয় একটু ভাল করে, বলো না।

বিমান—আমার বাবা সুবল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওই ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে যেখানে রবীন্দ্রনাথও ভর্তি হয়েছিলেন, সেখানে পড়তেন। ওখান থেকে পাশ করে সিটি কলেজে গেলেন। সেখানে স্বর্ণকুমারী দেবীর দৌহিত্র দীপক চৌধুরীও তখন ছাত্র। বাবার সঙ্গে দীপক চৌধুরীর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এত ঘনিষ্ঠ যে প্রায়ই তিনি বাবাকে বলতেন, তুই এত ভাল গান করিস। তুই আমাদের বাড়ি চল না। আমার দিদিমার কাছে কত গাইয়ে বাজিয়ে আসে তাদের সব দেখবি। দিদিমার কাছে তোকে নিয়ে যাব।

তা তোমার বাবা অত কম বয়সে ওরকম ভাল গান টান শিখলেন কি করে ?

বিমান—আমার বাবার প্রথম গান শেখা সেকালের বিখ্যাত খেয়ালী ধ্রুপদ গায়ক সাতকড়ি মালাকারের কাছে। অন্ধ গায়ক সাতকড়ি মালাকার। এঁর কাছে সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী বা অন্য কত গুণীই তো গান শিখেছেন। আমি যে সময়কার কথা বলছি সে সময় উনি দর্জিপাড়ার কাঠমার বাগানের কাছে (মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট) থাকতেন। কিন্তু শুনে অবাক হবে যে শেষ জীবনে তিনি আমাদের বাড়িতেই অনেকদিন থেকেছেন।

তা উনি কি জন্মান্ধ ছিলেন ? এমনভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতই বা শিখলেন কার কাছে ? এখন তো কেউ তাঁর নামও শোনে নি, লোকে তাকে চেনেও না অথচ অতবড় সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর কথা তো ভাই একটু শোনা দরকার। এটুকু জানি যে বোলপুরের কাছে ভেদিয়াতে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম। ছোট বেলা থেকেই পিতৃহীন তাই লেখাপড়াও কিছু হয় নি। পারিবারিক পেশায় শোলার কাজে, কাকার কাছে কাজ করেই তার শিশু শ্রমজীবির জীবন। বংশে কোনওরকম গান বাজনার চল ছিল না। তাহলে পরবর্তী জীবনটায় কি করে কি হল, সব তো অন্ধকারে—

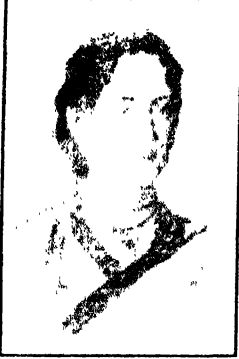
বিমান—জন্মান্ধ নন, ছোটবেলাতেই বসন্ত মারীগুটিকায় তাঁর চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুখেও বসন্তের দাগ গর্ত দেখেছি। দৈবাত্‌ই তাঁর গলায় স্বাভাবিক সুরের খেলা শুনে, গানবাজনা করতেন তুলসী চট্টোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক, ওঁকে তখনকার দিনের গুণী ধ্রুপদী টপ্পা গায়ক গোপাল চক্রবর্তী, যাঁকে সবাই নুলো গোপাল বলে জানত, তাঁর কাছে সাতকড়িকে নিয়ে গেলেন। তারপর নুলো গোপালের কাছে সাতকড়ির ৫/৬ বছরের শিক্ষা।

নুলো গোপাল ? এর কাছেই তো রাধিকা গোস্বামী, আলাউদ্দীন খাঁ এঁরাও শিখেছিলেন।

বিমান—তা ছাড়া মেটেবুরুজে থাকতেন পিয়ারা খাঁ যাঁর গান অনেকটা আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের মত ছিল। লক্ষ্ণৌ থেকে ওয়াজেদ আলীর সঙ্গে যে সব গাইয়ে বাজিয়ে পরিবারের দল মেটেবুরুজে আস্তানা গেড়েছিলেন সেইরকম পরিবারের এই পিয়ারা সাহেবের কাছে—তাঁর শেষ বয়সে, সাতকড়ি বেশ কিছু তালিম পেয়েছিলেন। কিন্তু এই গুণী শিল্পী, কোনদিনই যেমন লোকের কাছে সেরকম মান মর্যাদা পাননি তেমনি আর্থিক দূরবস্থাও কখনো ঘোচেনি।

পুরোনো লেখালিখি থেকে দেখেছি মাত্র একবার নাকি তিনি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে গান গাইবার ডাক পেয়েছিলেন। তা না হলে ছোটখাট অনুষ্ঠান বা ঘরোয়া আসরে বিনা পারিশ্রমিকে মাঝে মধ্যে গান গেয়েই তার দুঃখের জীবনটা গড়িয়ে গেছে।

বিমান—হ্যাঁ সেইরকম কোন সঙ্কটের দিনে শেষ জীবনে আমাদেরই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন, অন্য কোথাও তাঁর মত শিল্পীর আর কোন আশ্রয় জোটেনি।


স্বর্ণকুমারীদেবী

তাঁর স্ত্রী পুত্র কেউ ছিল না ?

বিমান—না, সে সময় তাঁর স্ত্রী জীবিত ছিলেন না যদিও শুনেছিলুম তিনি দুবার বিয়ে করেছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল, নাতিদেরও মাঝে মাঝে আসতে দেখেছি কিন্তু ওই পর্যন্ত। তাঁর মেয়েও ছিল, তারাও কেউ বাবাকে দেখাশোনার দায় নেয়নি। অতবড় গায়ক কিন্তু তাঁর সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসেনি ওই চরম দূরবস্থার দিনে। আমাদের বাড়িতে থাকতেন এই উত্তর কলকাতায়। খেতে ডাকলে, আমি দেখেছি, কি রকম হাতড়াতে হাতড়াতে বাইরে থেকে ভেতর বাড়িতে আসতেন। এই অবস্থার মধ্যে একবার একটা কাণ্ড ঘটে গেল। অন্ধ ছিলেন বলে অনেক সময় যেখানে থাকতেন, সেই ঘরটার জায়গা নোংরা করে ফেলতেন। একদিন এইরকম কিছু হয়ে যাবার পর, আমার কাকা হঠাৎ দারুণ রেগে গিয়ে, তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। তখন থেকে পাশের বস্তির রাস্তায় আশ্রয় নিলেন সাতকড়ি। শেষ বয়সে এইরকম অপমানে, অবহেলিত অবস্থায় তিনি, যাকে বলে একরকম প্রায় রাস্তায় পড়ে থেকে, সেখানেই শুয়ে একদিন মারা গেলেন। দেখ ভাই, এই কথাগুলো যে আমরা বলাবলি করছি এগুলো সব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সব হারিয়ে যাবে। তাই আমি চাইছি এই কথাগুলো সব থাকুক। যেন হারিয়ে না যায়।

আরে সেই উদ্দেশ্যেই তো আমাদের এই কথাবার্তা।

বিমান—হ্যা, ওই যে আগে বলেছি এসময়টায়, মানে ১৯২৩ থেকে আমার বাবা নিয়মিতই স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। মনে আছে একদিন বাবা বলেছিলেন 'স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ি গিয়ে আমার মনে হল আমি যেন একটা ডোবা থেকে একটা সাগরে এসে পৌঁছলাম।'

তাঁদের বাড়ির সংস্কৃতি, পরিবেশ, আচার আচরণ সবই যে কি রকম, আমি অবাক হয়ে গেলুম, অন্য রকম ছিল। বাবা বলতেন—যেমন তখন লোকে এমনি ধুতি পরত কিন্তু কজনই জানত যে ধুতির নিচে একটা আন্ডারওয়ার পরতে হয়। এটা ঠাকুর বাড়ি থেকে শেখা হয়েছিল।

স্বর্ণকুমারী দেবীব বাড়িতে তখন আমার বাবা, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য অভিনেতা জীবন গাঙ্গুলী, নরেশ মিত্র এঁরা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বাবা বলতেন আমি সেখানে এক কোণে বসে থাকতুম, দেখতুম। স্বর্ণকুমারী দেবীর মত অমন ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা আমি জীবনে আর দেখিনি। আমার বাবাকে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম দিন থেকেই ছেলে বলে ডাকতেন যদিও বাবা তাঁর নাতির বন্ধু ছিলেন।

প্রথম দিনে বাবা, মা-বলে স্বর্ণকুমারীর পায়ের ধূলো নিতেই, উনি একটু থেমে মিষ্টি সুরে বললেন—তুমি, তুমি আমার কোন ছেলে বলো তো ?

আমি তোমার ছোট ছেলে—সুবল ছেলে। বাবার জবাব। এই হল বাবার সঙ্গে

স্বর্ণকুমারীর প্রথম পরিচয়ের সংলাপ। প্রথম দিনেই এমন স্নেহের বাঁধন, এমন ব্যক্তিত্ব, তাঁর বসা দাঁড়ানো সব কিছুর এমন ঐশ্বর্য বাবাকে যেন কি রকম করে ফেলল। বাবার কথায়—'আমার যেন কি হয়ে গেল'। তখন স্বর্ণকুমারী আবার জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি নাকি খুব ভাল গান করতে পারো, দীপক বলছিল।


ব্রজেন গাঙ্গুলী

এই একটু শিখি টিখি—সসঙ্কোচে বাবার উত্তর।

তুমি কার কাছে শেখো, কি গান শেখো ?

এই সাতকড়ি মালাকারের কাছে একটু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, এছাড়া রাধারমন দাসের কাছে একটু আধটু কীর্ত্তন আর কি।

ওনার বাড়িতে তখন ছিলেন ব্রজেন গাঙ্গুলী মশাই, তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম স্বরলিপিকার, অনেক রেকর্ডও আছে—তাঁর ডাক পড়ল। গায়ে সাদা ফতুয়া, তার ওপর একটা উড়নি সাদামাটা চেহারার ব্রজেনবাবু এসে দাঁড়াতে স্বর্ণকুমারী বললেন—'আমার বাড়িতে তুমি একটা গানের ক্লাস খোলো'। কথামত সেই গান শেখানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল। এখানে যারা গান শিখতে শুরু করল তাদের কাউকেই কোন টাকাপয়সা দিতে হতো না। সব খরচ দিতেন স্বর্ণকুমারী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেয়ে সরলা দেবী। আমার বাবার এই কানেকশানটা এরপর বাবাকে সত্যিই অনেক দূর নিয়ে গিয়েছিল। বাবা বলতেন স্বর্ণকুমারীর ঘরে ঢুকলে মনে হত স্বর্ণকুমারীর যেন দশভূজার শক্তি ছিল। তখনকার দিনের কত জাঁদরেল পুরুষরাও যেন তাঁর এই ব্যক্তিত্বের কাছে এলে, যেমন—একবার লন্ডনের এক সিমফনী অর্কেষ্ট্রার ডিরেক্টর এসেছেন রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে স্বর্ণকুমারীর কাছে। স্বর্ণকুমারীকে তিনি বল্লেন এখানে এসে কিছু ইন্ডিয়ান স্ট্রীং ইনস্ট্রুমেন্ট আমি শুনতে চাই.... সেই ব্যাপারটা বলার আগে আমি বাবার সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর প্রসঙ্গটা আর একটু বলে নিতে চাই।

আগেই বলেছি স্বর্ণকুমারীর কাছে আমার বাবা, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, নরেশ মিত্ররা রেগুলার যাতায়াত করতেন। একবার ধীরাজ ভট্টাচার্য্য স্বর্ণকুমারীর লেখা একটা নাটক 'কনেবদল' মঞ্চস্থ করেছিলেন। প্রথম রাত্রিতে আমার বাবা সেই প্রহসনের ভোলাদাদার চরিত্রে নায়ক এবং স্ত্রীলোকের ভূমিকায় তার কনে সেজেছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য। এর পরবর্তী সময়ে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য আমার বাবাকে চিরকাল ওই ভোলাদাদা বলে ডেকেছেন। নরেশ মিত্র আমার বাবাকে সুবলচন্দ্র বলে ডাকতেন কিন্তু আরো আগে আমার বাবাকে বামুন সুবল আর সুবল দাশগুপ্তকে বদ্যি সুবল বলে ডাকতেন। ওখানেই বাবা কিছু গান-টানও করতেন।

তা তোমার বাবা মোটামুটি কি ধরনের গানটান করতেন ?

বিমান—আমার বাবা মোটামুটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই বেশি গাইতেন। তবে তিনি বিষ্ণুপুর


রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

ঘরানার বেশি ভক্ত ছিলেন। পরে বুঝেছি দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের ফলে ওটা ঠাকুরবাড়ি থেকে পাওয়া, তখন ঠাকুরবাড়ি রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর প্রভাবে পুরোপুরি বিষ্ণুপুরী ঘরানায় চলছিল তো। যার জন্য আমি দেখেছি আমরা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী—এঁদের গানের খুবই ভক্ত ছিলাম।

তোমার বাবা যে ঠাকুরবাড়িতে অত যাতায়াত করতেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ টালাপ হত কিনা তা জানো কি ?

বিমান—যতদূর শুনেছি বাবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামনা সামনি দু'একটা কথা কখনো সখনো হয়েছে। বরং ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াতের সূত্রে অন্য অনেকের সঙ্গে বাবার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। যেমন, শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। বাবারও তখন নাটক অভিনয়ের যথেষ্ট সখ ছিল, তবে ওই অ্যামেচার হিসাবে। বাবা বলতেন, যখন শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারের রিহার্স্যাল হত—শিশির বাবু তখন একটা উঁচু গোছের চেয়ারে বসে থাকতেন। কিংবা কোন উঁচু জায়গায় একটা আরাম কেদারায়। আমরা মাটিতে পায়ের তলায় বসে থাকতুম। কিন্তু সুনীতি চাটুজ্জের মত মস্ত লোকেরা এলে, শিশির বাবু তাদের পাশে এসে বসতেন। আমরা মাটিতেই থাকতাম। বাবা বলতেন,—কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথের বাড়ি গেলাম তখন আবাক হয়ে দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথ সোফায় বসে আছেন আর আমার পাশে, মেঝেতে এসে বসলেন বড়বাবু—শিশির বাবু। মানে, কবির পায়ের নিচে, আসন তলে মাটির 'পরে আমরা সবাই একাকার। আমার বাবা নাটক করতেন। শিশির বাবুর নাটকেও বাবা ওই সৈন্যটৈন্য গোছের চরিত্রেই সাজতেন। বাবা কিন্তু বেশি নাটক করেছেন নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে। এই সূত্রে কতকগুলো বলার মত নাম মনে পড়ছে।

ভূমেন রায়, রবি রায়, সরযূবালা দেবী (আমার সরযূমা), আঙ্গুরবালা দেবী, রানীবালা দেবী, কানন দেবী। এঁদের সঙ্গে আমার বাবার বেশ যোগাযোগ ছিল। তবে শেষের দিকে আমার বাবার সঙ্গে খুব বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বিধায়ক ভট্টাচার্য্যর সঙ্গে। আমার বাবা মাত্র ৬২ বছরেই মারা যান। তবু তার ভেতরেই ক্ল্যাসিক্যাল গায়কদের ভেতর বহু জ্ঞানী-গুণী গায়কদের সঙ্গেই তার মেলামেশা ছিল। তারাপদ চক্রবর্তী, সত্যেন ঘোষাল, সুখেন্দু গোস্বামী। তাছাড়া কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত—এরাও কিন্তু তখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীই ছিলেন।

কমল দাশগুপ্ত ? শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ?

বিমান—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভাই সিতাংশু, প্রথমে তোমায় একটা কথা বলছি। তুমিতো পুরানো ক্লাসিক্যাল গানের রেকর্ড সংগ্রহ করো। আমি বলছি, খুঁজে খুঁজে একবার



গ্রামাফোন কোম্পানীতে গান রেকর্ড করছেন ইন্দুবালা। পাশে আঙুরবালা, হারমোনিয়ামে জমিরুদ্দিন খাঁ আর তবলায় রাসবিহারী শীল।

শুনে দেখো গুপ্ত ব্রাদার্স নাম দিয়ে ১৯৩২ সালে কমল দাশগুপ্ত আর সুবল দাশগুপ্তর দ্বৈতকণ্ঠে খেয়াল গানের রেকর্ড বেরিয়েছিল। তখন ওদের কতো আর বয়েস—একজন ২০/২১ আর অন্যজনের ১৭/১৮। তিন মিনিটের রেকর্ডে দুজনের গলায় সেই বাংলা খেয়ালের জমজমা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। ট্রেনার ছিলেন দু'জন, ওস্তাদ জামিরউদ্দিন খাঁ সাহেব আর বিমল দাশগুপ্ত। আরো মজা এই যে কমল দাশগুপ্ত ও সুবল দাশগুপ্ত এই দুই ভাই যখন কাওয়ালী, গজল বা শাস্ত্রীয় খেয়াল গাইতেন রেডিওতে, তখন তাঁদের নাম বলা হত চাঁদ খাঁ, সূরয খাঁ। তখন এরকম চলত। কে মল্লিকের কথা সবার জানা।

বিমল দাশগুপ্তর তো কৌতুক নাটকে খুব নাম ডাক ছিল তা উনি কি ক্ল্যাসিক্যাল গানের ব্যাপারেও........

বিমান—আরে বিমল দাশগুপ্ত যে কিসে নয়, তার আর কি বলব। রবীন্দ্রনাথের 'রোগীর বন্ধু', 'চার কালা' যেটা উনি তুলসী লাহিড়ীর সঙ্গে করেছিলেন, সে সব ছিল একদিক। কিন্তু গানের অন্যান্য দিকেও যে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল, এখানে সেটা বলে রাখা দরকার। আমার বাবার কথা বলছিলে না ? আমার বাবা এক অন্যধরনের মানুষ ছিলেন, আমার বাবা এমনিতে নামের কাঙাল ছিলেন না। পয়সার কাঙালও ছিলেন না। এক অদ্ভুত মানুষ। জীবনে একপয়সাও রোজগার করেন নি।

তাহলে সংসার চলত কি করে ?

বিমান—আরে সে সব পুরনো ব্যাপার এখন বলতে লজ্জাও করবে। কিছু জমিজমা


শিশির ভাদ‌ড়ি

আর কিছু কোম্পানীর কাগজ—সব আমার ঠাকুর্দার রেখে যাওয়া। সে যুগে বড় লোকদের যা অনেক থাকত—আমরা অবশ্য সে রকম বড়লোক ছিলাম না। তাহলেও যা হোক, ওই কোম্পানীর কাগজ কিছু ছিল। বছরে দুবার তার সুদ পাওয়া যেত আর তাই দিয়ে সংসার খরচটা মোটামুটি চলে যেত।

আরে তখন তো লোকের প্রয়োজনও কম ছিল.....

বিমান—না, প্রয়োজনের থেকে লোকের চাহিদা কম ছিল, প্রয়োজন থাকলেও লোকের অত চাহিদা ছিল না। তখন বাড়ির কেউ এলে, বন্ধু-বান্ধব এলে না খেয়ে চলে যাবে এরকমটা কেউ ভাবতে পারতো না। বাড়িতে এলে খেয়েই যেত। এখনকার মতো নয়। এখনকার মতো লোকে ফ্রিজ খুলে 'ঠাণ্ডা' না 'গরম' ? জিজ্ঞেস করত না। তখন ওসব ছিলও না। তাই 'অ্যাই সব খেতে চলো' বলামাত্র গুরগুর করে সবাই উঠে খেতে চলে গেল। তখনকার দিনে সবকিছু এই রকমই সাদামাটা সরল ছিল। আমি দেখেছি আমাদের বাড়িতে সত্যেন ঘোষাল মশাই গান ধরেছেন, সঙ্গে আমার বাবা তবলা বাজাচ্ছেন। অতবড় নামকরা পেশাদার গায়ক, ঘরভর্তি লোকের সামনে অনায়াসে অবলীলাক্রমে গান গেয়েই যাচ্ছেন, অন্য কোন ব্যাপারে মন নেই।

আমার মনে হয় তখন লোকে বোধ হয় শিল্পটাকে বেশি ভালবাসত। এখন তার জায়গায় লোকে অর্থটাকেই বেশি ভালবাসে।

বিমান—যাই হোক এই ভাবেই বাবার সঙ্গে অনেক লোকেরই আলাপ পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

তা রবীন্দ্রনাথের বাড়ির গল্পদিয়ে শুরু করো না। সবার আগেই তো ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ?

বিমান—হ্যাঁ সেখানকার আসরটা কেমন ছিল জানো ? একদিনের কথা যেমন আমার বাবা বলছিলেন, সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেকেই রয়েছেন। সবার সঙ্গে শিশির ভাদুড়িও মাটিতে বসে। কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ, একটা কি রেফারেন্স দেবার দরকার হল। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ শিশির ভাদুড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা আমি সময়টা যা বল্লুম, দেখলুম শিশির একটু মাথা নাড়ল, বোধহয় একটু ভুল হয়েছে। আচ্ছা শিশির, এটাকি এই হবে ?

শিশির ভাদুড়ি সোজাসুজি স্পষ্ট বলে দিলেন, না, ওটা এই হবে।

তা এরকমই ঘরোয়া গোছের গল্পস্বল্প চলত।

আর একবার রবীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোতে। ওইরকম কথাবার্তা চলছে। তা সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথকে ধরে পড়ল কবিকে একটা কবিতা আবৃত্তি করতে হবে। সকলের খুব শুনতে ইচ্ছে করছে। সকলের সঙ্গে শিশির ভাদুড়িও আছেন। আর

বিশেষ মানুষ হিসেবে সেদিন সেখানে উপস্থিত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—উনি কবিকে কিছু চেকআপ করতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজসিক সোফা সিংহাসনে আর শিশিরবাবু যথারীতি মাটিতে আসন গ্রহণ করে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে তখন চয়নিকা বইটি ছিল। সঞ্চয়িতা তখনো বেরোয় নি। রবীন্দ্রনাথ চয়নিকাটি এগিয়ে দিয়ে বললেন—চয়নিকাটা শিশিরকে দাও তো, আজ শিশির উপস্থিত থাকতে, আমাকে তোমরা আবৃত্তি করতে বলছ কেন ?

আমার বাবা বলতেন রবীন্দ্রনাথের একটা অদ্ভুত বোধশক্তি ছিল। উনি ঠিক বুঝতে পারতেন কে, কোন কাজের উপযুক্ত লোক আর তা, সহজ করে বলে দিতেও পারতেন।

উনি শেষের কবিতায় লিখেছেন অমিত রায় ব্যাকরণ পড়তো কিন্তু উল্লেখ করে দিয়েছেন যে সেই ব্যাকরণটি সুনীতি চাটুজ্জ্যের। রবীন্দ্রনাথ বিধানচন্দ্রকে বললেন, একটু সময় ধরে তুমি শিশিরের আবৃত্তিটা শুনে যাও।

বাবা বলতেন আর কিছু হোক না হোক, এইটুকুতো পেয়েছি। এটাই কি কিছু কম! পেছনের আসনে বসে থেকেছি—তবু তো রবীন্দ্রনাথের ঘরে বসে। সামনা সামনি তাঁর মুখের কথা শুনেছি। ভাবা যায়!

তবে স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে যতটা সাবলীল ভাবে যেতে পারতাম বা সহজ থাকতে পারতাম রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে কিন্তু সেরকম পারতাম না। রবীন্দ্রনাথের কাছে এত ভিড় থাকত, এত বড় বড় দিকপালদের ব্যারিকেড থাকতো যে কাছে যেতে সাহসে কুলোতো না। যাঁরা প্রায়ই থাকতেন তাঁদের কয়েকজনের নাম বলছি—আগে যাঁরা ঘন ঘন আসতেন তাঁদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন, প্রমথনাথ বিশীর কথা প্রথমেই আসে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও অনেক সময় আসতে দেখেছি।

সত্যিকথা বলতে কি মায়ের কাছে গিয়ে যেমন নিজেকে স্বচ্ছন্দ মনে হত রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে তেমনটি সহজ হতে পারতুম না। ধরো না একদিন রবীন্দ্রনাথের বাড়ি গিয়ে দেখি যে মন্টুদা অর্থাৎ দিলীপকুমার রায় তাঁর নিজের লেখা গান তৈরি করে নিয়ে এসে কবিকে শোনাচ্ছেন, কথাবার্তা কইছেন, গেয়ে শোনাচ্ছেন। তা সেখানে এসে পড়ার পর অবস্থাটা একবার বোঝো।

আর একবার শিশির ভাদুড়ি কবির 'তপতী' আর 'শেষরক্ষা' নাটক দুটি সাধারণ মঞ্চে অভিনয় করার জন্যে কবির অনুমতি নিতে এসেছেন। আমি দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্মতি জানালেন কিন্তু সেই সঙ্গে বললেন, 'তুমি করো, আমি অনুমতি দিচ্ছি। তবে পূর্ণমহলার দিন আমি কিন্তু তা দেখতে যাব'। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ফুল রিহার্সাল বলেন নি, পরিষ্কার বলেছিলেন পূর্ণমহলা।

আর কৃষ্ণচন্দ্র দে রবীন্দ্রনাথের ওই যে গানটা করেছিলেন—আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে।

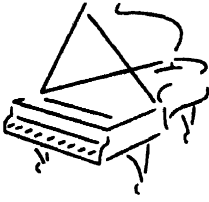
হ্যাঁ, বিসর্জন নাটকের গান। সেযুগের এম্পায়ার মঞ্চে ১৯২৩ সালে ২৫, ২৭ আর ২৮ শে আগস্ট গাওয়া হয়েছিল।

হ্যাঁ, কৃষ্ণচন্দ্রের গাওয়া এই গান রবীন্দ্রনাথের খুবই ভালো লেগেছিল। তাছাড়া ওই নাটকেই 'ওই আঁধার রাতে একলা পাগল' শুনেও রবীন্দ্রনাথ একই রকম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এত ভাল হয়েছিল যে কৃষ্ণচন্দ্রের এই গানের রেকর্ডটা আমার বাবা একেবারে নিয়মিত, বারবার শুনতেন। আমায় বলতেন যে এত বড় একটা ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরি বা টপ্পার গায়ক হয়েও এমনভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারা শুধু কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল।



বন্দেমাতরম্

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত বালক পত্রে (১৮৮৬) বন্দেমাতরম গানের স্বরলিপি সহ প্রকাশিত ছবি।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমার বাবা একটু বড় হয়ে অভিনয়ের থেকে গানে একটু বেশি মন দিলেন। সেযুগের বিখ্যাত ব্রজেন গাঙ্গুলীর কাছে যেমন রবীন্দ্রনাথের গান শিখেছিলেন তেমনি রামমোহন রায়ের কিছু গান, কাঙাল হরিনাথ, কেউ কেউ বলে কাঙাল ফিকির চাঁদের বিখ্যাত সব গানও শিখেছিলেন। 'যদি ডাকার মতো পারিতাম ডাকতে'। তখন ঠাকুরবাড়িতে খুব চলতো। ওঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন।তাই সাকার কালী কৃষ্ণ রাধা যেসব গানে থাকত না, ঠাকুরবাড়িতে সেগুলোর খুব চলন ছিল। তবে "হরি দিন তো গেল সন্ধে হল" গানটি ওখানে শোনা যেত। কেননা রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই তো কৃষ্ণবিষয়ক উল্লেখ আছে, তাই না ?

হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যেমন—তারো তারো হরি দীন জনে, এ হরি সুন্দর এ হরি সুন্দর, হরি তোমায় ডাকি, সংসারে একাকি—এমনি সব গান তো গীতবিতানেই রয়েছে। আচ্ছা তেমার বাবা ব্রজেন গাঙ্গুলীর কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শিখেছিলেন, তা তিনি কিরকম গাইতেন; মানে, তার মধ্যে রাবীন্দ্রিক ঘরানা বলতে যেরকম উচ্চারণ, ছন্দ লয়ের ঢঙ, সুরের মূর্চ্ছনা সে যুগে শোনা যেত—তার সঙ্গে তুলনা করলে তোমার বাবার গানকে কিরকম মনে হত ?

বিমান—আমার বাবা যা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন, সত্যি কথা বলছি আজ—তার সঙ্গে পঙ্কজদার গায়নের খুব মিল ছিল। পঙ্কজদাতো দিনু ঠাকুরের কাছে শিখেছিলেন কিন্তু আমার বাবা কখনো দিনু ঠাকুরের কাছে শেখেন নি। অথচ পঙ্কজদার গানের সঙ্গে আমার বাবার গানের যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যেত। তবে বাবার বন্ধু অনিল বাগচী, দিনু ঠাকুরের কাছে গান শিখেছিলেন। হয়তো সেই সূত্রে আমার বাবার গানের মধ্যে পঙ্কজদার গানের ছায়া দেখা যেত। আরও অবাক লাগত যে বাবা —'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী'র মতো বহু পরিচিত গানেরও কথা কিরকম বদল করে গাইতেন।

যেমন বাবার মুখে শুনেছি—'মনে করি অমনি সুরে গাই—সম্মুখে আমার সুর খুঁজে না পাই'। পরবর্তীকালে এটাই সবাই শুনত—'কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই'


হীরেন বসু

এসব বদল কেন, কীভাবে, কার দ্বারা কখন হয়েছিল —তা অবশ্য বলতে পারব না।

আবার দেখো 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' গানটা বাবা গাইতেন অন্যরকম সুরে। বোধহয় সুরান্তর ছিল। পরে ও সুরটা বদলে এখনকার মত হয়েছিল; জানি না, রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে এই বদল হয়েছিল কিনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার আগে এখনকার এই সুরটা আমি কিন্তু শুনিনি। তার মানে, বাবা আমায় বলেছিলেন, কবির মৃত্যুর পর এই চেনা সুরটি হয়েছিল —তবে এটা একান্তভাবেই আমার বাবার কথা। আমি আর কিছু বলতে পারব না।

তার মানে মনে হচ্ছে, উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোই গাইতেন।

বিমান—খুব ভাল গাইতেন। তিনি এতই রাবীন্দ্রিক ছিলেন বা এতই রবীন্দ্র ভক্ত ছিলেন যে বাবা রবীন্দ্রনাথকে বলতেন—কলির বাল্মীকি। বাবা বলতেন যে সারা দেশটাকে, বিশেষ করে বাঙালিকে সভ্যতা শিখিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আরও জানো যে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বা স্বর্ণকুমারীর বাড়িতে বাবা বঙ্কিমচন্দ্রের গান শিখেছিলেন—'মথুরা বাসিনী মধুর হাসিনী শ্যাম বিলাসিনী'।

হ্যাঁ মৃণালিনী উপন্যাসের গান। বঙ্কিমচন্দ্র লিখে রেখে গেছেন, ঢিমে তেতালা, জয়জয়ন্তীতে গাইতে হবে। তা বাবা-ও-গান শিখেছিলেন কার কাছে ?

বিমান—বাবা শিখেছিলেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। এইসা বিপুল চেহারা যে হিন্দুস্তান কোম্পানীতে তাঁর জন্য আলাদা করে অর্ডার দিয়ে বিশাল মাপের চেয়ার বানাতে হয়েছিল। উনি পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন—বাবারা মজা করে বলতেন মোটা দা।

আরে ওঁর কোরাসে গাওয়া 'জাগো পুরবাসী/আলোকের এই ঝর্ণাধারায়' রেকর্ড তো রীতিমতো বিখ্যাত।

বিমান—এছাড়া 'হও ধরমেতে ধীর' এসব প্রচুর প্রচলিত গান ওঁরই পরিচালনায় রেকর্ড হয়েছে। আবার হিন্দুস্তান থেকে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম রেকর্ড (তখন, মুখোপাধ্যায়) যেটা করিয়েছিলেন—'ডাকব না ডাকব না—তারও পরিচালক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।' কণিকার প্রথম আধুনিক গানেরও সুরকার এই হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

সে তো সেই ১৯৩৮ সালের 'গান নিয়ে মোর খেলা'-তাই না ?

হ্যাঁ, তারপর শোনো। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীর দুটি গান শেখার কিছু পরে হিন্দুস্তান রেকর্ডে বাবার গান রেকর্ড করার কথাও হয়েছিল। কিন্তু তখনকার দিনে রেডিও বা রেকর্ডে গান করলে নাকি খারাপ হয়ে যাবে, এইরকম একটা ধারণার চল ছিল



বাঁদিক থেকে বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (সরোদ), রাসবিহারী শীল (তবলা) ও গোপাল লাহিড়ী (ক্ল্যারিওনেট)

—এই জন্য আমার ঠাকুরমা, বাবাকে শেষপর্যন্ত আর রেকর্ড করতে দেননি। সেই দুঃখ আমার বাবার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। রেকর্ড করা তাঁর জীবনে আর কোনদিন হয়নি। তবে রেকর্ড কোম্পানীগুলির সঙ্গে বাবার যোগাযোগ মেলামেশা যাতায়াত বরাবর ছিল। বন্ধুবান্ধবও যথেষ্ট ছিল। সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা যার সঙ্গে হয়েছিল তিনি হলেন প্রখ্যাত অভিনেতা, গীতিকার সুরকার তুলসী লাহিড়ীর ছোট ভাই গোপাল লাহিড়ীর সঙ্গে। উনি তখনকার দিনের একজন প্রথম সারির সেরা ক্যারিওনেট শিল্পী ছিলেন। তার সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠতা বেশি হয়েছিল। এই গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী প্রথম রেকর্ডে গানের সঙ্গে ক্ল্যারিওনেট বাজান। সেটা ছিল হিজমাস্টারে কমলা ঝরিয়ার গানের সঙ্গে। সেসময় তার বহু ক্ল্যারিওনেটের রেকর্ড ছিল। এখন সে সব রেকর্ড যোগাড় করে শোনবার মতো জিনিস। এই সময় উনি আর বাগবাজারের সরোদীয়া বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় আর বেহালা বাদক পরিতোষ শীল—এই তিনজন মিলে সহযোগী যন্ত্রী হিসাবে প্রথম এইচ এম ভিতে যোগদান করেন। আর এদের পরিচালনা করতেন একজন সাহেব যাঁকে সবাই নিউম্যান সাহেব বলেই জানত।

তা এটা কোন সাল নাগাদ হবে ?

বিমান—এটা তিরিশের দশকে, ১৯৩২ সাল থেকে ৩৮ সাল পর্যন্ত সময়ের ব্যাপার। এ সময়ে আরও অনেকেও এইচ এম ভি-তে যন্ত্রশিল্পী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। যেমন সুবল দাশগুপ্ত তবলিয়া হিসেবে, অসিতবরণ তবলা বাদক হিসেবে, রঞ্জিত রায় শিল্পী ও পিয়ানো বাদক হিসেবে। উনি তো ভীষণ ভালো পিয়ানো বাজাতেন। কমল দাশগুপ্ত এলেন ম্যান্ডোলিন ও জাইলোফোন বাদক হিসেবে। বোঝো—এখন অনেকের কাছে এটা হয়ত বিশেষ খবরের মতো শোনাবে। তিরিশের দশকের গোড়ায় এতসব জিনিয়াস শিল্পী গানের জগতে এসে গেলেন। এরকম আর এক জন ছিলেন—টোপাদা। ভালো নাম অমল দত্ত। ইনিও বাজাতেন ম্যান্ডোলিন। বাংলা গানের নতুন রূপ খুলে গেল। শুধু হারমোনিয়াম তবলা সঙ্গতের সঙ্গে গান তখন লোকের তেমন ভাল লাগছিল না। তখন সবাই বল্লে গানের সঙ্গে যন্ত্রানুষঙ্গের দরকার। এই খানে তোমায় একটা ইতিহাসের কথা বলছি। আমি হীরেন বসুর মুখে শুনেছি প্রথম অরকেস্ট্রা সম্বলিত বাংলা আধুনিক কাব্য সঙ্গীত

তাঁরই কথা ও সুরে—মিস লাইটের গাওয়া গান—'শেফালি তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদ প্রাতে' ১৯২৯ সালে প্রথম রেকর্ডে বেরোয়। আর সঙ্গে সঙ্গে তা বাজার মাত করে দেয়। এর পর অরকেস্ট্রার সঙ্গে দ্বিতীয় গান করেছিলেন, শুনেছি, কৃষ্ণচন্দ্র দে-১৯৩৮ সালে।

গানের জগতে এঁরা তো সবাই, সম্রাট জাদুকর। হীরেন বসু (১৯০২-১৯৮৭)-র পরবর্তী গান, তাঁর কথা ও সুরে হয়েছিল ধীরেন দাসের (১৯০৩-১৯৬১) কণ্ঠে 'আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।' সেটা তো সে সময় জনপ্রিয়তার ইতিহাস তৈরি করেছিল। তবে সেকালে সবাই তো এরকমই ছিলেন। ধীরেন দাসই নজরুলের জীবদ্দশায় প্রথম ১৯৩২ সালে,নজরুলের বিখ্যাত 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' গানের সুর দিয়েছিলেন যা মৃণাল কান্তি ঘোষ রেকর্ডে গেয়ে রাতারাতি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

বিমান--এ সময়ের কিছু আগে ১৯২৮ সালে, প্রথম গ্রামোফোন কোম্পানীতে এলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ঘটনাক্রমে একই সঙ্গে এলেন তুলসী লাহিড়ী আর হীরেন বসু। এ তিনজন আবার একসঙ্গে গীতিকার ও সুরকার। হীরেন বসু অবশ্য চলচ্চিত্র থেকে এসেছিলেন—নিজে পরিচালক ও অভিনেতাও ছিলেন। 'কবি জয়দেব' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, গান গেয়েছিলেন—যার সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন সুবল দাশগুপ্ত। ছবি পরিচালনার কাজও তিনি করেছেন যেমন অমরগীতি, কবি তুলসী দাস।

এ তো হল শেষের দিকে। ১৯৩১ সালে বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাক ছবি 'ঋষির প্রেম'এ নায়িকা কাননের বিপরীতে হীরেন বসু শুধু নায়ক কলহনের ভূমিকায় অভিনয় করেননি—তিনি ওই ছবির গীতিকার ও সুরকারও ছিলেন।

বিমান—হীরেনদা আমায়, একটু নিজের কথা বলি, ভীষণ স্নেহ করতেন। উনি আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন, বাবা ওঁকে হীরেনদা বলতেন। আমি বালিগঞ্জের গানের স্কুলে হপ্তায় একদিন করে গান শেখাতে যেতাম। (এখনও অবশ্য যাই) --আর হীরেনদারও হাতে তেমন কাজ ছিল না। আমায় এত ভালবাসতেন যে প্রতিটি সোমবারে ওই স্কুলে যখন ক্লাস নিতে যেতাম তখন ওই স্কুলে উনি ঠিক চলে আসতেন। দেখা হত, কত গল্প হত। এই হীরেনদা সুরকার অনুপম ঘটককে সঙ্গীত জগতে নিয়ে এসেছিলেন।

হ্যাঁ তোমার বাবার কথাতো শেষ হয়নি। তাই আগে সেই প্রসঙ্গে এসো।

বিমান—হ্যাঁ আমার বাবা বাড়িতে বসেই গান বাজনা যাত্রা নাটক সবকিছুই শেখাতেন। তবে কেউ নিজে থেকে এসে তাঁর কাছে শিখতে চাইলে-তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে, অকৃপণ ভাবে শেখাতেন। ওতেই ওঁর আনন্দ। তাই এমনি শেখাতেন। যেমন, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। উনি ছোটবেলা থেকে আমার বাবার কাছে অনেক গান শিখেছিলেন। প্রথমে উনি তবলিয়া হিসেবে আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমার বাবাকে উনি দাদা বলতেন। আমাদের বাড়িতে যখন তাঁর আসা যাওয়া,


তুলসী লাহিড়ী

তখন রাজেন সেনগুপ্ত বলে এক সরোদীয়া ছিলেন। তিনি আমার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বাবা তাঁকে রাজা বলতেন। ওঁরা তখন বাবার কাছে খুবই আসতেন যেমন—গোপাল লাহিড়ী, রাজেন সেনগুপ্ত, রাইচাঁদ বড়াল এমনি কতজন।

এটা তখন কোন সময় ?

বিমান—এগুলো সব তিরিশ দশকের কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের সময়ে অর্থাৎ মোটামুটি ১৯১৬ থেকে ১৯৩৮ মধ্যে। এরকম অনেকেই এসে বাবার কাছে শিখেছেন যেমন আমি রামকুমার বাবুর কথাটা বললাম। আমি দেখেছি তখন মিস মনোরমা নামে একজন গায়িকা ছিলেন (কিছুকাল আগে উনি মারা গেছেন) তাঁর কাছে অনেক গাইয়েরা অনেক গান শিখেছিলেন কিন্তু কেউই সেসব স্বীকার করতেন না। আমার বাবাও তাঁর কাছ থেকে কিছু কিছু 'চিজ' নিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলে বাবার কাছ থেকে তিনি কোন পয়সা কড়ি নিতেন না। তার বদলে, আমার বাবা তাঁকেও গান শেখাতেন। বলতেন—তুমিও আমায় শিখিয়ে দিও, তাতে আমার দক্ষিণা হবে। এরকম অনেকেই আবার অন্য প্রয়োজনে আসতেন, ঠিক শেখার জন্য নয় যেমন, অনিল বাগচী। এঁরা আসতেন শোনবার জন্য বা জানবার জন্যে—যা আমি নিজে এখন করি। অনেকেই শুনতে আসে, এটা সেটা জানতে আসে।

তোমার বাবার গলা বা গান কীরকম ছিল ?

বিমান—এখনও যাঁরা পুরনো দিনের মানুষ রয়েছেন যেমন পাড়ার বুড়ো ডাক্তারবাবু উনি তো আমাকে নির্দ্বিধায় বলেন 'কাকার গলার মতো তোর গলা হয়নি। তুই যা গাইছিস খুব ভাল গাইছিস। কিন্তু তোর বাবা যা গাইতো সেরকমটা.........' তার মানে এর মধ্যে খানিকটা নস্টালজিয়া আছে। তা থাক, কিন্তু সত্যি বাবার খুব সুকণ্ঠ ছিল। তখন সুবল দাশগুপ্ত দারুণ একটা সুর করেছেন (১৯৩৯)—'নাইবা ঘুমালে প্রিয়' আর 'এখনি উঠিবে চাঁদ'—সায়গলের গলায় এই গান সকলের মুখে মুখে। সায়গলের রেকর্ড শুনে, আমার বাবা সুবল দাশগুপ্তকে বললেন—আমি গান দুটো কার কাছ থেকে আর শিখব, তুই আমায় শেখা। তা সুবল দাশগুপ্ত বাবাকে গানদুটো শিখিয়েও ছিলেন। তারপর গান দুটো এতই ভাল গাইতেন যে লোকে বলত বাবা সায়গলের থেকেও ভালই গাইছেন। সায়গলের তখন অত নামডাক, তবু অনেকে বাবার মুখে গানদুটো শুনতে চাইত। আমি দেখেছি এই চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সালের কথা, যুদ্ধের সময় কলকাতায় বোমা পড়ছে; বোমার ভয়ে কলকাতা ফাঁকা, রাস্তাঘাট চারিদিক শুনসান—তখন রাত্রিবেলা আমাদের বাড়ির ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাবার বন্ধুরা সব বসে বসে—বাবার মুখ থেকে বার বার শুনছেন 'নাইবা ঘুমালে প্রিয় বা এখনই উঠিবে চাঁদ।' তাছাড়া আরও



১৯০২ সালে রেকর্ডিং করছেন গহরজান

একটা ব্যাপার বাবার সম্বন্ধে বলা দরকার। সেটা হল বাবা বহু বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন আর ভাল অভিনয়ও করতে পারতেন। বাবা-সুবল মুখুজ্জে তাই সে যুগে শোভাবাজার বাগবাজারে বেশ পরিচিত ছিলেন। একাধারে যেমন সাহিত্য, সংস্কৃতি-সব বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল তেমনি তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের দলও সব ছিল রীতিমত বলবার মতো। মহাপণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসংলাপী নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য—এমনি সব মানুষ। এই বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের আসল নাম ছিল বগলা রঞ্জন—আমরা বলতুম বগলাকাকা। বেঁটে খাটো মানুষ---সুরসিক, সুপণ্ডিত। কথাতে যেমন মিষ্টভাষী—লেখার ভাষাও তেমনি সুমধুর। বিধায়ক নামটা দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ—কি ভাগ্য বলো তো! তাঁর লেখা অজস্র নাটকের মধ্যে মেঘমুক্তি, মাটির ঘর, বিশবছর আগে, ক্ষুধা, এন্টনি কবিয়াল বা সেতু যেমন আধুনিক বাংলা নাটকের মোড় ঘুবিয়ে দিয়েছিল—তেমনি বিশ্বরূপা মঞ্চে, ডাউন-ট্রেন নাটকে, তাঁর দুর্দান্ত অভিনয় দেখে, লোকে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমার বাবার সঙ্কলিত 'ধ্যান-কীর্ত্তন' (কীর্ত্তনের বই) বইটি অশোকনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মানে আমার বাবার মেলামেশার বৃত্তটি ছিল এইরকম সংস্কৃতির আলোয় ভরা।

তা তোমার বাবার গান বা তাঁর কাছ থেকে তুমি যে গানের-জগতে দীক্ষিত হবার প্রেরণা পেয়েছিলে সে তো বোঝা-ই যাচ্ছে। সে কথা একটু বলো না।

বিমান—সেই হিসেবে বললে আমার গুরু, আমার প্রথম গুরু—আমার বাবা। আমার জীবনের ষাটটা বছর ধরে তাঁকে দেখেছি। দশ বছর বয়স থেকেই তাঁর হাত ধরে এই গানের লাইনে ঘুরতে শিখেছি। এ ব্যাপারেও আমার বাবা যে কী রকম মানুষ ছিলেন তা শুনলে বুঝবে যে এ মানুষের জুড়ি কথ্‌খনো পাওয়া যাবে না। গানের জন্য এমন কাণ্ডকারখানা আর কোন বাপ-ব্যাটা যে কখনও করেনি তা হলফ করেই বলতে পারি।

বাড়ি থেকে আমায় নিয়ে বেরিয়েই বাবা একটা রিক্সায় আমায় তুললেন। রিক্সাওয়ালাকে বললেন—চলো রামবাগান। বাপের হাত ধরে, দশ বছরের ছেলে রামবাগানে বাইজী পল্লীতে যাচ্ছে ? রিক্সাওয়ালার খটকা লেগেছে। তাই জিজ্ঞাসু চোখে একটু ইতস্তত করছে। বাবা এবার আরও জোরে বললেন বললুম তো রামবাগান চলো, রামবাগান। রিক্সাটা লিবার্টি সিনেমার পাশ দিয়ে যখন অদ্বৈত মল্লিক লেনে ঢুকে ইন্দুবালার বাড়ির দিকে যাচ্ছে বাবা তখন বললেন 'যারা রাস্তায় তোমাকে আমাকে এক রিক্সায় দেখল তারা বলবে-এমন বাপেরও গলায় দড়ি ছেলেরও গলায় দড়ি—বাপ বেটাতে একসঙ্গে রিক্সায় রামবাগানে যাচ্ছে'! এই আমার বাবা। আমার জীবনে প্রথম ও প্রধান গুরু। ওই গান শোনার জন্য গানের গল্প শোনার জন্য, ওই বয়স থেকে আমি ইন্দুবালার বাড়ি গিয়েছি। ওঁর কাছে শুনেছি কত শিল্পীর গল্প, মাইফেলের গল্প। যেমন ধরো, গহরজানের কথা। তা ইন্দুবালা, আমার ইন্দু মা, একদিন বলছেন—গহরজান গাইছেন, আমাকে ভয়ানক স্নেহ করতেন। আমি কুঁকড়ে থাকতুম। তাঁর ওই রূপ আর আমি এত কুচ্ছিৎ কিন্তু আমার গলার আওয়াজ কী জানি কেন, গহরজানের খুব ভাল লাগল। বলতেন, —বেটি তু সুর লাগা। এমনি সব কত গল্পের আর শেষ নেই। কত জেনেছি, শুনেছি। এ সবই আমার বাবার জন্যে। তাই ভাবি বাবা যখন অমন ভাল গান গাইছেন তখন তা ধরে রাখার মতো আমাদের কিছু ছিল না। তাঁর গান কোন রেকর্ডে সংগ্রহ করে রাখা হয়নি। আমার এখন ইচ্ছে করে বা মনে হয় যে বাবার একটা রেকর্ড যদি থাকত! এইখানে একটা দুঃখের কথা বলি। আমার বাবার শেষ বয়সে কিছুটা আর্থিক অনটন হয়েছিল। এটা আমি বেশ গর্বের সঙ্গে বলছি। শেষের দিকে বাবা বলতেন—বাবা, হিসেবটা আর মেলাতে পারছি না। চিরকাল ভেবেছি পাঁচ টাকা মণ চাল খাবো, পঁচিশ টাকা ভরি সোনা। দশ টাকায় একসের চাল হবে তা কখনও ভাবতে পারিনি। তাই আজ আমার এই অবস্থা। ভাই, এসময় আমার বাবা যখন গান গাইতেন তখন স'বে বড়সড়ো ফিতের মত স্পুলের টেপ রেকর্ডার বেরিয়েছে। গ্রুণ্ডিগের ইয়া বড় সুটকেসের মত দেখতে। তা, এই রকম একটা মেসিন কিনেছিলেন আমার এক নিকট আত্মীয় (নামটা এখন আর বলতে চাই না)—১৯৬০/৬২ সালে। বাবা একদিন বললেন, আমার তো বয়স

হয়েছে শরীরও খারাপ হচ্ছে, তাই খুব ইচ্ছে করে আমার কিছু গান যদি আমি টেপ করে রেখে যেতে পারি তাহলে তোমার তা একদিন কাজে লাগবে। বাবার ইচ্ছের কথা শুনে আমি সেই আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে বললুম, তোমাদের টেপ রেকর্ডারটা দেবে ? বাড়িতে নিয়ে যাব, বাবার কিছু গান টেপ করে রাখব। তারপর আবার তোমাদের বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যাব। আর যদি মনে করো, তাহলে আমার সঙ্গে তোমরাও কেউ আসতে পারো, টেপকরার সময় থাকতেও পারো। এ্যাণ্ড হি রিফিউজড্‌। মুখের ওপর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। অবস্থাটা ভাবো। বাবা কিন্তু তা শুনে বললেন, এর জন্য দুঃখ করো না বাবা, তুমি যখন খুব ভাল গাইবে, সারা দেশে তোমার কতো নাম হবে। তখন তোমার মুখ থেকেই আমার নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তোমার গান আমি শুনব, তাতেই আমি খুব খুশি হব।

এতে অবশ্য আমার মনের যন্ত্রণা যায় নি।

কিন্তু আজ দেখ, বাংলা গানের জগতে তোমার কি নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা। আর তোমার মুখ থেকেই আজ তোমার বাবার সব কথা এসে যাচ্ছে, যা সবাইকে জানাতে পারছি। বাবা নিশ্চয় এসব শুনছেন। আর তাঁর আত্মাও খুশিতে ভরে উঠছে। কেননা সেই বিমানের মুখ থেকেই তো আজ সব কথা ছড়িয়ে পড়ছে।

বিমান—কিন্তু আমার বাবা এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাটাকেই তাঁর বক্তব্য বলে বিশ্বাস করতেন।

‘পিয়াসী—লয় তাহা ভাগ্য মানি’। ব্যস্‌। আর ভাইবোনদের ওপর বাবার এমনই স্নেহ ছিল যে—

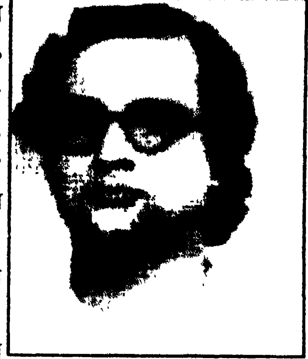
তা তোমরা ভাই বোন ক’জন ছিলে ?

বিমান—সে বলতে গেলে, বাবার শেষ জীবনে আমরা তিন ভাই চার বোন ছিলাম। তবে তারও আগে আমরা ছিলাম চারভাই পাঁচ বোন। বাবাকে তাই জীবনে ছেলে মেয়ে হারাবার শোকতাপ বেশ পেতে হয়েছে। আমরা এখন অবশ্য দুই ভাই আর চার বোন রয়েছি। তারমানে এমন বড়োসড়ো পরিবার, সব মিলিয়ে বাড়িতে আঠাশ খানি রেশন কার্ড ছিল। এই বিরাট সংসার নিয়ে আমাদের পাড়াটাও ছিল যেন একটা বিশালতর পরিবার। সুখে-দুঃখে, দরকারে অদরকারে—পাড়ার লোকজন সবাই কেমন হুট বলতে এসে, বাড়িতে জড়ো হয়ে যেত। যে কথা বলতে গিয়ে এসব বলছি তা হল, গান আমার বাবার সঙ্গে কি রকম হাড়ে মাসে জড়ানো ছিল, তা বোঝাতে।

আমার যখন ১৪ বছর বয়েস তখন আমার ১২ বছরের ছোট ভাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তিনদিনের মধ্যে মারা গেল।

কেন ? কী হয়েছিল ?

প্রথমে ডাক্তাররা বলেছিল মাম্পস হয়েছে। পরে শুনেছিলুম না, হয়েছিল আসলে প্লেগ। তখনকার দিনে তো আর সেরকম ওষুধপত্র বা চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না।


নির্মলেন্দু লাহিড়ী

যাই হোক—এই দুঃসংবাদ পেয়ে তো—উত্তর কলকাতার চরিত্র অনুযায়ী—পাড়ার লোক সব ভেঙে পড়ল। তারা বাবাকে বলল, তুমি শান্ত হয়ে বোসো-—আমরা সব আছি, আমরাই সব ব্যবস্থা করে, করে-কম্মে নেব। তা বাবা তখন কী করলেন ? বাবা আমাকে আর দাদাকে দুপাশে বসিয়ে পর পর শুধু গান গেয়ে চললেন—নিজে হারমনিয়াম বাজিয়ে। দৃশ্যটা একবার ভাবো। বাড়িতে পুত্রের মৃতদেহ তখনো রয়েছে, শোক, কান্নাকাটির শব্দ—বাবা নির্বিকার। একটানা না থেমে হারমোনিয়ামে সুর তুলে, একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন।

কোন কোন গান, তা মনে পড়ে ?


দিলীপ রায় (মন্টু)

বিমান—হ্যাঁ, প্রথমে গেয়েছিলেন—'যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম, সকলি নিও হে স্বামী' (জ্ঞান গোঁসাই-এর গান), দ্বিতীয় গানটা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে—তবুও শান্তি তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে'। আর তার পরেরটা ছিল রামমোহন রায়ের রামকেলিতে—'কতো আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে, এ মুখের পরিণাম, বারেক না ভাবো মনে। কৃষ্ণ কেন ক্রমে শ্বেত হবে, একে-একে সব দন্ত যাবে, গলিত চর্ম হবে দিনে দিনে' ....

এতো একেবারে নাটকীয়, অবিশ্বাস্য—

বিমান— হ্যাঁ, লোকে তো থ—অনেকে বাবাকে পাগল ঠাওরালো। কেউ কেউ আমাকে শুনিয়ে টিপ্পনী করছিল। এর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি! ছেলে মারা গেছে, আর বাবা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান জুড়েছে। এ কী কাণ্ড !

এখানে অন্য একটা ছোট্ট কৌতুকও আছে। সে সময়ে পুরুষমানুষ বসে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে, এটা মোটেই ভালো চোখে দেখা হত না। আর এরকম শোকের পরিবেশে যে কতো নিন্দার্হ, এটা লোকে ঠারে ঠারে জানাতে ছাড়ত না। কিন্তু আমার বাবা যে গানকে অবলম্বন করে শিল্পী হিসাবে সঙ্গীতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, ভাবলোকের কোন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তা বোঝার ক্ষমতা সাধারণ সংসারী মানুষদের ছিল না। সেই জন্য তাদের চোখে, বাবাকে সেদিন বড় পাগল পাগল লেগেছিল। শেষ জীবনে নির্মলেন্দু লাহিড়ী বাবার ভীষণ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আবার খুব ভক্ত মানুষও ছিলেন। তখন আমাদের বাড়িতে অন্নকূট উৎসব হত। উনি থিয়েটারে যাবার আগে, আমাদের বাড়িতে এসে ঠাকুর প্রণাম করে চলে যেতেন। আবার থিয়েটার শেষ করে, রাত্রে বাড়ি যাবার পথে

এসে প্রসাদ মুখে দিয়ে, তবে বাড়ি যাবেন। থাকতেন বাগবাজারে—তাই বাবাও মাঝে মাঝে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতেন। একবার ওরকম থিয়েটার শেষ করে আমাদের বাড়িতে আসতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে আবার প্রসাদও সব শেষ, একটুও আর নেই। কিন্তু উনি ঠিক এসেই হাঁক পাড়লেন—কই, আমার প্রসাদ কোথায় ?

ওই রাজার মত চেহারা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাগ্নে। দিলীপকুমার রায় আর উনি ছিলেন মামাতো-পিসতুতো ভাই। দুজনের চেহারায় এক অদ্ভুত মিল। দুজনের ছবি পাশাপাশি রাখলে, চট করে বোঝা যেত না কোনটা নির্মলেন্দু, কোনটা মন্টু।

বাড়ির লোকেরা তো অপ্রস্তুত, মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। প্রসাদ আর নেই। এখন কি করে মুখরক্ষা হবে ? উনি মুহূর্তে বুঝে নিলেন। তারপর দেখ—তাঁর এমন ভক্তি, নিষ্ঠা যে উনি অন্যের প্রসাদ খাওয়ার পর জড়ো করা কলাপাতা বা মাটির পদ্মকাটা সব রেকাব ঘেঁটে ঘেঁটে, তার ভেতর থেকে এঁটো উচ্ছিষ্ট প্রসাদকণা মাথায় ঠেকিয়ে, খুঁটে খুঁটে তুলে মুখে দিতে লাগলেন। এমনই তাঁর বিশ্বাস। এইই হল ভাই, প্রকৃত বিশ্বাস। সবাই তাঁকে জানত। বাবা বা আর সব লোক তাই এই ভক্ত মানুষটার সম্বন্ধে বলতেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর পর এমন সিদ্ধপুরুষ আর আমরা চোখে দেখিনি.....। আর তারপর সবাই তাঁর পায়ের ধূলো নিতেন। এই ছিলেন বাণী বিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

বিশাল অভিনেতা ! প্রতাপাদিত্য, ভাস্কর পণ্ডিত, শিবাজী, আওরঙ্গজেব, সিরাজদ্দৌল্লার মতন মুখ্য নাট্যচরিত্রের অভিনয়ে বা চলচিত্র কণ্ঠহার বা অভিযাত্রীতে নির্মলেন্দুর (১৮৯১-১৯৫০) অভিনয় এখনো অনেকের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। তাছাড়া ওঁদের পারিবারিক প্রভাবে সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর গভীর ধ্যানধারণার কথা আমরা প্রায় জানি না। তবে নির্মলেন্দু আর মন্টুর চেহারার সাদৃশ্য নিয়ে তুমি যা বললে সে প্রসঙ্গে নির্মলেন্দুর মুখের একটি রসিকতা এখানে সংযোজন না করে পারছি না। একবার এক পারিবারিক গল্প গুজবের আসরে, ওঁদের এক ভাইঝি মীরা হেসে বলল, আপনাদের দুজনকে পাশাপাশি গলাগলি ভারী মানায়, মনে হয় ভাই ভাই।

নির্মলেন্দু—যা বলেছিস। আরে এইজন্যেই আমরা উঠেছি।

মীরা—তার মানে ?

নির্মলেন্দু—মানে, মন্টু যে গানে এত নাম করেছে, উঠেছে তার কারণ ও আমার মত দেখতে আর আমি যে থিয়েটারে ডাকসাইটে অভিনেতা হয়ে উঠেছি তার কারণ আমি ওর মত দেখতে !

বিমান—এইরকম আর একজন ছিলেন গোপাল লাহিড়ী। পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, দোলের দিন, আমাদের বাড়ি এসে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁশি বাজিয়ে শোনাবেনই। তিনি আবার ভাল শিকারীও ছিলেন। দুর্ভাগ্য যে একবার দোলের ঠিক দুদিন আগে, তাঁর চাকর তাঁকে গুলি করে মারে। সেবার আর দোলে তাঁর

আসা হল না ! কী শীত কি গ্রীষ্ম তিনি একটা অদ্ভুত কোট পরতেন, সেটায় দুটো পকেট করা থাকত। ক্ল্যারিওনেটটাকে দুটো পার্টে খোলা যেত একটা এদিকে আর একটা অন্যদিকে। তা, আমার বাবা বললেন বুকে লাগে না ?

উনি বললেন, বুকে ঠেকে থাকে তো। খুব শান্তিতে থাকি। ভাবো, কি ভালোবাসা। স্ত্রীর অসুখের জন্যে একবার মাসখানেক ক্ল্যারিওনেট বাজাতে পারেন নি। প্রথম যেদিন ক্ল্যারিওনেটটা তুলে নিয়ে, রীড টিপে ফুঁ দিলেন ঠোঁটটা ফেটে রক্ত বেরুল। কিন্তু সেদিনের গোপালের বাজনা যে কি হল তা আর বলবার নয়, সে বাজনার তুলনা হয় না। একটা কথা বলা হয়নি, স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা বলবার সময় ব্রিটিশ সিমফনী অর্কেস্ট্রার একটা কথা বলা হয় নি। একবার তার ডিরেক্টর সাহেব, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কলকাতায় এসে স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতে এসেছেন। 'একটা ভাল স্ট্রীং ইনস্ট্রুমেন্ট বাজনা শুনতে চাই'। স্বর্ণকুমারীর কাছে সাহেব একদিন তাঁর এই ইচ্ছের কথা জানিয়ে ছিলেন। বড় ছেলে জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালকে স্বর্ণকুমারী বললেন, 'জ্যো-ৎ -স্না (আমরা যেমন চলতি কথায় জ্যোসনা বলি, স্বর্ণকুমারী সেভাবে নয়, খণ্ড-ৎ এর ওপর জোর দিয়ে কেটে কেটে উচ্চারণ করতেন খুব নিচু স্বরে) একটু খোঁজ করো তো ভাল একটা তারের যন্ত্র কে বাজাতে পারে। সাহেবকে কথা দিয়েছি, সামনের শনিবার ভাল বাজনা শোনাব।' সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, খেয়ালী মানুষ জ্যোৎস্নানাথ, আমার বাবাকে দেখিয়ে সোজা বলে দিলেন, কেন এই তো তোমার ছেলে বসে রয়েছে। দিনরাত গানবাজনা করে, ওকেই বলো না। ছেলেমানুষ, ওইই ব্যবস্থা করবে। বাবার বন্ধু ছিলেন রাজেন। সরোদ বাজাতেন। আর সামনের বাড়ির চন্দর—স্যাকরার কাজ করতেন আবার বাবার কাছে তবলা শিখতেন। বাবা এই দুজনকে বললেন, অ্যাই তোদের আমি ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে যাব, একটু ধোপদুরস্ত জামা কাপড় পরবি, সাহেবদের সামনে কথাবার্তা বেশি বলবি না, কিছু দরকার হলে আমায় বলবি।

এমনভাবে তালিম দিয়ে, বাবার ভাষায় 'ম্যানেজ করে', বাবা তো এই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতে হাজির হলেন। দেখা গেল ডিরেক্টর সায়েবের সঙ্গে তখন তাঁর আরো কয়েকজন সায়েব বন্ধু বান্ধবও, বাজনা শুনতে এসেছেন। আমার বাবা ওঁদের সরোদ সম্বন্ধে দু-চার কথায় খানিকটা বোঝালেন। তবলার চাঁটিতে তাল দেখালেন, তবে দেখা গেল সরোদের থেকে ওঁরা যেন তবলায় বেশি আকৃষ্ট হলেন। বিশেষ করে তবলচি চন্দরবাবু ল্যাটা মানুষ, বাঁ হাতে বাজাতেন বলে। বাঁয়াটা ডান হাতে আর তবলা বাঁ হাতে।

সায়েবদের ভীষণ উৎসাহ, আগ্রহ। বাবার কথাগুলো সব নোটবুকে টুকে নিয়েছেন। সরোদ তবলা সবকিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, নানাদিক থেকে দেখে, কতো ভাবে না ফটো তুলল। চোখেমুখে অবিশ্বাসের বিস্ময়। সেই তিরিশের যুগের গোড়ার কথা। শুধু দুটো আঙুলের কায়দায় সরোদের তার থেকে যে শব্দের তরঙ্গ, সুরের ঝংকার বা তবলার বোল-চালে যে তাল ছন্দ তৈরি হচ্ছে তাতে তাঁরা মুগ্ধ হতবাক। পর্যবেক্ষণেও

তেমন নিপুণ কুশলী। তাই ডিরেক্টর সাহেব নিজে এগিয়ে এসে সরোদের তারগুলো একটু এদিক ওদিক করে কান মুচড়ে বা টুং টাং করে আশ্চর্য, অনভ্যস্ত দুই আঙুলের খেলায়, দুম করে একটা বিলিতী গৎও বাজিয়ে শুনিয়ে দিয়ে কি খুশি! এবারে অবাক আমার বাবা আর তার দুই যন্ত্রীবন্ধু।

রাজেন কাকা তো বাইরে বেরিয়ে এসে বাবাকে বলে ফেলেছিলেন—শালা, একটা দৈত্য নাকি। সরোদের মত যে তারের যন্ত্র বাজাবার জন্য, শুধু ঠিকমত বসতে আমাদের দু-চার বছর লেগে যায়, সেখানে সায়েব কিনা, ওই একটু নাড়াচাড়া করে, কোন তারটায় কি কাজ, তা একটু বুঝে নিয়েই পুরো একটা বিলিতী গৎ একেবারে বাজিয়ে দিল!

বাবা বলেছিলেন, তাহলে বোঝ কি অবজারভেশন, কি সুরজ্ঞান, কানই বা কিরকম তৈরি।

এইরকম, নানা কারণে তখনকার দিনে, গান, বাজনা, যাত্রা নাটক এসব জগতের জ্ঞানী, গুণী, নামী কতো মানুষদের সমাবেশ যে আমাদের বাড়িতে চিরকাল হত, তা আজ কি বলব। এবং যে কোনও কারণে হোক আজও এরকম আসা যাওয়া যে অব্যাহত, এই যে সিতাংশু ঘোষের মত পণ্ডিত মানুষ .....

আরে থাক থাক আমার কথা।

বিমান—বলতে চাইছি যে সন্ধ্যা মুখার্জ্জি, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এ.টি.কানন, ভি.বালসারা, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বা আঙ্গুরবালার মত শিল্পীরা আমার বাড়িতে কত এসেছেন। সে তো আমার পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। আরে আঙ্গুরবালা তো এ বাড়িতে নিজেই এসেছেন, আমার বোনেদের বলেছিলেন, বিমান কিন্তু আমায় আসতে বলে নি। আমি নিজেই এসেছি। কি মহাভাগ্য বলো তো। আসলে উনি প্রথমবার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন গোপীনাথের মন্দিরে পূজা দিতেই। নিজে থেকে এসেছিলেন। তারপরে অবশ্য আমার বাবার সূত্রেই তাঁর সেই যাওয়া আসা অব্যাহত ছিল। আর আজ এখনো এই জিনিসটা চলছে। এত শিল্পীর আসা যাওয়া, বলতে বাধা নেই এটা যেন আমাদের এই বাড়ির একটা ঐতিহ্য হয়ে গেছে।

আচ্ছা এইবারে এসো তো তোমার বাবার জীবনের শেষদিকে। কি করে কি অবস্থায় সকলের এত ভালবাসা ছেড়ে, ঘনিষ্ঠ জগৎটাকে এমন প্রায় নীরবে ছেড়ে চলে গেলেন। সেই কথাগুলো একটু বলো না।

আগেই বলেছি আমার ঠাকুরদাদার সময় থেকেই আমাদের পরিবারে গান বাজনার একটা পরিমণ্ডল ছিল। আমার বাবারও সেই পারিবারিক আবহাওয়ার সূত্রে বরাবরই গানবাজনা নাটক যাত্রা অভিনয়ের চর্চাতেই দিনরাত কাটত। গান বাজনা করে পয়সা রোজগারের প্রশ্নই ছিল না। প্রথম জীবনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বেশি গাইতেন পরে অন্যান্য নানা ধরনের গানেও চলে গেলেন। বাজনার ব্যাপারেও তাই নানারকম যন্ত্রে হাত পাকানো এ সবের জন্যে টাকা পয়সা উপার্জনের দিকে তার মন ছিল

না। কিছু পৈতৃক জমিজমা বা কোম্পানীর কাগজের আয় থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসার যেভাবে চলতে পারে তাতে বাবা খুশি-এর ফলে গানবাজনার মহলে সারাজীবনই অ্যামেচার রয়ে গেলেন। চলেও যাচ্ছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালে ওই বিষয় সম্পত্তি জমিজমা এইসব নিয়ে জ্যাঠামশাই কাকাদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেন। বাড়ি ভাগ হল, সম্পত্তি ভাগাভাগি হল। যুদ্ধের বাজারে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেল, নতুন করে আয়ের সুবিধে নেই তাই আর্থিক অবস্থাও পড়ে গেল। এর ওপর পর পর কয়েকটা আঘাত, আমার জ্যাঠামশাই মারা গেলেন, তারপর পুত্রশোক—আমার ছোটভাই মারা গেল।

যে বাবা দিনরাত গান বাজনা নাটক অভিনয় এসব নিয়ে সদানন্দময় মানুষ ছিলেন—তিনি কিন্তু একদম বদলে গেলেন।

এ সময় থেকে তিনি সব ছেড়ে ছুড়ে শুধু কীর্ত্তন আর ভক্তিমূলক গানকে আঁকড়ে ধরলেন। আর ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে বাড়ির বাইরে যাওয়াও প্রায় বন্ধ করে দিলেন। আসলে মানসিকভাবে এত আঘাতে জর্জরিত হয়ে এমন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কাউকে তা জানতে বা বুঝতে দিতেও চাইতেন না। বাবা তখন বেশ বুঝতে পারছেন যে ডুবছেন কিন্তু আমাকে কোন দিন জানতে দিতে চাইতেন না। আমাদের বলতেন তোমরা কিছু ভেবো না। যেন টাইটানিক ডুবছে আমাদের বলছেন যাও তোমরা কেবিনের ঘরে গিয়ে বোসো। কিছু ভেবো না। আমি দেখছি। এইরকম একটা মানুষের সহ্যশক্তি আর কতোই বা তাকে ধরে রাখবে। তবু তারমধ্যে আমাদের দিকে তাঁর কর্তব্যবোধ টান টান সজাগ। এক বোন বললে সে ধ্রুপদ শিখবে, বাবা তাকে ধীরেন ভট্টাচার্য্যের কাছে ভর্তি করে দিলেন। আর একজন বললেন সে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে চায় বাবা তাকে সুবিনয় রায়ের কাছে ব্যবস্থা করে দিলেন। আমায় বললেন তোর কার কাছে শিখতে ইচ্ছে ? আমি বললুম কমল দাশগুপ্ত সুবল দাশগুপ্ত। বাবা বললেন ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি।

কিন্তু কোনদিন বলেন নি—বাবা, এখন বড় কষ্ট, আমি এখন এত টাকা যে কি করে কি করব।

না, এদের সবাইকে যে নিয়মিতভাবে বা ঠিক সময়ে টাকা দিতে পেরেছেন তা নয় আর তাঁরাও বাবাকে এত ভালবাসতেন যে কেউ টাকার জন্যে কোনো কিছু বলেন নি। নিজের যা কষ্ট তা নিজের ভেতরেই চেপে রাখতেন। এইভাবেই তাঁর দিনগুলো কাটছিল। শরীরও ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছিল। তাঁর অনেক ডাক্তার বন্ধু-টন্ধু ছিল। একদিন জানা গেল তাঁর পেটে ক্যানসার হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা, কষ্ট তাও তিনি চেপে রাখতে চেষ্টা করতেন, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায়। কোনদিন কেউ তাঁর মুখ থেকে উঃ আঃ শব্দও শোনেনি। এই অবস্থাতেও তাঁকে সম্পত্তি বিরোধের সূত্রে আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে অত্যন্ত অপমানকর কথা শুনতে হয়েছে—তুই আমাদের

থেকে বেশি সম্পত্তি নিয়েছিস। তুই আমার সম্পত্তিটা নিয়েছিস—এই ধরনের তীব্র কটুকথাও হজম করতে হয়েছে। তার মানে সর্বদিক থেকে আঘাতে, অপমানে, অনটনে বাবার কি নিপীড়িত অবস্থা। এর সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে ক্যানসারের পীড়ন।

এই রকম একটা দুরবস্থার সময়ে আমার একটা রেকর্ড বেরুল। বাবার সুরে। বাবা শয্যাশায়ী। কলের গানে দম দিয়ে বাজাবার ক্ষমতাও বাবার তখন আর নেই। ১৯৬৭ সালের ঘটনা। আমি তখন ধার দেনা করে ইলেকট্রিক/ব্যাটারীতে চলে একটা এইচ এম ভির রেকর্ড প্লেয়ার প্লে-বয় কিনে আনলুম বাবার জন্যে।

বাবা শুয়ে শুয়ে রেকর্ডের লেবেলটা বারবার এপিঠ-ওপিঠ দেখছেন, সেখানে ছাপা রয়েছে আমার নামের সঙ্গে সুরকার হিসেবে সুবল মুখোপাধ্যায়ের নামটি। ক্রমাগত এপিঠ বাজাচ্ছেন আবার সঙ্গে সঙ্গে ওপিঠ বাজাচ্ছেন। বারবার। একবার রেকর্ডটা নিয়ে অতি কষ্টে ঠাকুরঘরে গিয়ে রেকর্ডটা ঠাকুরের সিংহাসনে রাখলেন। আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন তুমি এই একটা রেকর্ডেই বিখ্যাত হয়ে যাবে। তাঁরই তৈরি করা সুরের প্রবাহে যেন তাঁর শরীরের সব রোগযন্ত্রণা সেদিন মুছে শেষ হয়ে গেল। ভারতী রেকর্ডের চার নং রেকর্ড। উৎসববাবুর লেখা—যাঁর লেখা 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা' এখনো লোকের মনে গেঁথে আছে—আর বাবার সুর। এক পিঠে—'যা চেয়েছি মাগো দাও দাও বলে তার চেয়ে বেশি দিয়েছ/আমি শুধু তোমার দেখাটি চেয়েছি, ডেকে তুমি কাছে নিয়েছ।' আর উল্টো পিঠে,—'কৃষ্ণরূপে দাঁড়াও কালী আমার হৃদয় সিংহাসনে'। সমর গুপ্ত মশাই আমায় বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে এই রেকর্ডটি করিয়েছিলেন।

এটা কি তোমার প্রথম রেকর্ড যার জন্যে বাবার এত আনন্দ ?

বিমান—না, এটা দ্বিতীয়। এর আগে একটা রেকর্ড হয়েছিল একপিঠে গীত আর অন্য পিঠে গজল। সুবল দাশগুপ্তর সুর। বাবার কিন্তু এ রেকর্ড তেমন মনোমত হয়নি। বাবা বললেন এটা পাকামো হয়েছে। এটা বিক্রী করার দরকার নেই এটা ক্যানসেল করে দাও। যাই হোক বাবার সুরের দ্বিতীয় রেকর্ডটা বেরোবার কিছুদিন পরেই এই বাড়িতেই আমার বাবা মারা গেলেন ১৯৬৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। তখন আমরা তিন ভাই আর মা। এখানে একটু মায়ের কথা বলি। কি বল,

অবশ্যই। মার কথা না হলে কি বাবার কথা পুরো হয় ?

বিমান—আমার বাবা আর মা—এঁদের বাবারা মানে, আমার ঠাকুরদাদা গোকুল মুখোপাধ্যায় আর আমার দাদামশাই পণ্ডিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দুজনে খুব বন্ধু ছিলেন। ওঁরা থাকতেন এই আমাদের পাশের গলিতে, এতই কাছে। দুই পরিবারে যথেষ্ট আসা যাওয়া, চেনাজানা, ভাবসাব ছিল। তাবলে আমার বাবা আর মার বিয়ে এমনিই কথাবার্তা বলার, পরেই হয়েছিল। লাভম্যারেজ ট্যারেজ নয়।

আরে দূর তখন আবার ওইসব ছিল নাকি। তা বিয়ের কথাবার্তা কি রকম হয়েছিল তাই একটু শুনি।

বিমান—আমার বাবা আর মার বিয়ে হয়েছিল খুব ছোট বয়সে। বলেছি তো আমার দাদামশাই ও ঠাকুরদাদা দুজনে খুব বন্ধু ছিলেন। দাদামশায়ের অনেকগুলি মেয়ে ছিল। একই পাড়ার মেয়ে, আমাদের বাড়ি খেলার জায়গা ছিল, তাই আমার মা ছোট্ট বয়সে আমাদের বাড়িতেই খেলতে আসত।

একদিন দাদামশাই রামচন্দ্র আমার ঠাকুরদাদাকে বললেন—গোকুলচন্দ্র আমি তো কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, আমার একটি মেয়েকে তুমি গ্রহণ করো। তা, আমার ঠাকুরদাদা রসিক লোক ছিলেন—তিনি বললেন ননী তো রোজই আমাদের বাড়ি আসে (ননী আমার মা নিভাননীর ডাকনাম), আমার পাকা চুল তুলে পয়সা নেয়, দশ গাছা পাকা চুল তুললে এক পয়সা। দোলনায় দোলে, বাড়িতেই খেলা করে, তা এবার না হয় পাকাপাকিই আসবে। এইভাবেই বাবা-মার বিয়ে হয়ে গেছে, মার বয়স বারো আর বাবার পনেরো। কিন্তু শোনো, সেই যে বারো বছর বয়সে মা আমাদের এ বাড়িতে এসেছিলেন তারপর কোনদিন, একদিনের জন্যও আর বাপের বাড়িতে যাননি। অথচ পাশের গলিতেই আমার মামার বাড়ি। মা তো কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন—দেখ, বারো বছর বয়সে এ বাড়িতে ঢুকেছি আর রাস্তার মুখ দেখিনি, আর তারপর একদিনও বাপের বাড়িতে রাত কাটাইনি।

তা ওঁদের বাড়িতে কি গানবাজনার তেমন চল ছিল ?

বিমান—হ্যাঁ সে কথাটা বলব। আমার দাদামশায় খুব ভাল পাখোয়াজ বাজাতেন। কি মজার দৃশ্য, দেখবার মত। আমার বাবা, মানে জামাই গান গাইছেন আর তাঁর শ্বশুর সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন। ভাবতে পারো শ্বশুর পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন আর জামাই-এর তারিফ করছেন—বহুৎ আচ্ছা। ওই রকম সব অপূর্ব পরিবেশ —কি মজার ঘটনা! আবার কোনসময় দাদামশাই বাবাকে বললেন—ওই চক্রধরটায় তোমার একটু ভুল হয়েছিল, আমি চালিয়ে নিয়েছি কিন্তু এইটা এইরকম হবে, তুমি আর একটা মাত্রা দেবে। তখন এই রকম ছিল, শ্বশুর বন্ধু হতে পারত।

আমার মনে হয়, একমাত্র গানই এরকম একটা সম্বন্ধ গড়ে দিতে পারে।

বিমান—এই পরিবেশে আমার মায়েরও গান নিয়ে ভাবনা কেমন ছিল জানো ? মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন পুরাতনী, বাংলা গানের একটা রেকর্ড করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। তাতে ভোলা ময়রার একটা গান ছিল।

'আমার মেটে ঘরে শ্রীবৃন্দাবন, ঐ ডাকছে শালিক, ডাকছে কোয়েল—হরি করবেন আগমন'।

তা, রেকর্ড করানোর পর গানটা মাকে শুনিয়েছি। মা বললেন ছাই হয়েছে।

আসলে মানব গানটার অনেক জায়গায় গলা খেলিয়ে এক-এক জায়গায় একটু বা কালোয়াতী কায়দা কসরৎ করে, যেমন ও গেয়ে থাকে, সেই রকম করে গেয়েছে। তাই মা'র মোটে ভাল লাগেনি।

তা মানব আসা মাত্রই আমি বললুম, চ' তোকে মা ডাকছে। আজ হবে তোর! তা মানব মার কাছে গিয়ে, আহা, কি আবদার করে বলল—কাকীমা কি হয়েছে ? কী

আমি ভুল করেছি, কোনখানটায় ?

মা বললে—বলি ওটা ভক্তিমূলক হয়েছে না ছাই হয়েছে। অ্যাঁ, ওরকম কি করে হবে ? ওরকম হবে না।

তা, কি রকম হবে ?

আমার মা তখন খুব অসুস্থ। দাদা মারা গেছে—বিছানায় শুয়ে শুয়ে মা খুব আস্তে আস্তে বললেন—না, এজন্মে পারবো না, সামনের জন্মে যদি পারি।

দাদা মারা যাবার পর মা তো একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। তারপর পড়ে গিয়ে, একেবারে শয্যাশায়ী, অক্ষমের জীবন। সেই কবে খেলাঘর থেকে, বারো বছরের যে বালিকা ১৯১৯ সালে, বৌ হয়ে এ ঘরে ঢুকেছিলেন—তিনিই তারপর এই প্রথম এবং শেষ বেলাকার মত 'দুঃখ সুখের ভবতরঙ্গে ভাসিয়ে দিলেন ভেলা।' নিজের হাতে গড়া সেই ঘর সংসারের মঞ্চ ছেড়ে, ১৯৮৯ তে ঘটল মার চির নিষ্ক্রমণ।

আমার মা, জ্যেঠিমা কাকীমা সবাই বেশ সঙ্গীত অনুরাগিনী ছিলেন। বিশেষ করে কাকীমা ভাল গান গাইতেন—বিয়ের পর দেখেছি কাকীমাই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছেন, তিনি আঙুরবালার গানই বেশি গাইতেন। তবে এছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান, ভক্তিমূলক গান বা কীর্ত্তনও খুব গাইতেন। এসব গান অবশ্য তিনি মহিলাদের কাছে শিখেছিলেন—কেননা পুরুষমানুষদের কাছে মেয়েদের গান শেখার তখন চল ছিল না। তখনকার দিনে বাড়ির গুরুজনদের এই ধরনের গান শোনানোর একটা রেওয়াজ ছিল, তিনি বাপের বাড়িতেই গান-টান শিখেছিলেন তবে কলের গান থেকে শুনে শুনে, সরাসরি গান তুলে নেওয়াটাও তখন খুব চালু ছিল। পরের যুগে আমার চার বোনেরা—প্রীতি, চিত্রা, ঝরনা আর অর্চনা—খুব ভাল শিখেছিল। এরা ধীরেন ভট্টাচার্য্যের কাছে ধ্রুপদের তালিম নিয়েছিল। বড়দি প্রফুল্লকুমার দাসের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতও শিখেছিল। ছোড়দি সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে চলে গেল সুবিনয় রায়ের কাছে। তবে অন্যান্য নানা ধরনের গান তারা শিখেছিল বাবার কাছে। মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বাবা তেমন উদগ্রীব বা পক্ষপাতী ছিলেন না। বাবার কাছে গান—সব থেকে বড় বিদ্যে। মেয়েরা ভাল করে গান শিখবে, বড় হবে তাতেই বাবার আগ্রহ। হয়ত এইসব কারণেই ছোট বোন ছাড়া আর কারুরই ছাঁদনাতলায় সাত পাকে বাঁধা পড়া, হয়ে ওঠেনি। শুধু ছোটবোনেরই বিয়ে হয়েছিল, অ্যাকাডেমিক মানুষ, এক কমার্সের অধ্যাপকের সঙ্গে নাম—বাসব চক্রবর্তী।

আব ছোটভাই নিতাই মুখোপাধ্যায়ও গান করে। এরা কেউই প্রফেশনাল নয়। তবে আমার বোনেরা গান শেখায় আর পরীক্ষা-টরীক্ষা দেওয়ায়—এরা তো কেউ বিয়ে থা করেনি। গান পড়াশানো নিয়েই থাকে।

ছোট ভাই গান করে, ছেলেদের পড়ায়, টিউটোরিয়াল করে। কলেজের ছেলেদের পড়ায়, প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে ওর বেশ সুনামই আছে। গান খুব ভালই গায় তবে আমার বাবার যে নাটক এবং গানের ঝোঁক ছিল, এই দুটোতেই কিন্তু ওর খুব আকর্ষণ। তাই ও নিজে লেখে, নিজে প্রযোজনা করে। গান গায়, নিজে সুর দেয়।

অর্কেস্ট্রা কমপোজিসন করে—ওই সব নিয়ে সব সময় ব্যস্ত। ও-ও বিয়ে থা করে নি। গান বাজনা লেখালেখি এই নিয়ে থাকে।

তার মানে তোমার বাবা গান বাজনার যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন—তা তোমাদের পরে, ধরে রাখার মত কেউ, তাহলে প্রায় থাকছে না।



যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়

বিমান—না, এইখানেই ফুলস্টপ। নিতাই প্রতি বছর একটা করে নাটক তৈরি করে। জন্মাষ্টমীর দিন আমাদের বাড়িতে ঠাকুরের সামনে সূর্যোদয় থেকে পরের দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা ধরে যে উৎসব হয় সেখানেই তার নাটক অভিনয় হয়। ভক্তিমূলক গান রচনা করা, পাড়ায় ছেলেমেয়ে বা বন্ধুবান্ধব দের দিয়ে, অভিনয় করানো, গান গাওয়া বা গাওয়ানো এ সবই ছোটভাই নিতাই বরাবর করে আসছে। বাড়ির এই যে গানের পরিবেশ কয়েক পুরুষ ধরে চলে আসছে, আমরা চলে গেলে আর তা থাকবে না। আমাদের বাড়ির এই ঐতিহ্যও সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে।

আমি প্রথমে আমাদের পাড়ার প্রাইমারী ইস্কুলে, যেটা আমাদের বাড়িতেই ছিল, সেখানেই লেখাপড়া শুরু করি আর তারপর ওখান থেকে, সেকালে যাকে বলত ইউ পি অর্থাৎ আপার প্রাইমারী বাংলায় সেটাকে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা বলত, সেটা পাশ করে, শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হই।

সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করলুম ১৯৪৯ সালে। ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়া হত। এবার স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হই। ওখানে আমার থেকে এক বছরের সিনিয়ার ছিল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী কালের বিখ্যাত গীতিকার। মজা এই যে তখন থেকে গানবাজনার ব্যাপার নিয়ে পুলকের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তখন থেকেই ও একটু আধটু গানটান লিখত আর আমিও সুরটুর করে গাইতুম।

স্কটিশে তো মেয়েরাও পড়ত। তা সেই উঠতি বয়সে, মেয়েদের দিকে যেমন হয় আর কি, যেমন একটু দুর্বলতা প্রকাশ করত তেমনি দুষ্টুমি করে খুব মজা করত। এরকম একটা মজার কথা বলি।

পুলক একবার একটা গান লিখে ফেলল—'এপ্রিল কি মে/মনে নেই যে/দেখা হল দু'টিতে/কলেজের ছুটিতে। ক'বে সেই ডে/মনে নেই যে।।'

আমি গানটায় সুর করে, আমাদের থেকে উঁচু ক্লাসের একটি মেয়েকে শুনিয়েও দিয়েছিলাম। ব্যস্, সে যুগে, এইতেই মেয়েরা আমাদের নামে কমপ্লেনও করেছিল। ফলে, কলেজ থেকে আমাকে একটা ওয়ার্নিং দেওয়া হল মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করার জন্যে। কিন্তু আরো মজা হল যখন ক্লাসের সমস্ত মেয়েরা আমার ফেভারে এই ওয়ার্নিং-এর বিরুদ্ধে অ্যাপীল করে বসল। ওরা সবাই একবাক্যে

বললে—বিমান খুব ভাল ছেলে, কখনও অসভ্যতা করে না। একদিন একটা গান গেয়ে ফেলেছে, তো কি একটা যেন হয়ে গেছে—ওকে ক্ষমা করে দিন।

এইখানে এই গানটা নিয়ে আর একটা মজার কথা বলি।

পরবর্তীকালে পুলকের পরিবারে বাংলা ছবি প্রডিউস করার একটা ঝোঁক হয়েছিল। ওর এক পিসেমশাই কি মেসোমশাই না, ভগ্নীপতি—দিদি কনকের স্বামী ছিলেন নামকরা পরিচালক সরোজ মুখোপাধ্যায়। তাঁর একটা ছবিতে উপযুক্ত সিচুয়েশনের একটা জায়গায় দেখা গেল, পুলক স্কটিশে পড়ার সময়ের ওই গানটা দিব্যি ঢুকিয়ে দিয়েছে।

তার মানে দেখো গানটা তখনো তার মনে গেঁথে ছিল। মন থেকে মুছে যায়নি। স্কটিশ চার্চে পড়তুম, মনে বেশ একটা গর্ব হোত। এই কলেজেই—তখন নাম ছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলি, একদিন পড়তেন স্বামী বিবেকানন্দ তারপর সুভাষচন্দ্র। এমনি কতো নামকরা লোক। আমরাও সেখানে পড়ি একি কম কথা! আমাদের থেকে একটু সিনিয়ার ঢাকা থেকে পাশ করে এসে ১৯৪৪ কি ৪৫-এ ভর্তি হয়েছেন বিখ্যাত গায়িকা উৎপলা ঘোষ।

মানে তখন তাঁর ওই 'এক হাতে মোর পুজোর থালা', রেকর্ডটা বোধহয় বেরিয়ে গেছে। তাই না ?

হ্যাঁ ওটা তখন বেরিয়েছে, খুব নাম করেছে।

কলেজে ছাত্র হিসেবে আমরা এমন কিছু ছিলাম না। যেমন সাধারণ ছাত্ররা সব হয়, আমরাও তেমনি সাদামাঠা, সাধারণ।

কিন্তু সেই কলেজে অনেক আনন্দের মুহূর্তের মধ্যে একটা বিশেষ আনন্দের দিনের কথা না বললে নয়। ১৯৯৯ সালে এই স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী হিসেবে আমাদের তিনজনকে—উৎপলা সেন, পুলক আর আমাকে একসঙ্গে ওই কলেজে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সে দিন, সে যে কি আনন্দ হয়েছিল তা আর বলতে পারব না, আমার জীবনের এটা একটা মস্ত বড় জিনিস, বিরাট পাথেয়। আমি এত বড় স্বীকৃতি আমার কলেজ থেকে পেয়েছি। এরকম আর একবারও হয়েছিল। তখন যে ইন্টার-কলেজিয়েট সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হত তাতে ১৯৫০ সালে, আমি কলেজের হয়ে পুরস্কার পেয়ে, কলেজকে ট্রফি এনে দিতে পেরেছি। সেদিনের বিচারকদের মধ্যে একজন এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর এই ৯৩/৯৪ বছর বয়সে তিনি আমাকে এত ভালবাসেন যে এখনো তিনি বিমানের কোনও নিন্দা সহ্য করবেন না। এদিক দিয়ে আমার যে কত সৌভাগ্য, তা বলে বোঝাতে পারব না। কিছুকাল আগেও তিনি ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন আমি তাঁর পায়ের তলায় বসে গান গেয়েছি। আমি যতক্ষণ গান গাইলুম ততক্ষণ উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে গেলেন। ভাই, কথাটা বলতে আমার এখনো গর্ব হচ্ছে মানে, আমার মতন একজনকে এই যে এত ভালবাসা, এ ক'জন পায়। ওঁর সঙ্গে বাকি যাঁরা বিচারক

ছিলেন অনিল বাগচী, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় এঁদের সবাইকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি—যদিও তাঁরা কেউই এখন আর নেই। আমার থেকে বয়সে বড় বা যাঁরা পিতৃপ্রতিম তাঁদের সকলকার পায়ে আজও আমার প্রণাম জানাচ্ছি। (হ্যাঁ, সঙ্গীতাচার্য যামিনী গাঙ্গুলীও, শেষমেষ ১৫ই আগস্ট ২০০২-এ আনন্দধামে চলে গেলেন!)

তা, এরপর কলেজে লেখাপড়া কি রকম চালালে বা এই সময় থেকে কোনো একটা সিস্টেমেটিক ভাবে, গান-টান শিখতে কি আরম্ভ করলে ?

বিমান—এর পরেই সব গোলমাল হয়ে গেল। হঠাৎ আমার বাবাকে বললাম যে আমার ভাল্লাগছে না। আমার পড়াশোনা করার ইচ্ছেটাই ছিল না। পরিষ্কার বলছি, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ফেল করলাম। পড়তেই মন চাইত না। আমার বাবা এতে খুব আঘাত পেলেন। বাবা বলতেন এজন পুরুষের, মিনিমাম অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন অন্তত গ্রাজুয়েট হওয়া চাই। তা আমি গ্র্যাজুয়েট হতে পারলুম না। বাবা এই বিষয়ে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তাঁকে আমি অনেক কষ্টও দিয়েছি। তবু তিনি এবার খুব সিরিয়াস ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সত্যিই মন দিয়ে ঠিকমত গান করতে চাই কি না। আমি সমান প্রত্যয়ের সঙ্গে বললুম—হ্যাঁ।

বাবা আমায় সত্যেন ঘোষালের কাছে নিয়ে গেলেন—

তাহলে সত্যেন ঘোষালই তোমরা গানের প্রথম গুরু ?

বিমান—না, না আমার বাবাই আমার প্রথম গুরু, তাঁর কাছেই তো আমি এতদিন যা কিছু শিখেছি।

বাবা প্রথম গুরু সেটা ঠিক আছে। কিন্তু বাড়ির বাইরের কারুর কাছে শেখা বলতে যা বোঝায় সেই হিসেবে প্রথম গুরু কাকে বলা যাবে সেই কথাটা বলছি ?

বিমান—না, তখন কমল দাশগুপ্ত সুবল দাশগুপ্ত আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমার তখন ওঁদের কাছ থেকে টুকটাক বেশ তালিম চলছে। ওঁদের বাড়িতেও আমি যাতায়াত করছি, শিখছি তবে বাবাকে না জানিয়ে।

কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্তরা যে তোমাদের বাড়িতে আসতেন, তুমি যেতে, তা কি সূত্রে ওঁরা আসতেন ?

বিমান—আরে ওঁরা আসতেন বাবার বন্ধু হিসেবে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে। বাবা যখন ওঁদের সঙ্গে গল্পগুজবে করছেন আমি সেখানে থাকলে বাবা আমায় বলতেন—যাও, ভেতরে যাও। পড়াশোনা করোগে। আমায় সরিয়ে দিলে কি হবে; বাবা মনে মনে বুঝলেন যে এরকম করে হবে না। গান শিখতে চাইলে ভাল করে শিখতে হবে। তাই তিনি তখন আমায় সত্যেন ঘোষালের কাছে নিয়ে গেলেন। সেই শুরু হল। তোমার ওই, সিস্টেমেটিক শেখা। প্রথম গুরু বাবা—তারপর প্রকৃত অর্থে সত্যেন ঘোষাল। মাঝখানে কমল দাশগুপ্ত সুবল দাশগুপ্ত খুব আসতেন, আড্ডা মারতে সময় কাটাতে হরদমই আসতেন। তখন একটি বড় বৈঠকখানা ছিল। আর বলতে কি, তখন কে, না আসত আমাদের বাড়িতে—অভিনেতা, গায়ক, গায়িকা?

তাছাড়া এই শোভাবাজার-বাগবাজার অঞ্চলে থাকার কারণে; আমি নিজেও কি কম নামজাদা মানুষের সঙ্গ করেছি ? নানা ক্ষেত্রে তাঁদের কতোজনকে তো সেই ছোট বেলা থেকে দেখছি।

কয়েকজনের নাম বলো না!

বিমান—সাহিত্যিকদের কথা আগে বলি। ধরো, হেমেন্দ্রকুমার রায়। তবে এঁর কথা একটু পরে আরো বলব'খন। এখানে শুধু এঁর সূত্রে, নজরুলের কথা আগে বলে নিচ্ছি। বিচুলি ঘাটে, গঙ্গার ধারে হেমেন্দ্রকুমারের বাড়িতে নজরুল প্রায়ই আসতেন। একদিন এখানে এসে নজরুল দেখলেন হেমেন রায়ের দুই ছেলে—হাবুলদা আর গাবুলদা কিছুতেই পড়ায় মন দিচ্ছে না। দুষ্টুমি করছে। তাই তাদের থামাবার জন্য নজরুল ওইখানে বসে, লিখে ফেললেন—'এক এক্কে এক, বাবা কোথায় দ্যাখ/দুই এক্কে দুই—নেইকো একটু শুই' তারপর আরও এগিয়ে চলল কবিতাটা। এমনি ধারায় দশ এক্কে দশ পর্যন্ত এসে শেষ হল। ছেলেরাও মজা পেল। এই হল স্বভাবকবি নজরুলের চরিত্র। আবার এই নজরুলের বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তখন থাকতেন গোপীমোহন দত্ত লেনে। সেই সূত্রে চেনা জানা। উনি নিজে আমায় বলেছেন নজরুল গদ্য লিখত আর আমি পদ্য অথচ দেখ কে কোন দিকে চলে যায়। এই শৈলজানন্দ ছবি করলেন—পাতালপুরী, নজরুলকে করলেন সঙ্গীত পরিচালক। আর নজরুলের সহকারী হয়ে এলেন কমল দাশগুপ্ত। এই ভাবেই ক্রমে ক্রমে যোগসূত্র তৈরি হয়—চেনাজানা হয়ে যায়।

তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে, আমার বাবার মাসী, মানে আমার ঠাকুমার বোনের বাড়িতে, ভাড়া থাকতেন। অত বড় মানুষ ওখানে থাকতেন, তবে তা বোঝবার মত বোধশক্তি আমাদের তখনো হয় নি। আমি তখন ছাত্র—সামান্য গানটান করছি। চুপিচুপি লুকিয়ে একদিন তারাশঙ্করের বাড়িতে গিয়ে পড়লুম। ভয়ে ভয়ে গেছি। উনি সিনেমার জন্য গল্প-টল্প লিখতেন। তাই যদি কোনও ছবিতে সুরটুর করার একটা চান্স করে দেন—এই মতলব আর কি! সেদিন ওঁর কাছে দু'তিনজন বন্ধু মানুষকে দেখলাম—পরে জেনেছিলাম তাঁরাও বিরাট মানুষ। একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একজন বনফুল। আমার উচ্চাশার কথা শুনে, ওঁরা মজা করে পরীক্ষা বা রগড় করে যাচাই করতে নামলেন। বিভূতিভূষণ বললেন,—তুমি গাইতে পারো, সুর করতে পারো বলছ। বেশ, আমি দুটো লাইন বলছি—সঙ্গে সঙ্গে সুর করতো দেখি কেমন পারো!' কথাটা বলে একটু ছড়ার মত করে উনি দুটো লাইন আওড়ালেন—'ও ললিতে, চাপ কলিতে একটা কথা শোনো সে/রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে—চূড়োবাঁধা এক মিনসে।' নাও, চটপট এর সুর করো তো।

আমিও একটা লোকসঙ্গীতের সুর ভেঙ্গে, তক্ষুনি ফোকসঙের মত গেয়ে দিয়েছি। দিকপাল তিন সাহিত্যিক বন্ধুর মধ্যে একটু যেন চোখাচোখি হল। তারপর গম্ভীর মানুষ তারাশঙ্কর—একটু রাঢ় অঞ্চলের টান মিশিয়ে, ধীর কণ্ঠে বললেন,—হুঁ, মনে হচ্ছে এ পারবেক হে।

এর কাছাকাছি নিবেদিতা লেনে একটা গানের স্কুল ছিল—কস্তুরবা সঙ্গীত বিদ্যালয়। সেখানে গান শেখাতে আসতেন কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিজনবালা ঘোষদস্তিদারও আসতেন দেখেছি। পরে তো কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্তদের আমাদের বাড়িতেই কতো দেখেছি। বাবার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়িতেও গেছি। তবে অভিনেতাদের মধ্যে সব থেকে বেশি আসতেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। নামকরা গায়িকা-—অভিনেত্রী মিস মনোরমা, ঊষাবতী এঁরাও খুব আসতেন।



কানন দেবী

তা এঁরা কেন বা কি উদ্দেশ্যে এত আসতেন ?

বিমান—আসল উদ্দেশ্য ছিল ঠাকুর দর্শন, গোপীনাথজীকে প্রণাম। এই রকমই খুব আসতেন নাট্যকার এবং নট বিধায়ক ভট্টাচার্য—যাঁকে মধুসংলাপী উপাধিতে লোকে চিনত। আর একজনকে মনে পড়ে দুলাল মুখোপাধ্যায়—যিনি পরে সন্ন্যাসীর জীবনে চলে গিয়ে অবধূত বা কালিকানন্দ অবধূত নামে সাহিত্যিক হিসেবেও খুব চাঞ্চল্য জাগিয়েছিলেন একসময়। তাছাড়া শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পরে কাজী নজরুল ইসলামও এসেছেন কয়েকবার।

আমার বাবার গ্রামোফোন কোম্পানীতে যাতায়াত ছিল—বোধ হয় সেই সূত্রে আরো কতজনই যে আসতেন! সে যুগের বিখ্যাত তুলসী লাহিড়ী। তাঁর ছোট ভাই গোপাল লাহিড়ী, বিখ্যাত ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে।

হ্যাঁ তুলসী লাহিড়ীর মত এমন চৌকশ প্রতিভা রঙ্গজগতে বড় একটা দেখা যায় না। জমিদার বাড়ির ছেলে ওকালতি পেশা ছেড়ে সোজা নির্বাক ছবির জগতে। তারপর একাধারে গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, চরিত্রাভিনেতা, চিত্রপরিচালক কি নয়। আর ছোটভাই গোপাল লাহিড়ী ? এর কথা আগে একটু বলেছ।

বিমান—তবে একটা ইতিহাসের কথা, এই ফাঁকে বলে রাখি যে—১৯৩২ সালে যন্ত্রসঙ্গীতের ইতিহাসে ভারতের প্রথম যুগলবন্দীর রেকর্ড বেরিয়েছিল বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের সরোদের সঙ্গে এই গোপাল লাহিড়ীর ক্ল্যারিওনেট বাজনা। আর রেকর্ডে গানের সঙ্গে ক্ল্যারিওনেটের অ্যাকোম্প্যানিমেন্ট যে এই গোপাল লাহিড়ী মশাই শুরু করেছিলেন তা তো আগেই বলেছি। কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত বা দুর্গা সেন এঁদের কথা আগে উল্লেখ করেছি।

হ্যাঁ, তারপর ধরো হাসির গানের রাজা রঞ্জিত রায়। উনি বাগবাজারে আমাদের কাছাকাছি থাকতেন। এই সঙ্গে সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কথাও বলতে হয়। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে এঁর যে বাড়ি ছিল চীৎপুর রোডে, তার ঠিক পাশের বাড়িটা ছিল আমাদের—যেখানে আমার জ্যাঠামশাই, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর থাকতেন।

আসলে হেমেন্দ্রকুমার আমায় জ্যাঠা- মশাইয়ের বন্ধু ছিলেন। আমার বাবা তাঁকে হেমেনদা বলতেন। ১৯৪২ সালে জ্যাঠামশাই মারা যাবার পর উনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে বাবার কাছে আসতেন। এই হেমেন্দ্রকুমার খুবই জনপ্রিয় সাহিত্যিক, শিশু সাহিত্যিক তো ছিলেনই কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতার কারণে শিশিরবাবুর থিয়েটারে একজন নৃত্য পরিচালকও ছিলেন। একই সঙ্গে একজন মস্ত গীতিকার হিসেবেও তাঁর তখন খুব নাম ডাক। কৃষ্ণচন্দ্র দের কণ্ঠে তাঁর লেখা কত গান যে লোকের মুখে মুখে ফিরত তা আর কি বলব। শিশিরকুমারের সীতা নাটকে 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে', এটা হেমেন্দ্রকুমারের লেখা। তারপর ধরো 'আমার কবিতা হারায়ে ফেলেছি', 'বধূ চরণ ধরে বারণ করি' কৃষ্ণচন্দ্র দের এই সব বহু বিখ্যাত গানের গীতিকার ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। শচীন দেববর্মনের একটা বিখ্যাত গান 'ও কালো মেঘ বলতে পারো'—এটাও হেমেন্দ্রকুমারের লেখা। সুগীতিকার হিসেবে তখন ওঁকে বলা হত বাংলার ওমর খৈয়াম।

আর শিশু সাহিত্যিক হিসেবে, ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের বই যখের ধন, বা সেইসব চরিত্র—বিমল, কুমার, রামহরি বা জয়ন্ত, সুন্দরবাবু—ছোট বড় কেউ আজো এদের ভুলতে পারে নি।

বিমান—তাছাড়া ওঁর পরবর্তী কালের বই 'যাঁদের দেখেছি' বা 'এখন যাঁদের দেখছি' এসব তো অনবদ্য। তাই বলছি এঁদের তুলনা হয় না, আর দ্বিতীয় আসবেও না।

আরও বলছি যে, আমার বাবার দয়াতে আমার অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গাতে যাবার যোগাযোগ হয়েছে। এবং সেই যোগাযোগগুলো, আমার বাবা তেমন পছন্দও করতেন না। বলতেন ওইটুকু বয়সে ওসব জায়গায় যাবে না, এইরকম আর কি। যেমন, আমি যখন ওই কম বয়সে আঙুর-মা, ইন্দু-মা মানে আঙ্গুরবালা দেবী ইন্দুবালা দেবী বা কমলা ঝরিয়া বা কানন দেবীর বাড়ি যাওয়া আসা করতুম আমার বাবা সেটা তেমন পছন্দ করতেন না।

তা কানন দেবীর প্রসঙ্গ এখানে আসছে কি করে ? কিংবা আঙ্গুরবালা বা ইন্দুবালা! এঁরা তো এপাড়ার দিকে থাকতেন, গান বাজনার জগতে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে না হয় যোগাযোগ হতেই পারে কিন্তু কানন দেবী ? ইনি এখানে আসছেন কোন্ সময় বা কোন সূত্রে ?

বিমান—আমার বাবার সঙ্গে ওঁর আলাপ পরিচয় ছিল—তবে ওটা হয়েছিল কানন দেবীর অনেক লেট আওয়ারে। উনি যখন কমল দাশগুপ্তের সুরে গান করছেন, নিউ থিয়েটার্সের যুগের অনেক পরে। এই ধরো ১৯৪১-এর পরে। নিউ থিয়েটার্সে কানন দেবীর শেষ ছবি—'পরিচয়' ১৯৪০ সালে। পরিচয়ের পর কানন দেবীর হাতে কোনও কাজ ছিল না। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে তখন একটা মনোমালিন্য চলছে। উনি বোধ হয়, তিনশো টাকা মাইনে বাড়াতে বলেছিলেন—একথা আমার কানন দেবীব নিজের মুখে শোনা। নিউথিয়েটার্স তাতে রাজী হয় নি। এঁদের



প্রমথেশ বড়ুয়া

অবস্থা তখন ভাল নয়। কানন দেবী এন. টি. ছেড়ে দিলেন। কিন্তু মনে মনে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন কেননা বীরেন্দ্রনাথ সরকারকে তিনি ভয়ানক শ্রদ্ধা করতেন। একদিন কানন দেবী একটি গল্প বলেছিলেন। আমার মুখ দিয়ে এখন বলছি বটে, কিন্তু জেনো বয়ানটা অবিকল কানন দেবীর—

"আমাদের সময় তখন নিয়মিত ইংরীজী ছবি দেখার বাধ্যবাধকতা ছিল। বলত ভাল করে অভিনয় শিখতে হলে, ইংরীজী ছবি দেখতেই হবে। তা, একদিন মেট্রোয় একটা সিনেমা দেখতে গেছি। হঠাৎ মেট্রোর করিডরে প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উনি সেই তাঁর নিজস্ব ভাবালু বাচন ভঙ্গিতে বললেন

এই যে কানন! কেমন আছো, কি করছো এখন ?

না, কোন কাজ কর্ম করছি না। বসে আছি।

কাজ করতে চাও ?

হ্যাঁ।

তাহলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

এইটুকু কথা বলেই সেদিন উনি শেষ করলেন। চলে গেলেন।

ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে, ওঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে আমি দেখা করলুম। উনি বললেন—আমি এম পি প্রোডাকশনে যোগ দিচ্ছি—'শেষ উত্তর' বলে একটা ছবি করব। ডাবল ভার্সান, দুটো ফিমেল রোল, দুজন হিরোয়িন দরকার। একটায় যমুনা করবে আর একটায় তুমি।

তা, আমার গল্পটা ভাল লাগল। তাছাড়া বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে অভিনয় করার আনন্দ আর অভিজ্ঞতা দুইই—খুব হয়েছিল। এই বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে কাজ করে 'মুক্তি' আমাকে অনেক ওপরে তুলে দিয়েছিল, যে—মুক্তির নামটা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।

নতুন জায়গা, শুধু বড়ুয়া সাহেব ছাড়া আর সবাই আমার অপরিচিত, অজানা পরিবেশ। শুনলুম সঙ্গীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত। এর আগে কমলবাবুর নামটা শোনা ছিল তবে আমি পঙ্কজবাবু আর রাইচাঁদ বড়াল এই দুজন মিউজিক ডিরেক্টরের কাছে বেশি কাজ করেছি। আর মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীতে কাজী নজরুল, বিনোদ গাঙ্গুলী, জ্ঞান দত্ত আর রাইচাঁদ বড়াল এই ক'জনের পরিচালনায় অনেক গানও করেছি। আমার আর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।


প্রনব রায়

তাই কমলবাবুর কাছে গান শিখতে গিয়ে, আমি দেখলাম বা আমার মনে হল আমি একটা সাগর দেখেছি যে সাগরে, পঙ্কজবাবু আর রাইচাঁদ আমাকে তরিয়ে দিয়েছেন। আর এখানে যে আর একটা সাগরে এসে পড়লাম।

কানন দেবী বলছেন,—বড়ুয়া সাহেব যখন আমাকে কমল দাশগুপ্তর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আর তখন কমলবাবু যেভাবে আমার পরীক্ষা নিলেন আর তারপর বললেন দেখুন, আপনার গলাটা একটু ঘষামাজা করতে হবে আমার গান গাইবার জন্যে—তখন আমি বললুম, এতে আমি অভ্যস্ত। যখন যে মিউজিক ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করেছি, তাঁর মত করেই আমাকে গলা তৈরি করতে হয়েছে। এখনও আমি তাই করব।

তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আমার আর সব কালজয়ী গান, তা সে 'আমি বনফুল গো' হোক কি অন্য যে গানই হোক, সব কমল দাশগুপ্তর সুরে তৈরি।''

এখানে একটা কথা বলি। আমি কানন দেবীর নিজের মুখ থেকে শুনেছি যে তখনকার দিনের সঙ্গীত পরিচালকদের অন্য আর একটা নাম ছিল, সেকেণ্ড ডিরেক্টর অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিচালক। তার মানে ছবি তৈরি করার ব্যাপারে সঙ্গীত পরিচালকের শুধু গানের ব্যাপারে নয়—সামগ্রিক ভাবে ছবিকে ভাল করার ব্যাপারে, সঙ্গীত পরিচালকের কথার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। একটা ঘটনার কথা বললেই কথাটা পরিষ্কার হবে। কানন দেবী বলছিলেন—'শেষ উত্তর ছবিটা তোলা শেষ হয়ে গেল। তখন বিশ্বযুদ্ধের সময়। সিনেমায় কাঁচা ফিল্ম আমদানী করে আনতে হয় তাই র-ফিল্মের খুব অভাব। অপচয় এড়াতে খুব বুঝেসুঝে ফিল্ম খরচ করতে হয়। শেষ উত্তর ছবিটা উদ্বোধনের পোষ্টার পর্যন্ত সব জায়গায় শোভা পাচ্ছে। বড়ুয়া সাহেবের বাড়িতে ছবিটার একটা প্রাক-উদ্বোধন শো হল। ছবিটার একটা জায়গা দেখিয়ে কমলবাবু বড়ুয়া সাহেবকে বললেন, এই জায়গাটার সিচুয়েশনে আমার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, এইখানে একটা গান থাকলে ভাল হত। বড়ুয়া সাহেব বুঝলেন যে কমলবাবুর কথাটা ফেলবার মত নয়। কিন্তু ছবির টাইটেল কার্ড তৈরি হয়ে গেছে—ছবি শেষ। এখন একটা গান ঢুকিয়ে নতুন করে শুটিং করা বাড়তি অনেক খরচের ব্যাপার। প্রোডিউসারের কাছে রাজার ছেলে বড়ুয়া সাহেবের খাতির অন্যরকম। তারা বলল আপনি কিছু ভাববেন না। খরচ যা লাগে হবে। আপনার মনোমত করে কাজটা শেষ করুন। প্রণব রায়ের লেখা একটা গান তৈরি হল। বড়ুয়া সাহেব কমলবাবুকে বললেন এ গানটা আপনি লাগাবার ব্যবস্থা করুন। এদিকে টাইটেল কার্ডে সব গানের গীতিকার হিসেবে শৈলেন রায়ের নাম। সেখানে তো প্রণব-রায়ের নাম আর ঢোকানো যাবে না। তা হোক, বড়ুয়া সাহেব

সিনারিও পাল্টালেন। ছবির ডেট পিছিয়ে দিতেও বড়ুয়া সাহেবের আপত্তি নেই। যুদ্ধের কাজের তৎপরতার মত নতুন গান, দৃশ্য তোলা হয়ে গেল, ছবিতে জোড়া হল। শুধু ওই গানটার গীতিকার প্রণব রায়ের নাম আর ছবিতে দেওয়া গেল না। তবে রেকর্ডে অবশ্য যথাযথ ভাবেই ওঁর নাম ছাপা হল। কানন দেবীর গাওয়া 'আমি বনফুল গো—গীতিকার প্রণব রায়'। কমলবাবুর কথায় এই গানটা যে ছবিটা কতো দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা এই ষাট বছর পরে এখনও গানটার জনপ্রিয়তা থেকে বোঝা যায়। আমি হয়ত একটু মজা করার জন্যে কানন দেবীকে জিজ্ঞেস করেছি আপনি তো এত মিউজিক ডিরেক্টরের কাছে কাজ করেছেন তা আপনার মতে কে শ্রেষ্ঠ বলতে পারেন ? উনি বল্লেন এক একজনের কাছে যখন শিখেছি তখন মনে হয়েছে যেন, তীর্থ দর্শন করছি। রাইবাবুর কাছে যখন শিখেছি তখন মনে হয়েছে হিমালয়ের কোলে বসে কৈলাসের মহাদেবকে দেখছি। পঙ্কজ মল্লিকের কাছে যখন 'সবার রঙে রঙ মেশাতে' শিখেছি তখন মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন দেখতে পাচ্ছি আর তা পঙ্কজদা যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাতে পঙ্কজদাকে মনে হয়েছিল তিনি একজন রবীন্দ্রাত্মা পুরুষ, আমার জীবন দেবতা। আর কমলবাবুর কাছে এসে যখন শিখেছি, তখন মনে হয়েছে সপ্ত সাগরের সঙ্গমে এসে আমি ডুব দিচ্ছি, শিখছি। এক একজনের রূপ তাঁর নিজের মত—এঁদের তল পাওয়া ভার।

দেখ, কি অপূর্ব ভাষায় কানন দেবী এ প্রশ্নটির জবাব দিয়েছিলেন। কি ভক্তি আর শ্রদ্ধা, সকলের প্রতিই।

এইরকম আর একজন শিল্পীর কথা বলি। তিনি আঙুরবালা দেবী। এইখানে একটা কথা আমাকে বলতেই হবে। দেখ আমার জীবনে আজ হয়ত অনেক কিছু পাইনি, পার্থিব অনেক জিনিস আমার বরাতে জোটেনি কিন্তু বলতে আনন্দই হচ্ছে যে অপার্থিব এমন অনেক জিনিস আমি পেয়েছি, যার কোন তুলনা হয় না বা তা ক'জন পেয়েছে তাও বলতে পারি না। যেমন ধরো আঙুরবালা দেবীকে গান শেখাতে গিয়ে আমার হাত কাঁপছে। আঙুরবালা দেবীকে গান—আমি আবার কি শেখাব ? তাঁর চারখানা গানের রেকর্ড তখন বাজারে বেরুবে। আর আমি হব তার ট্রেনার। এঁকে আমি আর কি শেখাব-রে বাবা।

ওঁর কথা বলার যেমন ধরন, তেমন করে বলছেন—অ'ছেলে কি রকম গান করবে, গাও না, আমি একটু শুনি, তোমার গান শুনি। বেশ ঠাট ঠমকের সঙ্গেই বলছেন—। ইনি জমিরুদ্দিন খাঁন, নজরুল ইসলাম, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত এঁদের মত রথীমহারথীদের পার করে এসেছেন, আমি তো এঁদের কাছে সামান্য, কি বলব, অ্যাকোরিয়ামের একটা ছোট্ট লাল মাছ। তা আমি তো ভয়ে ভয়ে গান শোনালুম। অনেকগুলো গান পরপর গেয়ে গেলুম। উনি তার থেকে চারটে গান পছন্দ করে দিলেন যেমন, 'ঢের সেধেছি ঢের কেঁদেছি', 'তব চরণ প্রান্তে মরণ বেলায়, স্মরণ, যারে হাত দিয়ে মালা'। গান তো উনি নির্বাচন করলেন। তারপর প্রতিদিন সকালে ওঁর বাড়ি যাই, কাছেই দর্জিপাড়াতে গান শেখাতে কিংবা এমনিই।

তা একদিন গান শেখাচ্ছি ওই, 'তব চরণ প্রান্তে মরণ বেলায়'—উনি তো তিরিশের দশকের গায়িকা ছিলেন কিন্তু এই গানটা একটু আজকালকার ধরনের অর্থাৎ ষাটের দশকের উপযোগী। তা একটা কাজ, এই ষাটের দশকের সঙ্গে খাপ খায়, আমি করছি। ওঁর তখন প্রায় সত্তর বছর বয়েস, কাজটা ওঁর গলায় ঠিক নিখুঁৎ আসছে না। গলাটা মোটা হয়ে গেছে। ওঁর অসুবিধেটা বুঝে, আমি বলে ফেলেছি —বাঃ ঠিক আছে। দেখলুম উনি ঝপ করে খাতাটা বন্ধ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। আমি বললুম কী হল ? চুপ করে গেলে কেন, বলো।

উনি যেন গর্জন করে উঠলেন—তুমি মাস্টার মস্ত ফাঁকিবাজ। যাও, তোমার কাছে গান শিখব না। তুমি যে কাজটা করছ সেটা আমার গলা দিয়ে বেরুল না অথচ তুমি কিনা বললে, হয়েছে। তোমার যে গান, তা আজ আমার গলায় দিয়ে বেরুল না, আজকে আমার সে বয়েসটা নেই। তা না হলে দেখিয়ে দিতাম, তুমি কতো বড় মাস্টার। জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব করোগেটের শেডে ছড়ি টেনে কড় কড় করে আওয়াজ তুলে বলেছিলেন, গলা দিয়ে এমন দানা বের করতে হবে। সেটাও আমি গলায় করে দেখিয়েছি সেদিন। তোমার এতটুকু ধৈর্য নেই, আজ আমার গলা দিয়ে তোমার কাজটা তোমার মত হল না। আর তুমি কিনা বলে দিলে হয়েছে! আমি তখন অপ্রস্তুত, তাড়াতাড়ি বললুম আজ একটা স্পেশাল পায়ের ধূলো নেব ? তিনি তখন থেমে ঠাট্টা করে, একটা গালাগাল দিয়ে বললেন—নে, বোস। আবার কর্ আমিও আবার করি। যতটা পারি তা তো করছি। ছাড়বি কেন ?

বাঃ। একটা কথা এখানে মনে হচ্ছে হঠাৎ আঙুরবালাকে তুমি গান শেখাতে গেলেই বা কেন। কী সূত্রে বা কোন সময়ে বলো তো।

বিমান—সেটা ১৯৭০ হবে, আমি তখন এইচ এম ভি বা অন্যান্য রেকর্ড কোম্পানীগুলোতে ট্রেনার হয়ে গেছি। এইম এম ভিতে ট্রেনার হয়ে আমার একটু সুনামও ছড়িয়েছিল যে আমি একজন ভাল ট্রেনার। তখন অন্য কোম্পানীগুলো থেকেও ডাকা ডাকি করত। বেশ গর্ব হত।

কিন্তু এইচ এম ভি-তে বাঁধা ট্রেনার হয়ে, অন্যান্য কোম্পানীতে আবার কি করে যেতে ?

বিমান—হ্যাঁ আমার এই অনুমতিটা ছিল। যাকে বলে ফ্রি-ল্যান্সার, সেরকম।

তা আঙ্গুরবালার কাছে যাবার কথাটা উঠল কি করে ?

বিমান—সে এক ব্যাপার। এইচ এম ভি থেকে আমায় বলল, দেখ না নজরুলের গান তো আবার ফিরে এসেছে, বাজার হয়েছে। তোমাকে তো আঙ্গুরবালা খুব স্নেহ করেন, তা একবার দেখ না, ওঁকে দিয়ে একটা রেকর্ড করাতে পারো কিনা। আমাকেও একটা টোপ দিয়েছিল। তুমিই ট্রেনার হবে।

তা আমি আঙ্গুরবালার কাছে গেলাম। বললাম কথাটা। তাতে উনি বললেন, দূর এত বয়স হয়ে গেছে, তার ওপর গলা এমন মোটা হয়ে গেছে, আমি কি আর পারব ?

আমি বললুম—আরে আমি তো ট্রেনার, যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ধরে তুমি করবে।

ট্রেনার হিসাবে তো আমার সঙ্গে ওঁর প্রথম আলাপ নয়। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ অনেক দিন থেকে। ওঁর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আগে একবার বলেছি যে, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলতে গেলে আমার দাদু ছিলেন। গীতিকার-সুরকার হিসেবে, সে যুগের গান বাজনার মহলে উৎসববাবু নামে তাঁর যথেষ্ট নামডাক, খ্যাতি ছিল। গাইতেনও ভাল। সেই উৎসববাবু একসময় অনেক দিন ধরে আঙ্গুরবালার ট্রেনারও ছিলেন, এবং সেই সূত্রে আঙ্গুরবালার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ছিল। আঙ্গুরবালার গাওয়া বিখ্যাত 'হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা' গানটাই কেবল নয়, আঙ্গুরবালার আর একখানা গান 'বাঁধো না তরীখানি' ও উৎসববাবুর লেখা, সুর এবং ট্রেনিং। শ্রীমতী ইন্দুবালারও একখানা গান ছিল, 'পাগল পাগল বলে লোকে, আমি পাগল হতে পারলাম কই' এটাও উৎসববাবুর। এসব গান এখন তো লোক কতো শোনে বা শুনতে চায় কিন্তু উৎসববাবুকে কে আর জানে ?

সেইজন্যই তো উৎসববাবুকে তুলে ধরা দরকার। ওঁর অনেক গান রজনীকান্তের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, অনেক গানের গীতিকারের নাম 'অজ্ঞাত' বলে নানান বইএ ছাপা থাকে। আমি তো এরকম কতো 'অজ্ঞাত' কেটে কেটে উৎসববাবুর নাম লিখেছি।

বিমান—আর দেখ কিরকম ট্রেনার ছিলেন। কাদের শেখাচ্ছেন ? না, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালার মত দুর্দান্ত গায়িকাদের। রাম শ্যাম যদু মধুদের নয়। তা আঙ্গুরবালাকে উনি যখন শেখাতেন, তখন আমার বাবা, মামার সঙ্গে আঙ্গুরবালা দেবীর বাড়ি যেতেন। তার সূত্রে আমাদের তিনি খুব স্নেহ করতেন। দ্যাখো আঙ্গুরবালার গানের শেষ বয়সে, এইচ এম ভি-র ট্রেনার হিসাবে আমার একটু নাম-টাম হয়েছে। আমাকে এত ভালবাসতেন যে, একবার নানা কাজে এক সপ্তাহ ওঁর বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠে নি।—একদিন দুপুরে ভাত খেতে বসেছি, এমন সময় শুনলুম, নিচ থেকে পাড়ার কয়েকজন ছেলে চেঁচিয়ে ডাকছে—নন্টুদা, নন্টুদা (আমার ডাক নাম) দেখ কে এসেছেন। ও মা দেখি আঙ্গুরবালা দেবী! আমি তো হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছি, দেখি যে আঙ্গুরবালা দেবী ওই ঠাকুরের উঠোনের পাশে, রকে বসে রয়েছেন। আমি তো অবাক। মা, কাকীমাও এসে পড়েছেন। ওঁকে ভেতরে নিয়ে যাবার কথা বলতেই, মুখ ঝামটে বললেন, কেন যাবো ? বিমান তো আমায় আসতে বলে নি। আমি নিজে থেকে এসেছি।

আমিও মজা করে বললাম, তোমার তো দেখছি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, ভর দুপুরে এই ভাত খাওয়ার সময় লোকের বাড়ি এসেছো!

অমনি আঙ্গুরবালা দেবী হাসিমুখে চোখ পাকিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, দেখেছো কাণ্ড, নিজে থেকে এসেছি তাও আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

এবার তাঁকে একেবারে জড়িয়ে ধরলুম। তখন কি হাসি।

হ্যাঁ এই হাসিগুলোই তো চিরকাল থেকে যায়, তাই না ?



ইন্দুবালাদেবী

বিমান—আমার মা বললেন, একবার ওপরে যাবেন না ? তখন স্নেহমাখা সুরে বললেন, আর একদিন যাবো। আমি অনেকদূরে একজায়গায় গিয়েছিলুম, এখান দিয়ে বাড়ি ফিরছি, ভাবলুম আমার বিমান ছেলেটা কেমন আছে একবারটা দেখে যাই। আমার সঙ্গে এইরকমই সম্বন্ধ ছিল। আর একদিনের কথা বলি। সেদিন ওঁর দর্জিপাড়ার বাড়িতে আমি আর উনি শুধু দুজনে বসে আছি। কথা কইতে কইতে উনি আমাকে বললেন, হ্যাঁ রে হনির (আঙ্গুরবালা দেবী উৎসববাবুকে তার ডাকনাম 'হনি' বলেই ডাকতেন) সেই কালো খাতাটা কোথায় গেল বলতো ?

আমি বললাম সেটা আমার বাবা আমায় দিয়ে গেছেন।

ওতে যত গান ছিল, জানিস তা সব আমায় নিয়ে লেখা। নিজের মধ্যে ডুবে আঙ্গুরবালা বলছেন, উনি শেষ কোন গান শিখিয়েছিলেন জানিস ?

বাঃ এতো দেখছি বেশ রসঘন নাটকীয় মোড় নিচ্ছে।

বিমান—হ্যাঁ, বেশ নাটকীয় ঘটনা। আগেই বলেছি, আঙ্গুরবালার সঙ্গে উৎসববাবুর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আঙ্গুরবালার বাড়ির নাম ছিল দ্রাক্ষাকুঞ্জ, ওটাও উৎসববাবুর দেওয়া। নানা কারণে উৎসববাবুর সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। বরং খিটিমিটি অশান্তি প্রায়শই পারিবারিক জীবনটা তেতো করে ফেলত। এইরকম একদিন মনোমালিন্য একটু বেশিমাত্রাতেই হয়ত হয়েছিল। 'দূর-এই সংসার' এই না বলে, উৎসববাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন কাউকে কিছু না বলে, সটান দ্রাক্ষাকুঞ্জে এসে, সোজা আঙ্গুরবালাকে বললেন, আঙ্গুর এক্ষুনি একটা গান তোলো। এক্ষুনি। বসে গেলেন, তোলালেন, 'আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি/তুমি যেন (আমায়) ঘৃণা কোরো না/আদর যতন করিতে যেমন, সে বাঁধন যেন ছিঁড়ো না/আপনার, পর সবারে চিনেছি, তাই তো রেখেছি দূরে গো/হৃদয়ের বীণা ভাঙিয়া ফেলেছি, পাছে বা সুরে তা বাজে গো/আসুক দুঃখ আসুক বেদনা, আসুক ভুবন ঘিরিয়া/শুধু তুমি থেকো দুটো কথা বোলো/দূরে যেনো সরে যেও না।।'

তা এই আঙ্গুরবালার সঙ্গে আমার আমৃত্যু সম্পর্ক ছিল। উনি যে বছর মারা গেলেন—সেই ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত।

আঙ্গুরবালা অনেক নাটকে অভিনয় করেছিলেন।

নাটক কেন, হিন্দি, উর্দু, বাংলা মিলিয়ে বহু চলচ্চিত্রেও তো তাঁকে দেখা গেছে।

এরকম সবদিকে চৌকশ শিল্পী দ্বিতীয় খুঁজে পাওয়া ভার। আসলে নির্বাক চলচ্চিত্রে অভিনেত্রী হিসাবে জীবন শুরু করে—উর্দু, হিন্দি, বাংলা, বহু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। একই সঙ্গে সঙ্গীতজগতের শীর্ষস্থানে পৌঁছে, শেষ দিন পর্যন্ত দাপুটে শিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তিতে, কখনো এতটুকু টান ধরে নি। প্রথম রেকর্ড এইচ এম ভি-র পি-৪৭২১ এর এক পিঠে 'বাঁধ না তরী খানি' আর অন্য পিঠে 'কালা তোর তরে কদমতলায়' এই দিয়ে গানের জগতে প্রবেশ, তখন তার বয়স ষোলোও না। আর সেই জয় যাত্রা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, কোন কিছুতে থামে নি। প্রথম সবাক ছবি যমুনা পুলিনে দিয়ে ছায়াছবির জীবন শুরু আর তারপর মুক্তার মুক্তি নাটকে নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে প্রথম মঞ্চে নামালেন নৃপেন বসু —সে যুগের বিখ্যাত নেপেন বোস। এরপর যে কত বিখ্যাত নাটকে অভিনয়ে গানে মাত করে দিয়েছেন তার কয়েকটা তো আজো নাটকের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেমন—আত্মদর্শন, তুলসীদাস, সাজাহান, ব্যাপিকা বিদায়—

বিমান—হ্যাঁ, উনি নিজে আমায় বলেছেন যে একবার সত্যের সন্ধান নাটকে উনি পিয়ারী আর কবির ভূমিকায় কৃষ্ণচন্দ্র দে। কেষ্টবাবু এ নাটকের সুরকারও। তা আঙ্গুরবালা বলছেন, 'একদিন আমার গানেই বেশি এনকোর পড়ছে (তখনকার দিনে থিয়েটারে এই এনকোর বলে একটা জিনিসের চল ছিল। ভাল লাগলেই লোকে চেঁচাবে এনকোর এনকোর—মানে রিপীট, আবার গাও) কেষ্টবাবু জনান্তিকে বললেন, কিগো আঙ্গুর, তুমি যে আজ আমায় বসিয়ে দিলে, তা আমি বললুম সুরকার তো আপনিই, শেখানে ও আপনার—এ বাহবা তো আপনারই পাওনা।' এই রকম হত তখন। থিয়েটারে আমরা অনেক কিছু দেখতাম, শুনতাম। এমনি কতো কথা, কতো ঘটনা আঙ্গুরবালার কাছে আমিও শুনেছি। এই প্রসঙ্গে আঙ্গুর-মার মুখের অন্য একটা গল্প, এইখানে বলতে ইচ্ছে করছে। এ থেকে বুঝবে, অন্যদের গুণের স্বীকৃতি দিতে আঙ্গুর-মার মনটাও কতো বড় ছিল। যেমন, কানন দেবীর কথা প্রসঙ্গে আঙ্গুরবালা বলছেন—

কানন তো আমাদের সময়কার। তখন থেকেই দেখেছি, ও কিন্তু এক অদ্ভুত ধরণের অন্যরকম মেয়ে ছিল। আমাদের তখন অল্প বয়েস। কাজের ফাঁকে আমরা সবাই একসঙ্গে বসে আড্ডা দিই, হাসি গল্পগুজব করি। হৈ হুল্লোড় করি। এই, তোর ওই পার্টটা কিরকম লাগছে ? আজকে মেকআপটা কিরকম হবে, এই সব। স্টুডিওতে সিনেমার শ্যুটিং এর দিন যেমন সব মেয়েরা করে আর কি ? কানন কিন্তু তা নয়, চিরকাল ওর—ওপরে ওঠার লক্ষ্য। এমনি একদিন হঠাৎ দেখি আমাদের কারুর সঙ্গে কোন কথা নয়। আমাদের ওই হৈ-চৈ চেঁচামিচির মধ্যে কানন একপাশে, আলাদা মনে ইংরেজি ফার্স্টবুক পড়ছে। নিজে নিজে ইংরেজি পড়ছে, ইংরেজি শিখছে। আমরা তখন খুব ইয়ার্কি, ঠাট্টা-তামাসা করেছি, কিন্তু পরবর্তী কালে কানন কি রকম ভালো ইংরেজি বলতো। বিলেত আমেরিকা কতো ঘুরে এল। আমরা তো আর জীবনে ওসব জায়গায় যেতে পারি নি।

সেইজন্যই মজা দেখ, সে কাননবালা থেকে কানন দেবী হয়ে গেল আর আমরা সেই বালা'ই রয়ে গেলাম।

না, না তাতো নয় সবাই এখনো কতো ভালোবাসে, বলে আঙ্গুরবালা দেবী ইন্দুবালা দেবী.........

বিমান—ঠিক, তা ঠিক বলেছ। হ্যাঁ, ইন্দুবালা, আমার ইন্দু-মার কথা যখন এসেই পড়ল তখন ইন্দুবালার কথাও এই এখানেই বলে নিই।

ইন্দুবালার বাড়িতে আমার প্রথম যাওয়া—সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। তখন শীতকাল, বেলা সাড়ে এগারোটা-বারোটা হবে। আমার বাবা হঠাৎ আমায় বললেন, চলো তো, আমার সঙ্গে চলো। তখন আমার বয়স ১০/১২ হবে। বাবা একটা রিক্সা ডেকে আমায় বললেন, ওঠো।

বাবাও রিক্সাতে উঠে রিক্সাওয়ালাকে বললেন, চলো রামবাগান চলো। বাপ-ব্যাটা একসঙ্গে রামবাগানে যাবে শুনে, রিক্সাওলাও মনে হল একটু থমকে গেল। তখন রামবাগান জায়গাটা, লোকের চোখে তেমন একটা সম্মানের ছিল না। এখন ওই জায়গাটার নাম হয়েছে অদ্বৈত মল্লিক লেন বা ডোমপাড়া। একটা বাড়ির সামনে এসে দেখি বাড়ির গায়ে পাথরের ওপর লেখা মিস ইন্দুবালা। আমার এখনো বেশ মনে আছে বাবা রিক্সাওলাকে আট-আনা পয়সা দিয়েছিলেন। বাবা আমায় বললেন, নামো।

দুজনে মিলে ওপরে যেতেই দেখলুম বাড়ির এক মহিলা তটস্থ হয়ে উঠলেন। ইন্দুবালাকে তাঁর বাড়িতে এই প্রথম দেখলুম। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এ কী আমার সৌভাগ্য, সকাল বেলায় ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলো পড়ল আমার বাড়িতে।' আমার বাবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। আর তারপর আমায় দেখিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটি, এটি কে ?

বাবা বললেন, আমার মেজ ছেলে। অমনি 'তুমি দাঁড়াও তো বাবা' বলে উনি আমার পায়ে হাত দিতে এসেছেন দেখে, আমি পিছিয়ে সরে যাচ্ছিলুম, উনি আমায় বললেন না বাবা, ব্রাহ্মণ সন্তান, তা তোমার পৈতে হোয়েছে ? আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম হ্যাঁ আমার পৈতে হয়ে গেছে। আর রোখা গেল না, আমার বাবা বললেন, আরে ওর আবার পায়ের ধূলো কি নেবে ? 'কী যে বলো', উনি বললেন, 'না বাব, ওটা আমায় করতেই হবে'। উনি একরকম জোর করেই সেদিন আমার পায়ের ধূলো নিলেন। আমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছি। তখনকার যুগে ওঁরা সব খুব ধর্মভীরু ছিলেন আর ব্রাহ্মণদের খুব মানতেন। তাছাড়া আমাদের বাড়িতে গোপীনাথ মন্দিরের দৌলতে আমাদের ওপর ভক্তি-টক্তিগুলো খুব দেখাতেন সবাই। আমার বাবা তখন সামলে নেবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, আমার এ ছেলেটা কিছু গানটান করে, বিশেষ করে কাজীর গান। তোমার গানও আমি কয়েকটা শিখিয়েছি। ও তোমাকে কিছু গান শোনাবে।

তা আমায় শুনিয়ে ওর কি হবে ? আমি ওর কী উপকারে লাগব ?

তুমি শুনে একটু বলবে, ওর কতটা কী হোল।

বাবা বললেন, তাছাড়া ওর হচ্ছে কিনা সেটা তুমিই ভালো বুঝবে। তুমি হলে গহরজান বাঈজীর হাতে তৈরি।

বাবার মুখে এই কথাটা শোনা মাত্র উনি দুকানে হাত দিলেন, গুরুর নামে একটু মাথা নোয়ালেন।

যাই হোক, আমি ওঁকে গেয়ে শোনালুম—'বৌকথা কও', ওঁরই রেকর্ডের গান। বাবা আমায় শিখিয়েছিলেন, রেকর্ডটাও তিনি আমায় অজস্র বার বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ট্রাই টু মীট ইট। আমি গাইলাম, ইন্দুবালা শুনলেন। শুনে ওঁর নিজস্ব জোরালো বলার ঢং-এ বললেন, ও যা গাইল, ইন্দুবালার চোদ্দ পুরুষ তা গাইতে পারবে না। আমি তো থ!

বাবা বললেন, না না এরকম বলতে নেই, অমনি করে বোলো না। ইন্দুবালা তাতে যেন আরো প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'শুনুন মুকুজ্জে মশাই আমি এই ইন্দুবালা, সেই ইন্দুবালার বিচারক হয়ে, এই কথাটা বলছি। জানেন বাবা, এখনকার এই ছেলে-মেয়েরা, এরা অনেক এগিয়ে গেছে। আমাদের সময় গান ছিল মুখস্ত গাওয়া, চীৎকার করে গাইতে হোত। আমাদের এক্সপ্রেসন দেবার জায়গা ছিল না। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে, গান এখন অনেক এগিয়ে গেছে। গানের ভেতরে অনেক মাধুর্য এসেছে। তখনকার দিনে আমাদের শুধু গানই ছিল। এখন অন্যরকম, গানে অনেক মাধুর্য এসেছে।'

আমি অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনছি। তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষটিকে দেখছি—তাঁর পরিমণ্ডলটা দেখছি। ঘরে সাজানো অনেক খেলনা-পুতুল চোখে পড়ছিল—এগুলো সবই শিল্পীর নিজের হাতে তৈরি। তাঁর পরিধানটার কথাও আমার এখনও মনে আছে। উনি তখন শাড়ী পরে ছিলেন না, তাঁর পরনে ছিল এক অদ্ভুত রকমের ঘাঘরা ধরনের পরিধান। বাড়িতে অনেক পোষা পশু পাখিও ছিল। আর দেখেছিলাম, ওঁর অদ্ভুত মাতৃভক্তি। সেই দুঃখিনী মা, যিনি কি কষ্ট করেই না এই শিল্পী ইন্দুবালাকে গড়ে তুলেছিলেন। ওঁর সেই মাকেও আমি দেখেছিলাম। ইন্দুবালার মার কথাও ক্রমে ক্রমে আমি তাঁর মুখ থেকে শুনেছিলাম। উনি আমার কাছে কোন কথা গোপন করেন নি, সব উন্মুক্ত সত্য বলেছিলেন।

হ্যাঁ সে কাহিনীও তো এক গল্পের মতো। ওঁর মা সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাতেন। সে যুগের বিখ্যাত কবি, যাঁর 'পদ্যমালা' পাঠ্য বই সে যুগে কোন বাঙালিই না শৈশবে পড়েছে ! সেই কবিতা, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' কার না মুখস্ত ছিল। সেই কবি, নাট্যকার মনোমোহন বসুর সেজ ছেলে মতিলাল বসু আর ছোট ছেলে প্রিয়নাথ বসুর বিখ্যাত প্রোঃ বোসেস সার্কাসের অন্যতম মালিক মতিলাল বসুর মেয়ে, এই ইন্দু। ওই সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাতেন সুদক্ষা রাজবালা। সার্কাসে থাকতে থাকতে মতিলাল রাজবালাকে জীবনসঙ্গিনী করে নেন। আর তারপর ১৮৯৮-এর নভেম্বরে, পাঞ্জাবের মাটিতে

একদিন ইন্দুবালা প্রথম পৃথিবীর আলো দেখলেন। কিন্তু তখন থেকেই নিরবচ্ছিন্ন জীবনসংগ্রামে.......

বিমান—সেকথাও তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি। উনি বলেছিলেন 'পাঞ্জাবে আমার ছোটবেলা কেটেছিল। আমার বাবার সঙ্গে মায়ের বয়সের অনেক তফাৎ ছিল। আর আমার বাবা দেখতে মোটেই সুপুরুষ ছিলেন না। রসিকতা করে বলেছিলেন এই আমাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। বছর দুয়েকের ভেতরেই বাবা মার ছাড়াছাড়ি হবার পর, মা আমার—নিঃসহায় হয়ে গেল। অনেক ঠোক্কর খেতে খেতে, আমার যখন বছর সাতেক বয়স, তখন আমি মায়ের হাত ধরে একজনের সঙ্গে , বর্তমানের অদ্বৈত মল্লিক লেনে—তখনকার দিনের রামবাগান অঞ্চলের রূপোগাছি পাড়ার এই বাড়িতে এসে উঠি। আজও এই বাড়িতেই আছি। আমি বীণাপানি পর্দাস্কুলে ভর্তি হয়েছি, পড়েছি। 'জলপানি' পেয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেছি। ক্লাস ফোর থেকে সিক্স-এ ডবল প্রমোশোনও পেয়েছিলুম।'

কিন্তু যখন জানা গেল যে উনি, যাকে বলে গৃহস্থ বাড়ি থেকে আসেন নি, তখন স্কুল থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েছিল। ফলে ওইখানেই ওঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দেখ তাহলে কি সাংঘাতিক লজ্জা আর অপমান। পেটচালাবার জন্য রাজবালাও তখন ভাবছিলেন ভাল করে গান শেখার কথা। ওস্তাদ রেখে, খেয়াল ধ্রুপদ শেখা শুরু হল। সেই সূত্রে সেকালের বিখ্যাত পাখোয়াজি দুলী ভট্টাচার্য্যের মতো গুণী মানুষজন দেরও রামবাগানের বাড়িতে আনাগোনা শুরু হল।, মার গান শেখা শুনে ইন্দুরও যেন একটু একটু তালিম শুরু হয়ে গেল। সে সময় মার সঙ্গে বাবার ছাড়া ছাড়ি হয়ে গেলেও বাবা বা কাকা প্রোঃ প্রিয়নাথ বসু মাঝে মাঝেই ইন্দুকে দেখতে রামবাগানের বাড়িতে আসতেন। কিছু কিছু টাকা পয়সাও দিতেন। বাবা কিন্তু ইন্দুকে খুব আদর করতেন। কবির ছেলে, মতিলাল কতো সময় ছড়া কাটতে কাটতে ইন্দুকে আদর করতেন। 'হারানিধি ইন্দু আমার একবার আয়, করি কোলে/ তাপিত হৃদয় জুড়াও আমার, শ্রীমুখে একবার, বাবা বলে।' ইন্দুও বাবার কোলে উঠে, শুনে শুনে শেখা গানের টুকরো কলি গেয়ে উঠত। প্রিয়কাকা বলতেন, দাদা দেখ, আজ বলছি ইন্দু ঠিক গাইয়ে হবে।

বিমান—ওঁর হাতের লেখাও খুব সুন্দর ছিল। প্রবীণ বয়সে উনি ওর একখানা আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। আমি দেখেছি। তবে উনি সেটা আর শেষ করতে পাবেন নি। পরে, বাঁধন সেনগুপ্ত সেটা সম্পূর্ণ করেছিলেন। ওই পরিস্থিতে ইন্দুবালাকে,. ওঁর মা বলেছিলেন—দেখ ইন্দু, আমার এমন কোন অর্থের সঙ্গতি নেই যে তোমায় বসিয়ে খাওয়াতে পারবো, তোমার রূপ নেই, তুমি কালো, মোটা, তুমি ট্যারা—তোমার রূপের আকর্ষণে কেউ তোমায় চাইবে না। তোমার এমন কোনও গুণ অর্জন করতে হবে যা দিয়ে তুমি জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। আর তাহলে, আমরা যারা থাকব, আমাদেরও বুড়ো বয়সে, তুমি দেখতে পারবে।

এই সময় ইন্দু বা ওঁর মাকে মোটামুটি একটু দেখাশোনা করতেন, ইন্দুর বাবার এক মামাতো ভাই, জীবনকৃষ্ণ ঘোষ। ইন্দু এঁকেই কাকা বলতেন। আর ওঁর মাও এঁর ওপর যথেষ্ট নির্ভর করতেন। ইন্দুর মার দুশ্চিন্তা দেখে, এই জীবনকৃষ্ণই একদিন বললেন, তুমি ভেবো না, আমি ইন্দুর গান শেখার একটা ব্যবস্থা ঠিক করে দেবো।

বিমান—হ্যাঁ ইনিই ইন্দুকে তখনকার দিনের বিখ্যাত গৌরীশঙ্কর মিশিরজীর কাছে নিয়ে গেলেন। বলে কয়ে ইন্দুকে গান শেখাবার জন্যে মিশিরজীকে রাজীও করালেন। সেই শুরু হল ইন্দুর নিয়মমাফিক গান শেখা। ইন্দুর গানের উৎসাহ, গলার কাজে, খুশি হয়ে মিশিরজী একদিন ইন্দুকে গহরজান বাঈজীর কাছে গান শিখতে নিয়ে গেলেন। ইন্দু-মা আমায় বলেছিলেন—'প্রথম দিন গহরজানের রূপ দেখেই আমি বিমোহিত হয়ে গেছি। তারপর তার চলন বলন, তার স্টাইল, ধরনধারণ সবই যেন কি অদ্ভুত অপরূপ লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, ওই সুন্দরী যৌবনবতী অর্থবতী রমণী, জানি না, আমার মত এই কুৎসিৎ মেয়েটাকে কেন তিনি এত স্নেহে আপন করে নিলেন।' গহরজানের কাছে ইন্দুবালা অনেকদিন গান শিখেছেন এবং পরবর্তীকালে আরো যাঁদের কাছে শিখেছেন তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁয়ের কথা উনি খুব বেশি বলতেন। এই জমিরুদ্দিন খাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা গড়ে ওঠে গ্রামাফোন কোম্পানীতে। গ্রামাফোন কোম্পানীতে ইন্দুবালাকে নিয়ে যান সেকালের নামকরা গাইয়ে এম এন ঘোষ—মন্তাবাবু। পরে ইন্দুবালাকে থিয়েটারেও নিয়ে গিয়েছিলেন এই মন্তাবাবু। গানে এবং থিয়েটারে অভিনয়ে উনি খুব নাম করেন। আমি নিজে শুনেছি, গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকের পাগলিনী চরিত্রের সংলাপ অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে গড় গড় করে মুখস্ত বলে যাচ্ছেন। উনি দানী বাবুর সঙ্গে অভিনয় করেছেন, আবার পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ীদের সঙ্গেও অভিনয় করেছেন। আবার দেখ, বায়োস্কোপ, ছায়াছবিতে নির্বাক যুগে বা সবাক যুগে, সমান তালে অভিনয় করেছেন। সেই সঙ্গে হিন্দি, উর্দু বা গুজরাতি কতো ছবিতে অভিনয় করেছেন, তা আর কে জানে।

আরে, আমি নিজে বম্বের রঞ্জিত মুভিটোনের 'দেওয়ালী' (১৯৪০-৪১) ছবিতে ইন্দুবালাকে দেখেছি। বড়লোকের স্থূলাঙ্গী অনূঢ়া কন্যার চরিত্রে। কনে দেখতে এসে পাত্র বেশী মতিলাল একবারটি মেয়ে দেখেই দৌড়ে পালাচ্ছেন, এই সিচুয়েশনে ইন্দুবালা দরজার কপাট ধরে গেয়ে উঠলেন সেই বিখ্যাত ঠুংরি, 'সাঁইয়া তু একবেরি আ যা'। নিপাট লক্ষ্ণৌ-ই তান বাটে। আমরা তো কোন ছার পলায়নপর মতিলালকেও সুরের জাদুতে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

বিমান—হ্যাঁ, ইন্দুবালাই প্রথম মহিলা যিনি বাংলার বাইরে হিন্দি উর্দুতে গান রেকর্ড করেছিলেন। পাঞ্জাবে জন্মাবার এবং থাকার দরুণ তিনি বাংলার বাইরের অনেকগুলো ভাষা জানতেন। আর সেগুলোর উচ্চারণও ছিল খুব ভালো।

কিন্তু একটা কথা যে উনি মহীশূরে কি করে রাজার সভাগায়িকা হলেন ? ওদিকে

তো উত্তরভারতীয় ভাষা চলত না, কেউ বুঝত না। আবার ইন্দুবালাও দক্ষিণের ভাষায় রপ্ত ছিলেন না। তাহলে ?

বিমান—আরে একসময় তাঁর গানের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহীশূরের ক্ষেত্রে তিনি বলেই দিয়েছিলেন যে উত্তর-ভারতীয় খেয়াল, ঠুংরি, গজল, দাদরা সব গানই গাইব আর তাঁরাও তাতে রাজী হয়েছিলেন বলেই মহীশূরের রাজ গায়িকা হিসেবে সেখানে অনেকদিন বাঁধা চাকরি করেছেন।

তবে একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার। মহীশূরে ওঁকে একটানা থাকতে হত না। উৎসবে, অনুষ্ঠানে বিশেষ আসরে রাজার ডাক পড়লেই যেতে হত, সব খরচ রাজকোষ থেকেই জুটত। ফলে কলকাতা বা অন্যত্র গানবাজনার চর্চা বা পরিবেশনাও দিব্যি চলত। এই ভাবেই মহীশূরের রাজ গায়িকা হিসাবে মাসিক আড়াইশো টাকা মাইনেতে এগারোটা বছর তাঁর কেটেছিল। ১৯৪৬ সালে দেশ স্বাধীন হবার সময় পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় কোন বিঘ্ন হয় নি।

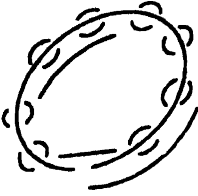
বিমান—ঠিক, সেইজন্যই গানবাজনার জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। তাঁর কথায়, আর একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এখানেই সেটা বলে নিই। ১৯৮৪ সালের ৩০ নভেম্বর, শীতকাল। সকালে উঠেই খবর পেলাম মধ্যকলকাতার একটা নার্সিংহোমে রাধাকান্ত নন্দী মারা গেছেন। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। আমি, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় নার্সিংহোমে গেলুম। অনেক শিল্পীরা এসেছেন। ওখানে খানিকক্ষণ রইলাম, যেটুকু যা করণীয় তা করে বাড়ি ফিরে এলুম। বাড়িতে ঢুকে সবে জুতোটা খুলে জামাটা ছাড়তে যাচ্ছি এমন সময় রামকুমার বাবুর বাড়ি থেকে একজন লোক এল। রামকুমার বাবু বলে পাঠিয়েছেন, নন্টুকে বলো জামাকাপড় ছাড়তে হবে না, এক্ষুণি বেরিয়ে আসতে, ইন্দু-মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সেদিন নিমতলা মহাশ্মশানে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। দুটো চিতা এক সঙ্গে জ্বলছে—একটা রাধাকান্ত নন্দীর আর একটা ইন্দুবালার। রাধাকান্ত নন্দীর বাবা রোহিণী নন্দী ইন্দুবালার সঙ্গে এককালে বাজিয়েছেন। ইন্দুবালাও রাধাকান্তকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কি যোগাযোগ, দুজনের চিতা একই সময়ে জ্বলছে। রাধাকান্ত নন্দীর পাশে সেদিন বিশেষ কোন শিল্পী ছিলেন না। শুধু মান্না দে-কে দেখেছি শোকার্ত হয়ে অনেকক্ষণ সেখানে থাকতে।

দেখ, দেহপট সনে নট যেমন সকলি হারায় তেমনি কণ্ঠ সনে গায়ক সকলি হারায়। তাই ইন্দুবালার চিতার পাশেও সেদিন সেরকম কিন্তু ভিড় ছিল না। তবে কলকাতার মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়কে ওখানে উপস্থিত থাকতে দেখেছি। আমি, রামকুমার বাবু যে, সেখানে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলুম সে যে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্রে, সে কথা না বললেও চলে। পরে মেয়রের সহযোগিতায় রামকুমারের চেষ্টায় কিছু অর্থসংগ্রহ করে ইন্দুবালার স্মৃতিতে নিমতলা শ্মশানে একটা পাথরের ফলক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমিও এদের সঙ্গে ছিলুম। সেইখানেই বাঙলা গানের ভুবনে, ইন্দুবালার কায়িক অন্তর্ধান।

অন্তর্ধানই বটে! কেননা সশরীরে না থকেলেও ইন্দুবালা তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে আজও রীতিমত জীবন্ত, প্রাণবন্ত। আমার মতে (একান্ত ভাবেই এটা আমার ব্যক্তিগত মত) সবরকম গানের ধারায় মিলিয়ে তিনি, আজকের মান-এও একমাত্র কমপ্লিট গায়িকা। কেউ কেউ আমার এ কথায় হয়ত ভ্রূ কোঁচকাবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁরা নিশ্চয় ইন্দুবালার সব রকম গান ভালভাবে শোনেন নি। তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, খেয়াল, ঠুংরি, দাদরা, গজল, নজরুলের গান, শ্যামা সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, নাটকের গান, কাব্যগীতি, দেহতত্ত্ব, রামপ্রসাদী প্রভৃতি সবধরনের গান শোনার সুযোগ এখন আর তেমন হয় না বলে ইন্দুবালার প্রকৃত মূল্যায়ন কেমন যেন গুলিয়ে যায়। তবে ইন্দুবালার এই প্রয়াণ প্রসঙ্গে আমার কেমন একটা আলাদা অনুভূতি হয়। দুই সমসাময়িক দুর্দান্ত শিল্পীর মধ্যে ১৯৮৪ সালের গোড়ায়, ৭ই জানুয়ারিতে চলে গেলেন আঙ্গুরবালা আর একই বছরের প্রায় শেষের দিকে ৩০ শে নভেম্বরে যে অন্যজন ইন্দুবালাও চলে গেলেন—এর মধ্যে কি কোনও ভাবসূত্রের যোগ আছে বলে মনে হয় ? ইন্দুবালার প্রয়াণের পর যে স্মৃতি-ফলকের কথা উল্লেখ করেছ সেই ফলকে শেষ পর্যন্ত যে, ইন্দুবালার নিজের লেখা একটা দারুণ কবিতা উৎকীর্ণ হয়েছিল তা যেমন যথার্থ হয়েছিল তেমনি আরো আশ্চর্য লাগে যে ওই কবিতাটাকে প্রথমে গান হিসাবে রেকর্ডে গেয়েছিলেন ওই আঙ্গুরবালা এবং পরবর্তী কালে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, যিনি ইন্দুবালার খুব ঘনিষ্ঠই ছিলেন। তিনি এই গানটা আবার রেকর্ড করেছিলেন। সব মিলিয়ে যেন একটা বিনিসুতোর মালা। ১৪০১ সালের ১লা বোশেখ, নিমতলায় বৈদ্যুতিক চুল্লীঘরের বাইরের দেয়ালে প্রতিস্থাপন করে যে ফলকটির উদ্বোধন হয়েছিল, ইন্দুবালার সেই কবিতাটিই বা কজন মন দিয়ে পড়েছেন। এইই হয়। তাই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা প্রায় অবহেলিত এই কবিতাটার অংশবিশেষ এখানে স্মরণ না করে পারছি না। কেননা এই কবিতাতেই ইন্দুবালার মর্মচেতনা, আত্মার চূড়ান্ত উপলব্ধি কি অনবদ্য ভাষাতেই না প্রকাশ পেয়েছিল—

ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান, পরম পবিত্র চরম যোগের স্থান,
পাপী পুণ্যবান, মূর্খ কি বিদ্বান, সমান ভাবে হেথা সকলে শয়ান।
কন্দর্প সমান রূপের গর্বকারী, সৎজন, তস্কর, গৃহী, বনচারী
রাজা আর ভিখারী সকলে সমান।
শ্মশানমাত্র নাম কিন্তু শান্তিধাম, সুখ-দুঃখ শ্রান্তির চির অবসান।
হেন মহাতীর্থে, আতিথ্য গ্রহণ, যদিরে অধম, চায় তোর মন
সময়মত পেলে, মৃত্যুর দরশন,—সখা, বলে তারে তুমি করো আলিঙ্গন।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ বৃহস্পতি বার, একুশে জুন, দুহাজার এক। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। মেঘলা রঙ দেখে আকাশটাকে মনে হচ্ছে যেন, শ্লেট। আর শ্লেট দেখলেই সেই ছোট বেলার অ আ ক খ-র আঁকিবুকি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তা আজকে, তোমার সেই প্রথম ভাগের দিনগুলো দিয়েই শুরু করো না—

বিমান— সে ওই ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে আমার জন্ম, আমাদের এই বাড়িতেই। বাংলা আশ্বিন মাসে, রাধাষ্টমীর আগে—পরে একটা দিন। ঠিক কোন দিন তা বলতে পারব না। না, আমাদের বাড়িতে জন্মদিন পালন করবার চল নেই। আর বাড়িতে, মা ঠাকুরমারা এক একজন, এক একটা তারিখ বলতেন। কারুর সঙ্গে কারুর মিলত না। তাই সঠিক বলা যাচ্ছে না। আমাদের এই পাড়াটা ছিল একটু আধাগ্রাম। আমার মনে আছে, আমার বাবা সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যুর ওপার থেকে আমাদের পাড়ার এই দিকটার কোনও ব্যাপারে বলতে গেলে, চিরকাল চেঁচিয়ে বলতেন খেজুরতলা। পুরনো কলকাতার অনেক জায়গাতেই তখন এই 'তলা'-টা নামের সঙ্গে জুড়ে খুব চলত। বটতলা, তেঁতুলতলা, কম্বুলেতলা, এমনি আর কি। এ নামের অনেকগুলো তো এখনো চলছে। এই পাড়াতে ছেলেদের পড়ার জন্য একটাই প্রাইমারী ইস্কুল ছিল। তা ওটাও আমাদের এই বাড়িতে আমাদের বাপ-ঠাকুরদার এবং এবাড়ি-সেবাড়ি, কবিরাজ বাড়ির কর্তারা—সবাই মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছেলেরা যাতে কাছাকাছি পড়াশোনা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। আজো এটা এখানে রয়েছে এবং চলছে। ক্রমে, গভর্ণমেন্টকে অনেক ধরা করা করে এখান থেকে বৃত্তি পরীক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছিল। এর শতবর্ষও পার হয়ে গেছে ১৯৮৫ তে।

তা, ওখান থেকে আপার প্রাইমারী অর্থাৎ বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করে আমি শ্যামবাজারের এ.ভি.স্কুলে ভর্তি হই। ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৪৯ সালে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হলাম। কিন্তু কি বলব, লেখাপড়ায় আমি কোন দিন তেমন ভাল ছিলুম না। তেমনি কোন কালে কিছুতেই পড়াশোনায় মন ছিল না, মন

লাগত না। তখন থেকে কেবল গানের প্রতিই আমার যতো দুর্বলতা ছিল। গান নিয়েই যেন পাগল। এই ধরো না, কিছুদিন আগে আমার এক ছাত্র কানন দেবীর একটা হিন্দি গানের ক্যাসেট দিয়ে গেছে। 'জবাব', 'হসপিটাল', 'বিদ্যাপতি' এসব ছবির গান আমি বহুবার শুনেছি তবু আমি আবার ওই ক্যাসেট বার বার শুনছি। যতো শুনছি, নতুন করে ভাল লাগছে, আবার শুনছি। আমার ভাই বোনেরা তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বুঝছি কারুর আর ততো ভাললাগছে না। কিন্তু আমার যেন আরো বেশি বেশিই ভাল লাগছে। পাগলের মত শুনছি।

আমার সংসার জীবন বড় বিচিত্র। সেই ছোটবেলা থেকেই আমি গাইয়ে হব, বড় সুরকার হব, গান নিয়ে থাকব, সব সময় এমনি সব স্বপ্ন দেখতুম। অহরহ সেই ভাবনায় ছটফট করতুম। সেই বয়সে যখন সব ছেলেরা দৌড়োদৌড়ি করছে, খেলাধূলায় মেতে থাকছে, আমার ভাগ্য তখন আমার জন্য যেন অন্যরকম বিচরণ কেন্দ্র তৈরি করছে। জীবনে এগিয়ে যাবার দৌড়ে, আমার শরীরটা ক্রমাগত প্রতিবন্ধ হয়ে হয়ে, হার্ডল রেসে পরিণত করেছে।

তাই ওই অল্প বয়সেই আমার তিন তিনবার, ভীষণ মরণ বাঁচন সমস্যা হয়েছে। টাইফয়েড—সেযুগে এটা একটা ভয়ঙ্কর মারণ ব্যাধি ছিল। আর আমার দু দুবার টাইফয়েড হয়েছিল। আর তৃতীয়বার টাইফয়েডের সঙ্গে এসেছে মেনিনজাইটিস। এত সাংঘাতিক যে তারি সূত্রে আমার একটা চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। বয়স তখন আর কতো, এই বারোর মত। সেই সঙ্গে, মনে আছে আমার আর কথা বলার শক্তি রইল না। বোবা হয়ে গেলাম। পা দুটোও কি রকম আটকে চলৎশক্তিহীন অচল হয়ে পড়লাম। দীর্ঘ চুরাশি দিন পর আমার জ্বর রেমিশন হয়েছিল। সেই অবস্থায় বাবা-মা ঠাকুমারা কি কষ্ট করে কতো যত্নে, আমায় একটু একটু করে শরীর চালনা অভ্যেস করিয়েছিলেন। তখনকার যা চিকিৎসা সম্ভব, সব অনেক দিন ধরে নিয়মকরে, কোরে—কোরে একদিন মোটামুটি একটু সুস্থ হলাম। পাড়ার কতো লোক ভালবেসে কতো সেবা করেছে, হাত ধরে ধরে হাঁটিয়েছে। কিন্তু অন্য ছেলেদের মত বাইরে হুটোপাটি করার জীবন আর ফিরে পেলুম না। বিছানায় পড়ে পড়ে, শুয়ে শুয়ে বছর দেড়েক কেটে যাবার পর যেন খানিকটা ধাতস্থ হলাম, সুস্থ হয়ে উঠলাম। আমরা সাত ভাই বোন ছিলাম। বড়দি প্রীতি, বড়দা গোলক, মেজদি চিত্রা, তারপর আমি, আমার পর বিমল, দুই বোন ঝর্ণা, অর্চনা আর সবায়ের ছোট ভাই নিতাই। আমার ওপরে এক দাদা, আর ঠিক আমার পরে এক ভাই ছিল, বিমল। বিমল ওই ছোট বয়সেই গান-টান গাইতে পারত, তবলা বাজাত, ভায়োলিনেও হাত ছিল। কিন্তু সে যুগে ব্যাটাছেলে গান গাইছে, তার ওপর বাচ্চা বয়সে গান বাজনা করছে, এটা লোকে ভালভাবে নিতে পারত না। তবে আশ্চর্য, আমি আর বিমল আমাদের দুই ভাইকে পাড়াপড়শী ছেলেরা, পাড়ার টুকটাক ফাংশনে বলে কয়ে নিয়ে গিয়ে, গান-টান গাওয়াত। তা সেই ভাইটি আকস্মিক ভাবে তিনদিনের জ্বরে যে তেরো বছর বয়সে মারা গিয়েছিল সে কথা তো আগেই বলেছি। ওই সময় আমার জ্যাঠামশাইও মারা গেলেন। পরিণত

বয়সের ছেলে। কচি বয়সের নাতি এবং পরিণত বয়সের ছেলে, পর পর মারা যাওয়াতে, আমার ঠাকুমার একেবারে উন্মাদ অবস্থা। আর আমার বাবার মধ্যেও দেখা গেল একটা বিশেষ পরিবর্তন। এতদিন দেখেছি আমার বাবা গান-বাজনার জগতের সব কিছুতেই ডুবে থাকতেন। সবরকমের গান—ভক্তিমূলক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রজনীকান্তর গান, নজরুলগীতি সবই যথেষ্ট গাইতেন, তার মধ্যে অবশ্য নজরুলের গানটা বেশিই গাইতেন। তেমনি অনেক রকম যন্ত্রও বাজাতে পারতেন। এস্রাজ, পিয়ানো, অর্গান, ঢোল, তবলা, খোল এসব অবলীলাক্রমেই বাজাতেন। তাই বাড়িতে ওই সব শোকাবহ ঘটনার পর যখন তিনি ওই সব নানান ধরনের গান, বৈঠকি গান গাওয়া প্রায় ছেড়ে দিলেন, তখন তাতে সবার অবাক লেগেছিল। এসবের বদলে বাবা তখন কীর্ত্তনের দল প্রতিষ্ঠা করলেন। ঈশ্বরের নামকীর্তনে তিনি বোধহয় শান্তির পথ খুঁজতে শুরু করলেন।

আমার বাবা পিয়ানো শিখেছিলেন স্বর্ণকুমারীর দেবীর বাড়িতে। পিয়ানো কেনবার সামর্থ্য তখন আমাদের ছিল না। এখনো নেই। তাই আমাদের বাড়িতে পিয়ানো ছিল না। তবে ঠাকুরদার অর্গান ছিল। ঠাকুর্দা অর্গান বাজিয়ে এককালে গান গাইতেন। বাবা অর্গানটা তাই বাড়িতেই বাজাতে শিখেছিলেন। পিয়ানো বাজানোতে বাবার ভাল হাত ছিল। অন্যের গানের সঙ্গে বাবার পিয়ানো-বাজনার রেকর্ডও হয়েছিল। তবে সে যুগে তো সঙ্গতকারদের নাম, তাইবা বলি কেন—গীতিকার সুরকারদের নামও, রেকর্ডে ছাপা হত না। আমরাও এখন তাই বলতে পারব না, কোন গানের রেকর্ডে বাবার পিয়ানো বাজনা ধরা ছিল। অদ্ভুত এক মানুষ ছিলেন আমার বাবা। গান, বাজনা, সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়—সব একসঙ্গে করতেন। তবে কখনও পেশাদারী ভাবে গানবাজনা করেন নি। চিরদিনই অ্যামেচার।

শুনলে অবাক হবে, অভিনয় জগতে কারা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, তুলসী লাহিড়ী, রবি রায়, ভূমেন রায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধু হলেও বাবা দুর্গাদাসকে 'দাদা' বলতেন। সিনেমা জগতে তখন দুর্গাদাসের কি নামডাক। সোনারপুর লাইনের কালিকাপুরের জমিদার বাড়ির ছেলে। তবে কাজের জন্যে উনি তখন ভবানীপুর অঞ্চলে থাকতেন। নিউথিয়েটার্সের মাইনে করা আর্টিস্ট, আবার তার বাইরে স্টেজেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট।

রঙমহল, নাট্যভারতী, মিনার্ভায়, কয়েকটা অভিনয় তো চিরকাল মনে রাখার মত। নাট্যভারতীতে পি ডব্লু ডি, রঙমহলে স্বামী-স্ত্রী, মাটির ঘর, বিশবছর আগে। মিনার্ভাতে শেষ মঞ্চাবতরণ 'কাঁটা ও কমল' নাটকে আর সিনেমায় 'প্রিয়বান্ধবী' দুটোতেই চূড়ান্ত অভিনয় ক্ষমতার নিদর্শন রেখেছিলেন।

বিমান—অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। কতো মজার গল্প শুনতুম, এদিকে দয়ালু, ওদিকে চরম নিষ্ঠুর। কি রকম জানো ? বাবার মুখে শুনেছি—শীতকালে রাত্তির বেলায় রাস্তায় ভিখারীরা চাপাচুপি দিয়ে কুঁকড়ে ঘুমোচ্ছে, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে উনি লাথি মেরে তাদের ঘুম থেকে ওঠালেন। আবার তাদের কাতরানি দেখে

তাদের সামনে যা হাতে উঠল তা ছড়িয়ে দিলেন।

এ সব তো নিশ্চয় নেশার ঝোঁকে ?

বিমান—হ্যাঁ। সিনেমা থিয়েটারের নট-নটীদের এমনি সব কথা শুনতে খুব মজা লাগত।

আমি দেখেছি, সরযূ-মা, সরযূবালা দেবী, রানীবালা দেবী তখনকার দিনের মঞ্চসম্রাজ্ঞী, নাট্যসম্রাজ্ঞী এরা সকলেই আমার বাবাকে খুব সম্মান করতেন। কিন্তু আমার বাবা কোনদিন তাঁদের সঙ্গে অভিনয়-টভিনয় কিছু করেন নি। বাবা বরাবর অ্যামেচার হয়েই থেকে গিয়েছিলেন।

এই কিছু কাল আগে মারা গেলেন মঙ্গলকাকা, মঙ্গল চক্রবর্তী যিনি সিনেমার ডিরেক্টর ছিলেন। প্রথম জীবনে উনি আমার বাবার আন্ডারে কতো অভিনয় করেছেন। ওঁর বাবা ক্ষিতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সম্পর্কে আমার বাবার মামা ছিলেন। সেই সূত্রে আমার কাকা। মঙ্গলকাকা খুব কম বয়স থেকেই থিয়েটারে, সিনেমায় অভিনয় করেছেন। ১৯৩৯-এ নরেশ মিত্রের পরিচালনায় যে 'শর্মিষ্ঠা' নামে ছবি মুক্তি পেয়েছিল তাতে কচের ভূমিকায় মঙ্গলকাকা প্রথম সিনেমায় নামেন। তারপর মাতৃহারা বলে একটা ছবিতে প্রমীলা ত্রিবেদীর বিপরীতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এমন আরও ছবিতে অভিনয় করেছেন। তখন উনি আজকের বাড়িতেই থাকতেন। পরবর্তী সময়ে সিনেমার পরিচালক হয়ে অনেকগুলো নামকরা ছবি করেছিলেন। সোনার হরিণ, তাসের ঘর, শিকার, আমি সে ও সখা, প্রণয়পাশা, দিনান্তের আলো এই সব।

আমার বাবার এরকম প্রচুর বন্ধু ছিল। একজন খুব ভাল বন্ধুর কথা মনে পড়েছে। বিখ্যাত পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রী। আমার বাবা যখন কীর্ত্তনের দল গড়লেন, তখন ওই গান-কথকতার মধ্যে যতো সংস্কৃত স্তব স্তোত্র বা কথা আছে সব ঠিকঠাক করে লিখে, সাজিয়ে সংযোজন করে দিয়েছিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রথম গীটার বাজিয়ে হিসেবে সুজিত নাথ, অমিয় অধিকারী, পরিতোষ শীল.....

আরে পরিতোষ শীল তো বেহালা বাদক ছিলেন ?

হ্যাঁ, সবাই তাই জানে। কিন্তু শোনো পরিতোষদা যে ভীষণ ভাল গীটার আর পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান বাজাতেন তাও জেনে রাখো।

কিন্তু জ্ঞানবাবুও (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ) তো গীটার বাজাতেন। সেযুগে উমা বসুর রূপে-বর্ণে-ছন্দে গানের সঙ্গে রেকর্ডে জ্ঞানবাবুই তো গীটার বাজিয়েছিলেন।

বিমান—আরে জ্ঞানবাবু তো পরিতোষ শীলের অনুজ শিল্পী ছিলেন। রূপে-বর্ণে-ছন্দেতে জ্ঞানবাবু গীটার বাজিয়েছিলেন ১৯৪০-এ আর পরিতোষদা তো ১৯৩৪ থেকেই সব বাজাচ্ছিলেন বেহালা, গীটার, পিয়ানো, অ্যাকোর্ডিয়ান। যূথিকা রায়ের রেকর্ডে 'পাহাড়ু দেশের বন্ধু আমার' সঙ্গে ১৯৩৪-এ উনি অ্যাকোর্ডিয়ান বাজিয়েছেন। আমার কাছে শোনো, যে ১৯৩৫ সালে গ্রামাফোন কোম্পানী থেকে একটা দ্বৈত

যন্ত্রসংগীতের রেকর্ড বেরিয়েছিল, পরিতোষ শীল (বেহালা) ও কমল দাশগুপ্ত (ম্যাণ্ডোলিন)-যার এক পিঠে 'পাহাড় দেশের বন্ধু' আর অন্য পিঠে 'রূপকাহিনীর দেশে'-র সুর বাজিয়ে শোনানো হয়েছিল।

কমল দাশগুপ্ত ম্যাণ্ডোলিন ? কখনো তো শুনিনি ?

বিমান—হ্যাঁ, আমার কাছেই তো শুনবে। এখন আর এসব আর কে জানবে বা বলবে ! আমরা এরকম অনেক তথ্য হারিয়ে ফেলছি, ভুলে যেতে বসেছি। আজও হয়তো সব জানিনা বা বলতে পারবো না, তবু যেটুকু আমার মগজে আছে আমি সেটুকু অন্ততঃ জানিয়ে দিতে চাই।

তা তুমি তখন গানটান শেখবার সময়, বাবার মত কোন বাজনা টাজনা বাজাতে শেখবার চেষ্টা করোনি কখনো ?

বিমান—ওই যে বাবা বলেছিলেন গানের সঙ্গে তাল শিখতে—সেটাতেই মন দিয়েছিলুম। তবে কিছুদিন গীটার শিখেছিলুম। বাবা একবার এসরাজ শেখাতে চেয়েছিলেন কিন্তু আঙুল এমন কেটে গেল তারের ঘষা-ঘষিতে যে আমি ওটাতে আর হাত দিলুম না। তবে ওই তাল জ্ঞানের জন্যে তবলাটা শিখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু শুধু ঠেকাটা বাজাতে শিখে আর বাজাই নি। আমি ঠেকাগুলো সব বাজাতে পারি। কিন্তু আর এগোনো হয় নি।

তারমানে কলেজ থেকে বেরুতে না বেরুতেই, গানের জগতে পুরোপুরি নেমে পড়লে ?

বিমান—আরে আমি যেদিন প্রথমে রেডিওতে গান গাইলাম তা শুনে আমার বাবা প্রথমেই, আমি যাতে আর গাইতে না পারি সে ব্যবস্থা করে ফেললেন।

বাঃ, সে আবার কী ? ব্যাপারটা কী হল বলোতো ! সেটা কোন সাল ? কী গান ?

বিমান—এই বোধহয় চুয়ান্ন হবে। আধুনিক গান। আমি বাবাকে না জানিয়ে রেডিওতে অডিসন দিয়েছিলাম। তারপর প্রোগ্রামটা পেতে বাবাকে বলেছিলাম আমার প্রোগ্রামটা শুনতে। তখন দুপুরবেলায় নবাগতদের প্রোগ্রাম দেওয়া হত। তা আমার প্রোগ্রাম তো পড়ল একটা ১.৪০-এ, আর একটা ২.২০ থেকে আড়াইটে। ওই দুপুরে আমি প্রেমের গান গেয়েছিলাম, 'ওই সব জ্যোৎস্না হাসে আকাশে'।

কার লেখা, কার গান ?

বিমান—আমার নিজের লেখা, নিজের সুরে। আরে তখন আমি নিজেকে মস্ত বড় আর্টিস্ট ভাবছি যে। ভাত খেতে খেতে বাবা সে গান শুনলেন। তখন তো সব সরাসরি লাইভ ব্রডকাস্ট হত। আমি তো দুপুরের কনসেশন ভাড়া চারটি পয়সা দিয়ে, বেলগাছিয়া ভায়া গ্রে স্ট্রীট ট্রামে চেপে, পনেরো মিনিটের ভেতরেই ডালহৌসী থেকে বাড়ি পৌঁছে গেছি। তখন তো আর রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম বলে কিছু ছিল না। আর দিব্যি বসার জায়গাও পাওয়া যেত। বাড়িতে ঢুকেই বাবার সামনে। নিরুচ্ছ্বাস কণ্ঠে বাবা বললেন, হুঁ আর্টিস্ট হয়ে গেছ। আর কি, রেডিওয় গান

গেয়েছ ! ঠিক আছে, যাও খেয়ে নাও। ব্যাস, আর কিছু বললেন না। আমি একটু দমে গেলাম। ভাল-খারাপ কিছু বললেন না। অথচ তখনকার দিনে রেডিওতে গান গাওয়া তো দারুণ একটা সম্মানের ব্যাপার ছিল। তাই আশ্চর্য হচ্ছিলাম যখন এর পরে আর কোন প্রোগ্রামের ডাক আসছিল না।

কী এমন হল ? কেনই বা আর প্রোগ্রাম দিচ্ছে না ? খোঁজ নিতে একদিন চলে গেলাম রেডিও অফিসে। জিজ্ঞাসা করলুম ব্যাপারটা।

প্রোগ্রাম কর্মকর্তা বললেন, সে কি, তুমি জানো না ? তোমার বাবা তো এখানে এসে বলে গেছেন, তোমায় আর প্রোগ্রাম না দিতে। সেই জন্যই তো তোমায় আর প্রোগ্রাম দেওয়া হচ্ছে না।

সে আবার কী ? বাবা বারণ করে গেছেন ? কিন্তু কেন—কারণটা কী ? আমি জানতে চাইলুম।

তোমার বাবা এসে বললেন, আমার ছেলেকে তোমরা অডিসনে পাশ করিয়েছিলে কেন বলতো ?

আমরা বলেছিলুম, কেন ওতো ভালই গেয়েছিল।

তখন উনি বলেছিলেন ওই তো বয়স কতটুকুই বা জানে। এখন থেকে রেডিওতে গাইলে ওর কি শেখার আগ্রহ থাকবে ? ভাববে এখনই শিল্পী হয়ে গেছি। তারপর খাতা বগলে করে ওই লীলা-রেখা-রেবা করে বেড়াবে। এই করলে আর শিখবে কবে ! এখনই তো শেখবার সময়। ওর যদি ভাল চাও তো, ভাই ওকে এখন থেকে আর প্রোগ্রাম দিও না। বাবার কথাটা শুনে সেদিন যেন একটা ধাক্কা খেয়েছিলুম। মনে মনে হয়ত তখন একটু আহত হয়েছিলাম। প্রোগ্রামও অনেক দিন পাইনি। কিন্তু অনেক দিন পরে যখন বাবার কথাটার মানে ধরতে পেরেছি তখন বুঝেছি, বাবা কি সুন্দর কথাই না বলেছিলেন। বাবার কথার সার সত্য তাই আমি সারাজীবন স্বীকার করে এসেছি, মনে রেখেছি আর এখনো সব-সময় আমার ছাত্র-ছাত্রীদের বলি।

তা রেডিওতে গাইবার আগে অডিসন পর্ব কি রকম ছিল, তাতে কারা ছিল, কিছু মনে আছে ?

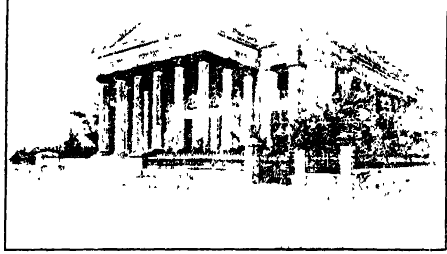
বিমান—দুর, তখন ওই ফর্ম ফিলাপ করা বা ফি কিছুই ছিল না। একটা অ্যাপ্লিকেশন করলেই হত। এক মাসের ভেতরেই সব হয়ে গিয়েছিল।

অডিসনে তোমার গানের সঙ্গে কারা সঙ্গত করেছিলেন মনে আছে ?

বিমান—যতদূর মনে পড়ছে, তবলায় ছিলেন অবনী রায়চৌধুরী আর এসরাজে ভোলানাথ সাহা। আসলে ১নং গার্স্টিন প্লেসে রেডিও স্টেশনের স্টুডিওতে বসে গান গাইছি, তাতেই মনে হচ্ছিল যেন সেদিন বুকের ওপর দিয়ে বুলডোজার চলছে।

এই কিছুদিন আগে, কলকাতা রেডিওর ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব আরম্ভ হল। ওরা

আমায় সেদিন গার্স্টিন প্লেসে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়িটায় ঢোকার মুখে একটা কালোমত দেয়ালে, আবছা সাদায় লেখা অল ইন্ডিয়া রেডিও। দেখে ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল।



সেনেট হল

এখনকার আকাশবাণীর বাড়িটা খুবই ভাল; গর্জাস কিন্তু ১নং গার্স্টিন প্লেসের মধ্যে তো একটা ইতিহাস ছিল। যেমন আমার বাবা খুবই আঘাত পেয়েছিলেন যখন সেনেট হলের সেই বিশাল বিশাল, অপূর্ব থামওলা ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে সেখানে সেন্টিনারী বাড়ি উঠেছিল। আমিও সেই সেনেট হলে গিয়েছি। মনে পড়ে মোহিতলাল মজুমদারের বক্তৃতা বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর। মনে পড়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরসিক মানুষ হারীতকৃষ্ণ দেব ওখানে রয়েছেন। মনে পড়ে কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের কথা। কলকাতার কত কথা। দেখেছি যুদ্ধের সময় ১৯৩৯-৪৪ সালে কলকাতায় বোমা পড়া। অদ্ভুত কতো রটনা কিন্তু আমরা ছোটরা এসবে খুব মজা পেতাম। সারা পাড়া, প্রায় সব বাড়ি খালি করে লোকে তখন পালাচ্ছে—বলছে ইভ্যাকুয়েসন করছে। পাড়ায় শুধু দুটো বাড়িতে লোক রয়েছে, আমাদের বাড়ি আর সামনের বাড়িতে। সারা পাড়া শুনশান খাঁ খাঁ করছে। প্রায়ই যখন সাইরেন বাজত, বাবা, কাকা একতলার ঘরে আমাদের সবাইকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেরা উঠোনে পাইচারী করত। একদিন ভর দুপুরে এই রকম অবস্থায় শুনলাম হাতিবাগান বাজারের এধারে ওধারে কয়েকটা বোমা পড়েছে। বড়দের সঙ্গে আমরা দেখতে গেলুম বোমা পড়ে কি রকম, কি হয়েছে। দেখলুম কতকগুলো চালার দোকানঘর ভেঙে গেছে আর একটা বড়সড় গর্ত মতো হয়েছে। ভড় লেনে একটা জায়গা থেকে তোড়ে জল বেরুচ্ছে। আবার দেখ, ১৯৪২-৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ দেখেছি। রাত ১২টা বেজে গেছে, তখনো শুনেছি কেউ বাইরে কাতর কণ্ঠে বলছে—একটু ফ্যান দেবে মা। সকালে দেখেছি রাস্তায় পড়ে আছে জীর্ণ শীর্ণ মরা মানুষের দেহ। যুদ্ধের ডামাডোলে ব্ল্যাকআউট দেখেছি, এ আর পি, সিভিক গার্ড দেখেছি। রাস্তার ধারে, মোড়ে মোড়ে, মাটি কেটে ট্রেঞ্চ আর তার পাশে পাশে মোটা পাঁচিলের দেওয়াল ব্যাফলওয়াল (পাড়ায় দাদারা বলত 'বিফল প্রাচীর') গেঁথে তুলছে মিস্ত্রীরা। এই পরিবেশ নিয়ে ডাঃ যশোদা দুলাল মণ্ডল গানও করেছিলেন।

ইতিহাসকে ধরে এ গানটাও যেন ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

ক্যালকাটা নাইনটিন ফরটি থ্রি অক্টোবর
এ. আর. পি. মিলিটারী—পথে পথে ভিখিরি;
অ্যাকসিডেন্ট অ্যাণ্ড ড্রাউট-কন্ট্রোল, পারমিট ব্ল্যাকআউট
এবং সব জিনিসের বাড়ল দর—ক্যালকাটা নাইনটিন ফরটি থ্রি অক্টোবর।

যুদ্ধ, বোমা, দুর্ভিক্ষ সব পিঠোপিঠি হয়েছিল। তারপর ১৯৪৫-এর আগস্টে যুদ্ধ মিটে গেল। তখন স্কুলে পড়ি, বিজয়োৎসব করার জন্যে স্কুল থেকে সিনেমা দেখানো হয়েছিল। ওই বছরের শেষে দিল্লিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের শাহনওয়াজ খাঁ, সাইগল ও ধীলনদের বিচারের চাঞ্চল্যকর মামলাতে জওহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেলরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন। জয় হিন্দ কথাটা খুব চালু হয়ে গেল, ঘরে ঘরে নেতাজি সুভাষের ছবি টাঙানোরও ধূম পড়ে গিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতায় ডিরেক্ট অ্যাকসন থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা কলকাতা থেকে শুরু হয়ে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ, বিহার ও অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল। কাতারে কাতারে উদ্বাস্তু মানুষ কলকাতায় এসে জড়ো হচ্ছিল। নোয়াখালি থেকে প্রচুর মানুষ উত্তর কলকাতার অনেক স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিল। সেজন্যে অনেক স্কুলের পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সেই সময় গান্ধীজিও এসে কিছুদিন ছিলেন। জওহরলাল এসেছিলেন, তাঁকে দেখতেও গিয়েছিলাম।

আমাদের আশেপাশে অনেক মুসলমানের বসবাস ছিল। আমার বাবা ইসমাইল নামে একজনের কাছে চুল কাটতেন। গোলাম কিবৃয়া, ডাকনাম ছিল খোকা, শুনলে অবাক হবে যে সে আমার বাবার কীর্ত্তনের দলে কীর্ত্তন করত। আমারও অনেক মুসলমান বন্ধু ছিল। বাবার মুসলমান বন্ধুদের অনেকে আমার মাকে বৌদি আমার ঠাকুমাকে মা বলতেন, এমনকি বিজয়া দশমীর দিন আমাদের এই উঠোনে বসে, একসঙ্গে সিদ্ধির সরবৎ আর মিষ্টি খেতেন, আপনজনের মত।

তারপরেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগল। রাস্তাঘাট শুনসান, শ্মশানের মত। চুপি চুপি রাস্তায় বেরিয়ে, এপাশে ওপাশে মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য এত হাহাকারের মধ্যে, এইসব বিষয় নিয়ে নতুন গানও বেরিয়েছে। থিয়েটার, সিনেমা হয়ত মাঝেমধ্যে কয়েকদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হয়েছে কিন্তু তারপর আবার চালু হয়েছে। তখনকারদিনে, দিনে তিনবার সিনেমার শো হত তিনটে, ছটা, নটায় আর থিয়েটারে নাটক শুরু হত সন্ধে সাড়ে ছটায়। শেষ হত যে কত রাত্তিরে তার ঠিক ছিল না। কিন্তু এইসব মারামারি, হাঙ্গামার সময় চালু হল নুন শো। একটা শব্দ শুনলুম, কোথাও গণ্ডগোল হলেই কার্ফুজারী, আর যতক্ষণ না তা তুলে নেওয়া হয় ততক্ষণ সবাই ঘরবন্দী। দোকান পাট, রাস্তাঘাট সব বন্ধ। এই সময় থেকে ব্ল্যাক কথাটার খুব চল হল, ঝালে ঝোলে অম্বলে, সবেতে। যুদ্ধের সময় থেকে ব্ল্যাকআউট তো ছিলই তার ওপর চালু হল ব্ল্যাকমার্কেট, ব্ল্যাকমানি। মিনার্ভা থিয়েটারে তো একটা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তার নামই কালোটাকা। আমার বাবাও এই নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তবে অভিনয় করেননি। উপন্যাস, সিনেমার নামেও কালো জুড়ে বসত কালোঘোড়া, কালোছায়া এমনি আর কি। যুদ্ধের সময়ের এমনি কত কিছু যে আমাদের সামাজিক জীবনেও ছায়া ফেলত তাও বেশ মজার।

সে সময় কাননদেবীর 'আমি বনফুল গো' গানটা দারুণ হিট হয়েছিল। অমনি এর

প্যারোডী বেরিয়ে গেল। একই সুরে 'জা-পানী বিমান গো'। 'উদয়ের পথে'-র ছবির বিখ্যাত গান 'গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই'-এর প্যারোডী বেরুল 'খেয়ে যাই, পান খেয়ে যাই'। যুদ্ধের সময় থেকে কালোবাজারি ব্যবসাদারিতে রমরমিয়ে পান খাওয়ার যে তাৎপর্য তৈরি হয়েছিল তাই নিয়েই, বোধহয় এই মস্করা, ব্যঙ্গগীতির উপাদান হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার দিনটি আমার খুব মনে আছে। অন্যদের মত আমাদের বাড়িও নেতাজি, গান্ধীজির ছবি, আলোটালো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। তখনও স্বাধীনতার ঠিক মানে বুঝি না, সেদিনের ইংরীজি বাংলা সব খবরের কাগজে স্বাধীনতার গুরুত্ব নিয়ে কত ছবি, রচনা। সব কাগজে সজনীকান্ত দাসের লেখা, অভ্যুদয় নাটকের অনেকগুলো গানের সুকৃতি সেনের দেওয়া সুরের স্বরলিপি ছাপা হয়েছিল। পরে সেই অভ্যুদয়ের রেকর্ডও বেরিয়েছিল। আমার বাবা, স্বরলিপি দেখে আমাদের সেই গান শিখিয়েছিলেন। সেদিনই জাতীয় পতাকার চরকার জায়গায় অশোক চক্র ঠাঁই পেল। অভ্যুদয়ের গানেও তাই লেখা হল, 'চক্রশোভিত উড়ে নিশান, নবভারতের বাজে বিষাণ/কে আছে কোথায়, ছুটে এস সব জ্ঞানী ও কর্মী ধনী কিষাণ/পনেরো আগস্ট পুণ্য দিন স্বাধীন ভারতে জাগে নবীন, হেরো তিনরঙা পতাকার তলে মিলিত হিন্দু মুসলমান।'

এর সঙ্গে ওই দিনের আরেকটা ভারি ইন্টারেস্টিং ঘটনার কথা বলতে হচ্ছে। ১৫ই আগস্ট রাত বারোটায় (অর্থাৎ ১৪ই আগস্ট মধ্য রাতে) হাতিবাগানের উত্তরা সিনেমার হলে একটি নতুন ছবি, অগ্রদূতের 'স্বপ্ন ও সাধনা' পর্দায় প্রথম দেখানো শুরু হয়েছিল। ছবির উদ্বোধন করেছিলেন কলকাতার মেয়র সুধীর রায়চৌধুরী। সুপ্রভা সরকারের গাওয়া, 'গানের সুরে জ্বালবো তারার দীপগুলি' রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে, দারুণ হিট হয়েছিল।

আমিও সেদিন প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলুম। বন্ধুর সঙ্গে এক অজানা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম, হাঁটতে হাঁটতে সার্কুলার রোড পেরিয়ে এখনকার ভি. আই. পি রোডের জায়গা বরাবর চলে গিয়েছিলুম, তখন ওখানে শুধু কিছু বস্তি, ঝুপড়ি, জলাজমি আর নালা, কয়েকটা কয়লার দোকান। এই দিনে অজানা কলকাতার খানিকটা অংশের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল---কি রোমাঞ্চ। আমিও যেন স্বাধীন হলাম, একা একা ঘোরাঘুরি যাতায়াতে অভ্যস্ত হলাম। কিন্তু গানের সঙ্গে লেগেই থাকলাম। তখন পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা রঞ্জিত রায়ের গান—'রামরাবণের যুদ্ধ আমি পড়ছি ইতিহাসে, আর রাম রহিমের যুদ্ধ আমার, আইজো চোখে ভাসে/ কেউ কয় জয় হিন্দ, কেউ আল্লা হো আকবর, শঙ্খঘণ্টার আওয়াজে বুক করে ধড়ফড়/ মরা মানুষের ছড়াছড়ি পথের ডাইনা বাঁয়, দেইখ্যা ভাবি, পাটিসাপ্টা গড়াগড়ি যায়/ মানুষের সামনে মানুষের চক্ষু কাকে কুইট্টা খায়, পতির সামনে সতী নারীর ধর্ম খোয়া যায়/' বাজারে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। নতুন যুগে তখন অনেক কিছুই নতুন দেখছি। স্বাধীনতা দেখলাম, ভোট দেখলাম (১৯৫২ তে আমার

অবশ্য ভোট ছিল না)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে ম্যাট্রিকুলেশন ছিল সেটা নতুন একটা বোর্ড করে, সরিয়ে নেওয়া হল। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড করে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নাম বদলে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা প্রবর্তন হল, এখন তো আবার সে নাম বদলে, অন্য নাম হয়েছে, সব খবর রাখি না।

সামাজিক জীবনেও কতো পরিবর্তন এল। তখন কলকাতা শহরে, হাতে গোনা কয়েকটা সার্বজনীন দুর্গা পুজো হত। আর কালীপুজো তো সারা কলকাতায় ৫-৬টা হত কিনা সন্দেহ। পুজোর চাঁদা নিয়ে যে জুলুম হতে পারে, তা আমরা ভাবতেও পারতুম না।

পাড়ার দুর্গা পুজোর প্যাণ্ডেলে আমার বাবার দল যাত্রা করত, নাটক অভিনয় করত। পরিচালক থাকতেন ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী। এঁর ছেলে মঙ্গল চক্রবর্তী, গোপাল চট্টোপাধ্যায় এরা সব পার্ট করতেন। নির্মলেন্দু লাহিড়ী বেশির ভাগ সময়, সভাপতি হয়ে বক্তৃতা করতেন। নাটকের খুব রেওয়াজ ছিল। আমরা এই বারোয়ারি পুজোগুলোকে আমাদের নিজেদের পুজো বলেই মনে করতুম। গোটা পাড়াটা যেন একটা পরিবার। আমার ঠাকুমা, মা কাকীমারা পাড়ার অন্যান্য বাড়ির মহিলাদের নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, ফুল সাজানো, নৈবেদ্য সাজানো, পুজোয় জোগাড়-যন্তর সব করতেন এবং তা উপবাসী থেকে। বোমা পড়ার সময়, ব্ল্যাকআউট হল আলোর রোশনাই বন্ধ হয়ে সব মিটমিটে আলো আঁধারি। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ দিয়ে সারসার যেত দৈত্যের মত মিলিটারী ট্রাক। প্রায়ই সাহেবরা সব নেমে এসে, পুজো প্যাণ্ডেলে ঠাকুর দেখতেন। বাবা-কাকাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন, বুঝিয়ে দিতেন। এটাতে আমাদের খুব গর্ব হত—সায়েবরা আমাদের প্যাণ্ডেলে এসেছে —এ কি কম কথা। বোমার ভয়ে, এখন সব বাড়ির জানলার কাঁচের ওপর কাগজ সাঁটা থাকত যাতে বোমার ঘায়ে কাঁচের টুকরো চারদিকে ছিটকে না পড়ে। রাস্তার আলোতে তখন টিনের ঠুলি পরানো থাকত, তা দিয়ে সামান্য ছিটেফোঁটা আলো বেরুত, তাতে রাস্তার বাড়ি ঘর, লোকজনকে যেন ছায়ামিছিলের মত দেখাত। আমরা ছাত্ররা চুপি চুপি দুপুর বারোটায় নুন শোয়ে, লুকিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে শিখলুম। তখন বায়োস্কোপের গান খুব ভাল হত—সব গান প্রায়ই লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। আর সে সুর গান কেমন মুখস্ত হয়ে, মনে যেন গেঁথে যেত। এতদিন বাদে, এখনো আমার সে রকম অনেক গান বেশ মনে আছে। বিরাজ বৌ-এর রাধারানীর গাওয়া, 'আমার প্রদীপখানি তোমার পথে আজো' গানটা এখনো গাইতে পারি। রঞ্জিত রায়ের, 'এই না জলের আরশিতে', সত্য চৌধুরীর, 'ম্যায় ভুখা হুঁ' কতো বলব। শুনতে শুনতে কি ভালই না লাগত।

এই গানের টানে, ভাল করে শেখার টানে, ক্ল্যাসিক্যাল শিখতে চলে গেলুম সত্যেন ঘোষালের কাছে। আর বাড়িতেও শেখাও চলছে। বাড়িতে তো কত বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের আসা যাওয়া ছিলই, তাঁদের কাছ থেকে শেখা হচ্ছে। মোট কথা গানই তখন আমার সব।

তখন যে তোমাদের বাড়িতে অত বড় বড় শিল্পীরা সব আসছে যাচ্ছে, তাতে তোমাদের কি রকম মনে হত ? ওই সব বিখ্যাত মানুষদের দেখে তোমরা কি ভাবতে ? তোমাদের ওপর ওঁদের ইমপ্যাক্ট কিরকম হত ?

বিমান—আরে ওঁরা আমাদের বাড়ি এমন আসা যাওয়া করতেন, গান গল্প আড্ডা দিতেন যে মনে হত ওঁরা যেন আমাদের বাড়ির লোক। ওঁরা যে অত সব নামী দামী লোক ছিলেন তা বুঝতেই পারতুম না আর পাড়াতেও দু চারজন হয়ত চিনতে পারতো কেননা তাঁরা এত ঘন ঘন আসতেন যে তাঁদের তো অনেকেই দেখেছে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক কিছুই বুঝত না। তখন তো রেডিওতে বা রেকর্ডে মুখ দেখা যেত না। আর মিডিয়ার এত প্রচারও ছিল না। একটা পত্রিকা ছিল রূপমঞ্চ, তাতে ছবি টবি থাকত কিন্তু কজনই বা তা কিনে পড়ত ? এখনকার মত এত কাগজ পত্রপত্রিকা, গাদা গাদা টিভি চ্যানেল এসব তো ছিল না। তাই গাইয়ে বাজিয়েদের বিশেষ কেউ চিনতে পারতো না। কিন্তু যাঁরা সিনেমা, থিয়েটারে নামতেন তাঁদের অনেকেই চিনতে পারতো। অহীন্দ্র চৌধুরি, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবীন্দ্রকুমার রায়, ভূমেন রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য এঁরা যখন আমার বাবার কাছে আসতেন তখন লোকে বেশ চিনতে পারতো।

আমি আগেই বলেছি যে আমার ছোট ভাই যখন মারা গেল তখন বাড়িতে পাড়ার লোকজনের ভিড় ভেঙে পড়ল। পাড়ার লোক আমাদের কাছ থেকে ভাইয়ের প্রাণহীন দেহটা নিয়ে চলে গেল। আমার বাবা কিন্তু নিশ্চল বসে একনাগাড়ে আপনমনে গান গেয়ে যাচ্ছেন। লোকে হতবাক, এমন কাণ্ড আগে কখনো কেউ দেখে নি। এই দেখে, আমি সেই ছোট বয়সে থেকেই শিখেছি, বুঝেছি, আমার মধ্যেও শোকে, দুঃখে, আনন্দে গানের একটা মুখ্য ভূমিকা আছে। খুব কষ্ট পেলে বা খুব আনন্দ পেলে, গান গেয়েই আমি শান্তি পাই। আমি এখন নিজেই হয়ত কিছু গান লিখি, সুর করি। অন্যরা তা গায়। আবার আমায় দিয়ে কিছু কিছু অভিনয়ও করিয়ে নিয়েছে নানাজনে। এইসব নিয়েই আছি—এ থেকেই মনের শান্তি।

আমি ছোট বেলায় জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর খুব ভক্ত ছিলাম। কাজেই রেকর্ড শুনে, সেই গান গলায় তুলে, তার গান আমি খুবই গাইতাম আর আজও গাই। এখন আমার মনে হয়, গানগুলো তখন আমি না বুঝে গেয়েছি। শুধু সুরের আকর্ষণেই গেয়ে গেছি, শিল্পীর কণ্ঠস্বর কতো সময় আমায় আকৃষ্ট করেছে। পঙ্কজ মল্লিক রেডিওর সঙ্গীত শিক্ষার আসরে বলতেন, আগে গানটির কথার মানে বোঝো তারপর গান। তখনকার দিনে শিক্ষার পদ্ধতি ছিল, সব কথার গভীর অর্থ, ভাল করে আগে বুঝিয়ে দেওয়া।পঙ্কজ মল্লিকের এই মানে বুঝিয়ে দেবার কথায় কানন দেবীর যে উপলব্ধি হয়েছিল তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু আজকে আমার মনে হয়, গানটার মানে বুঝে, বোধহয় উপলব্ধি থেকে, কত সময় ইমপ্রোভাইজ করেও গেয়ে থাকি। তখন ছেলেমানুষ ছিলুম কিছু গান হয়ত না বুঝে, নিতান্ত

বয়সের, কি বলব, টানে কিংবা এর প্রভাবে, কত গেয়েছি। আর আজকে গানটা আমার ভেতরে ঢুকে গেছে, সুরের প্রবাহে আমি যেন গড়িয়ে চলে গেছি। তখন গানের সঙ্গে আমার, যাকে বলে কি রকম একটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—আর আজকে, গান আমি ভালবাসি। গান আমার ভাল লাগে কিন্তু কেন ভাল লাগে, কি জন্য ভাল লাগে, তা ঠিক জানি না। তখন তো আমি কোনও গানেরই সেভাবে মানে বুঝি না। 'নাইবা ঘুমালে প্রিয়'র মানে যেমন বুঝি না তেমনি 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর' এরও অর্থ উপলব্ধি করি না। আবার 'বাঁধো না তরী খানি' তার অর্থই যে কি, তাও জানি না।

আমার খুব গজল, গীত এসব শেখার ইচ্ছে ছিল। অল্প বয়সে, যখন ছেলেরা কলেজে ঢোকে তখন তারা ভাবে যে, যত রকম রোমান্টিসিজম আছে সব তারা আয়ত্ত করে ফেলেছে। সুবল দাশগুপ্তের কাছে তখন আমি যাতায়াত করছি, শিখছি। তা আমি সাহস করে একদিন বললুম, আমায় একটা গজল শেখাবেন ? ওঁকে তো সাগর বল্লেও কম বলা হয়—মহাসাগর!

ওঁর কাছে এসব যেন কিছুই না, এমনি স্বরে বল্লেন—

এ আর কি এমন। নে, শেখ্ না।

উনি এরপর একটা ফারসী গজল গেয়ে গেয়ে শিখিয়ে দিলেন। কথাগুলোর মানে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না। কিন্তু সুর, তাল, ছন্দ আর তবলাটবলা এমন বাজছে, যাকে বলে দারুণ মন মাতানো গান, যে গলায় তা মোটামুটি বেশ উঠেও গেল। আমার বাবা মাঝে মাঝে হঠাৎ এক আধদিন একটু হিসেব নিতেন। সারাদিন কোথায় কি করলুম, কতোটা কি শিখলুম এইসব। যেদিন ধরতেন, সেদিন একেবারে পিণ্ডি চটকে ছাড়তেন। খপ্ করে একদিন ধরলেন—

কি গান আজ শিখলে ?

তা, আমি বেশ স্টাইলের মাথায়, বাবার কাছেই চাল মেরে বলেছি—এই একটা গজল।

তাই নাকি ? বেশ তো, একটু গাও শুনি।

আমি তো বেশ খেলিয়ে একটু গাইলুম। বিড়ি খেতে খেতে বাবা গানটা শুনলেন। তারপর বললেন, বেশ, বেশ খুব তো হাসতে হাসতে গাইলে। তা গানটার মানে কী ? তাছাড়া এটা আনন্দের গান, না দুঃখের ? আমি তো একটা কথাও বুঝতে পারলুম না যে তুমি কী গাইলে বা বললে। আমি রীতিমতো অপ্রস্তুত। কিছুই বলতে পারছি না, চুপ করে আছি। তাই দেখে বাবা এবার বেশ কঠিন স্বরেই বললেন ছিঃ, তুমি নিজে যেটা বোঝো নি, অন্য লোককে সেটা বোঝাবার চেষ্টা করছ ? যা নিজে না জানবে, নিজে যার ভেতর ঢুকতে না পারবে, সেরকম জিনিস কোনদিন তোমার হবে না, কখনও তা তোমার আয়ত্তে আসবে না। তুমি অবশ্যই তোমার মাস্টার মশাই-এর কাছ থেকে, কাল এর মানেটা কী, তা জেনে আসবে এবং এটা দুঃখের গান, না আনন্দের গান বা কি করে গাইতে হবে এসব জিজ্ঞেস


কমল দাশগুপ্ত

করে বুঝে আসবে। শোনো ভাই সিতাংশু, তার পর দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি আগে গানের মানে না বুঝে আর কখনোই গাইতে যাই না। আমার বাবার সেই চাবুকের মত কথা আজও আমাকে সজাগ, সদাসতর্ক রাখে। আর বাবার এতবড় কথাটা শুনে, সেদিন থেকে আমার জীবনের সঙ্গীত চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। এখনও সেকথা সব সময় মনে রাখি, মেনে চলি।

পঙ্কজ মল্লিকও তো সব রেডিওর সঙ্গীত শিক্ষার আসরে এই কথাটা রোজ বলতেন। প্রতিটা শব্দ বারবার কাটা কাটা উচ্চারণ করে অর্থ বোঝাতেন, এর একটা লাইনের অর্থ, গোটা গানের ভাবার্থ ভেঙে ভেঙে বারবার বলতেন, বোঝাতেন, গাইতেন।

বিমান—আরে তখন ওসব মাথায় ঢুকতো না। তবে হ্যাঁ, পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত শিক্ষার আসরে বিশেষ করে মন দিয়ে শিখতুম উনি যখন হিন্দি, উর্দু গীত গজল শেখাতেন। ওই শুনে সব মনে ধরে যেত কেননা তখনকার শিক্ষাই ওরকম ছিল, সব বুঝিয়ে দিত, মানে বুঝে মনে গেঁথে যেত। না বুঝলে কিছুই শেখা হত না। কানন দেবীকে গালে কমল দাশগুপ্তের হাতের চড় খেতে হয়েছিল। নিজের চোখে দেখিনি তবে আমি তখন শুনেছি।

কমল দাশগুপ্তের কথা যখন উঠল তখন কমল দাশগুপ্ত ও সুবল দাশগুপ্ত গানের জগতে দুজনে কি করে একসঙ্গে এত প্রতিষ্ঠা পেলেন বা গোড়া থেকে গানের ক্ষেত্রে দুজনে, কিভাবে এত সুর সৃষ্টি করেছিলেন, সে কথা এখানে খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

বিমান—দেখ, কমলবাবুকে বলা হত 'সুরের জাদুকর।' কিন্তু তার সম্বন্ধে পঙ্কজ মল্লিক যা বলেছিলেন তার ওপরে আর কথা হয় না। সে সব কথা কি আর আজকের।

যখন ভাগাভাগি হয়ে, কলম্বিয়া কোম্পানী, এইচ এম ভি থেকে আলাদা হয়ে গেল, তখন কমল দাশগুপ্তকে বলা হল তুমি যেমন বরাবর হিজ মাস্টারস্ ভয়েসে কাজ করে এসেছ এখনো তেমনি করো। কিন্তু তুমি কলম্বিয়াতেও আগের মত ট্রেনার থাকবে।

এর আগে, প্রথমে কলম্বিয়া পঙ্কজ মল্লিকের কাছে গিয়েছিল। প্রস্তাব দিয়েছিল যে কমল দাশগুপ্ত যেমন হিজ মাস্টারসে চীফ ট্রেনার ছিলেন এখনো তেমনি থাকবেন। এখন কলম্বিয়াতে তাই আপনি আসুন। চীফ ট্রেনার হিসেবে কলম্বিয়াতে যোগ দিন।

পঙ্কজ মল্লিক বলেছিলেন প্রথমত আমি রেডিওতে চাকরি করি। তার ওপর আমি নিউ থিয়েটার্সের মাইনে করা মিউজিক ডিরেক্টর। কাজেই কলম্বিয়াতে যাবার



সুবল দাশগুপ্ত

অসুবিধা রয়েছে। তাছাড়া ওঁদের সঙ্গে আমার চুক্তি আছে আমি অন্য কোথাও কাজ করব না। আমার প্রস্তাব, আপনারা কমল দাশগুপ্তর কাছেই, যান্ না।

কলম্বিয়ার কর্তারা বললেন কমল বাবু তো রয়েছেনই, এখানে এটা ওটা 'কাজ তো করছেনই। আপনাকেও তো আমরা সেইরকমই করতে বলছি।

একথা শুনে পঙ্কজ মল্লিক যা বললেন, তাতে যেমন কমল দাশগুপ্তর যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছিল তেমনি আরো বেশি করে প্রকাশ পেয়েছিল মানুষ পঙ্কজ মল্লিকের চরিত্রের উদার মহত্ব। পঙ্কজ মল্লিক বলেছিলেন 'শুনুন ওর অনেক ক্ষমতা। কমল ইচ্ছে করলে একটা কেন দশটা কোম্পানির কাজই, সে অনায়াসে করতে পারে। আসলে কমল is such a music director, who is a trainer of trainers! এখনও আমরা অনেক সময় হিন্দি-উর্দু গজল বা গীত গাইতে গেলে কমলকে ডেকে শুনিয়ে দিই, ঠিক হয়েছে কিনা'। এই হলেন পঙ্কজ মল্লিক। এমন হলেন কমল দাশগুপ্ত।

আমি বলছি, যে দুই ভাই একসঙ্গে শিখতে আরম্ভ করল, বড় হল, একই সঙ্গে তৈরি হল। এরকমটা হল কি করে ?

বিমান—অসাধারণ প্রতিভা। অসাধারণ প্রতিভা বলেই এরকম সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু শুধু প্রতিভাই কি দুজন মানুষকে একসঙ্গে একই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে ? এর জন্যে সুযোগও তো চাই।

বিমান—সুযোগ পেতে ওঁদের খুব অসুবিধে হয়নি, কিছু যোগাযোগ হয়ে গেছে। প্রথম কথা, ওঁদের দাদা ছিলেন বিখ্যাত বিমল দাশগুপ্ত। তার ওপর দাদার বন্ধু ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, ধীরেন দাস, তুলসী লাহিড়ীর মতন সব মানুষ। শুরুতে তাই দুই ভাই, দাদা বিমল দাশগুপ্তর সহকারী হয়ে কাজ আরম্ভ করেছিল। বিমল দাশগুপ্ত তখন একটা রেকর্ড কোম্পানীতে কাজ করতেন। তো এ লাইনে কোনও পয়সা ছিল না, মাস গেলে তিরিশ টাকা মাইনে পেতেন। তাই সংসার চালাবাব জন্যে লোককে অন্য কিছু একটা করতেই হত। তা, বিমল দাশগুপ্ত বেশ ভাল ম্যাজিশিয়ান ছিলেন। পেশাগতভাবে ম্যাজিক শো করতেন। পুরোন ছবিতে দেখা যাবে প্রোঃ বিমল দাশগুপ্তর বুকের দুপাশে অনেক মেডেল-টেডেল ঝোলানো। রেকর্ডের অফিসে নজরুল সুর করলেন। বিমল, কমলকে সেই গান শিখিয়ে দিয়ে অন্য কাজে চলে গেলেন। আর কমল সেই গান আবার রেকর্ডের গায়ককে তুলিয়ে দিলেন। এভাবে গান তোলানো বাবদ গান-পিছু পাঁচ টাকা করে পারিশ্রমিক জুটত। তা মাস গেলে পঞ্চাশটা টাকা তো হয়ে যেত, সেই কি কম! আর সুবল দাশগুপ্ত গানের সঙ্গে তবলা বাজাবার চাকরি নিয়েছিলেন, তা থেকে যা রোজগার হবার, হোত। সুবল দাশগুপ্ত তবলা শেখা শুরু করেছিলেন সেকালের একজন তবলচি

যার নাম ছিল রামঅক্ষয়। আমার বাবা, বড় জ্যাঠামশাইও এঁর কাছে তবলার তালিম নিয়েছিলেন। তাই, এই দুইভাই প্রথমে তবলাবাদক হিসেবেই টুইন কোম্পানীতে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। সেই সঙ্গে অবশ্য এঁরা গানও শিখছিলেন—প্রথমে দাদা বিমলের কাছে, তারপর নজরুল ইসলাম এবং আরো পরে ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে।

তবে কমল দাশগুপ্ত আরো অনেকের কাছে বিভিন্ন ধরনের গান শেখায় লেগেছিলেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ভজন, কীর্তন, গীত গজল জমিরুদ্দিন খাঁ বা কৃষ্ণচন্দ দের কাছে শিখতে শিখতে কমল দাশগুপ্ত দারুণ নোটেশন লিখতেও শিখেছিলেন। তাছাড়া পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যেমন অনেক পাঠ নিয়েছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-পুত্র দিলীপ-কুমারের কাছ থেকে, তেমনি রবীন্দ্রসঙ্গীতও শিখেছিলেন ব্রজেন গাঙ্গুলি এবং অনাদি দস্তিদারের কাছে।

সে কি। কমল দাশগুপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন ?

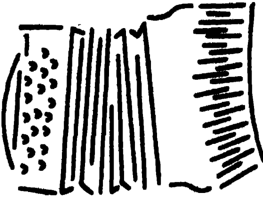
বিমান—শিখেছিলেন মানে ? খুব ভাল করে শিখেছিলেন। দেখবে তাঁর কতো বিখ্যাত গানের ভেতর রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ঢুকে গেছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি শুনে দেখো। কমল দাশগুপ্তর নিজের গাওয়া 'এসেছিল মধু যামিনী' গানের অন্তরা, 'দুজনার মুখ পরে আসি/পড়েছিল জ্যোছনার রাশি'-এর সুরের সঙ্গে পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়/বিজলি থেকে থেকে চমকায়' মিলিয়ে দেখো। দেখবে কি মিল। এ তো হবেই। আমি তো জানি যে অন্তত শ'পাঁচেক রবীন্দ্রসঙ্গীত কমল দাশগুপ্তর কণ্ঠস্থ ছিল, বুকের ভেতর ভরা ছিল। এইচ এম ভিতে তখন অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতেন যে নিউম্যান সায়েব, তাঁর কাছে উনি রীতিমত সিরিয়াসলি ওয়েস্টার্ন গান আর অর্কেস্ট্রার মিউজিক রচনা শিখেছিলেন। যার ফলে, পরে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তিনি রেকর্ডে বা ছবিতে আবহ সঙ্গীত রচনায় অদ্ভুত সব বৈচিত্র্য এনেছিলেন। বাংলা গানের সঙ্গে বিলিতি অর্কেস্ট্রার সমন্বয় করে, গানের সুরে যে অন্য এক নতুন মাত্রা যোগ করা যায় সে ব্যাপারে অগ্রণী হিসেবে আমি দুজনকে মনে করি। এক, পঙ্কজ মল্লিক আর এক কমল দাশগুপ্ত।

তবে পঙ্কজদা তো ফিল্মের বাইরে খুব বেশি অন্য গানে সুর করেননি কিন্তু কমল দাশগুপ্ত হিন্দি, বাংলা ৩/৪ হাজার গানে অর্কেস্ট্রার সঙ্গে সুর বৈচিত্র্য রচনা করেছেন। পঙ্কজদার তৈরি গানের সঙ্গে তখন বড়জোর সেতার, পিয়ানো আর অর্গান থাকত। তখনকার দিনের অনেক ছবিতে দেখবে, মানে শুনবে যে, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত নিজে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। সে যুগে এমনটাই ছিল। বড় বড় মিউজিক ডিরেক্টররা নিজেরা সব যন্ত্র বাজাতে জানতেন, পারতেন আর নিজেরা বাজিয়ে তা দেখিয়ে দিতেন মহড়ার সময়। আমি নিজে দেখেছি রাইবাবু, পঙ্কজদা, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, শৈলেশ দত্তগুপ্ত প্রত্যেকেই যে কোনও যন্ত্র দরকার সেটা বাজিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সে যুগ যেন শেষ হয়ে গেছে। এই ধরো না,

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে। গানে, বাজনায়, গলা আর হাত, কোনটায় না ফুল ফুটিয়েছে ? সবেতেই অদ্বিতীয়। আমরা কজনই বা জানি যে, তবলার রাধাকান্ত নন্দী কতো ভাল হারমোনিয়াম বাজাতেন। আমি গাইছি, রাধাকান্ত নন্দী তবলায় সঙ্গত করছেন, হঠাৎ তবলা ছেড়ে হারমোনিয়াম ধরলেন—বিলে বলে একটা ছেলেকে তবলায় বসিয়ে দিলেন। তাহলে বোঝো এঁরা সব কোন্ জাতের শিল্পী ছিলেন, কেমন এঁদের তালিম ছিল, সাধনা ছিল। কিন্তু এঁরা যে কোনও ব্যতিক্রমী শিল্পী ছিলেন, তাও তো নয়। আসলে সে কালের গতিপ্রকৃতিই এরকম ছিল।

আরে বিগত দিনের কোনকিছুর প্রশংসা জিনিসটাই বর্তমান প্রজন্মের সর্বজ্ঞদের কাছে যেন ঠাট্টা বিদ্রূপের বস্তু। ওটা নাকি বুড়োদের একটা রোগ। অথচ দেখবে কেউ চোখে আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট করে বলতেও পারবে না, কেন অতীত দিনের ভালগুলো ভাল নয়; কালধর্মের প্রবাহে কেনই বা সেগুলোকে হাস্যকর বলা হবে বা আদিম আবর্জনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হবে ?





চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিমান—আগের কথার সূত্র ধরে তাই, এখানে একটা কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে। আজকাল বাংলা গানের স্বর্ণযুগ বলে একটা কথা খুব চলছে। লোকে বেমালুম বলে যাচ্ছে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাট দশক হল, বাংলা গানের স্বর্ণযুগ। কথাটা আমার খুব লাগে, মনে বাজে। তাহলে পঞ্চাশের আগে পর্যন্ত কোন্ যুগ ছিল ? তাম্রযুগ না লৌহযুগ না প্রস্তরযুগ কোন্‌টা ? সে সময়কার, শচীনদেব বর্মন, পঙ্কজ মল্লিক, কুন্দনলাল সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব এঁরা সবাই তাহলে কোন্ যুগের ? একথা ঠিক হেমন্ত, মানবেন্দ্র, শ্যামল মিত্র বা একটু পরে সতীনাথ বা মান্না দে-এঁরা স্বাধীনতার পরবর্তী একটা সময়ে অবশ্যই দারুণভাবে নিজেদের গুণবত্তায়, গায়নে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের আগে কিংবা বিশ-তিরিশের দশকের সময়ে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে নস্যাৎ করে সেই প্রস্তর যুগের ধূলো বালির নিচে চাপা দেব কি করে ? স্বর্ণযুগ বলে ওভাবে একতরফা, কখনোই চিহ্নিত করা যায় না। আমার মতে এগুলো অভিজ্ঞতার অভাব। কারণ বিশ তিরিশের দশক থেকে, আমরা তো অনেক অনেক প্রতিভাকেই পেয়েছি। ক'জনের আর নাম বলব ঃ

জ্ঞান গোঁসাই (১৯০২-১৯৪৭), ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৭৭). কালীপদ পাঠক (১৮৯০-১৯৭০), কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩-১৯৬২), তারাপদ চক্রবর্তী (১৯০৯-১৯৭০), শচীন দেব বর্মন (১৯০৬-১৯৭৫), পঙ্কজ মল্লিক (১৯০৫-১৯৭৮), সায়গল (১৯০৪-১৯৪৭), পাহাড়ী সান্যাল (১৯০৬-১৯৭৪), হিমাংশু দত্ত (১৯০৮-১৯৪৪), সুধীরলাল (১৯১৬-১৯৪৯) বা জগন্ময় মিত্র ((১৯১৮) প্রভৃতি।

কিংবা ধরো মেয়েদের কথা। ইন্দুবালা (১৮৯৮-১৯৮৪), আঙুরবালা (১৯০০-১৯৮৪), শৈল দেবী (১৯১৪-১৯৪৪), কমলা ঝরিয়া (১৯০৬-১৯৭৯), সুপ্রভা (ঘোষ) সরকার (১৯১৯-১৯৮৯), কানন দেবী (১৯১৫-১৯৯২), যূথিকা রায় এঁদেরকে তাহলে কোন্ যুগের লোক বলবো ?

তাইই তো। .....আরো একটু যদি পিছিয়ে যাও সেই লালবাতি বা মঞ্চের পাদপ্রদীপের

আলো থেকে উঠে আসা আশ্চর্যময়ী, কৃষ্ণভামিনী, পান্নাময়ী, মানিকমালা, মানদা সুন্দরী, মালতীমালা, নীহারবালা বা এই তো সেদিন ওই দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়েও নাট্যনিকেতনে সিরাজদ্দৌলা নাটকে হরিমতীর 'পথহারা পাখি' গান দীর্ঘদিন ধরে দর্শকদের কাঁদিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রকেও চোখ মুছতে দেখা গিয়েছিল। এঁরা সব কোন্ যুগের লোক ? এঁদের কি আজকে, আদি প্রস্তর যুগের অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে ?

বিমান—আরে, একজন নিয়মিত গায়ক শিল্পী বলে তো তেমন পরিচিতি ছিল না —তবু পাহাড়ী সান্ন্যালের দু একটা রেকর্ড শুনলে এখনো দাঁড়িয়ে যেতে হয়।

অবশ্যই। 'বিদ্যাপতি' ছবিতে, 'ভরা ভাদর মাহ' কিংবা 'ভাগ্যচক্র'তে 'কেন পরান হল বাঁধন হারা', 'মীরাবাই'তে 'আমার আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল' এসব তো ছিল সেকালের সুপারহিট। কত কালের গান, এ যুগে প্লে-ব্যাকের ঠেলায় কে আর সিনেমায় নিজের গলায় গান গাইতে পায়। তবু দেখো, এই তো ক'বছর আগে সত্যজিৎ রায় অরণ্যের দিনরাত্রিতে পাহাড়ীকে দিয়ে গাওয়ালেন অতুলপ্রসাদের সেই 'সে ডাকে আমারে'। এই বুড়ো বয়সে অনভ্যস্ত গলাতেও পাহাড়ীর সে গান শ্রোতাকে তো মুগ্ধ করে দিয়েছিল!

বিমান—নিশ্চয়। এই পাহাড়ী সান্ন্যালের মাঝ বয়সে গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত, নীতিন বসুর নৌকাডুবিতে সেই 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল', যারা শুনেছে তারা কি কেউ ভুলতে পেরেছে ? তাবপর এই তিরিশের দশকে আমরা পেয়েছিলুম সত্য চৌধুরির মত আর্টিস্টকে, সব রকমের গানে যিনি সমান ওস্তাদ। বেচু দত্তর মত আর্টিস্টকেও এই সময়ে পেয়েছি। এঁরা তো আজও অননুকরণীয়। এমনি আরো কতো জনের নাম হয়ত এক্ষুনি মনে পড়ছে না কিন্তু সে যাই হোক না কেন, শুধু শুধু ৫০ বা ৬০-এর দশককে এই যে এত ঢাক পিটিয়ে স্বর্ণযুগ বলা হচ্ছে, তার আগের যুগকে কেন নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে—তার ব্যাখ্যা কেউ তো দিচ্ছে না। অথচ দেখো আজকে সব থেকে বেশি রি-মেক হচ্ছে তিরিশ আর চল্লিশের দশকের গান। এ থেকে তাহলে আমি কি ধরে নেব, বলো। এটাই তো আমার আজকের বক্তব্য, ক্ষোভ যাই বলো না কেন ?

আরে এসবের অনেক আগের, প্রায় আদি যুগের কথাই ধরো না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বা তারও আগে যাঁরা গান লিখেছেন—সুরে তালে বিভিন্ন ধারার গান তৈরি করেছেন, দেশের পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে শিবতলা, কালীতলার মঞ্চে বা মেলায়, আসরে গেয়ে গেয়ে বাংলা গানকে এক কাল থেকে অন্যকালের রাস্তায় মাইল স্টোনের মত একাদিক্রমে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন—তাঁরা সব কোন্ কালের ? কই, তাঁদের সৃষ্টির শতবার্ষিকী, দু'শতক বার্ষিকীর কথা তো কেউ বলে না!

পাতালের গভীর থেকে যে খনিজ সম্পদ আহরণ করে তাঁরা, বাংলা গানের নতুন, নতুন ধারার প্রবর্তন করে গেছেন, এতকাল পরেও সে সবে, কই, মর্চে তো ধরে

নি। আজও সেসব গান লোকের মুখে মুখে ফেরে। মনের গহনে তাঁদের মূর্তিও কতো জীবন্ত। গীতিকার, গায়ক সাধক এঁদের কয়েকজনের নাম বললেই বোঝা যাবে যে, এঁদের প্রবর্তিত গান, গানের ধারা আজ এই দেড়শো, দুশো, আড়াইশো বছর পরেও কেমন সচল হয়ে রয়েছে। আমি শুধু জন্মের সাল ধরে, কয়েকজনেরই নাম করে যাচ্ছি : ভারত চন্দ্র (১৭১২), রামপ্রসাদ (১৭১৮), রামনিধি গুপ্ত-নিধুবাবু (১৭৪১), কমলাকান্ত (১৭৭২), বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী (১৮০৪-ধ্রুপদী, রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত শিক্ষক), দাশরথি রায় (১৮০৮), যদু ভট্ট (১৮৪০), অঘোরনাথ চক্রবর্তী (১৮৫২), রাধিকা গোস্বামী (১৮৬৩), গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০), এমনি আরো কত বলব! সোনারূপো দিয়েই যদি যুগকে চিহ্নিত কোরে, পঞ্চাশ ষাটের দশককে স্বর্ণযুগ বলে আহ্লাদে তুবড়িবাজী করতে হয়—তবে, যাঁদের নাম করলুম তাঁদের যুগকে কি নামে ডাকব ?

বিমান—আরে, সেইজন্যেই তো তথাকথিত ওই স্বর্ণযুগের আগেকার কথায় আবার আসছি। একবার ভাবো তো তিরিশের দশকে, আমরা কি দুর্দান্ত সব মিউজিক ডিরেক্টর পেয়েছিলাম—রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, তিমিরবরণ, হিমাংশু দত্ত, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, অনুপম ঘটক, দুর্গা সেন, রবীন চট্টোপাধ্যায় এরপর হরিপ্রসন্ন দাস যিনি হেমন্তদাকে দিয়ে প্রথম প্লেব্যাক গাওয়ালেন নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের মুখে, নিমাই সন্ন্যাস ছবিতে। ইনি একসময় রাইবাবুরই সহকারী ছিলেন। তারপর দেখো, আমি নিজে পঞ্চাশের দশক থেকে গান বাজনার প্রফেশনাল লাইনের সঙ্গে যুক্ত। আমি অনেক সঙ্গীত পরিচালক দেখেছি। তখন সাহেব কোম্পানীরা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। ভারতীয় কোম্পানীদের হাতে এক পার্সেন্ট বেশি অর্থাৎ ৫১ শতাংশ শেয়ার ছেড়ে দিয়ে, ওরা কিন্তু তখনও কোম্পানী চালিয়ে যাচ্ছে, কাজ করছে। কি ক্ষুরধার এদের পরিচালন ক্ষমতা। এমন তীক্ষ্ণ নজর যে একজন আর্টিস্ট একবার হয়ত ফ্লপ করল, ওঁরা কিন্তু এক একজনের সম্বন্ধে ঠিক বলে দেবে, একবার ফ্লপ করল বটে কিন্তু ও পরে আমাদের ঠিকই পয়সা দেবে। এটা ওদের প্রখর বোধ বুদ্ধির কথা।

আজকে আমরা হৈ চৈ করি, যে—তালাত মাহমুদকে নিয়ে, সেই তালাত (তপনকুমার) যখন কলকাতায় নিউ থিয়েটার্সের সিনেমায় অভিনয় করতে এল, তখন এখানকার লোকেরা বললে আরে বাবা, আমাদের এখানে, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার থাকতে, তালাত কী গান গাইবে ? আসলে, তালাতের প্রথম দুটি রেকর্ড চলেনি। তখন হিজ মাস্টার্সের পি কে সেন, কমল দাশগুপ্তকে সামান্য একটু বললেন, কমল এই ছেলেটাকে একটু দেখবেন। ওদিকে রাইট সায়েব তখনও রয়েছেন। তিনি একটু তালাতের গান শুনে, কি রকম যেন প্রত্যয়ের সঙ্গে টুপ করে বলে ফেললেন—এ কিন্তু হিট করবে আর একটা গান হিট করলেই দেখবে পুরোন যা সব রেকর্ড আছে, সব টেনে বেরিয়ে যাবে। সো পুট হিম টু মিস্টার দাশগুপ্ত।

কমলবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কমলবাবু গলা শুনলেন। বললেন হুঁ, উচ্চারণটা ঠিক করতে হবে। আর তালাতকে বললেন লেখা দেখে দেখে পড়ো, উচ্চারণ ঠিক করো। যার লেখা তাকেই দিচ্ছি, তোমাকে পড়ে পড়ে শোনাবে আর তুমি সেই রকম করে বলবে।


তালাত মাহমুদ (তপনকুমার)

তারপরেই একেবারে ঘনিষ্ঠ সুরে জানিয়ে দিলেন, তুই পড়াটা বেশ ভাল করে মুখের উচ্চারণে তোল্, আর আমি সুরটা করে নিই। তারপর যা ঘটেছিল সে তো স্বপ্নের মত।

১৯৪৪ সালে তালাতের অর্থাৎ বাংলা তপনকুমারের প্রথম এই রেকর্ডটা বেরুল। একপিঠে—'দুটি পাখি দুটি তীরে মাঝে নদী বহে ধীরে' গিরীন চক্রবর্তীর লেখা উল্টোপিঠে, প্রণব রায়ের লেখা 'ঘুমের ছায়া চাঁদের চোখে'। ব্যস্, আর বলার কিছু রইল না। ১৯৪৪ সালের গান আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও রেডিওতে বাজছে। ক্যাসেটেরও কাটতিতে ঘাটতি হয় নি। বারবার রি-মেক হচ্ছে।

এরপর ধরো কৃষ্ণচন্দ্র দে বা তাঁরও আগে লালচাঁদ বড়াল, গহরজান বাঈজী যাঁরা বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করে গেছেন সেই ১৯০২/১৯০৪ বা তারও আগেকার কালে। ওঁদেরকে আমি এখন কোন যুগের লোক বলব ? ওঁরা কি তবে সব আদিম বন্য যুগের মানুষ ছিলেন যাঁরা—তীর-ধনুক নিয়ে বিচরণ করতেন ? যে যুগে তাঁদের তৈরি সোনার তরী তাঁদেরই সৃষ্ট সোনার ধানে গিয়েছে ভরি—তাঁরা তো ওই স্বর্ণযুগ তৈরি করে গেছেন। তবু তাঁদের সোনা দিয়ে চিহ্নিত করতে চাইবে না শুধু তাঁরাই যারা কালের কষ্টিপাথরে ঘষে আসল সোনাটা যাচাই করে, চিনে নেবার শিক্ষাটাই সেভাবে, আত্মস্থ করতে পারে নি বা পায়নি।

যদি যুগ হিসেবেই বলো—তাহলে বলতে হয় যে, সব যুগেই এক এক দশক ধরে এক এক গুচ্ছ প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। হয়ত তাদের সবাই নানা কারণে, বাধায় ঠিকমত বিকশিত হতে পারে নি। এখনকার কালেও তাদের অনেকে সব সময় প্রকাশিত হচ্ছে না বা নিজেদের প্রস্ফুটিত করতে পারছে না। হাতের কাছে অনেক কিছু জিনিসপত্র থাকলেই তো আর সব সময় যথার্থ কাজ হয় না। এখনো তো সা-রে-গা-মা আছে, মানুষের গান আছে বা গলাও আছে—

কিন্তু সেরকম সাধনা বোধ হয় নেই কিংবা নিষ্ঠা—? তাও কি তেমন আছে ?

বিমান—তাই তো। এখন একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাই। এই ডটকম, কম্পিউটরের যুগে, ধরে ধরে, অনেকক্ষণ সময় ধরে কিছু হয় না। এখন সব সঙ্গে সঙ্গে, তাৎক্ষণিক, ইনস্টান্টের যুগ।

আমি তাই ওদের বলি—দেখ ভাই এই ইনস্টান্টের যুগে অনেক কিছুই হয়ত



জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

ইনস্টান্ট হয়। কিন্তু কিছুতেই একটা ইনস্টান্ট রবি ঠাকুর বা বিবেকানন্দ হবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা থেকে 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই—কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই'।

এ গান কখনো, এক্ষুনি বসে এক্ষুনি লিখে দেব, তা হয় না। এক্ষুনি বসে, একটুকরো বিজ্ঞাপনের গান হতে পারে। কিন্তু এমন কোনও সৃষ্টি হতে পারে না, যা একশো বছর পরে লোকে আবার নতুন করে চাইবে, রিমেক হবে। তার মানে আমি বলতে চাইছি এমন সৃষ্টি যা চিরকালীন, কোনদিন পুরোন হবে না। যেমন সেক্সপীয়র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বা মাইকেল এঁরা তো কখনোই পুরোন হবেন না। আমি এতটাও যাচ্ছি না। কিন্তু এমন মানুষ এখনো আমরা পাই না, তা নয়। আমার দেখা এমন মানুষ ধরো, আমি যদি—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথা বলি। মানুষটা এমন যে, একটা মানুষের ভেতর কতো গুণ থাকলে তবেই না একটা জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ হতে পারে।

আজকাল তো দেখি অনেকের অনেকরকম মূল্যায়ন হচ্ছে, তাদের নিয়ে ফলাও করে কতো লেখালিখি হয়। সিনেমায় যে, একটি হিন্দি ছবিতে, চার পাঁচ খানা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর নকল করে গানের সুর তৈরি করেছে, তাকে নিয়ে নানান মাধ্যমে কতো না অনুষ্ঠান, হৈ চৈ, স্মরণ বরণ। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত, কই—কৃষ্ণচন্দ্র দে, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভীষ্মদেব, জ্ঞান গোঁসাইকে নিয়ে সে রকম বড়োসড়ো কাজ তো দেখতে পেলুম না।

আমি তোমায় বলছি এই যে—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ যিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত শিল্পী, গায়ক, তবলা বাদক, কথাকার, সঙ্গীত শিক্ষক তথা এমন তবলা শিক্ষক যে, তাঁর কাছে তবলা শিখে, বাঙালির প্রায় একটা গোটা প্রজন্ম সর্বভারতীয় স্তরে আজ একটা বিশেষ মর্যাদার জায়গায় পৌঁছে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মত শক্ত জমিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এমনি কতো কথা বলব। আসলে কী নন তিনি ? এঁকে নিয়ে কিছু কথা আজ সিতাংশু শেখর ঘোষকে বলতেই হবে। তুমি তো আমার বহুকালের বন্ধুলোক। তুমি জানো, আমি চিরকাল কি রকম সব লোকের, কতো বড় মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ হলেন এমনই একজন মানুষ যাঁকে আমি জ্ঞানদা হিসেবে শ্রদ্ধা করি যদিও প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ আমার গুরু নন। কিন্তু জ্ঞানদা আমার গুরুদের। এমনই বন্ধু ছিলেন যে জ্ঞানদাকে আমি তুমি বলতাম, এত অন্তরঙ্গ যে, এছাড়া আর কিছু আমি বলতে পারিনি তাঁকে।

আমার গুরুরা ওঁকে যা শ্রদ্ধা সম্মান করতেন তার পরিমাপ হয় না। তাতে আমি মনে করতুম, উনি আমার গুরু হলে আমি তো ধন্য হয়ে যেতাম।

প্রথম আলাপ পরিচয়টা কবে কি করে হল ?

বিমান—সে, কল্পনা করতে পারো ১৯৪৮-এ—তখন আমার ১৭/১৮ বছর বয়েস। হাতিবাগানের কাছে নলিন সরকার স্ট্রীটে হিজ মাস্টার্সের ও কলম্বিয়ার রিহার্সাল রুম ছিল। ওখানে আমার বাবা-টাবা যেতেন, আমি মাঝে মধ্যে ওঁর সঙ্গে যেতুম। কতো সব বড় বড় শিল্পীরা আসতেন, কাছ থেকে তাঁদের দেখা বা কখনও দু একটা কথা বলতে পারা—এ কি কম লোভনীয় ? তাছাড়া, তখন উঠতি গান বাজনা করছে এমন ছেলের পক্ষে, ওই রিহার্সাল রুমে ঢুকতে পাওয়াও বিশেষ সৌভাগ্যের বলে ধরা হত। তা এইরকমই একদিন বাবার সঙ্গে ওখানে গেছি। রিহার্সাল রুমে ঢুকে দেখি সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন উজ্জ্বল পুরুষ, বেশ সযত্ন চর্চিত গোঁফ, পরনে গরদের পাঞ্জাবী, মালকোঁচা মারা ধুতি, চুলটা ব্যাকব্রাশ করে ওল্টানো। চোখে চশমা, বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। জলদ গম্ভীর স্বরে, স্মিত কণ্ঠে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি, কেমন আছেন ?

ওফ, সেদিন যা সব কাণ্ড করলেন আপনি। অন্তরঙ্গ রসালো ভঙ্গিতে বাবা জবাব দিলেন।

কলকাতায় সদ্য অনুষ্ঠিত এক সঙ্গীত সম্মেলনের মঞ্চে, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের সঙ্গে বাজাবার সময়ে, জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে প্রকাশ্যে কিছু বাগবিতন্ডা প্রসঙ্গে, বাবার কথাটি শুনে উনি একটু হেসে বললেন আরে না, না—যা আপনি, ভাবছেন ও সব কিছু নয়। চলি, এখন। উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন আমার দিকে চোখ পড়তে, বাবা বললেন ইস্ উনি যে চলে গেলেন।

জানিস উনি কে ? জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ—বাংলায় সঙ্গীত জগতে ওরকম একটা লোক আর হয় না। চ' ওঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি, আলাপ করিয়ে দিই। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দেখা গেল উনি একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। বাবা আমায় ওঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন আমার ছেলে, গানটান করে, একে একটু আশীর্বাদ করুন।

স্নেহের সুরে জ্ঞানবাবু বললেন, 'কী গান করো, কার কাছে শেখো। খুব ভাল, খুব ভাল।' ব্যস, এইটুকুই ওই প্রথম আলাপের সংলাপ। আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই, গাড়িতে উঠে পড়লেন। কিন্তু এরপরে অনেক দিন বাদে সেই সত্তরের দশকে যখন পঃ বঃ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি তৈরি হল, তখন থেকে ওঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। আকাদেমির নানা ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা ভোলবার নয়। বাংলা গানের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আমি অনেক আলোচনা করেছি। আর প্রায়শই তো এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতুম, জেনে নিতুম। উনিও কতো সময় আমাকে ডেকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। এইভাবে বুঝেছি, যে কারণেই হোক উনি আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন।

আমি ঠিকমত উত্তর দিতে পারলে উনি খুব এনজয় করতেন, খুশি হতেন। তখন সকলকে বলতেন এই ছেলেটা দেখছি মুখস্থ ইতিহাস।

এইচ এম ভিতে রেকর্ডিং করতে গেছি। রিহার্স্যাল চলছে, জ্ঞানদা ঘরে এসে পড়েছেন। তখন রাধাকান্ত নন্দী, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আমি, নির্মল বিশ্বাস আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সবাই বললে—বিমানের ট্রেনিং-এ আমরা এই গানটা তৈরি করছি, আপনি একটু সাজেশন দিয়ে যান, কি করলে আর একটু ভাল হবে। উনি চা খেতে খেতে, গান শুনতে শুনতে মুখে মুখে বলে দিতেন এই খানটায় এই রকম করো না, ওইখানটায় ওইটে করো.... তা ভালই তো হচ্ছে, আমি কি আর বলব। বেশ বেশ। ইত্যাদি।

সব সময় সুরের মধ্যেই আছেন। তাই মনে হয়, জ্ঞানপ্রকাশ মানেই যেন গান প্রকাশ, তাই না ?

বিমান—তারপর একদিনের কথা মনে পড়ছে। ওঁর ছাত্র বিখ্যাত তবলাবাদক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। একদিন হঠাৎ আমায় ফোন করে বলল বিমানদা গুরুজী তোমায় ডেকেছেন।

আমি তো ভয় পেয়ে কাঁটা। বারবার জিজ্ঞাসা করছি কেন, কেন ডেকেছেন, বলো তো। সঞ্জয় বললে তা জানি না। উনি শুধু বলেছেন বিমানকে নিয়ে সন্ধেবেলা তুমি আসবে। আমি তো আরো ভয়ে কাঁপছি। আমি তো রেডিওতে গান করি, ফাংশানে গাই, কোথায় কি ভুল করেছি, কি ভুল বলেছি, জ্ঞানদা হয়ত কোনও ভুলত্রুটি পেয়েছেন তাই আমাকে হয়ত বকাবকি করবেন। মহা বিপদ।

যাই হোক সঞ্জয় গাড়ি নিয়ে এল। গাড়ি চালিয়ে আমায় সোজা নিয়ে এল জ্ঞানদার বাড়ি, কি যেন নাম ?

হেমছায়া, আয়রণ সাইড রোড।

বিমান—হ্যাঁ হ্যাঁ, হেমছায়া। দৌড়ে লিফটে উঠতে উঠতে ফের আমার জিজ্ঞাসা —জ্ঞানদা ডাকলেন কেন ? সঞ্জয় বলছে—সত্যি বিমানদা বিশ্বাস করো, আমি কিছু জানি না। ওঁর আবাসে ঢুকলুম। জ্ঞানদা তো খুব সৌখীন মানুষ ছিলেন। সুন্দর সাজানো, ঘরে মোটা পর্দা, মোটা কার্পেট।

আরে, ডিকসন লেনের সেই খানদানী মেজাজটা যাবে কোথায়!

বিমান—ঘরে বসে আছি একটা সোফায়। তারপর হঠাৎ সেই চিরাচরিত গটগট করে হাঁটা, জ্ঞানদা ঘরে ঢুকলেন। পরনে লুঙ্গি আর গায়ে পাঞ্জাবী, বোতাম লাগানো নেই বুকটা খোলা। এই যে তুমি এসে গেছ তোমাকে ভীষণ দরকার আমার। দাঁড়াও তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

আমি গিয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলুম।

বলো কেমন আছ ?

আমি বললুম ভাল আছি, দাদা।

শোনো। তোমাকে একটি ছাত্রী দেবো, ছাত্রীর মাথাটি কিন্তু খুব একটা পরিষ্কার নয়। তবে আমি ঠিক করলাম, আচ্ছা দাঁড়াও, ছাত্রীটিকে আগে ডেকে আনি।

কথাটা বলেই তিনি অন্দরে ঢুকে ওঁর স্ত্রী শ্রীমতী ললিতা দেবী (ঘোষ)-কে সঙ্গে করে, ডেকে নিয়ে এলেন। একটা গমক দিয়ে দ্রুত লয়ে বলে চললেন—এই, এই তোমার ছাত্রী। এ রেডিওতে নজরুল গীতিতে পাশ করেছে। আমি নজরুল গীতি ২/১টা জানি, বেশি জানি না। ললিতা হয়ত নিয়মিত, মাসে একটা করে নজরুল গীতির প্রোগ্রাম পাবে। প্রোগ্রাম করার মত নজরুলের গান আমি জানি না। এর জন্যে, ওর তো ছ'খানা আটখানা করে গান তৈরি রাখা দরকার। কাজেই তুমি ওকে নিয়মিত এ গান শেখাবে। তা কবে থেকে আসবে, তাই বলো।

—তা আজকে আরম্ভ করব ? সঙ্কুচিত হয়ে মৃদুকণ্ঠে বললুম।

খুব ভাল, তা করে দাও, করে দাও। এই হল জ্ঞানদার সোজাসুজি সংক্ষিপ্ত বাচন ভঙ্গি।

সেই শুরু হল। তখন থেকে নিয়ম করে সপ্তাহে একদিন, জ্ঞানদার বাড়িতে যাওয়া আর সেই সঙ্গে ললিতাকে, গান শেখাতে লেগে গেলুম। তাই ললিতা আমায় দাদা বলে, ঠিক দাদার মতই শ্রদ্ধা করে। মল্লার মাঝে মাঝে ঠেকা দেয়। এইভাবেই ললিতাকে গান শেখানো চলছিল। মাঝে মধ্যে হঠাৎ একদিন হয়ত, গান শেখানোর মাঝখানে জ্ঞানদা স্ত্রীকে বললেন, আচ্ছা, এখন কি তোমার গান শেখা হয়ে গ্যাছে ? আজ না হয় এই পর্যন্তই থাক, তুমি তোমার কাজ করোগে। আমি এখন একটু বিমানের সঙ্গে বসব।

জানো সিতাংশু, সবচেয়ে বড় কথা, আমার গর্ব যে ঐরকম একজন, বিশাল মানের প্রতিভাবান মানুষটি আমায় প্রায়ই বলতেন তুমি আমায় গান শোনাও, পুরোন দিনের গান, আমি শুনব। আমি গাইতাম, উনি মন দিয়ে শুনতেন। আরো আমি করতাম কি—ওঁর বন্ধুবান্ধবদের গানও যে কতো সময় গেয়ে দিতাম। তার মধ্যে বেশির ভাগ গাইতাম কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত আর হিমাংশু দত্তর গান। তবে মজা হোত, যে ওনার নিজেরই বহু সুর করা গান উনি ভুলে যেতেন। আমি সেগুলো গেয়ে শোনাতাম। উনি উচ্ছ্বাসে বলে উঠতেন, বাঃ, এটা কার গান ? বেশ ভাল হয়েছে তো! তখন আমি বলতুম—

এটা তো আপনারই তৈরি গান।

অ্যাঁ—বলে, উনি হেসে উঠতেন। আমারও তার ছোঁয়া লাগত। একটা ঘটনার কথা বলি। আজকে, জীবনের অনেক পথ পেরিয়ে যখন নিজের কথা বলতে বসেইছি তখন, সিতাংশু তোমাকে এ কথাটা না বলে যে পারছি না! কথাটা হল, ওই গান শেখানো শেষ হবার পর চলে আসার সময় রোজ জ্ঞানদা আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন। ভাবো দেখি কী অপার স্নেহ, উদার বিস্তৃত বক্ষপট। প্রতিদিন সেই বক্ষপটে আমায় জাপটে ধরে, উনি উদ্বেল হয়ে কাঁদতেন। আশীর্বাদ করে শুধু একটু বলতেন তুমি ভাল থাকো। এইভাবে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কি রকম হয়ে উঠেছিল—তা, আর একটা ঘটনার কথা শুনলে, বুঝতে পারবে।

একবার রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমিতে কোনও একটা বিষয়ে, একটা ব্যাপার ঘটেছিল। যার জন্যে একটু একটু উত্তেজনাও সৃষ্টি হয়েছিল। সব শুনে, জ্ঞানদা বলেছিলেন, তোমরা এত অস্থির হচ্ছ কেন ? ভাবছ কেন ? তোমরা বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ করো, তাকে ডেকে পাঠাও এক্ষুনি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই থেকে বোঝো আমার ওপর তাঁর কি রকম অগাধ আস্থা ছিল। এই হলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ—জ্ঞানদা, যার স্নেহ ভালবাসায় আমি ধন্য হয়েছি।

আর একদিনের কথা বলি। তখন ললিতাকে গান শিখিয়ে চলে আসার আগে, প্রায় প্রতিদিন জ্ঞানদাকে দু চারটে গান শুনিয়ে তবে ছাড়া পেতাম, না-হলে আসতে পারতুম না। জ্ঞানদা অমন ভাবে আমার গান শুনছেন, এতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করতুম। ভাবো তো, আমি যা খুশি গাইছি আর জ্ঞানদা বসে বসে আমার সেই গান, গানের পর গান শুনছেন! খুব কম কথা বলতেন, শুধু মাঝে মাঝে বলতেন—ওই, ওই জায়গাটা আর একবার করো তো, শুনি। এর থেকে আর বড়ো পুরস্কার কি হতে পারে, বলো।

রেডিওর রম্যগীতিতে ১৯৫৫ সালে, সরল গুহর লেখা আর জ্ঞানপ্রকাশের সুরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য একটা গান করেছিলেন, 'আমার কথা বলবো পরে, তোমার কথা বলো/কাজল কালো নয়ন তোমার, কেন ছলোছলো/তোমার কথাই বলো'।

সেদিন, আমি এই গানটা গেয়ে, শেষ করতে করতে প্রায় দেড়টা বেজেছে। তখন ললিতা জ্ঞানদাকে বলছে, এবার তুমি ওঁকে ছেড়ে দাও, উনিও তো বাড়ি গিয়ে খাবেন, অতদূরে থাকেন।

আমিও দেখলুম উনি খাবার টেবিলে বসছেন, এবার খেতে বসবেন।

আমি তখন তাড়াতড়ি হেমছায়া থেকে বেরিয়ে বিড়লা মন্দিরের কাছাকাছি এসেছি, হঠাৎ মাঝপথে দেখি, ওঁর বাড়ির এক পরিচারিকা প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে ডাকছে—ও দাদা, ও দাদা শীগগির চলুন, সায়েব আপনাকে আবার ডাকছেন।

আবার কি হল রে বাবা, এই তো এলুম, আবার ডাকছেন কেন ? যাই হোক দ্রুতপায়ে ওপরে গিয়ে হাজির হতেই ললিতা বললেন—আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে উনি খাচ্ছেন না। খালি বলছেন বিমানকে ডাকো, ওই গানটা বিমান আবার গা'ক, তা না হলে আমি খাব না। অবাক হয়ে দেখলুম একটা ছোট ছেলের মত, চেয়ারে বসে কিরকম পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। বিহ্বল হয়ে আমিও তাঁর পায়ের তলায় মাটিতে বসে পড়েছি—

উনি বলে চলেছেন গাও, ওই গানটা গাও। খাবারে হাতও দিচ্ছেন না। খালি গলায়, আমিও তক্ষুনি গানটা গাইতে শুরু করে দিয়েছি।

আমার কথা বলবো পরে......

আমি গাইছি। দেখতে পেলুম একটা কচি ছেলের মত উনি ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

গলা দিয়ে কি রকম চাপা কান্নার অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসছে, গানটা শেষ হতে, আমার মুখটা ধরে ওর বুকের বাঁধনে রগড়াতে লাগলেন। কোন কথা বললেন না।

আমি বললুম এবার আমি যাই, অনুমতি করুন। এক কথায় জ্ঞানদা বললেন—হ্যাঁ যাও, যাও।

যেন আমাকে ধমকাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার হাতটা ধরে বললেন, দাঁড়াও দাঁড়াও, দাঁড়াও। আবার জড়িয়ে ধরে, বুঝতে পারলুম আমার বুকে কিছু একটা ঢুকিয়ে দিলেন। উনি বোধহয় ট্যাক্সিভাড়াটা এইভাবে দিয়ে দিলেন। আমি কিছুতেই নেব না। তখন উনি দৃঢ় হুকুমের স্বরে বললেন, যাও, চলে যাও এখুনি, তা না হলে আমি আজ তোমাকে আর ছাড়বই না।

তা, এ গানটা শুনে উনি এতটা ইমোশনাল হয়ে পড়লেন, কেন বলো তো! এ গানের পেছনে কোন বিশেষ ভাবাবেগের কারণ ছিল নাকি ?

বিমান—না, সেরকম আমি কিছু শুনিনি। তবে আমার মনে হয় জ্ঞানদা গানটা ভুলে গিয়েছিলেন। নিজের এত ভাল একটা ক্রিয়েশন তাঁর মনের কোমল ভাবাবেগে হয়ত দারুণ নাড়া দিয়েছিল, তাই নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেননি। তবে উনি যখন কিছু বলেননি, আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। আমাদের সময়ে আমরা শ্রদ্ধা করতুম, ভাল বাসতুম আর ভয়ও করতুম। কারুর কাছে এটা কেন, ওটা নয় কেন, কোন ব্যাপারেও কৈফিয়ৎ চাওয়া—এসব ভাবাই যেত না। আর এইসব চরিত্র, জ্ঞানপ্রকাশদের মত মানুষদের কথাই আলাদা। এঁদের তুলনা তো এঁরা নিজেরাই।

আমি দেখেছি উনি সঙ্গীত পরিচালনা করছেন। এক গাদা মিউজিসিয়ান, যন্ত্রী, শিল্পী। প্রথমে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট নিজে হাতে ধরে, টিউন করিয়ে নিতেন। নিজের দু কানে, দুটো সুর মেলাবার যন্ত্র—এটা জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ছাড়া হয় না। একে বলছেন আর একটু বাড়াও, ওকে বলছেন আর একটু কমাও। তার সঙ্গে সমন্বয়—সৃষ্টি। এ শুধু ওনার মত পারসোনালিটি থাকলে, তবেই ওই কোয়ালিটি বেরুবে। এ হল সঙ্গীত পরিচালক জ্ঞানপ্রকাশের কথা। কিন্তু তাঁর মহানুভবতা ? কে আর কতটুকু জানে! অসচ্ছল কোন শিল্পীর কি অভাব, কার আর্থিক অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, আর্থিক অনটনে কি কষ্টে পড়েছে—জ্ঞানদা খুঁজে খুঁজে তাদের ডেকে এনে রম্যগীতিতে বা অন্যভাবে কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। কতো লোককে যে তিনি টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন তার কোন হিসেব নেই। কিন্তু কোনদিন কারুর কাছে সেসব, প্রকাশও করেননি। আমি তাঁর পরিবারের সঙ্গে এখনও যুক্ত। তাঁর পুত্র মল্লার এখন নামী শিল্পী, ভাল বাজায়। তাঁর স্ত্রী ললিতাদি এখন আর গানটান গাইতে আসরে বসেন না। জ্ঞানদা চলে যাবার পর উনি গানটান একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। পারিবারিক সঙ্গীত চর্চার কথায় জ্ঞানদার হারমোনিয়াম বাজানোর কথা না বললে চলে না। জ্ঞানদার হারমোনিয়াম বাজানো যে কি জিনিস তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। তাছাড়া সবসময় একটা নতুন কিছু করা, বা নতুনভাবে করা, এরকম স্বভাবের জন্যে সর্বদা যেন ছটফট করতেন। এরকম একজন সতত সৃজনশীল, আদ্যোপান্ত শিল্পীমনের মানুষ আর পাওয়া যাবে না।

এই রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা গল্প আজ আমি বলছি, যা কেউ জানে না। এমনকি জ্ঞানদার ঘনিষ্ঠদের কেউও বোধহয় জানে না। জ্ঞানদার মত সুরস্রষ্টার মানসিকতা এ গল্পটা থেকে নির্ভুল ভাবে বোঝা যাবে।

এখনকার দিনের বহু ব্যবহৃত টেপ রেকর্ডার যন্ত্রটি, তখন সবে বাজারে বেরিয়েছে। দু'দশ জনের বাড়িতে হয়ত সদ্য সদ্য এসেছে। জ্ঞানদা ক্রীক রোতে তখন প্রতি রবিবার কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে যেতেন, সেখানে কাউকে ক্ল্যাসিক্যাল গান শেখাতেন। তাদের বাড়ি, শোনা গেল, টেপ রেকর্ডার এসেছে। সখের প্রাণ, নতুন টেপ রেকর্ডার মাত্র একটা নয় বরং একাধিক কেনা হয়ে গেছে। টেপ রেকর্ডার ব্যাপারটা কি রকম কি হয়, তা জানবুঝের জন্যে, জ্ঞানদা একটা রেকর্ডারে মিনিট পাঁচ-সাত ত্রিতালে তবলায় লহরা বাজিয়ে রেকর্ড করলেন। তারপর সেই টেপ বাজিয়ে শুনে তো একেবারে মজে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন টেপে হারমোনিয়াম বাজনা তুললে কেমন হয় ? কিন্তু হারমোনিয়ামের সঙ্গে তবলা বাজাবে কে ?

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এল একটা টেপ রেকর্ডার যন্ত্রে তাঁর বাজানো এই তবলা লহরার টেপটা চালিয়ে, তার সঙ্গে সমন্বয় করে হারমোনিয়ামের বাজনাও যদি আর একটা টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা যায়—তাহলে একই বাদকের হারমোনিয়াম বাজনা আর সঙ্গে তার নিজের তবলা সঙ্গত—সে এক বেশ নতুন ব্যাপার হবে।

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। একটা যন্ত্রে তবলা লহরার টেপটা চালিয়ে তার সামনে আর একটা রেকর্ডার চালিয়ে জ্ঞানদা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেলেন। কি অনায়াসে একটা অভিনব প্রয়াস সফল হল। এটাই এদেশের প্রথম টেপ-ধৃত হারমোনিয়ামের রেকর্ড কিনা, তা আজ আর জানা যাবে না। কেননা ওই দুটো টেপের অস্তিত্বও তো এখন অন্ধকারের গর্ভে। পরে অবশ্য জ্ঞানদা বালসারার সঙ্গে একসঙ্গে একটা রেকর্ড করেছিলেন। পিয়ানো হারমোনিয়ামের দ্বৈত যন্ত্রসঙ্গীত যার সঙ্গে শ্যামল বসু তবলা সঙ্গত করেছিলেন।

ই পি রেকর্ডের যুগে জ্ঞানপ্রকাশের একক হাতের বাজনা 'নগেনের গিন্নীর দাঁত কনকন' তবলার বোলের মজাকি, যেভাবে তুঙ্গে তুলেছিলেন তাতে আমার মনে হয়েছিল যে এ জিনিস একমাত্র জ্ঞানপ্রকাশের হাত থেকেই বেরুনো সম্ভব, তাই না ?

বিমান—তা তো বটেই। তাঁর প্রতিভার কথার কি আর শেষ আছে। মার্গ সঙ্গীত, কাব্যগীতি এসব না হয় ছেড়ে দিচ্ছি।

কিন্তু জ্ঞানদা যে কি দারুণ হাসির গান গাইতে পারতেন তা কজন আর মনে রেখেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বুড়ো বুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকতো'—তাঁর মুখে যে শুনেছে সে-ই জানে, হাসির গানকে কোন স্তরে তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

আবার দ্যাখো, সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের কবিতায় প্রথম সুর দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত, এ কথা আমরা জানি। কিন্তু জ্ঞানদা'ও রম্যগীতির আসরে, আবোল

তাবোলের অনেক গানে সুর করে, পরিবেশন করেছিলেন কিন্তু সে সব গান কারা গেয়েছিলেন তা জানলে অবাক হতে হবে।

রম্যগীতির পর্যায়ে জ্ঞানদার তৈরি সুরে আবোল তাবোলের গান গেয়েছিলেন জ্ঞানদা নিজে, রঞ্জিত রায় আর পরিতোষ শীল। বিখ্যাত বেহালাবাদক হিসেবেই যাঁর পরিচিতি ছিল।

তবে এখানে, আমার নিজের একান্তভাবে ব্যক্তিগত একটা অভিমতের কথা বলে দিই। আমি খুবই অনুভব করি যে জ্ঞানদার যেরকম বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর নানাকাজের যে বিশাল ব্যাপ্তি তার তুলনায় জ্ঞানদার প্রাপ্য সম্মান আমরা তাঁকে কতটাই বা দিয়েছি! সারা জীবন ধরে তাঁর বিপুল সাঙ্গীতিক কাজকর্মের যোগ্য স্বীকৃতি বা সম্মান আমরা যে কখনোই সেভাবে দিই নি, এটা আমাদেরই লজ্জা। এমন কি সরকারী স্তরে বিদেশ সফর প্রসূত তাঁর যে ভ্রমণ কাহিনীর বই 'এলেম নতুন দেশে' বাজারে বেরিয়েছিল তাও উপযুক্ত বিপনন প্রচারের অভাবে, সাধারণ পাঠকের হাটে সেভাবে পৌঁছতেই পারেনি। শুনেছি এককালে ভাল টেনিস খেলতেন, ক্রিকেটেও তাঁর দক্ষতা সুনাম কুড়িয়েছিল। হিন্দি, উর্দু, ইংরাজী, সংস্কৃত সব মিলিয়ে তাঁকে ছোটখাটো ভাষাবিদ বললেও, ভুল হবেনা। বহু হিন্দি-উর্দু গজল তিনি রচনা করেছেন। যেখানে হাত দিয়েছেন তাঁর স্পর্শে, সেখানেই সব সোনা হয়ে গেছে। হারমোনিয়ামের কথা বলেছি। গীটারেই কি কিছু কম ? যদিও তাঁর প্রাণের সঙ্গে ক্ল্যাসিকালের গাঁটছড়া বাঁধা, তবু গীটারে তাঁর আঙ্গুল ছোঁয়ানো, সুরের জাদুতে, সেই ১৯৪০ সালে উমা বসু-র গান 'রূপে বর্ণে, ছন্দে' কিরকম আনন্দের পাখা মেলে দিয়েছিল তা তো সেই রেকর্ডেই ধরা আছে। কেউ কি জানে যে, শচীন দেববর্মনের সেই বিখ্যাত গান—'ওরে সুজন নাইয়া'র সঙ্গে, জ্ঞান ঘোষ গীটার আর অনুপম ঘটক অর্গানে সঙ্গত করেছিলেন ?

উনি নিজে কোনদিনই বেশি গাইতেন না, প্রকাশ্য আসরে তো নয়ই। রেডিওতে অবশ্য মাঝে মধ্যে গেয়েছেন সঙ্গীতাঞ্জলি বা রম্যগীতির প্রোগ্রামে। এসব গানের কিছু কিছু স্টুডিও রেকর্ডও ছিল কিন্তু সেসব আর শোনা যায় না, সব গেল কোথায় ? তাঁর গাওয়া কিছু খেয়াল গান/ঠুংরির টুকরো, জ্ঞানদা মারা যাবার পর তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য অজয় চক্রবর্তী, কিছুকাল আগে, শ্রুতিনন্দন থেকে, ক্যাসেটে বের করেছেন—এটা খুবই দরকার ছিল।

কিন্তু বাংলা কাব্যসঙ্গীতে বা রাগপ্রধান গানে তাঁর যে সব সৃষ্টি ছিল সেসব তো আর পাওয়া যাচ্ছে না। বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে। তাঁর নিজের গাওয়া এরকম একটা গান ৪০ দশকের হবে, এখনো কানে লেগে রয়েছে। হয়ত কারুর মনে পড়তেও পারে—'কেন তবে গান গাহিলে'। ১৯৪৩-এ বম্বেতে তোলা নীতিন বসুর 'বিচার' ছবিতে জ্ঞানপ্রকাশের সুরে কয়েকটা গান একটা নতুন আস্বাদ এনে দিয়েছিল। দোলা দিয়ে মন ছুঁয়ে যেত। পরেও তাঁর সুরে যদু ভট্ট, আশা প্রভৃতি অনেক ছবির গান, অন্তত মৌলিকত্বের জন্যে সংরক্ষণের দরকার ছিল। কিন্তু

সত্যিই, আমরা জ্ঞানপ্রকাশের কাজের যথাযোগ্য মর্যাদা দিই নি। আজ মনে হয় সাঙ্গীতিক মুগ্ধবোধের ব্যাকরণটা আমাদেরই ঠিকমত পড়া হয়ে ওঠেনি।

বিমান—আরে তাই তো বলছি এখন সব ক্যারেটে সোনার কারবার। গিনি সোনার কারিকুরি। যাঁরা ওই পঞ্চাশ-ষাটের দশককে স্বর্ণযুগ বলে চেঁচায় তারা আর যাই হোক, গিনি সোনাতে ক্যারেটের পরিমাণ অনুধাবন করতে বোধহয় শেখেনি।

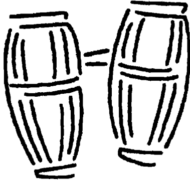
তবে আমি যদি বলি, এসব নেহাৎই অলীক স্বর্ণযুগের ছলনা আর তজ্জনিত প্রমাদ তাহলে!

বিমান—যাক গে সে কথা। আসল কথাটা হল যে জ্ঞানপ্রকাশ সুর দিতেন, গান তৈরি করতেন, কিন্তু নিজে সেভাবে শ্রোতাদের সামনে বসে গান গাইতেন না। সেই সূত্র ধরে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি—আমি দেখেছি, সব বড় ট্রেনাররাই যখন সুর করছেন, গান বাঁধছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেরা গান গাওয়া থেকে সরে এসেছেন। একমাত্র পঙ্কজ মল্লিক আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই দুজনই সঙ্গীত পরিচালনা আর গায়ক শিল্পী হিসেবে গান গাওয়া—দুটোই বজায় রেখেছিলেন। আর সুধীরলাল চক্রবর্তী অবশ্য এরকম কিছু কিছু করেছেন। অন্য সুর-শিল্পীদের এরকম করতে, বড় একটা দেখিনি। এঁদের মধ্যে যাঁরা সুর করেছেন তাঁরা সুরই করেছেন। যাঁরা গান গেয়েছেন তাঁরা শুধু গেয়েই গেছেন। এক আধজন হয়ত ব্যতিক্রম থাকতে পারেন—তবে সাধারণভাবে যা দেখেছি, সেইটা বললাম।

আমার যেন কি রকম মনে হত যে হয়ত ভাল সুরকার কিন্তু ভাল কণ্ঠশিল্পী নন।

বিমান—না না, এঁরা অনেকেই ভীষণ ভাল গাইয়েও ছিলেন। যেমন ধরো সুবল দাশগুপ্ত—এমন গাইয়ে যে ওস্তাদরাও ভয় পেত। এত দুর্দান্ত গাইতেন যে ভীষ্মদেব, বড়ে গোলাম আলি খাঁ, রাইচাঁদ বড়ালদের মত শ্রোতা একটানা বসে শুনতেন। সুবল দাশগুপ্ত তখন গাইছেন খেয়াল, ঠুংরি এইসব। এ বড় চাট্টিখানি কথা নয় —সুবল দাশগুপ্তর সে সব গানের দু একটা রেকর্ড যদি সংগ্রহ করা যায় তো শুনে বুঝবে কি স্তরের গান, সেসব ছিল। তখন ব্রডকাস্ট বলে একটা নতুন কোম্পানীতে সুবল দাশগুপ্তর রাগপ্রধান গানের কয়েকটা রেকর্ড ছিল, এখন আর পাওয়া যায় না। টুইন কোম্পানীতে কমল দাশগুপ্ত আর সুবল দাশগুপ্তর, দ্বৈত কণ্ঠের খেয়াল গানের একটা রেকর্ড ছিল এক পিঠে মালকোষ আর অন্য পিঠে বাগেশ্রী। আমি অনেক চেষ্টা করেও আর জোগাড় করতে পারিনি। তুমিও তো খোঁজাখুঁজি করো, পুরনো দিনের রেকর্ড সংগ্রহ করো। দেখ না, এ রেকর্ডটা জোগাড় করতে পারো কি না।

সেটা শুনতে পেলে, বুঝবে তখনকার গান কেমন ছিল। আমরা কোন্ যুগকে ফেলে এসেছি। কোন্ দিগন্তের রঙ, সত্যিই আমাদের নজরের আড়ালে হারিয়ে গেছে।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিমান—দেখ, হারিয়ে যাওয়ার কথা বলতে গিয়ে আমার এখন আর একজনের কথা বিশেষ ভাবে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি বাংলা বিনোদন জগতের এক এবং অদ্বিতীয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—এককালে বাঙালি পরিবারের অন্দরমহলেও যাঁর নাম, নিত্যদিন শোনা যেত।

অথচ এখন, অবাক হয়ে দেখি যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে আমরা কিরকম একটা জায়গায় আটকে রেখে দিয়েছি—মহালয়া। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর নাম বললেই একালে লোকে বলে ওই মহালয়া তো ? আজকাল তো পঙ্কজ মল্লিকের নাম বললেও ছেলে-মেয়েরা বলে মহালয়ার পঙ্কজ মল্লিক তো। আরে কলকাতা রেডিওর মহালয়া (মহিষাসুরমর্দিনী) তে তিন বন্ধু বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক আর বীরেন ভদ্র এই তিনজন মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন ঠিক কথা, সাঙ্গীতিক ইতিহাস হয়ে বাঙালির রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, সেও ঠিক আছে। কিন্তু সেটাই তো তাঁদের একমাত্র পরিচয় নয়, একমাত্র ক্রিয়েশন নয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তো একাধারে ছিলেন বেতারের প্রাণ, বেতার অভিনেতা, নাট্যপরিচালক, নাট্যকার, সাহিত্যিক হিসেবেও তার কি তৎপরতা। শৈলজানন্দ, প্রেমেন মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায় এঁদের সঙ্গে মিলে এঁরা বেতারে একটা বারোয়ারি উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে রচনা করেছিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের লেখা নাটক, 'ব্ল্যাক আউট', 'মেস নং ৪৯' বেতারে বা মঞ্চে দুজায়গাতেই দারুণ সফল। রেকর্ডের অন্তত তিরিশটি পালা নাটকে তাঁর অভিনয় ধরা আছে। ছোটদের পুজো বার্ষিকীতে মজাদার লেখা ছাড়া, যুগান্তরেও প্রায়ই তিনি লিখতেন। তবে সব থেকে পপুলার হয়েছিল শ্রীবিরূপাক্ষ ছদ্মনামে বেতারের কৌতুক কথা এবং গ্রন্থাকারে তাঁর লেখা, 'ঝঞ্ঝাট', 'বিরূপাক্ষের বিষমবিপদ', 'অযাচিত উপদেশ', 'বিরূপাক্ষের নিদারুণ অভিজ্ঞতা', ইত্যাদি ইত্যাদি। অনবদ্য হাস্যরসের খোরাক। অন্যদিকে বিষ্ণুশর্মা নামে বেতারের মহিলা মহল পরিচালনা করেও খুব জমিয়ে দিয়েছিলেন। আবার দেখ, গীতিকার হিসাবে তাঁর লেখা গানও কম ছিল না। বীরেনদার লেখা একটা গানের একটুখানি আমি বলি, দেখবে কি মরমী কথা 'শান্তির ভিখারীরা এসো, এসো বনের নিবিড় ছায়/তৃপ্তি সলিলে অবগাহি, জুড়াও তাপিত কায়/ জীবনের যতো ব্যথা, লভিবে চির নীরবতা/দুঃখ দৈন্য ব্যাকুলতা, সব তাপ যে


বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

হারায়'। তাছাড়া বীরেনদার গলায় গানও আমি শুনেছি। রেডিওতেও তিনি গান গেয়েছেন। এমনকি তাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতে শুনেছি। বিশেষ করে মনে পড়ে আর একদিনের গান—'যদি তোমার দেখা না পাই কভু' ভাবতে পারো ? বীরেনদা সেকালের উচ্চশিক্ষিত গ্রাজুয়েট মানুষ—অথচ সাংস্কৃতিক জগতের টানে, সব ছেড়েছুড়ে বেতারে যোগ দিয়েছিলেন। এবং গোড়া থেকেই বেতার নাটকের সব দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয়েছিল। সে সময় বেতার নাটকের কোন ধারণাই কারুর ছিল না। বীরেনদা নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বেতার নাটকের একেবারে নিজস্ব একটা ধাবা তৈরি করে নিয়েছিলেন যা অনুসরণ করে পরবর্তীকালে কতো বেতার নাটকের সার্থক প্রযোজনা সম্ভব হয়েছে। যেমন, বীরেনদা রেডিওতে একটা নাটক করাচ্ছেন। সংলাপ বলছেন, 'ঘরটা অন্ধকার কেন ? আলো কোথায়, এখানে মনে হচ্ছে একটা প্রদীপ রয়েছে। দাঁড়াও, প্রদীপটা জ্বালি'। এই বলার সঙ্গে সঙ্গে ফস্ করে প্রদীপ জ্বালার মত একটা আওয়াজ করে কেবল শ্রুতির ভেতর দিয়ে, শ্রোতাদের উপলব্ধিতে, ছবিটা মেলে ধরার একটা পদ্ধতি তৈরি করে দেখিয়ে দিলেন। এইরকম উদ্ভাবনী শক্তিতে বীরেনদা একজন স্রষ্টা। এই স্রষ্টা বীরেনদার যেন তুলনা হয় না।

নাটকের ক্ষেত্রে এককালে, এক একটা শুক্রবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় কলকাতার পেশাদারী মঞ্চ থেকে আড়াই ঘণ্টার নাটক সরাসরি রীলে করে, বেতারে প্রচারের অভিনব ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই চল্লিশের দশকে দূর দূরান্তরের শ্রোতা বাড়িতে বসে, সপরিবারে কলকাতার বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনীত নাটক শুনতে পেতেন। আবার মাঝে মাঝে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, দুর্গাদাসের মত নট শিল্পীদের বেতার স্টেশনে এনে, নাটকে অভিনয় করাতেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। অমনি তাৎক্ষণিক তৎপরতায় উনি কবির শেষযাত্রার ধারাভাষ্য দিয়ে আগাগোড়া রীলে করে গেছেন। শবযাত্রার শুরু থেকে শেষমেষ দাহকার্য পর্যন্ত এমন অবলীলায় বর্ণনা করে গেছেন যে সবাই রেডিও মারফৎ সব যেন চোখের সামনে দেখতে পেয়েছেন, শোকাশ্রুতে ভেসে গেছেন। তারপর ধরো, কলকাতার ময়দান থেকে বাংলায় ফুটবল খেলার ধারাবিবরণীও বীরেনদাই প্রথম চালু করেছিলেন।

এখন এসব জলভাত কিন্তু তখন ? সব কিছু ভেবে চিন্তে, মাথা খাটিয়ে বের করতে হয়েছে। নতুন কিছু প্রবর্তন করতে হয়েছে। আবার দেখ, দুর্গা পুজোর বিসর্জনের রীলে, সেও বীরেনদার নতুন কিছু করার ফসল। নৌকোয় বসে এঘাট-ওঘাট, ঘুরে ঘুরে প্রতিমা নিরঞ্জনের ছবি, ছবির মত বড় করে মুখের ভাষায় লোককে শোনানো এ কি কম কথা! তাঁর মাথায় যে এরকম কতো কি সব সময় খেলত, তার কথা বলে শেষ করা যাবে না।

তখন অবিভক্ত বাংলার গভর্নর ছিলেন লর্ড ব্রেবোর্ন। তিনি মারা যেতেও তাঁর শেষযাত্রার ধারাবিবরণী রেডিওতে প্রচার হয়েছিল। সেখানেও সেই বীরেনদা।

জ্ঞানদার বহুমুখী প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে বলেছি তিনি একটা দিকের দিকপাল সেইরকম বীরেনদার কথা বলতে গেলেও বলতে হয় বীরেনদাও আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি জগতের একটা গর্ব।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। দেশজুড়ে মানুষের মনে কি উত্তেজনা কি উচ্ছ্বাস। দিল্লিতে মাঝরাতে গণ পরিষদে বা রাত পোহালে লাল কেল্লায় যা যা হয়েছিল সে কথায় যাচ্ছি না। কিন্তু কলকাতায় কি হল তা তো ভুললে চলবে না।

সেইদিনই বাঙালির বাংলাদেশ ভাগ হল আর সেই কোপে বাঙালির বিরাট অংশকে উদ্বাস্তু হতে হল। সেদিনই নতুন জাতীয় পতাকা আকাশে তোলা হল, তাতে চরকার জায়গায় এল অশোকচক্র। মাঝ রাতে নতুন পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানের ধারাবিবরণী দিয়েই, বেতারের টিম নিয়ে কলকাতার পথে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন সারারাত ধরে ট্রাম বাসে কাউকে পয়সা দিতে হয়নি। সারারাত কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে, স্বাধীনতার প্রথম কয়েকঘণ্টার ঐতিহাসিক মুহূর্তকে বেতারের ধারাবিবরণী ও ভাষ্য মারফৎ বীরেনদা লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে, অবিস্মরণীয় করে রাখলেন! কি অদম্য উৎসাহ ক্লান্তিহীন কর্তব্যের নিষ্ঠা। বীরেনদার সঙ্গে ওই বেতারের দলে সেদিন তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, যতদূর মনে পড়ছে নীলিমা সান্ন্যাল, ইন্দিরাদি আর জয়ন্ত চৌধুরি। তাঁরাও ওই স্মরণীয় অধ্যায়ে সামিল হয়ে স্মরণীয় হয়ে গিয়েছেন।

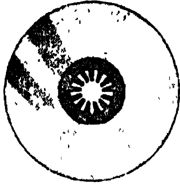
তাই বলছি সাহিত্য, ছায়াচিত্র, নাটক, মঞ্চ, রেকর্ড সবকিছুতেই বীরেনদার তুলনা নেই। আর বাঙালির জীবন থেকে যে রস শুকিয়ে যেতে বসেছে সেই হাস্যরসের সৃষ্টিতেও বীরেনদা অপ্রতিরোধ্য।

একজায়গায় তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠান করতে গেছি। মজা করে বললুম আপনি যে জগতের সঙ্গে জড়িত, সেই অভিনয়, নাটক, সিনেমার লোকজনের সকলেরই তো কিছু না কিছু নেশা-টেশা থাকেই। তা আপনার মুখে তো কোনদিন সিগারেটও দেখিনি, আপনি কোনদিনই কোনও নেশা করেন নি ?

জবাবে মুখস্ত সংলাপের মত বীরেনদা গঁড় গড় করে বললেন না, নেশা আমি কিছু করি নি। আর যাও বা করেছি, তা মুখ দিয়ে নয়, নাক দিয়ে। সে নেশাটা যে নস্যির নেশা তা সহাস্যে রঙ্গ কথাতেই বুঝিয়ে দিলেন।

এই হলেন বেতার বিনোদনের অদ্বিতীয় প্রবাদপুরুষ বীরেনদা। তবে, আমরাও এই মানুষের যথাযোগ্য মর্যাদা না-দিতে একটুও দ্বিধা করিনি। এমন বীরেনদাকে নাকি একদিন কোনরকম আঁচ না দিয়েই, তাঁর হাতে গড়া কলকাতা রেডিও থেকে তাঁকে পত্রপাঠ অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটা আমি পরে শুনে বড় কষ্ট পেয়েছিলুম।

ঠিক যেমন পঙ্কজ মল্লিকের ভাগ্যে ঘটেছিল ? সেই ট্র্যাডিশন, দেখছি, বেতার জগতে সমানে চলিতেছে!



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সব্যসাচী যে মানুষটির হাতে গড়া কলকাতা রেডিওর সাহায্য না পেলে বাংলা গানের প্রসার বা শিল্পীদের প্রচার কতোটা কি সম্ভব হত, তা যখন বলা শক্ত তখন সেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কথা, বাংলা গানের পরিধিতে, প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করি। তবে সেই প্রসঙ্গ সূত্রে, এবার কার কথা বলবে বলে, ভাবছ ?

বিমান—হ্যাঁ গানের জগতে শিল্পী কুশীলবদের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটাও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই কথা ভেবে আমি এবার তাই কিছু সংস্থার কথা বলছি।

প্রথমেই যেমন ধরো হিন্দুস্থান কোম্পানী। আর তার মাথা চণ্ডী সাহা। বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এঁর যে কী অবদান সেটা এক কথায় বলা যাবে না। তার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ১৯৩২ সালটা বাংলা গানের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই ১৯৩২ সালে দু-দুটো রেকর্ড কোম্পানী আমাদের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটা হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস। আর অন্যটা মেগাফোন। তখন রেকর্ড কোম্পানী করতে হলে, সকলকেই এইচ এম ভির তাঁবে থাকতে হত। কারণ আসল জিনিস, রেকর্ড ছেপে বের করার যন্ত্র, রেকর্ড প্রিন্টিং মেসিন এদেশে ওঁদের কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে ছিল না। তাই এইচ এম ভিকে পয়সা দিয়ে অন্যদের রেকর্ড প্রিন্ট করাতে হত। ফলে তদ্বির, তদারক, খোশামোদ ছাড়া টাকাপয়সা গুণে, এইচ এম ভির দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায় থাকতে হত। এই অবস্থায় যখন চণ্ডী সাহা হিন্দুস্থান কোম্পানী খুললেন তখন তিনি কি স্বপ্ন নিয়ে কাজ শুরু করলেন, জানো ?

তিনি তাঁর এক নম্বর রেকর্ড এইচ-১ বের করলেন একেবারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। হ্যাঁ এক পিঠে আবৃত্তি, শিশুর—'এখনো তো বড় হইনি আমি' আর উল্টো পিঠে সেই অবিস্মরণীয় গান 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই'........

বিমান—এইরকম দু নম্বর রেকর্ড বেরুল কবি অতুলপ্রসাদ সেনের স্বকণ্ঠের দুটি গান, তিন নম্বর হল রেণুকা দাশগুপ্তার কণ্ঠে সেই চিরকালের সুপারহিট 'যদি গোকুলচন্দ্র'—

হ্যাঁ, জ্ঞানদাসের 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল' আর উল্টো পিঠে অতুলপ্রসাদের সেই বিখ্যাত গান 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ'।

বিমান—তারপর এইভাবে পরপর বেরুবার পর ন' নম্বরে আবার সেই চিরকালের হিট গান, রবীন্দ্রনাথের 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে। সব দিক থেকে ঐতিহাসিক এক রেকর্ড।

চণ্ডীবাবু হঠাৎ গানের জগতে এলেন কি ভাবে ? আগে উনি কোন লাইনে ছিলেন ?

বিমান—উনি অন্যরকম ব্যবসা করতেন। উনি আসলে বাঙালি ছিলেন না। শুনেছি উনি পাঞ্জাব কি উত্তর প্রদেশের লোক ছিলেন। ওঁদের আসল উপাধি ছিল শ', যেমন বলে না, শ-ওয়ালেশ সেইরকম শ। তার মানে উনি মূলত বাঙালি সাহা নন। এদেশে থাকতে থাকতে এবং কাজ করতে করতে প্রতিষ্ঠা পাবার পর উনি পরে শ'-কে সাহা করে নিয়েছিলেন। চণ্ডীচরণ সাহা তার থেকে সি. সি. সাহা এইরকম আর কি। ওঁর বাবাও ব্যবসাতে যথেষ্ট পয়সা করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে বড় ছেলে হরেকৃষ্ণ আরো বেশি পয়সা করেছিলেন। তুলনায় চণ্ডীবাবুর পয়সা অপেক্ষাকৃত কমই ছিল। কিন্তু হরেকৃষ্ণ বাবু বিলাস ব্যসনে বা কাপ্তেনীতে সব পয়সা শেষ করে ফেলেছিলেন। চণ্ডীবাবু তাই খুব সাবধানে যা টাকাপয়সা ছিল তাই দিয়ে ব্যবসাতে নেমে পড়েছিলেন—যে জিনিসে খুব একটা দেশীয় প্রতিযোগিতা ছিল না। প্রথমে সেই রেকর্ড. গ্রামোফোন এই সবের একটা দোকান খুলে বসলেন। আর তাই থেকে গানের লাইনে আরো বড় করে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে, পরে উনি রেকর্ড কোম্পানী গড়ে, রীতিমত চমক সৃষ্টি করলেন।

আর একটু একটু করে সেখানে উনি জড়ো করলেন দুর্দান্ত সব গাইয়েদের—কে. এল সায়গল, কুমার শচীন দেব বর্মন, পাহাড়ী সান্ন্যাল থেকে আরম্ভ করে সাহানা দেবী, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল পুত্র দিলীপকুমার রায়দের মত শিল্পীদের। এঁদের সকলকে নিয়ে এসে এইচ এম ভির সঙ্গে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করলেন। একটা বিশেষ কথা এখানে জানানো দরকার যে, এই ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উসকে দেবার জন্যে, চণ্ডীবাবু একটা স্বদেশী চেতনা তৈরি করে ব্যবসার কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা দেখিয়েছিলেন। বড় বড় শিল্পীদের কাছে আবেদন জানাতেন যে তুমি বাঙালি হয়ে কেন বিদেশী সাহেব কোম্পানীদের অধীনে রেকর্ড করবে ? এস, নিজেদের রেকর্ড কোম্পানী স্বদেশী হিন্দুস্থান কোম্পানীতে যোগ দাও। চণ্ডীবাবুর এই দেশাত্মবোধ অনেককেই আকৃষ্ট করত। তাঁর এই স্বদেশপ্রেম স্বদেশী চেতনাকে সেযুগে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করত সে কথা এখন আর লোকে জানে না। তাই সেই অতুলপ্রসাদের বিখ্যাত সব স্বদেশী গান প্রথম কোরাসে রেকর্ড করে হিন্দুস্থান কোম্পানী যেভাবে তা জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার স্বীকৃতি রাখা দরকার। শুধু অতুলপ্রসাদ কেন, এরকম অন্যদের লেখা গানও কত প্রচারিত হয়েছিল। হিন্দুস্থান রেকর্ডে অতুলপ্রসাদের 'উঠ গো ভারত লক্ষ্মী' বা 'হও ধরমেতে ধীর, হও

করমেতে বীর' সে যুগে বাঙালি সমাজে ছেলেবুড়ো সকলকে স্বদেশী চেতনায় যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তার জন্যে চণ্ডীবাবুর উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিতেই হবে।

আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসার এবং প্রচারে যে রকম প্রচণ্ড প্রচেষ্টার কাজ চালিয়ে গেছেন আমাদের চণ্ডী সাহা মশাই, তা আজকের দিনে বলে বোঝানো যাবে না। সে যুগে বিশেষভাবে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্যে তিনিই, বোধহয় প্রথম একজন বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক গায়ককে নিয়োগ করেছিলেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—সবাই তাঁকে মোটাদা বলে ডাকত। তিনি এত মোটা ছিলেন যে তাঁর জন্যে হিন্দুস্থান কোম্পানীতে চণ্ডীদা, একটা আলাদা বিশাল আকারের চেয়ার তৈরি করিয়েছিলেন। আজ বলি যে, সায়গল সায়েব যা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন তার বেশিরভাগ কিন্তু শিখিয়েছেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। পঙ্কজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল অনেক ছবিতে, সায়গলের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। কিন্তু একেবারে নিয়ম করে এবং নিয়মিত ভাবে অনেকদিন ধরে, সায়গল সায়েব রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন এবং চর্চা করেছেন এই মোটাদার কাছে। আসলে তিনি যে কটা রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেছিলেন শুধুমাত্র সে কটা গানই তাঁর শেখা পুঁজি নয়। বেশ খেটেখুটে সায়গল সায়েব রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্টাইল বা ভঙ্গি যা কিছু আয়ত্ত করেছিলেন তা বলতে গেলে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শেখা। সায়গলের সব গানই হিন্দুস্থান কোম্পানী থেকে বেরুত। চণ্ডীবাবু সব আর্টিস্টকে বলতেন তোমরা রেগুলার হরিপদবাবুর কাছে তালিম নেবে। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদী বা রজনীকান্তর গান।

নতুন প্রতিভাও খুঁজে খুঁজে বের করতেন যেমন ধরো, সুধীন চট্টোপাধ্যায়। সেকালে বেতারের মারফৎ তাঁর সুনাম ছড়িয়েছিল, কিন্তু রেকর্ডে চণ্ডীবাবুই তাঁকে সুযোগ দিয়েছিলেন। তারপর বলি হেমন্তদার কথা। গায়ক নয়, সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে চণ্ডীবাবুই প্রথম আমাদের পরিচয় করিয়েছেন—যেমন সুধীন চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গান, 'তুমি কি দেখেছ প্রিয় কৃষ্ণচূড়ার ফুলে বনানী গিয়েছে ছেয়ে' আবার হেমন্ত-জায়া বেলা মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে চণ্ডীদাই প্রথম রেকর্ড করিয়েছিলেন। শুধু পাহাড়ী সান্ন্যাল, শচীনদেব বর্মন বা সায়গল নন, তখনকার দিনে যা ভাবা যেত না চণ্ডীদা সেইরকম এক কাণ্ড করে ফেললেন। তিনি ফৈয়াজ খাঁর মত এক বিশাল ওস্তাদকে নিয়ে এসে, হিন্দুস্থানে রেকর্ড পর্যন্ত করিয়েছিলেন। এতো আজকের দিনেও ভাবা যায় না।

আবার দেখ, একই পরিবারের নাজির হোসেন, আলি হোসেন এঁরা সানাই বাজাতেন। চণ্ডীদা এদের ধরে এনে সানাই-এর এমন রেকর্ড করিয়ে ফেললেন যে রাতারাতি নামডাক হয়ে গেল। চণ্ডীদা গোপাল লাহিড়ীকে দিয়ে ক্ল্যারিওনেট বাজনার রেকর্ড করিয়েছিলেন। এইরকম দু'চারটে উদাহরণ থেকেই বুঝবে যে বাংলা গানের জগতে চণ্ডী সাহার কি প্রচুর অবদান ছিল। এই যে অনুপম ঘটক! এ কিন্তু চণ্ডী সাহার আবিষ্কার। তারপর সজনীকান্ত মতিলাল, নির্মলচন্দ্র বড়াল।

সজনী মতিলালের এইচ-১৬ রেকর্ডে, 'ফুলেরি বাসরে তব' ও 'তব চরণ তলে' বা এইচ ৪০ রেকর্ডে নির্মল বড়ালের 'তুমিই আমার গান' আর 'মন না রাঙায়ে কি ভুল করিয়ে কাপড় রাঙালে যোগী' এতো সেকালে একেবারে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছিল...


অসিতবরণ (কালোদা)

বিমান—ঠিকই তো। এবার চণ্ডীদা হিন্দুস্থানের ট্রেনার করে নিয়ে এলেন রাইচাঁদ বড়ালকে। আবার অল্প কিছুদিন বাদে, এই রাইচাঁদকেই মেগাফোনের ট্রেনার করে নিয়ে গেলেন জিতেন ঘোষ, মেগাফোনের মালিক, সর্বেসর্বা। তখন মেগাফোনের অফিস ছিল কলেজ স্ট্রিট মোড়ের কাছে, হ্যারিসন রোডের ওপর আর হিন্দুস্থানের অফিস ছিল অক্রূর দত্ত লেনে। দুপুর বেলায় দুই কোম্পানীর অফিসেই সব আর্টিস্টদের দারুণ আড্ডা জমত। তাই আর্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে এই দুটো জায়গায় গেলেই যে পাওয়া যাবে তা সবাই জানত। সে যুগে আর্টিস্টদের মধ্যেও বেশ বন্ধুত্ব ছিল। তবে তারা দু কোম্পানীর মধ্যে ভাগাভাগি করে, যে যার কাজ করত। যে হিন্দুস্থানে ছিল সে হিন্দুস্থানেই রেকর্ড করত। যে মেগাফোনের লোক সে মেগাফোনেই কাজ করত। যেমন ভবানী দাস—তিনি বরাবর মেগাফোনের। সুধীরলাল চক্রবর্তী এইরকম হিন্দুস্থানের। পঙ্কজদা, শচীনদেব, সায়গলও গোড়া থেকে হিন্দুস্থানের, তবে পরে পঙ্কজদা, শচীনদেব বর্মন এইচ এম ভির সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলি। আমি তিনজন আর্টিস্টকে দেখেছি যাঁরা একই সঙ্গে দুটো করে কোম্পানীতে কাজ করেছেন।

কমলা (ঝরিয়া) এইচ এম ভি আর মেগাফোনে, পঙ্কজ মল্লিক হিন্দুস্থান আর কলম্বিয়াতে আর জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী এইচ এম ভি আর মেগাফোনে। তখনকার দিনে সবাইকার সঙ্গে লাইফ কনট্রাক্ট করা হত। বড় আর্টিস্টদের বেলায় এইটাই রেওয়াজ ছিল।

এমনি এইচ এম ভিতে অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় (কালোদা) তবলা বাজাতেন, গানের সঙ্গে তবলা বাজাবার চাকরি।

একদিন কমল দাশগুপ্ত কালোদার গান শুনে ফেলেছিলেন। অসিতবরণকে কমলদা বললেন আরে কালো তুই তো দেখছি বেশ ভাল গান করিস। চল্ তোকে দিয়ে গান রেকর্ড করাই। কমল দাশগুপ্তর কথা, অতএব গান রেকর্ড হল। আর এমন বরাত যে প্রথম গানেই হিট। অসিতবরণের প্রথম বাংলা বেসিক রেকর্ডের সেই গানটি ছিল, 'আমার প্রথম গান তোমারে শোনাব বলে, আমি জেগে আছি সারা নিশি, তুমি এখনি যেও না চলে।' অথচ আশ্চর্য যে—রেকর্ড, রেডিও মারফৎ সুগায়ক হিসেবে নামটাম হবার পরেও কালোদা গানই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর

যখন রেডিওতে চাকরি করছেন তখন সিনেমার নায়ক হয়ে প্রতিশ্রুতি ছবিতে (১৯৪১) আবার গান গাইলেন এবং সেই ছবির গানগুলো আবার বাজার মাৎ করল। এই সময় চণ্ডী সাহা কালোদাকে হিন্দুস্থানে নিয়ে এলেন এবং আবার তাঁকে দিয়ে হিন্দুস্থানে রেকর্ড করাতে শুরু করলেন। এরপর অসিতবরণ বহু হিন্দি বাংলা বহু ছবিতে গান গেয়েছেন। তার মধ্যে অনেক গানই খুব বিখ্যাত হয়েছিল —যেমন 'রাজার মেয়ে কাহার লাগি গাঁথছ মনিহার', 'রজনীতে তুমি আসিবে', 'হাম কোচয়ান হ্যয়', 'আমার ভুবনে এল বসন্ত' এছাড়া সঞ্চালী বলে একটা ছবি হয়েছিল তাতেও কালোদার অনেক গান ছিল। আরো মজা আছে। এ ছবির গানগুলো লিখেছিল প্রণব রায় আর সুর করেছিলেন দুর্গা সেন। আরো উল্লেখ করা, দরকার যে এ ছবিতে অসিতবরণের গান ছাড়াও সাবিত্রী ঘোষের গানও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। হিন্দুস্থানে যখন অসিতবরণকে নিয়ে আসা হল, সেই সময়ে মেগাফোন নিয়ে এল রবীন মজুমদারকে যদিও শাপমুক্তি, গরমিল এইসব ছবির কল্যাণে রবীন মজুমদার, অসিতবরণের আগেই, ছায়াছবির গায়ক-নায়ক হিসেবে নাম করেছিলেন।

আগেই বলেছি যে তখন দুটো রেকর্ডের প্রতিষ্ঠান একই সময়ে চলছে—দুটো প্রতিষ্ঠানই বাঙালির। একটা হিন্দুস্থানের কথা বলেছি। অন্যটা হল মেগাফোন—যেটা জিতেন ঘোষ গড়ে তুলেছিলেন।

জিতেন ঘোষের ছিল একটা সাইকেলের দোকান আর ছিল টুইন কোম্পানীর রেকর্ডের একমাত্র সোল ডিস্ট্রিবিউটরশীপ। এইচ এম ভি থেকে টুইন কোম্পানীর যা রেকর্ড বেরোত, শুনলে অবাক হবে যে তার দাম ছিল চোদ্দ আনা। যাকে বলে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা আর কি! এর আসল মানেটা যে কী, তা একটু পরেই বলছি। পরে বাজারী চাহিদা অনুসারে কিছুটা বাড়িয়ে এক টাকা দু আনা রেকর্ডের দাম করা হয়েছিল। টুইন ছিল আসলে এইচ এম ভি কোম্পানীরই অনুজ প্রতিষ্ঠান যাকে বলে সিস্টার কনসার্ন।

এইখানে আমি রেকর্ড সংসারের এমন কিছু পুরোন ইতিহাস বলে রাখি যা, আমি মরে গেলে আর সেসব বলে দেবার মতো কাউকে পাবে না।

ব্যাপারটা কি রকম জানো ?

রেকর্ড সংসারের সেই আদিযুগে সাহেব কোম্পানী হিজমাস্টার্স ভয়েসের দু'দশটা নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে চলত বাইশটা লেবেল। তার মধ্যে ভারতেও অনেকগুলো চালু করেছিল, যেমন লেবেল টুইনস, লেবেল ওডিয়ন, লেবেল রিগ্যাল, লেবেল এতোল ইত্যাদি। প্রশাসনিক এবং ব্যবসায়িক কারণে এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন তকমায়, ওদের একচেটে বাণিজ্যের জাল প্রসারিত হয়েছিল। পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মত, এও যেন আর একরকম সাম্রাজ্যের বিস্তার।

টুইন রেকর্ড তৈরি হত, কম খরচে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মালমশলা দিয়ে—যাতে বাজারে ছাড়ার সময় নতুন টুইন রেকর্ড অনেক সস্তায় বিক্রী করা যেত। আজকালকার

ভাষায় এটা ছিল ওদের নিছক একটা বিপনন কৌশল। এইচ এম ভির যত রেকর্ড অবিক্রীত পড়ে থাকত এবং যেগুলো আর বাজারে কাটবে না বলে বোঝা যেত সেগুলো ডিলারদের কাছ থেকে এইচ এম ভি ফেরৎ নিত। তারপর সেই রেকর্ডের গালা ভেঙে গুঁড়িয়ে, তারপর সেই গালা গালিয়ে তাই দিয়ে এখানে টুইন রেকর্ড তৈরি হত। তবে এর একটা অন্য ভাল দিকও ছিল। এই চোদ্দআনা, এক টাকা দু আনায় বিক্রী করে, দু' চারটি আর্টিস্টকে তো প্রোমোট করাও যেত। তখন কৃষ্ণচন্দ্র দে, আব্বাসউদ্দিন আহমেদ এঁদের গানের এইচ এম ভি রেকর্ড সাধারণত আড়াই টাকায় বিক্রী হত। খুব হিট হয় গেলে দাম হয়ে যেত তিন টাকা।

বাজারে তখন আড়াই/তিন টাকায় এক মণ মোটা মাঝারি চাল পাওয়া যেত। তা, গরীব দেশে, লোকে আগে একমণ চাল কিনবে, না, একখানা রেকর্ড কিনবে ? যখন একটা হিট এইচ এম ভি রেকর্ডের কাটতি কমে আসত তখন কোম্পানী সেই গানটা টুইন রেকর্ডে ছেপে বাজারে ওই চোদ্দ আনা একটাকা দু আনাতে ছাড়ত। ধরো না, কৃষ্ণচন্দ্র দের ওই বিখ্যাত, 'বধূঁ চরণ ধরে বারণ' কর গানটা যেই না কর্তারা দেখলে, যে রেকর্ডের কাটতিতে ভাঁটা পড়ছে, অমনি তখন ওরা গানটা আবার টুইনে চালান করে বাজারে ছেড়ে দিলে চৌদ্দ আনা দামে। আগে, ইচ্ছে হলেও যারা তিনটাকায় কিনতে পারেনি তারা, এই চৌদ্দ আনার হাত ছানিতে নতুন উৎসাহে কিনতে শুরু করল। সাহেবদের কি ব্যবসা বুদ্ধি তা একবার দেখ। তেমনি আব্বাসউদ্দিনের গান গ্রামের দিকে প্রচণ্ড বিক্রী বলে, টুইনে ছাপো। তাছাড়া একটা নতুন আর্টিস্টকে প্রোমোট করতে গেলে, আর্থিক ঝুঁকি নেবার কি দরকার ? টুইনের লেবেলে, সস্তার দামে, ঘরে ঘরে আগে ঢুকিয়ে দাও নামটা।

তারপর না হয় তাকে বেশি দামের এইচ এম ভি লেবেলে তোলা যাবে। পরিকল্পনাটা এইরকম। কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্তরও প্রথম রেকর্ড টুইনে। ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালার মত শিল্পীদের অনেক গানও প্রথমে এইচ এম ভি রেকর্ডে বেরিয়েছিল। পরে ওই একই উদ্দেশ্যে, টুইন থেকেও বেরিয়েছিল। যে কথা হচ্ছিল যে এই টুইন রেকর্ডের সোল ডিস্ট্রিবিউটার ছিলেন ওই জিতেন ঘোষ, জে. এন. ঘোষ। তিনি এইচ এম ভিরও এজেন্ট ছিলেন। অতএব জিতেন ঘোষ এইচ এম ভির রেকর্ড, টুইন রেকর্ড সবই ডিলারদের মারফৎ গাঁয়ে গঞ্জে পাঠাতেন। পূব-বাংলায় তখন বিশাল বাজার আর রেকর্ডের গানই সেখানকার পারিবারিক বিনোদনের প্রধান সামগ্রী। তাই বিক্রীবাটাও সেই অনুপাতে। তখন জে এন ঘোষের রেকর্ড পিছু কমিশন ছিল, নাকি মাত্র এক আনা, অর্থাৎ চার পয়সা। আর তাই থেকেই জিতেন ঘোষ লাখ লাখ টাকা রোজগার করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ সাইকেলের দোকান, রেকর্ডের দোকান, টুইনের রেকর্ডবিক্রীর সোল ডিস্ট্রিবিউটরশীপ থেকে আসা সব মিলিয়ে রোজগারের টাকায়, উদ্যোগী মানুষ জিতেন ঘোষ খুলে ফেললেন মেগাফোন কোম্পানী। আর তারপর নিজের প্রতিষ্ঠান খুলে জিতেন ঘোষ অল্পদিনের ভেতর, নিজেই একদিন একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে গেলেন। কতো খ্যাত-অখ্যাত শিল্পীকে যে তিনি প্রোমোট করে গানের দিগন্তকে আলোয় আলোয় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তার

কথা এখন আর কেই বা মনে রেখেছে ? তবু অন্তত একজন মস্ত শিল্পীর কথা এখানে একটু উল্লেখ না করে পারছি না। কানন দেবী, সে কালের কানন বালা, যাঁর কথা প্রসঙ্গক্রমে আগেও একটু-আধটু বলেছি। যেভাবে সামান্য অবস্থা থেকে জিতেন ঘোষ কাননবালাকে সঙ্গীতের জগতে তুলে ধরেছিলেন সেও কোনো গল্পকথার মত। সেই কথা মনে রেখে আমিও শুনেছি, কাননবালা জিতেন ঘোষকে বাবা বলতেন। কাননবালার প্রসঙ্গে তাই পরে আবার আসব। যাই হোক পেশাগত কাজকর্ম বা ব্যবসার ব্যাপারে চণ্ডী সাহা ও জিতেন ঘোষের মধ্যে স্বাভাবিক একটা প্রফেশনাল রাইভালরি ছিল কিন্তু দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বও যথেষ্ট ছিল।

'তুই কি করছিস্', 'জিতেন তুমি কি করছ' ? 'আমি ভাবছি এইটা করব'।—

এই রকম সব আপনজনের মত কথাবার্তা তো সবসময়েই হোত। এইভাবে ঘনিষ্ঠ কাজকর্ম করতে করতে বছর দেড়েকের মাথায়, এই লাইনে আর একটা কোম্পানী এসে দাঁড়াল এন. বি. সেনদের সেনোলা কোম্পানী। এঁরা ১১ এসপ্ল্যানেড ইস্টের পাশে হারমোনিয়াম, পিয়ানো প্রভৃতি নানা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবসা করত। তারা বেশ তোড়জোড় করেই রেকর্ডের ব্যবসাতে নেমে পড়ল। শুরু থেকেই তারা নবদ্বীপ হালদার, গীতা দাস, আরতি দাস, সুকৃতি সেন এমনকি শৈল দেবীর মত আর্টিস্টকেও সেনোলার নিজস্ব শিল্পী ঘোষণা করে রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। তখনকার সব শিল্পীরা এভাবে তিন দেশী প্রতিষ্ঠানে এসে ভিড়ে গেল। ফলে সায়েব কোম্পানীর মুরুব্বীদের মাথা একেবারে খারাপ করে দিয়েছিল, তিন তিনটে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি। এদের কাজে দারুণ একটা পলিসির প্রচার হয়ে গিয়েছিল—স্বদেশী। রেকর্ডের ওপর তখন লেখা থাকত, 'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড' 'ভারতীয় মূলধনে তৈরি বাঙালির রেকর্ড, হিন্দুস্থান রেকর্ড'। এতে করে একটা জাতীয়তা বোধের সেন্টিমেন্ট ভীষণ কাজ করেছিল।

শুনেছিলুম সায়গল সায়েব নাকি বলেছিলেন 'ও হিজ মাস্টার্স ভয়েসকো কুত্তা কোম্পানীমে হাম কভি না যায়গা'।

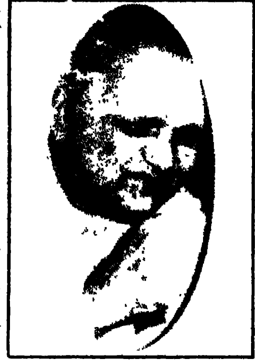
বিমান—অবশ্য যায়ও নি। পরে ১৯৪৪ সালে তো দুম্ করে মরেও গেল। বম্বে থেকে হিন্দি ছবির যে সব রেকর্ড বেরিয়েছিল, এমন কি তানসেনেরও, সেও হিন্দুস্থানের।

তবে এতদিন বাদে এখন, মিউজিক ওয়ার্ল্ডে সেদিন আমি দেখলুম সায়গলের ছবি রয়েছে। তখনকার ওইসব পুরোন কিছু গানের সত্ত্ব এইচ এম ভি কিনে নিয়েছে। তাই ওরা এখন এইচ এম ভি লেবেলে সায়গলের কিছু কিছু হিন্দি গানের ক্যাসেট বের করেছে। সায়গল সায়েবের কথা আমি পরে আরো বলব। এখন চণ্ডী সাহা আর জিতেন ঘোষের প্রসঙ্গটা আগে শেষ করে নিই।

দেখ, এই চণ্ডী সাহা আর জিতেন ঘোষ যে কত বড় প্রতিভাবান ছিলেন তা দু' একটা কাজ থেকেই বুঝে নেবে।

যদি জিতেন ঘোষ না থাকতো তাহলে আজ আমরা ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কে বা

ছায়া দেবী যে কিরকম দুর্দান্ত গায়িকা ছিলেন তা জানতেই পারতুম না। জিতেন ঘোষ ঠিক এঁদের চিনে নিয়েছিলেন। তাই এঁদের ডেকে ডেকে এনে, রেকর্ড করিয়েছিলেন। অথচ আগে এইচ এম ভি এঁদের বাতিল করেছিল।



ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

একবার জিতেন ঘোষ কোনও কাজে বরিশালের দিকে একটা গ্রামে গেছেন। উনি বোধ হয় বরিশালের লোক ছিলেন। সেখানে দেখলেন এক বৈষ্ণবী রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষে করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনলেন আর সোজা সঙ্গে করে নিয়ে চলে এলেন। অনন্তবালা বৈষ্ণবী আর তার সঙ্গী হরেকৃষ্ণ দাস। সেই অনন্তবালা শেষ পর্যন্ত, মনে করে দেখ, কোথায় উঠে গেল। এরকম তিনি অনেককে করেছেন। দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্যের কথা ধরো। বাংলা সিনেমার এক নম্বর চটকদার নায়ককে জড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পালা নাটকের সঙ্গে। রেকর্ডে মঞ্চ নাটকের, পালার ধ্যানধারণা তখনো তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। অথচ জিতেন ঘোষ দুর্গাদাসের ওপর পালা নাটক রেকর্ড করাবার সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা এখন যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি নাটক সংরক্ষণের কাজে তাঁর এই অবদানেরও পরিমাপ হয় না। আর কি সব পালা নাটকই না, দুর্গাদাসের হাত দিয়ে বেরিয়েছিল—মানময়ী গার্লস স্কুল, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত ভাবলে অবাক হতে হয়। এভাবে জিতেন ঘোষ যে এমনি কতো শিল্পীকে তুলে এনেছেন, তৈরি করেছেন তা বলা সম্ভব নয়। এঁদের মধ্যে এখনও কেউ কেউ আমাদের মাঝখানে রয়েছেন, যাঁরা এখনো সমান জনপ্রিয়। আর যাঁরা নেই তাঁদের অনেকে তো শ্রোতাদের মনের মধ্যেই বেঁচে রয়েছেন। দু চার জনের নাম বললেই, জিতেন ঘোষ সম্বন্ধে আমি যা বলতে চাইছি সেটা পরিষ্কার হবে। ধরো না, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বা সনৎ সিংহর কথা। জিতেন ঘোষের আবিষ্কার, আজকের দিনেও এঁদের নিয়ে গানের আসরে রেডিও, টিভিতে কি টানাটানি! আবার নচিকেতা ঘোষ, অপরেশ লাহিড়ী এঁদেরও শ্রোতারা ভোলে নি। এছাড়া আর একজনের কথা বলি—বিশ্বনাথ মৈত্র যাঁকে দিয়ে জিতেন বাবু শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা মূলক গানের একটা নতুন ধারাই বাজারে চালু করেছিলেন। সময়ের প্রেক্ষাপটে বাঙালি রেকর্ড ব্যবসায়ীদের এ সব কৃতিত্বের স্বাক্ষর তো মুছে যাবার নয়। হিন্দুস্থান রেকর্ডের ক্ষেত্রেও এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে সেখানে এনে রেকর্ড করানো হয়েছিল বলেই তো এখনো শিশির প্রতিভার কিছু কিছু পরিচয়-এ যুগের মানুষের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে।

অথচ এমন মজা যে, তখন আর্টিস্টরা রেকর্ডে গান গাইলে হয়ত নামধাম হোত সমাজে মান সম্মান বা জনপ্রিয়তা পেত কিন্তু এইসব কোম্পানীর শিল্পীরা কোনদিন সেভাবে আর্থিক সাফল্য পায় নি। কিন্তু এঁরা কেউই কখনও এ কোম্পানীর বাইরে


শচীন দেববর্মন

যাননি। আনুগত্যবোধ জিনিসটা তখনো ছিল। পরবর্তীকালে কোন সময় হয়ত কোম্পানীতে কাজ হচ্ছে না, বন্ধ হয়ে আছে তখন কেউ হয়ত অন্যত্র গেছেন। কিন্তু সে তো আলাদা কথা। আমি শুনেছি ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মত মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যে, উদয়াস্ত মেগাফোন কোম্পানীতে বসে, সুর করছেন। গান রেকর্ড করছেন শুধু এক থালা মুড়ি তেল দিয়ে মেখে, কাঁচালঙ্কা বেগুনি ফুলুরি চিবোতে, চিবোতে কাজই করে যাচ্ছেন। সারাদিনে কেবল কাপের পর কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে আপন মনে সৃষ্টি কর্মেই ডুবে রয়েছেন।

আর হিন্দুস্থান কোম্পানীতে শচীনদেব বর্মনের মত আর্টিস্ট বলছেন—অ্যাই চণ্ডীদা তিরিশটা টাকা দ্যান তো। চণ্ডীদা তা-ই দিলেন। এঁরা কোন দিনই অন্য কোথাও যাননি। এর থেকে বোঝো, সেদিনের ওইসব শিল্পীদের ভেতর মানবিকতা কতখানি ছিল। যে কোম্পানী থেকে প্রথম রেকর্ড বেরিয়েছে, নাম হয়েছে, আমায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তাকে কি, নিজের একটু স্বার্থে, ছাড়ব বললেই ছাড়া যায় ? আজকে বলি —শচীনদেবের ভয়েস শুনে এইচ এম ভি তাকে বাতিল করে দিয়েছিল। আর সেই শচীনদেব কালক্রমে হিন্দুস্থান কোম্পানীতে থেকে, একেবারে জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেল। অপর দিকে ওই হিন্দুস্থান কোম্পানী বছরের পর বছর ধরে সায়গল আর শচীনদেবের রেকর্ড বিক্রী করে করে, আজও মানুষের কাছে উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে রয়েছে। চণ্ডীদার সময় থেকেই, আমি এইচ এম ভিতে যাতায়াত শুরু করেছিলাম। তবে ১৯৭০-এর গোড়ায়, গানের ব্যাপারে সন্তোষ সেনগুপ্তর কথাই যখন এইচ এম ভিতে প্রায় শেষ কথা, সে সময়ে উনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, আমায় ট্রেনার করে ওখানে নিয়ে যান। তখন থেকে সময়ের পর্বে পর্বে আমার ট্রেনিং-এ ওখান থেকে কত রেকর্ড যে বেরিয়েছে তার আর কি বলব। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অনুপ ঘোষাল, পূরবী দত্ত, মীরা দত্তরায়, নীতিশ দত্তরায় প্রভৃতির সঙ্গে আজকেও, এখনো একাজ করে যাচ্ছি। এ পর্বেও রেকর্ডিং করিয়ে চলেছি ইন্দ্রানী সেন, হৈমন্তী শুক্লা, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊষা উত্থুপদের। তাদের গান ক্যাসেট হয়ে বেরুচ্ছে।

এর প্রায় একই সঙ্গে সেই ১৯৭২ সালে, আমি হিন্দুস্থানেও যোগ দিয়েছিলুম। ওখানে তখন নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সর্বেসর্বা। সুনীল চক্রবর্তী ছিলেন ওঁর সহকারী। তাছাড়া উনি তবলাও খুব ভাল বাজাতেন। পরে উনি দীর্ঘদিন রেডিওতেও বাজিয়েছেন, কাজ করেছেন। আমার চোখে ভাসছে ১৯৬৮ সালের একটা দিন। সেদিন তরুণ আমজাদ আলি খাঁ হিন্দুস্থান-এ সরোদের প্রথম রেকর্ড করল। তার সঙ্গে সেদিন তবলায় সঙ্গত করেছিলেন এই সুনীল চক্রবর্তী। আর ওই রেকর্ডিং

এর সময় ওখানে কারা উপস্থিত ছিলেন, জানো ? রাইচাঁদ বড়াল, যামিনী মতিলালদের মত সুরজ্ঞ মানুষ। আমিও সেদিন ওখানে বসে।

কয়েক বছরের ভেতর, হিন্দুস্থান, আবার তাদের একটা নতুন লেবেল চালু করল। নাম হল ইনরেকো। ভি. বালসারা এখানে ম্যানেজার হয়ে যোগ দিলেন। আমিও এবার এইচ এম ভির সঙ্গে ইনরেকোতে কাজ করতে শুরু করলাম।

তা হিন্দুস্থানের নামটা হঠাৎ পাল্টে নতুন একটা নাম ইনরেকো করা হল কেন বলো তো। এতদিনের এত নাম ডাক...

বিমান—না, হিন্দুস্থান নামটা পাল্টানো হয়নি, হিন্দুস্থানও ছিল। তবে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, কিছু আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পাবার আশায়, হিন্দুস্থান কোম্পানীই আর একটা নতুন লেবেল ইনরেকোকে, বাজারে আনল। আর্থিক দায়দায়িত্বের ব্যাপারে ওই সময়টাতে হিন্দুস্থানের কিছু সমস্যা হয়েছিল। সে সব সমস্যা কাটিয়ে কোম্পানীর হাল ফেরাবার উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে থেকে যাতে আর্থিক সহায়তা পাবার সুবিধে হয় তার জন্যে নতুন নামের একটা কোম্পানী খোলা হল।

ইন্ডিয়ান রেকর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী অর্থাৎ ইনরেকো। সেই সঙ্গে বেহালা অঞ্চলে, নিজেদের একটা কারখানা ওরা চালু করেছিল। এই কারখানাতে ইনরেকো এইচ এম ভির ওপর আর নির্ভর না করে নিজেদের রেকর্ড প্রিন্টিং ব্যবস্থা প্রথম চালু করল। আর তাই থেকে ইনরেকোর যথেষ্ট নামও হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। এতদিন ধরে, চিরকাল হিন্দুস্থান সমেত সবাইকে, এইচ এম ভি থেকে রেকর্ড প্রিন্ট করাতে হত। এইচ এম ভির একচেটিয়া কর্তৃত্বে বিরক্ত কিছু কিছু রেকর্ড কোম্পানী বোম্বাই থেকে প্রিন্ট করিয়ে আনত। তাতে অবশ্য অনেক বেশি খরচ পড়ে যেত। তাই যখন ইনরেকো কলকাতাতে প্রথম রেকর্ড প্রিন্টিংও এর কাজটা চালু করল তখন এইচ এম ভিকে সেই প্রথম এদেশীয় কম্পিটিশনের মুখোমুখি হতে হল। এইচ এম ভি-র এতদিনের একচেটে আধিপত্য, সত্তরের দশকের শেষে, ইনরেকোর কাছে সেই প্রথম চোট খেল। তখন শুধু ভারতবর্ষ কেন, বলতে গেলে, অর্ধেক এশিয়ার কোম্পানীকে এখানকার এইচ এম ভি কোম্পানী থেকে প্রিন্ট করিয়ে নিয়ে যেতে হত।

আমি তখন এইচ এম ভিতে ঢুকেছি, শুধু যাতায়াত করি আমার গুরুদের বা বাবার সঙ্গে। কিন্তু সে অর্থে ওখানে কাজ করি না। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে আমি নিজে দেখেছি চৈনিক রেকর্ড এখানে প্রিন্ট করানো হচ্ছে। সিঙ্গাপুরের গান, ধর্মীয় গান, এমনকি রাশিয়ান গানের রেকর্ডও এখানে প্রিন্ট করানো হচ্ছে।

এবার তাই ইনরেকো যখন কলকাতায় তাদের রেকর্ড প্রিন্টিং-এর কারখানা খুলল তখন রেকর্ড জগতে হৈ চৈ পড়ে গেল। সবার মনে একটাই কথা, এবার এইচ এম ভি খুব জব্দ হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইনরেকো সেই কোয়ালিটি আনতে পারলো না আর তার থেকে বড় কথা, ওঁরা ব্যবসাটাও ভাল করে করতে পারল না। ফলে সরকারী ঋণের

টাকা শোধ করার ব্যাপারে হ'ল নানান জটিলতা। বিভিন্ন কারণে ইনরেকো আর বেশিদিন চলল না, বন্ধ হয়ে গেল। অতএব আবার এইচ এম ভি-র ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল, ব্যবসাও আবার রমরম করে বেড়ে চলল।

এখন অবশ্য আর রেকর্ড নেই, রেকর্ডের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ক্যাসেটের যুগ। বিশাল প্রযুক্তিগত আধিপত্য নিয়ে এইচ এম ভি যেমন নতুন উদ্যমে ক্যাসেটের বাজারেও বিপুল বাণিজ্য করছে, তেমনি খুব সহজ, অনায়াসলব্ধ প্রযুক্তির কারণে ছোটবড়, বহু কোম্পানীই এই বাজারে নেমে পড়েছে। কেউ কেউ বাড়িতে বসেই রাশি রাশি ক্যাসেট কপি করে বাজারে ছড়িয়ে দিতে পারে। তবে এখন এটা যেন ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, ঘরে ঘরে আজকাল ক্যাসেটের ফলাও ব্যবসা। এখানে গুণমানের ব্যাপারটা নেহাৎই গৌণ।

তবে একটা জিনিস এখানে বেশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে রেকর্ডের ব্যবসা এবং কমার্সিয়াল রেকর্ড তৈরি ম্যানুফ্যাকচার করার ব্যাপারটা, যারা এদেশে প্রথম শুরু করেছিল সেই এইচ এম ভি কোম্পানীই আমার রেকর্ড যুগের অবসানে ক্যাসেটের ব্যবসাতেও শুরু থেকে নেমে পড়ে—এখন তো সকলের আগে আগেই রয়েছে।

বিমান—মধ্যিখানে অবশ্য রেকর্ডের ব্যবসাতে হিন্দুস্থান, মেগাফোন, সেনোলা, পাওনীয়ার, ভারতী, অনেকেই এসেছিল।

কিন্তু বাণিজ্যিক স্তরে, প্রিন্টিং বা রেকর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কারিগরীতে, এরা তো কেউ হাত দেয় নি, তাই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতেও পারল না।

বিমান—এর ফাঁকে কিছুদিনের জন্যে ইনরেকো তবু একটু চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিজেদের ব্যর্থতার জন্য ইনরেকোও আর চলল না। এইচ এম ভি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তবে ক্যাসেটকে পেছনে ফেলে এখন আবার নতুন ডিস্কের যুগ শুরু হয়েছে, তবে এই সেই পুরোন গ্রামোফোনের ডিস্ক রেকর্ড নয়। এ হল বিজ্ঞানের নবতম সৃষ্টি সিডি, কমপ্যাক্ট ডিস্ক। তবে আমি তোমায় বলছি এ আমার ব্যক্তিগত মত, এই সিডি বাজারে তেমনভাবে চলবে না। তুমি যদি মন দিয়ে রেডিওতে সিডির গান শোনো দেখবে মাঝেমাঝেই কি রকম গানের প্রবাহ স্কিড করছে, যেন পা পিছলে ছিটকে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। নিটোল ছন্দে, সুষম মসৃণ গতিতে নয়। শব্দমাধুর্যও যেন ক্রমশ স্বাদহীন হয়ে পড়ে। প্রথমবার যেমন দ্বিতীয়বার তার থেকে ম্যাড়মেড়ে তাছাড়া এখনো আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্তদের কাছে সিডিকে কেমন যেন বড়লোকী, যথেষ্ট মহার্ঘ্য বলে মনে হয়। দু তিনশো টাকা দামের ডিস্ক বা সাত আট হাজার টাকা দামের সিডি বাজাবার যন্ত্র—সখ সাধ করে কেনার মত অবস্থাপন্ন, অত লোকই বা কোথায় ?

আরে, সেইজন্যই সি ডি নয়, এখনো গানের কথা উঠলেই লোকের মনে গ্রামোফোনের ডিস্কের গানই কড়া নাড়ে। তাই সুরের জগতের এই চাঁদ সওদাগরকে গান পাগল বাঙালিরা কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না। এঁরা যে প্রকৃত অর্থেই বাংলা গানের ধারক বা বাহক।

বিমান—যাই হোক একটা কথা বলি। এঁরা যেমন রাস্তা থেকে ভিখিরি, আউল বাউল, বৈরাগীদের তুলে নিয়ে এসে তাঁদের দিয়ে গান গাইয়ে কতোবারই না হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন তেমনি সামান্য টাকা পয়সা দিয়ে ওই অজ্ঞাত শিল্পীদের তো বাঁচতেও সাহায্য করেছেন।

আর বিচক্ষণ ব্যবসাবুদ্ধিতে তাঁরা হয়ত টাকাও অনেক রোজগার করেছেন। কিন্তু তার জন্যে যে কি অগাধ পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটাও তো জানা দরকার। এখানে সেখানে, কি হিন্দু কি মুসলমান, কতো যে অজ্ঞাত শিল্পীদের ডেরায়, খোঁজাখুঁজি হত—কোথাও লেখাজোখা নেই। এইসব মানুষদের মধ্যে কে কাওয়ালি গাইছে, কে রামায়ণ গান করছে সেরকম কাউকে চোখে পড়লেই, ধরে ধরে তাদের কলকাতায় নিয়ে এসেছেন। এ কি কম কথা, এ উদ্যোগের কি দাম নেই ?
চণ্ডীবাবুরা নিজেরা যেতেন ?

বিমান—সব জায়গায় ওঁরা নিজেরা যাবেন কেন ? ওঁদের সেরকম লোকজন ছিল, নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন চণ্ডীবাবুর এরকম একজন বিশ্বস্ত মানুষ।

সুরদা বলে আর একজন ছিলেন আমি তার ভাল নামটা জানি না। আমিও কখনো যেতুম কাউকে কাউকে ধরে নিয়ে আসতুম, একেবারে অজ্ঞাত অখ্যাত। দেহাতের লোকজন বিশেষ করে বিহার-টিহারের বহু জায়গায়, লোকে আর্টিস্টদের কারুরই নাম জানত না। বলতো—এ কিসকো গানা হ্যায় ? কিসকা গান আউর কেয়া গানা হ্যায় বাবু। ক্যা মালুম হ্যায়। এইভাবে এই সব গাঁয়ে-গঞ্জের সরলপ্রাণ মানুষও বাংলা রেকর্ড শিল্পের অনেক উপকার করেছে। কৌতূহল—এগোতেও তো সাহায্য করে!

পান্নালাল বোস—কাওয়ালি ছাড়া আর বিশেষ কিছু গাইতে পারতো না। চণ্ডীদা তাকে বললেন তুই বাংলায় কাওয়ালি কর। তাকে দিয়ে এমন বাংলা কাওয়ালি গাওয়ালেন যে তার নামই হয়ে গেল পান্না কাওয়াল। এই পান্না কাওয়ালকে দিয়ে চণ্ডীদা একবার কী করেছিলেন, জানো ?

১৯৪৩/৪৪ হবে, সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা তখন সায়গন রেডিও থেকে প্রায়ই প্রচারিত হত। কলকাতাতেও, যারা পারত তারা খুব ঔৎসুক্য নিয়ে শুনত। আর সমস্ত ভারতে নেতাজীর নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে তখন এত উত্তেজনা, আগ্রহ যে চণ্ডীদা স্টুডিওতে রেডিও সেট বসিয়ে, নীরোদ বাবুকে দিয়ে সেইসব বক্তৃতা যথাসম্ভব রেকর্ড করিয়ে নিতেন। তারপর অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সেই বাংলা ও ইংরেজি বক্তৃতাগুলোর রেকর্ড বাজারে পৌঁছে দিতেন। একেবারে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

পান্নাকে দিয়ে ওইসময়, আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে লেখা একটা নতুন কাওয়ালি গানেরও রেকর্ড করিয়েছিলেন চণ্ডীবাবু, তাই না ?

বিমান—হ্যাঁ, এ বড় কম কথা নয়। সে সময় ওই যুদ্ধের বাজারে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কোনও রেকর্ড বার করার জন্যে অনেক আর্থিক ঝুঁকি নিতেও পেছপা হন


সুধীরলাল চক্রবর্তী

নি। সেটা কি মনে রাখবার মত কথা নয় ?

চণ্ডীদার এরকম অন্যরকম কিছু করার বেশ একটা ঝোঁক ছিল। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে উনি তাই একবার অনেক চেষ্টাচরিত্র করে সাহানা দেবী আর দিলীপকুমার রায় (পণ্ডীচেরি)-কে দিয়ে, শ্রীঅরবিন্দ বন্দনা গান রেকর্ড করাতে সফল হয়েছিলেন।

আবার দেখ, এই হিন্দুস্থান কোম্পানীতে সুধীরলাল চক্রবর্তী রেকর্ড করার জন্যে গান গাইছেন, একটা ভাঙা রেকর্ডিং মেশিনে। এইচ এম ভির মত অত ঝকমকে দামী মেশিনপত্র তো হিন্দুস্থানের ছিল না। একটা ছোট্ট রেকর্ড করার স্টুডিও ছিল ৬/১ অক্রূর দত্ত লেনে। মেগাফোন কোং তখন রেকর্ডিং এর জন্যে এইচ এম ভির স্টুডিও ভাড়া নিত। আর হিন্দুস্থান নিজেদের ওই কুঠরী স্টুডিওতে গান তুলে ম্যাট্রিক্সটা এইচ এম ভিতে পাঠাত। এইচ এম ভি তখন তা প্রিন্ট করে হিন্দুস্থানকে ফেরৎ দিত বাজারে ছাড়বার জন্যে। তা আয়োজন উপকরণ হিন্দুস্থানের যেমনই হোক, গানটাই তো আসল। তাহলে সেই গানটা কি ?

সুধীরলাল মহলা দিচ্ছেন, বারবার গাইছেন, 'খেলা ঘর মোর ভেসে গেছে হায়, নয়নেরি যমুনায়'। সঙ্গে বাজছে একটা বেহালা, একটা গীটার আর তবলা। নীরোদ-দা রেকর্ডে গানটা টেক করলেন। কয়েক লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছিল এই রেকর্ডটা, ভাবা যায়। রেকর্ড করে দিয়ে সুধীরলাল চলে গেছেন। পরে আবার একদিন বাড়ি যাবার সময় চণ্ডীদাকে সসঙ্কোচে বললেন—

চণ্ডীদা কিছু টাকার দরকার ছিল, যদি.........

কতো টাকা আগাম নিয়ে গেছিস, তা আগে বল্। চণ্ডীদা ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর মুহূর্তে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে সুধীরলালের হাতে গুঁজে দিলেন, বললেন আচ্ছা নে, এই কটা টাকা রাখ।

ঠিক কতো টাকা সেদিন চণ্ডীদা দিয়েছিলেন তা এখন আর মনে পড়ছে না, তবে ছিল নেহাৎই কম। সুধীরলাল বিনা বাক্যেই চলে গেলেন। এইটুকুতেই সন্তুষ্ট। জাতশিল্পী এঁদের এই জন্যেই বলে, দিনকালটাই তখন এইরকম ছিল। এমনি আর একজনের কথা বলি—কুন্দনলাল সায়গল। দুটো গান রেকর্ড করার জন্যে সায়গল সাহেব আগেভাগেই পারিশ্রমিকের টাকাটা নিয়ে গিয়েছিলেন। শুনেছিলুম তখনকার দিনে, দুটো গানের জন্য উনি নাকি চল্লিশের মত নিয়েছিলেন। সে রেকর্ড বাজারে আসতেই একেবারে সুপার ডুপার হিট হয়ে গেল। অথচ তাঁকে একদিন চণ্ডীদা বললেন তোর এই রেকর্ডটা খুব বিক্রী হয়েছে সায়গল, তুই এই পাঁচশো টাকা নে। টাকাটা দেবার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু সরল মুখে, সায়গল বললে, না

চণ্ডীদা। ওই রেকর্ডটার জন্যে আমি তো আর টাকা নেব না। কারণ আমি তো তখন তোমায় বলেছিলুম, আমার দরকার আমাকে চল্লিশটা টাকা দাও, আমি তোমাকে একটি রেকর্ড করে দেব। তা তুমি আমায় চল্লিশ টাকা দিয়েছিলে। তাই আমি এজন্যে, আর টাকা নেব না। চণ্ডীদা একটু পীড়াপীড়ি করলে, শুনেছিলুম সায়গল নাকি বলেছিল তা হয় না চণ্ডীদা। যে পাতে থুথু ফেলে উঠে পড়েছি আর তাতে ভাত খাওয়া যায় না। ভেবে দেখ, একজন শিল্পীর কতো বড়ো মন হলে এইরকম কথা বলতে পারে। তখনকার সময়ে ৫০০ টাকা বড় কম টাকা ছিল না। এইরকম ছিল সে যুগের একজন জনপ্রিয়তম শিল্পীর মনোভাব। কোম্পানীর মালিকের সঙ্গে এত বড় বড় আর্টিস্টদের এরকম অন্তরঙ্গ সহযোগিতার সম্পর্ক আমি তো অনেক দেখেছি। হিন্দুস্থানে দেখেছি, সাবিত্রী ঘোষ, উৎপলা ঘোষ, সুপ্রভা ঘোষ, অনুপম ঘটক সবাই চণ্ডীদার আবিষ্কার।

সুধীরলাল এসে বলল আমার এক ছাত্রী বড় ভাল গায় চণ্ডীদা। কণ্ঠটি বড় মিষ্টি। চণ্ডীদা বললেন তা কিরকম মেওয়া ফলবে, বলছিস ? ঠিক আছে, তোর কথায় রেকর্ড করব। বাজারে চলবে তো।

দ্যাখেন কইরা দ্যাখেন। ভালই চলবে।

এইটাই হল উৎপলা ঘোষ (সেন) এর প্রথম রেকর্ড—'এক হাতে মোর পুজোর থালা' আর 'বনফুল জাগে পথের ধারে'। এখনো লোকে শুনতে চায় শুনে আশ মেটে না।

তখন আর এক ব্যাপার হত। এটা কিন্তু শিখিয়েছিল এইচ এম ভি। এক এক সময় আর্টিস্টদের বলে দিত কাল সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত এইখানে সবাই এসে বসে থাকবে। কখন কাকে দরকার হবে, কি দরকার হবে এখন তা বলা যাচ্ছে না।

সকাল বেলা তাড়াতাড়ি সবাই যা হোক কিছু খেয়ে-দেয়ে চলে যেত। ওখানে অবশ্য নিয়মিত দুপুরে লাঞ্চ দেওয়া হত। আমি যখন ওখানে প্রথম কাজ করতে গেছি, সে ওই পঞ্চাশের দশকে হবে, তখন ভয়ে ভয়ে যেতুম। মকরদা, গুপীদা যারা ওখানকার বেয়াড, তারা এসে আমাদের খাওয়া দাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করে যেত। আমি তো না হয় তখন ছেলেমানুষ কিন্তু যারা নাম করা শিল্পী—যেমন মানব, শ্যামল, এরাও কিন্তু ওই গুপীদা, মকরদা, বলে ওদের ডেকেছে। তখন ওইরকম সম্পর্কটা সবাই ধরে রাখত। আর ওদেরও কিরকম স্নেহ-ভালবাসা ছিল জানো ?

আরো কিছু পরে, যখন এইচ এম ভিতে আমার খানিকটা পজিশন পদোন্নতি হয়েছে, ট্রেনার হয়েছি, ধোপদুরস্ত, একটু দামী জামা কাপড় পরে, কলার-টলার তুলে ওখানে যাচ্ছি, তখন কোনদিন গুপী বলল কিছু খাবি ?

আমি বললুম হ্যাঁ দাও, যাহোক।

শোন তুই আজ আমার পাশে বসে খাবি. কাল দেখলুম যে, তুই খেতে বসেছিস



দিলীপ কুমার রায়

আর নির্মল রাক্ষসটা তোর পাত থেকে সব তুলে নিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। তুই তো কিছুই খেলি না। তাই আজকে তুই আমার পাশে বসে খাবি।

বোঝো কি ভালবাসা! দেখ আজকে আমার এ কথাটা বলতে বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। এই ভালবাসা না হলে কি কাজ হয় ? আবার একটা ঘটনার কথা বলি। সবাই জানে যে কৃষ্ণচন্দ্র দে অন্ধগায়ক দেখতে পেতেন না। একদিন হেমন্ত মুখার্জি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যরা কাজ করছেন। কেষ্টবাবু এসে সেই ঘরে ঢুকে পড়েছেন। তখন ঘরের দুতিনজনের হাতে সিগারেট ছিল। তাঁরা তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে, যে যার সিগারেট ফেলে দিলেন। কেষ্টবাবু তো দেখতে পান না তাহলে অমন হাতের সিগারেট ফেলবার, কি এমন দরকার ছিল ? আসলে, এটা ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীদের প্রতি অনুজদের সম্মান প্রদর্শনের স্বভাবগত অভ্যেস।

বলতে পারো তখন এটা আমাদের একটা জাতীয় চরিত্রের মতন ছিল।

বিমান—আমরা সেই শিক্ষাটা গ্রহণ করেছি। আর আমাদের ওই গানবাজনার জগতে অভ্যাসবশতই ওইভাবে চলেছি। তাই ওখানকার ওই বেয়ারা, পিয়ন সবাইকেই আমরা দাদা বলে ডেকেছি। পরিবেশটাও এইরকম ছিল। অফিসাররাও বিনা দ্বিধায়, অবলীলাক্রমে বলে যেতেন এই যে শুনুন, বলুন কি করবেন, কিছু ভেবেছেন ? কোন্ শিল্পীকে দিয়ে, কি করবেন বলে ঠিক করলেন ? আপনি একটা প্ল্যান দিন্ না। জবাবে আমিও বললুম আপনিই বলুন না, আপনাদের কি প্ল্যান।

আমি কিছু প্ল্যান দিচ্ছি না আপনিই দিন। ওপরওয়ালারা স্যাংসান করবে।

তখন আমি হয়ত বললুম, ভাবছি এঁকে দিয়ে এই করাব, ওঁকে দিয়ে ওই করাব। এইরকম আর কি।

কিন্তু আজকাল কি কমারশিয়ালি, এ ধরনের ঢিলেঢালা আন্তরিক কথাবার্তা চালানো যাবে ? আবার একটা অন্য কথা বলি ব্যবসা ভাবনার কথা। মেগাফোন কোম্পানীর —১৯৪৩-৪৪ সাল। তখন সুভাষচন্দ্রের যুগ, আই. এন. এ-র যুগ। জিতেন বাবুর ব্যবসা-বুদ্ধি নড়েচড়ে উঠল। উনি বিশ্বনাথ মৈত্রকে ডেকে আনলেন। তাঁকে দিয়ে নেতাজী প্রশস্তিমূলক পরপর এক গোছা রেকর্ড করালেন। সব রেকর্ড হিট হয়ে

গেল—'আদেশ ছিল দিল্লি চলো', 'দিল্লি মোরা জয় করেছি', 'নেতাজী জিন্দাবাদ' এমনি কতো।

এইসঙ্গে বাজারে ছাড়লেন রেকর্ড, নেতাজী পালা-নাটক। গাঁয়েগঞ্জে হু হু করে কাটতি। আসলে তখন লোকে নেতাজীর নামেই উচ্ছ্বসিত তাই চালাও নেতাজী। বিচক্ষণ জিতেনবাবুর বুদ্ধিতে এই প্ল্যানটা কি ভাল ভাবেই না কাজে লেগে গিয়েছিল।

আবার আমার চোখে দেখা ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি বিকেল বেলা। হঠাৎ রটে গেল মহাত্মা গান্ধী কীলড্।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। শীতকালের বিকেল। আমি তখন কলকাতা ইউনির্ভাসিটির আশুতোষ হলে। সেখানে দিলীপকুমার রায়ের গানের আসর তখন খুব জমেছে, সঙ্গে গাইছেন মঞ্জু গুপ্তা। হল ভর্তি মানুষ নিঃশব্দে শুনছে 'ঘুম যাই মা' পাশাপাশি জার্মান ভাষার অনুবাদ। হঠাৎ একজন এসে সেই গানের মাঝখানেই দিলীপকুমারের কানে কানে কিছু বলল। মাইকে শুধু শোনা গেল দিলীপকুমারের অস্ফুট উচ্চারণ ঈস্ কি সর্বনাশ! দিলীপকুমার এবার মুখটা মাইকে এনে বললেন গান আর হবে না, এইমাত্র শুনলুম মহাত্মাজী হ্যাজ্ বিন শট্ ডেড। বিশাল হল ঘরে একটা আর্তনাদের রোল উঠল।

বিমান—এইচ এম ভির বাড়িতে তখন বড়কর্তা রাইটসাহেব আর বড় অফিসার হেমচন্দ্র সোম হাজির রয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যে রাইটসায়েব অর্ডার দিলেন। সমস্ত ভাল লিরিসিস্ট গীতিকার, একনম্বর শিল্পী, একনম্বর সুরকার যারা আছেন, এক্ষুনি তাদের ডেকে পাঠাও, এক্ষুনি। আর যাঁরা এখন এখানে আছেন, তাঁদের সবাইকে ডিটেন করাও, আটকে রাখো। আর সবাইকে জানিয়ে দাও যে আজ রাত্রে কেউ বাড়ি যেতে পারবে না। সবাই এখানে থাকবে। গাড়ি পাঠাও সবাইকে এখানে নিয়ে এসো। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজই গান লেখা হবে, সুর করা হবে এবং সব আর্টিস্ট নির্দিষ্ট করা হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে কবি শৈলেন রায়, সজনীকান্ত দাস এঁরা সব এসে গেলেন। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগন্ময় মিত্র, শচীন গুপ্ত, সুকৃতি সেন, সুপ্রীতি ঘোষ, যূথিকা রায় এঁরাও সব জড়ো হলেন। কোম্পানী থেকে তখনই জানিয়ে দেওয়া হল এখন সন্ধে সাড়ে ছটা, সাড়ে আটটার মধ্যে সব গান লেখা শেষ করতে হবে। আর্টিস্টদের ডাকো আজ এখানে সব থাকবে, খাওয়া দাওয়া করবে, রাত বারোটার মধ্যে সব গানের সুর তৈরি করা শেষ করবে। দিনেরবেলা যে যার বাড়ি যাবে। এখন যার যা ইচ্ছে, দরকার, ডিমান্ড সব কোম্পানীর খরচে মেটানো হবে। বলো কে কি খাবে-মিষ্টি, বিরিয়ানী, রসগোল্লা, যে যা খেতে চাও বলো, সব পাবে, কে কোন দোকানের, যার যা পছন্দ তাও।

বলো তুমি কি খাবে ?

বিরিয়ানী। অকপটেই একজন বললেন।

কোন দোকানের ?

সে তার পছন্দসই দোকানের নাম বলা মাত্রই সায়েবের উদার অর্ডার অ্যাই, যাও

ওই দোকান থেকে বিরিয়ানী নিয়ে এসো। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি সসঙ্কোচে বললুম ওই যা হোক গোটা দুই স্যাণ্ডউইচ হলেই হবে...

তা কি হয় ? কি মিষ্টি খাবে বলো।

ওই দুটো রসগোল্লা।

যাও, শীগগির নিয়ে এসো, দেরী কোরো না।

মূল উদ্দেশ্য গান্ধীজীর ওপর রেকর্ড যত তাড়াতাড়ি পারো, বাজারে ছাড়তে হবে —সবার আগে।

এইরকম ছিল সায়েবদের ব্যবসার কায়দা, মার্কেটিং এর নমুনা। কিন্তু তাঁদের শ্রদ্ধা রুচির কথাও একটু বলি, যা এখন আর কারুর, মনেও নেই।

তার মানে, গান্ধীজী সদ্য মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তখনই, কোম্পানী তেড়েফুঁড়ে রেকর্ড তৈরিতে নেমে পড়ল। ব্যবসাদারী দৌড়ে সেসব গান, পালা—সব সেরা আর্টিস্টদের কণ্ঠে করানো হল। কিন্তু দেখ, সেইসব টাটকা রেকর্ডের লেবেলে, একটাতেও হিজ মাস্টার্সের সেই পরিচিত কুকুরের ছবি এই প্রথম দেওয়া হল না। তার জায়গায়, সবাইকে অবাক করে জাতীয় পতাকার ছবি ছেপে এই রেকর্ডগুলো বের করা হয়েছিল। গান্ধীজীর স্মরণে এই যে ব্যতিক্রমী রেকর্ডগুলো তড়িঘড়ি বেরুল, সেগুলো দিয়েই, সেসময় এইচ এম ভি শ্রদ্ধাঞ্জলির অর্ঘ্য সাজিয়েছিল।

এরপরে এই ধরনের রেকর্ড দ্বিতীয়বার হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীতে। এই উপলক্ষে প্রকাশিত প্রত্যেকটি রেকর্ডের লেবেলে রবীন্দ্রনাথের ফটো ছেপে, রেকর্ডে সাঁটা হয়েছিল। এই বিশেষ দুটো কাজ আমার চোখে এখনো জ্বলজ্বল করে ভাসছে।

গান্ধীজীকে নিয়ে এ জাতীয় রেকর্ড তখনকার প্রায় সমস্ত নামকরা আর্টিস্টকে দিয়েই করানো হয়েছিল।

হ্যাঁ হিন্দিতে মহম্মদ রফিকে দিয়ে দুখানা রেকর্ডের চার পিঠে গাওয়ানো 'বাপু কী অমর কাহানী' সারা ভারতে তোলপাড় তুলেছিল। কিন্তু আশ্চর্য সে রেকর্ড এখন সবাই ভুলে গেছে। এমনকি আজকালকার পুরনো গান খুঁজে বের করবার হুজুগেও রেডিও বা ক্যাসেটের কর্মকর্তাদের কেউই, এ রেকর্ডের পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবেননি। এটা খুব দুঃখের কথা।

বিমান—হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম। বাংলাতে সব থেকে বেশি গান লিখেছিলেন সজনীকান্ত আর কবি শৈলেন রায়। আর সুরকারদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল। কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, সুকৃতি সেন, নিতাই ঘটক এমনি আর কি। তবে সব থেকে হিট করেছিল বিজনবালা ঘোষ দস্তিদারের রামধূন গানের রেকর্ড। অনেকের কণ্ঠেই রামধূন গান বাজারে বেরিয়েছিল কিন্তু বিজনবালারটা সবাইকে ছাপিয়ে একেবারে বাজার মাৎ করে দিয়েছিল। ধনঞ্জয়ের রামধূনও বিখ্যাত হয়েছিল। তবে বিজনবালারটাই সব থেকে বেশি জনপ্রিয় হতে পেরেছিল।

বিজনবালার এই গানটা ব্যবহার করে, সেই ১৯৪৯ সালে নিউ থিয়েটার্সের একখানা ছবিও হয়েছিল 'অঞ্জনগড়'। বিজনবালার অনুমতি না নিয়ে এই ছবিতে এক দৃশ্যে এই গানটা ব্যবহার করা হয়েছিল। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল নায়িকা সুনন্দা দেবীর লিপে বিজনবালার রামধূন-এর এই রেকর্ডটা কাজে লাগিয়েছিলেন। বিজনবালা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস ঠুকে দিয়েছিলেন। অনেক দিন মামলা চলার পর আইনের চোখে প্রমাণিত হয়েছিল যে এটি বাস্তবিকই বিজনবালারই রেকর্ডের গান। এখানে, দীর্ঘদিন চাপা পড়ে থাকা ঘটনার কথা আজ আর বলতে বাধা নেই। এইচ এম ভি রেকর্ডে, বিজনবালার গান যে 'অঞ্জনগড়' ছবিতে নিউ থিয়েটার্স এবং রাইবাবু অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছেন একথা সাক্ষ্য প্রমাণে সাব্যস্ত হবার পর এবং আদালতে সেকথা নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে কবুল করার পর, আপোষ মীমাংসার ইচ্ছেয় বাদীপক্ষ সে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। তারপর সংশ্লিষ্ট চার পক্ষ সবাই একসঙ্গে বসে আলাপ আলোচনায় সব সন্তোষজনকভাবে মিটিয়ে নিয়ে যাবতীয় বিবাদ-বিতর্ক, তিক্ততায় এমন ইতি টেনে দিয়েছিল যাতে এ প্রসঙ্গটি পরবর্তীকালে আর কখনো, কেউ না তোলে। তাই-ই হয়েছিল যার জন্যে এখন আর এ ব্যাপারটা নিয়ে কোন কথা শোনাও যায় না।

ওঙ্কারনাথ থেকে শুরু করে পালুস্কর তারপর শচীন গুপ্ত পর্যন্ত অনেকেই, বাংলা, হিন্দিতে বারবার রেকর্ডে এ গানটা করেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন কারণে বিজনবালার এই রামধূনের রেকর্ড অনেকদিন ধরে খবরের কাগজে পত্রপত্রিকা বা রেডিওতে প্রচারের শিরোনামে ঠাঁই পাবার সুযোগ পেয়েছিল।

শুধু তাইবা কেন ? আমি তো এই সেদিন এই ২০০২-এর জানুয়ারিতেও রেডিওতে বিজনবালার এই রামধূনটি শুনতে পেয়েছি। তার মানে, সোনা রূপো কিছু নয় ভালো গান কখনো মরে না। হয়ত কখনো চাপা পড়ে যায় কিন্তু একদিন না একদিন আবার তা ঠিক জেগে ওঠে। বাঙালির গানে এমনটা আমরা অনেক দেখেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ



বিমান—কথা বলতে বলতে, বিংশ শতাব্দীর মাঝ বরাবর পৌঁছে, এবার মনে হচ্ছে এইখানে নিউ থিয়েটার্সের কথাটা বলে নেওয়াই বোধ হয় ভাল। কেননা, চল্লিশের দশকে নিউ থিয়েটার্স বাংলা চিত্র জগতের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য করে—আধুনিক বাংলা গানকেও যেভাবে প্রভাবিত করেছিল তার জন্যে বাংলা গান ও তার শিল্পীদের নিয়ে যে কোন আলোচনায়, নিউ থিয়েটার্সের কথা আসবেই। চল্লিশের দশকে এম পি প্রোডাকসনও অবশ্য, বাংলা ছবির জগতে এসে গিয়েছিল এবং ওঁদেরও আধুনিক বাংলা গানে, উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

তা কেন ? সে হিসেবে তো নিউ থিয়েটার্স, সেই তিরিশের দশকের গোড়া থেকেই রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল।

বিমান—হ্যাঁ সেই 'চণ্ডীদাস' ছবি থেকেই নিউ থিয়েটার্স একদম জাঁকিয়ে বসেছিল। তারপর 'চণ্ডীদাস' থেকে 'মুক্তি' একটা বিরাট ব্যাপার। সেই নিউ থিয়েটার্সের কথা বলতে গেলে, অনেকের সম্বন্ধেই স্মৃতি চারণ করতে হবে। তবে আমি তো গানেরই বেশি খোঁজ রাখতুম। তাই গানের মানুষদের কথাই বেশি বলব। আর নিউ থিয়েটার্সের ছবির গানের কথা উঠলে, প্রথমেই মনে পড়বে সায়গল সায়েবকে। কুন্দন লাল সায়গল (১৯০৪-১৯৪৬)। প্রথমেই বলি—আমি কিন্তু সায়গল সায়েবকে চাক্ষুষ দেখিনি। তবে বাবার মুখে তাঁর অনেক গল্প শুনেছি আর তাঁর গান শুনেছি আমার ছোটবেলা থেকে। শুনেছি—তিনি নাকি খুব মজার মানুষ ছিলেন। পঙ্কজ মল্লিককে নিয়ে একটা মজার ঘটনার কথা বলি—তা থেকেই বুঝবে সায়গল সাহেব মানুষটি কেমন মজাদার ছিলেন। তখন সায়গল সায়েব মোটর বাইক চেপে ঘোরাঘুরি করতেন। এমনি একদিন পঙ্কজদাকে আসতে দেখতে পেয়ে, একরকম জোরাজুরি আবদার করে পঙ্কজদাকে, পেছনে বসিয়ে বাইকে রওনা দিলেন। খানিকটা পরে মনে হল পঙ্কজদা যেন পেছনের সীটে নেই। সে কি ? বোঝা গেল কোনসময় পঙ্কজদা যেভাবে হোক বাইক থেকে ছিটকে গেছেন বা পড়ে গেছেন। হয়ত আপন মনে সায়গল অনেকটা রাস্তা চলে গেছেন—অথচ খেয়াল করেননি


পঙ্কজকুমার মল্লিক

যে, পেছনে পঙ্কজ আর নেই। ভয় পেয়ে সায়গল তখন ফেলে আসা পুরো রাস্তাটা, আবার একবার ঘুরে এলেন। নাঃ, পঙ্কজদাকে পাওয়া গেল না, কোন উল্টোপাল্টা খবরও পাওয়া গেল না। কি হল রে বাবা! এবার সায়গল সোজা চলে গেলেন পঙ্কজবাবুর বাড়ি। হ্যাঁ, ওই তো পঙ্কজবাবু বাড়িতে রয়েছেন, যাক বাঁচা গেল। জানা গেল পঙ্কজবাবুর ওরকম বাইকের পেছনে বসে যাওয়া অভ্যেস ছিল না। লম্বা মানুষ, তাই পথের কোথাও একটু স্পীড আস্তে হতেই, সুযোগ বুঝে পঙ্কজদা টুক করে নেমে পড়েছেন, সায়গলের নজর এড়িয়ে। আপন খেয়ালে সায়গল হুহু করে ছুটে চলে গেছেন। সায়গল হাজির হতেই পঙ্কজদার বাড়িতে তখন কি হাসাহাসি। সায়গল লজ্জায় অপ্রস্তুত। মানুষ হিসেবে সায়গল খুব দিলদরিয়া মহানুভব গোছের ছিলেন। একবার কোন এক পরিচিত অসুস্থ মানুষের সাহায্যের উদ্দেশ্যে, চ্যারিটি শো করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি গান গাইবেন। শো এর দিন যথাসময়ে উদ্যোক্তারা সায়গলকে নিতে এসে দেখল, সায়গল সায়েব বাড়িতে নেই। সর্বনাশ—যা খেয়ালী মানুষ! আন্দাজমত সব জায়গায় খোঁজ খবর করেও সায়গলের হদিশ পাওয়া গেল না। এই ফাংশানের সঙ্গে অমর মল্লিকরাও যুক্ত ছিলেন। চারদিকে ছোটাছুটি করেও পাত্তা পাওয়া গেল না। কি যে বিপদ! অনেকক্ষণ বাদে দেখা গেল দিব্যি খোশমেজাজে সায়গল নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে আসছেন, সবাই তো হাঁ হাঁ করে উঠল। সায়গল বললেন আরে বাবা, তোমাদের ফাংশনের কথা আমার মনে আছে, এই তো এসে গেছি।

কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক তো দেরি হয়ে গেছে—এদিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে যে! হাসতে হাসতে আশ্বস্ত করলেন—দেখ না, চুল কাটতে গিয়েছিলাম, তোমাদের ফাংশন বলে কথা। ভাল করে সেজেগুজে যেতে হবে না ? তিনি ছিলেন, তাঁর সময়ের জনপ্রিয়তম শিল্পী, তাঁর গলা থেকে সুর বেরোতে না বেরোতেই লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত।

যাই হোক অনুষ্ঠান তো তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শেষ হল। সায়গল অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া সব টাকাপয়সা নিয়ে বললেন যে, তিনি ওই অসুস্থ মানুষটির বাড়িতে যাবেন। উনি কোনও বড় স্টার বা নামকরা কেউ ছিলেন না—উনি ছিলেন স্টুডিওর একজন সাধারণ টেকনিশিয়ান—যাদের দিকে বড় একটা কেউ ফিরেও তাকায় না। সায়গলের মনটা কেমন ছিল তা এই ছোট্ট ঘটনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। তাছাড়া সায়গল ওসব জলসা-টলসা এড়িয়ে যেতেন—ফাংশানে গাইতেন, বলতে গেলে খুবই কম। ১৯৪৯ সালে 'পরিচয়' ছবির পরেই বম্বে থেকে ডাক পেয়ে বম্বে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর তানসেন ছবি শুধু গানের জন্যেই অসাধারণ হিট করেছিল। এর কিছুদিন পর থেকে তার শরীরটা ক্রমশঃ ভেঙে



কুন্দলাল সায়গল

পড়ছিল। ফলে অসুস্থ শরীরে জলন্ধরে, নিজের দেশের বাড়িতে চলে যেতে হল। শুনেছি অত্যধিক পানদোষে সেরে ওঠার বদলে তিনি শেষপর্যন্ত অকালেই চলে গেলেন।

হ্যাঁ, মাত্র ৪৩ বছর বয়সে। ১৯৪৭ সালের ১৮ই জানুয়ারি।

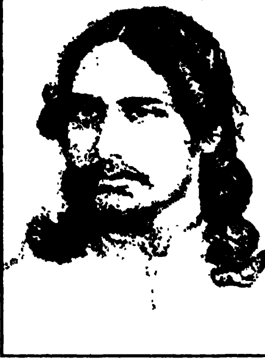
বিমান—কিন্তু মানুষ শিল্পী সায়গল আজো সকলের মনে রীতিমত বেঁচে রয়েছেন। আসলে চরিত্রগুণে তাঁর মতন ক'টা মানুষ আর হয়! একটা ঘটনার কথা বলি।

যে কোম্পানী থেকে এবং গানের রেকর্ড করে সায়গল নামযশ অর্থ সব পেয়েছিলেন তিনি অনেক প্রলোভনেও সেই কোম্পানীকে কখনো ছাড়ার কথা ভাবেননি কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায়। সেই হিন্দুস্থানের মালিক চণ্ডী সাহার সঙ্গে তাঁর ছিল সত্যিকারের প্রাণের সম্পর্ক।

তখন শুনেছি যে সায়গল সায়েব নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীতও শিখতেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তাছাড়া পঙ্কজদার কাছেও শিখেছেন। এর ওপর আবার, বাংলা ভাষাটা জানার জন্যে, তিনি রীতিমত সিরিয়াসলি বাংলাও শিখতেন নিয়ম করে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান তিনি গেয়েছেন। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে গানও শুনিয়েছিলেন। হারমোনিয়াম ঘাড়ে করে শান্তিনিকেতনে গিয়ে উনি রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়ে এসেছিলেন। সে একটা আর এক গল্প। হয়ত তোমায় আগেও বলেছি তবু এমন গল্প দুবার বললেও ভাল লাগে, কোন ক্ষতি নেই।

জীবন মরণ ছবিতে সায়গলের মুখে রবীন্দ্রনাথের একটা গান ছিল। পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনায় সায়গল সিনেমার গল্পের উপযোগী করে গানটার একটা শব্দ পাল্টাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পঙ্কজকুমারের মত রবীন্দ্রময় মানুষ তাতে কিছুতেই রাজী হবেন না। গানটা হল 'আমি তোমায় যতো শুনিয়েছিলেম গান'—যে গানটা পরে একেবারে সুপারহিট হয়েছিল। এই গানটার শেষ পংক্তিতে আছে—'সেই কথাটি কবি পড়বে তোমার মনে, বর্ষামুখর রাতে, ফাগুন সমীরণে'। তা দেখ, সায়গলের কি সূক্ষ্ম অনুভব।

সে বললে ছবির নায়ক হয়ে এই গানটি, নায়িকাকে উদ্দেশ করে শোনাচ্ছি। সেখানে আমি কি করে নায়িকাকে কবি বলব ? তাই আমি কবির বদলে গাইব —জানি। এই নিয়ে টানাটানি। পঙ্কজ মল্লিকও কিছুতে সম্মতি দেবেন না। এই গল্পটা আমি শুনেছিলুম তখনকার বিখ্যাত নায়ক-গায়ক অসিতবরণ অর্থাৎ কালোদার কাছ থেকে। তখন ওই তিরিশের দশকে বিশ্বভারতীর বোর্ড-টোর্ড হয়নি। তখন ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত দিতে হলে তার স্যাম্পল রেকর্ড তৈরি করে, কবিকে


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে আসতে হত। কবি নিজে এই অ্যাপ্রুভ্যাল দিতেন। সায়গলের জোরাজুরিতে ওই 'জানি' শব্দ লাগানো স্যাম্পল কপি রেকর্ড রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হল। কবি ঠিক ধরেছেন। বিনা অনুমোদনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই রেকর্ড ফেরৎ এল। তখন সবাই বললে যাক্ গে ঢের হয়েছে, আবার নতুন করে রেকর্ড করো। এতো জানা কথা যে, কবি কখনোই তাঁর গানের কথা পাল্টানোতে সায় দেবেন না। এটা চলবে না। সায়গলের তখন রোখ চেপে গেছে। তিনি বললেন,—ঠিক আছে আমাকে তোমরা একটা গাড়ী দাও, একটা কলের গান আর স্যাম্পেল রেকর্ডটা দাও। আমি নিজে রবীন্দ্রনাথকে শোনাবো আমার কথা, তাঁকে বলতেই হবে, আমি শান্তিনিকেতনে যাব। যে কথা, সেই কাজ। পরের দিন গাড়ি , রেকর্ড, যন্ত্রপাতি নিয়ে সায়গল শান্তিনিকেতনে ছুটলেন। সেই স্যাম্পল রেকর্ডটা কবিকে আবার শুনিয়ে বললেন গুরুদেব, আমি একটা অবাঙালি পাঞ্জাবী ছেলে, আপনার গান আমি ভালবাসি—প্রাণ দিয়ে আপনার গান গাই কিন্তু এই ছবিটাতে আমি এ গানটা গাইছি, গল্পের নায়িকার জন্যে। সেখানে তাকে কবি বলে ডেকে, কিছু বললে কি ঠিক হবে ? তাছাড়া নায়িকাকে কবি বলতে আমার কেমন যেন ভাল লাগছিল না, কবি বললে তাকে কিরকম পুরুষ পুরুষ মনে হচ্ছিল। তাই আমি আপনার সুর, তাল, ছন্দ, মানে—সব ঠিক রেখে শুধু 'কবি' শব্দটার জায়গায় 'জানি' বলতে চেয়েছি।

কবি মন দিয়ে শুনলেন। সস্নেহে সায়গলকে একটু চেয়ে চেয়ে দেখলেন। মুখে তীক্ষ্ণ হাসি। তারপর বললেন—ঠিক আছে। শুধু এই ছবিটার জন্যে চেঞ্জটা কোরো। কিন্তু পরে তুমি যখন আবার গ্রামোফোনের জন্য রেকর্ড করবে, ডিস্কের জন্যে গানটা গাইবে তখন কিন্তু আমার কথাটা রেখো। অনুমোদনের সঙ্গে কবি নির্দেশটাও লিখে দিয়েছিলেন। পরের দিন, সায়গল কবির লেখাটা মাথায় করে, নাচতে নাচতে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে ফিরে এসেছিলেন। কবি সে রাত্রে খাইয়ে দাইয়ে সায়গলকে শান্তিনিকেতনে রেখে দিয়েছিলেন এবং সন্ধ্যায় সায়গলকে বসিয়ে তার মুখ থেকে অনেক গানও শুনেছিলেন। এরপর শুনেছি অনেক দিন বাদে রবীন্দ্রনাথ নাকি কোন অবকাশে, শচীনদেব বর্মনকে বলেছিলেন 'হ্যাঁরে, সায়গল অবাঙালি হয়ে আমার গান কতো গায় আর তুই বাঙালি হয়ে, আমার গান তো করিস না, কেন রে' ? চণ্ডী সাহার কাছ থেকেই আমি এ কথাটা শুনেছি।

শচীন কর্তা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান খুব ভাল জানতেন। তার প্রমাণ তিনি বহু হিন্দি ছবির গানেতে, রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বসিয়ে বারবার দেখিয়েছেন।

সায়গলের অনেক নায়িকা ছিলেন, আমি তাঁদের একজনের কথা এখানে বলব। তিনি কানন দেবী।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সংস্পর্শে আসার। অল্পদিন হলেও এসেছি।

একটি মহিলা যিনি জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায়, চেহারায় আচার-ব্যবহারে, কথায় তাঁর প্রযোজনার প্রথম যে ছবি অনন্যা, সত্যিই সেইরকম অনন্যা ছিলেন। জোরে কথা বলতে কখনো দেখিনি। ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে যে কথা বলতেন, আমি বুঝতাম যে উনি হিসেব করে বলছেন। যে কাজটা করতেন, সেটার ব্যাপারে আগে নিশ্চিত হয়ে নিতেন যে তাতে তিনি কৃতকার্য হবেন। তবেই তিনি কাজটা হাতে নিতেন। এমনি তাঁর ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বটি কেমন তা আমি একটা অনুষ্ঠানে নিজের চোখে দেখেছি। তখন কলকাতায় রবীন্দ্রসদন হয়নি। মহাজাতি সদনের বাড়িটা হয়েছে কিন্তু তখনো ছাদ হয়নি, মাথার ওপর টানা ত্রিপল খাটিয়ে ঢাকা দেওয়া থাকত। সে কি আজকের কথা। সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের নামকরণ ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন সেই ১৯৩৯ সালের ১৯ শে আগস্ট। বহুকাল বাদে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে এর ছাদটা তৈরি হয়। এর আগে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র একবার একটা রসিকতা করেছিলেন এই নিয়ে, তিনি বলেছিলেন—আমার বাড়িতে একটা ছাতা আছে যেটা আমার মাথার ওপরে ছাদের কাজ করে কিন্তু মহাজাতি সদনের বাড়িটা রয়েছে অথচ তার মাথার ওপর দেবার মত একটা ছাদও কোথাও রাখা নেই। যাক্ ওটা অন্য কথা, যে কথা বলছিলুম—

একটা অনুষ্ঠানে তখনকার দিনের রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন। পৌঁছুতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, তখন সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই অবস্থায় কানন দেবী এসে পড়লেন। কিন্তু তাঁকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর সায়েব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গভর্নরকে দাঁড়াতে দেখে অন্যসবাই একযোগে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি মুগ্ধ অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখেছিলাম। দেখেছিলাম একজন অভিনেত্রীর সম্মান, কি শ্রদ্ধার এই ব্যক্তিত্ব। তার মানে কানন নিজেকে যেভাবে কাননবালা থেকে কানন দেবীতে উত্তীর্ণ করেছিলেন তা ভাবতে গেলেও বিস্ময় লাগে। তাঁর জীবনযাত্রায় কি ডিসিপ্লিন! সাধারণ কথাবার্তা, দেখাশোনাও আমার সঙ্গে অনেক হয়েছে। কিন্তু তিনি তো বেশি কথা বলতেন না। কিছুক্ষণ সময় হয়ে গেলেই উনি স্পষ্ট মুখের ওপর বলতেন, 'আচ্ছা বাবা, আমি এবার একটু কাজ করি। আজকে তুমি এসো'। তারপর একটু থেমে, আবার এসো কিন্তু—এটাও বলতেন। আমি তাঁকে সঙ্গীত নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করতুম। একবার তাঁর গান শেখা, অভিনয় এসব নিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন আমি প্রথমে গান শিখেছি, বলতে গেলে এর ওর তার কাছে এমন কিছু নয়। ছোট বয়সেই পেটের তাগিদে রোজগারের ধান্দায় নামতে হয়েছিল।

কলকাতায় ওয়েলিংটনের মোড়ে কমলালয় স্টোর্সের বিশাল বাড়ি ছিল, এখনো আছে, তবে সে আদি বাড়ি আর নেই। তখন এটা, কলকাতায় বাঙালিদের তৈরি করা প্রথম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, এত বিরাট যে আমার বাবাদের বলতে শুনেছি

ওখানে মোটর গাড়ি থেকে পাঁচফোড়ন সব পাওয়া যায়। সে যাই হোক, ওইখানে কমলালয়ে স্টোর্সের বিশাল বাড়ি ঘর ওঠবার আগে, ওই জমিতে যে 'চীপ থিয়েটার' বলে অস্থায়ী গোছের (এখনকার লোকেরা হয়ত জানে না) একটা ছোটখাট থিয়েটার চলত তার প্রবেশ পত্র ছিল—চার আনা, আট আনা আর এক টাকার টিকিট। আগেকার দিনে বিয়ে বাড়িতে, ভেনেস্তাকাঠের যে হলদে রঙের ফোল্ডিং চেয়ার ব্যবহার হত, তাই এখানে পাতা থাকত। সেগুলো থেকে সব সময়েই মচ্‌মচ্‌ শব্দ ছড়াতো। মাথার ওপরে ত্রিপল—খানিকটা জায়গা দরমা দিয়ে পার্টিশন করে ঘেরা থাকত থিয়েটারের লোকজনের, মেকআপ সাজগোজের জন্যে। ওখানে আমি প্রথম স্টেজে নামি। ওখানে কি একটা নাটকে আমি প্রথম অভিনয় করলাম। তা সেটা মোটামুটি চলল। তারপর আমি আর সুলালবাবু, মানে জহর গাঙ্গুলী অভিনয় করলাম রবীন মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকে। এটা কিন্তু খুব চলেছিল—তাই লোকের নজরে পড়লুম। এই নাটকে বেশ কয়েকটা গানও ছিল, আর সেইজন্যে এখান থেকেই আমার গান লোকে প্রথম শুনল। আর সেই থেকে একটু একটু নামও হল। এইখান থেকেই বলতে পারো, আমার কিছুটা ভাগ্য পরিবর্তন হল। তবে জানো বিমানবাবু, এইরকম ভাগ্য পরিবর্তন আমার অনেকবার হয়েছে। কানন দেবী বলছেন—একেবারে ছোট বেলায় হতদরিদ্র ছিলাম। হ্যাঁ, যাকে বলে হতদরিদ্র্‌। আমার তখন কি নাম ছিল জানো ? আমার নাম ছিল মেথরি। অর্থাৎ লেডি মেথর মানে মেথরানী। আমার চেহারাটা কেমন ছিল তা জানি না। তবে তখন যে খুব রোগা ছিলাম এইটা মনে আছে। আর আমার বাবা-মার চেহারা কেমন ছিল, এতকাল পরে এখন আর তা বলা যাবে না। এইভাবে অভিনয় টভিনয় করেছি কিন্তু আমার গান লোকের বেশি ভাল লাগত। বলতে গেলে আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় শিল্প হচ্ছে—সঙ্গীত একথা আমি বারবারই বলব। আমি বহুলোকের কাছেই গান শিখেছিলাম তবে তাঁদের মধ্যে সতীশ বলে একজন ছিলেন, তাঁর পদবীটা আমার মনে নেই, তাঁর কাছেই বেশি শিখেছি। উনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুণী শিক্ষক ছিলেন।

যদ্দূর মনে হয় ওই সতীশবাবুর পদবী ছিল অর্ণব—সতীশ অর্ণব। লোকে জানতেন পাঁচুবাবু বলে। ওঁরই সেজ মেয়ে ছিলেন বিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী বেলা অর্ণব। ওঁরা কেউই এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। সতীশবাবু তখন উত্তর হাওড়ার সালকেতে থাকতেন আর বহু ছাত্রছাত্রীকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম দিতেন।

বিমান—হ্যাঁ উনি বলেছিলেন যে একজন মিশ্র পদবীর হিন্দুস্থানী ওস্তাদের কাছেও গান শিখেছিলেন। নামটা মনে নেই তবে তিনি যে রামকৃষ্ণ মিশ্রর ঘরের কেউ হবেন—তা সে কথাটা বেশ মনে পড়ে। এছাড়া কানন দেবী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও নাড়া বেঁধে কিছুদিন গান শিখেছিলেন। একই সঙ্গে রাইচাঁদ বড়াল বা পঙ্কজ মল্লিকের কাছেও শিখেছেন। আরো পরে, তিনি বলছেন, 'আমি ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, অনাদি দস্তিদার এঁদের কাছে গান শিখেছি। এইভাবে গানের এক একটা

ধারায় আমি ভেসেছি। পঙ্কজদার গান গেয়েছি, তখন কিন্তু পঙ্কজদাকে মাথায় রেখেছি। রাইচাঁদ বড়ালের গান করেছি রাইচাঁদকে মাথায় রেখেছি। আর একজনের নাম বলছি তাঁর কাছেও শিখেছি—জ্ঞান দত্ত, দেখ, আজ আর তাঁর নাম কেউ করে না। এই পৃথিবীতে আমি একজনকেই বাবা বলে কথা বলতুম—তিনি মেগাফোন কোম্পানীর মালিক জে. এন. ঘোষ—যাঁর নাম জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ। তিনি আমাকে মস্ত বড় আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমার জন্যে এবং রাইবাবুর জন্যে মেগাফোন কোম্পানীতে আলাদা ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন'। এখানে আরো একটা কথা বলি যে—এত জনের কাছে গান শেখার পর কানন দেবী কিন্তু স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের কাছে। কাজীদার কাছে শিখে উনি কিছু বেসিক গান রেকর্ড করেছিলেন। এটা অনেকেই জানে না মেগাফোনের। কাজী নজরুলের একটা গান উনি আমায় রেকর্ড থেকে শুনিয়েছিলেন এবং রেকর্ড থেকে আমি সেই গানটা তুলেছিলাম—'এস বসন্তের রাজা আমার/বোসো হৃদয়ের সিংহাসনে' এ গানটা আমি আর কোথাও শুনিনি। আমিও কোন রেকর্ড করিনি বা করাইনি। মানবেন্দ্রকে গানখানা তুলিয়েছিলাম কিন্তু রেকর্ড করানো আর হয়নি। নজরুলের আরো কয়েকটা গান উনি রেকর্ড করেছিলেন। এই গান শেখার ব্যাপারে উনি আমায় কতো কথাই বলতেন। যেমন তিনি বলতেন—'রাইদা অর্থাৎ রাইচাঁদ বড়ালের শেখানোর পদ্ধতি একরকম। উনি বিরাট সঙ্গীতজ্ঞ। রাইদা নিজের গলায় গেয়ে আমাদের বোঝাতে পারতেন না। মস্ত বড় তবলিয়া, মস্ত বড় পিয়ানো বাদক, দারুন অর্গ্যান বাজিয়ে কিন্তু রাইদা কোন কালেই গায়ক ছিলেন না।

সে সুবিধাটা পঙ্কজদার ছিল, পঙ্কজদা নিজে গেয়ে গেয়ে দেখাতে পারতেন। রাইদা অতবড় সুরকার, স্রষ্টা অথচ নিজে গেয়ে আমাদের বোঝাতে পারতেন না। মুনসী বলে নিউ থিয়েটার্সের একজন সারেঙ্গী বাদক ছিলেন। রাইদা এই মুনসীজীকে সঙ্গে রাখতেন, রাইদা যে নোটেশন বলে যেতেন মুনসীজী সেটা সারেঙ্গীতে বাজাতেন। আমরা সেই সারেঙ্গীর সুর শুনে, গান তুলতাম। এইজন্যে রাইদা মুনসীজীকে অনেকগুলো করে গান তোলাতেন। সাথী ছবির গানের কথা ধরো। সাথীর অনেকগুলো গান মুনসীকে তুলিয়ে রেখেছিলেন। আবার কিছু কীর্ত্তনের বিশেষ অঙ্গও তোলানো ছিল—যেমন অঙ্গনে আগুন যব্ বসিয়া-আ। এইরকম আরও কত। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতুম। এইভাবে রাইদার কাছে গান শিখেছি এবং শেখা মানে—রাইদারও ধৈর্য এবং আমারও ধৈর্য। তার পরীক্ষাও হত। এমন এমন দিন গেছে ধরো 'পরিচয়' ছবি কি 'সাথী' দীর্ঘক্ষণ ধরে গান তোলা চলছে তো চলছেই। পরিচালকরা, নীতিন বসু বা ফনী মজুমদার হয়ত রাইবাবুকে বললেন—আজ অনেকক্ষণ হয়েছে, আজ না হয় থাক্।

রাইবাবুর গম্ভীরভাবে বলতেন—থাকবার জন্যে তো শুরু করিনি। আবার শুরু হল, যতক্ষণ না নিঁখুত হয় ততক্ষণ চলবে।

আবার দেখ, পঙ্কজদার মিউজিক রুমে যখন গেলুম তখন হয়ত পঙ্কজদা তাঁর

নিজের সুর করা একটা গান হাতে ধরিয়ে দিলেন। 'ওগো সুন্দর, মনের গহনে তোমায় মূরতি খানি।' এবার গানটা তোলাবার জন্যে পঙ্কজদা বোঝাবেন 'কেন' ? 'কী জন্যে'। গানটার সিচুয়েশন কী, ওই 'সুন্দর' কে। তারপর উনি নিজে গানটা ধীরে ধীরে পড়বেন—একবার মোটামুটি গেয়ে শুনিয়ে দেবেন। তারপর বলবেন এইবার আগে গানটা দু তিনবার ভাল করে পড়ো। 'মনের গহনে তোমার মূরতি খানি, ভেঙে ভেঙে যায়, মুছে যায় বারে বারে, বাহির বিশ্বে তাইতো তোমারে টানি'।

এবার সুরটা তোলাতে শুরু করলেন, একটু একটু করে। বললে বিশ্বাস করবে না, কানন দেবী বলেন—'সকাল দশটা থেকে প্রায় পৌনে বারোটা পর্যন্ত কোনক্রমে হল, প্রথম দুটো লাইন। একখানা তো গান—বেলা তিনটের সময় বললেন এবার থাক, আজ আদ্ধেকটা হল, কাল বাকিটা শেষ করতে হবে। এই হলেন পঙ্কজদা একেবারে নিজের মনোমত না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ান নেই। ওঁর একটা নিয়ম ছিল উনি যেটি বলবেন, সেটি কমা, ফুলস্টপ পর্যন্ত একেবারে নিখুঁতভাবে করতে হবে। উনি যেখানে যতোটা নিঃশ্বাস নেবেন আমাকেও ঠিক সেইভাবে ততোটুকুই করতে হবে। তার মানে পঙ্কজদা শিল্পীর ভেতর নিজেকে যেন ঢুকিয়ে দিতেন।'

এতে আমি বলেছিলুম এটা কি খুব ভাল হোত ? কানন দেবী বলেছিলেন—'না, স্বাধীনতা যে ছিল না, তা নয়। আমাদের হয়ত কিছু বলতে ইচ্ছে করত, কিন্তু আমরা তা বলতুম না। জানতুম যে পঙ্কজদা কতো ভেবে, গানের ভেতর অব্দি ঢুকে গিয়ে যা করেছেন, তার সঙ্গে আমার ইচ্ছে না মিললে পঙ্কজদা কিছুতেই অ্যালাউ করবেন না।' আমরা তখন শিখেছিলুম যে মাস্টার মশাই যেমনটি বলবেন আমাদেরও ঠিক তেমনটিই করতে হবে। আমরা তাই অন্যরকম কিছু বলতে চেষ্টাও করতুম না। আর পঙ্কজদার মত বিরাট মানুষের কাছে তা সম্ভবও ছিল না।'

ওই সময়ে কানন দেবী কৃষ্ণচন্দ্র দের কাছেও গান শিখেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কানন দেবীকে নাকি অনুরাধা বলে ডাকতেন। বিদ্যাপতি ছবিতে, কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে কানন দেবী এমন হৃদয় স্পর্শী ভাবে অনুরাধার পার্ট করেছিলেন যে তারপর থেকে উনি কাননকে অনুরাধা বলেই ডাকতেন। মাঝে মাঝে আবার কাজী নজরুলের লেখা ওই ছবির সংলাপের ভাষায়, সস্নেহে বলতেন—'রাধে।' এই ছোট্ট ডাক থেকেই কিন্তু বোঝা যায় তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ভালবাসার সম্পর্ক কি গভীর অনুভবের স্তরে পৌঁছেছিল। কানন দেবীর ক্ষেত্রে বারবার ভাগ্য পরিবর্তনের কথা উনি আগেই বলেছেন। এক ফাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলুম উনি নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন ?

তাতে উনি, রেগে কিনা জানি না, বলেছিলেন—তোমার অত জানবার ইচ্ছে কেন বলো তো! কি দরকার ?

আমি বললুম এমনিই, আমার সব কিছু জানতে ইচ্ছে করে, ভাল লাগে। আসলে

উনি, মাইনে কিছু বাড়াতে বলেছিলেন কিন্তু তখন নিউ থিয়েটার্সের কর্তারা তাতে রাজি হননি। তাঁদের বক্তব্য ছিল কোম্পানীর অবস্থা এখন ভাল নয়, পরপর অনেক ছবি ফ্লপ করেছে, বাজারে মার খেয়েছে, তাই এখন টাকা পয়সা বাড়ানো সম্ভব নয়। কানন দেবী বলছিলেন—'অতএব ছেড়ে দিলাম। দুঃখ পেয়েছিলাম তবুও একটু অভিমান করেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখন যুদ্ধের সময়।কলকাতায় বোমা-টোমা পড়ছে, আমারও হাতে কাজকর্ম নেই। মেট্রো সিনেমায় বড়ুয়া সায়েবের সঙ্গে একদিন দেখা, সেই সূত্রে আমি এম. পি প্রোডাকসনে যোগ দিয়ে, অনেক কাজই করেছি। ওখানে এসে দেখলুম বড়ুয়া সায়েবের সব কিছু কড়া ডিসিপ্লিনে বাঁধা। ওখানেই দেখলুম কমল দাশগুপ্তকে—ওঁদের মিউজিক ডিরেক্টর। বিরাট নামডাক। তাঁর সুরে, অনেক শিল্পীর মুখের গান শুনেছি, মুগ্ধ হয়েছি। মনে মনে একটা ইচ্ছে ছিল ওঁর সুরে আমিও গান গাইলে আমার খুব ভাল লাগবে। কিন্তু কমল দাশগুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে খুব কঠোর টাইপের মানুষ ছিলেন। অতবড় রসিক মানুষ কিন্তু রসবোধটা তাঁর বাইরে তেমনভাবে বেরোত না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হত বড় কঠোর, কঠিন। এমনও হয়েছে, আমার একটু সময়ের হেরফের হয়েছে উনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। আমি পঙ্কজবাবুর সুরে, রাইবাবুর সুরে বাংলা, হিন্দি, উর্দু অনেক গানই গেয়েছি। কমল দাশগুপ্তর সুরেও অনেক ছবিতে গান গেয়েছি—বাংলা, হিন্দি ডবল ভার্সানে। কমলবাবুর ট্রেনিং-এ প্রথম ছবি করেছিলুম 'শেষ উত্তর।' এই ছবিতে চারখানা গান গেয়েছিলাম। সেই চারখানা গানই এখনো লোকের মনে বেঁচে রয়েছে—সেগুলোর ক্যাসেট এখনো বাজারে খুব বিকোয়। দেখ না, লতা মঙ্গেশকরের মত শিল্পী এতদিন বাদে আমার সেই সব গানের, হিন্দি ভার্সানের রি-মেক করলেন। পরের ছবিটা হল যোগাযোগ হিন্দি ভার্সানে 'হসপিটাল'। শেষ উত্তরেরও হিন্দি ভার্সান হয়েছিল 'জবাব।' সত্যি অবাক লাগে এই চারখানা ছবির রেকর্ড বিক্রী করে সে যুগে, উনি নাকি দেড়-দুলাখ টাকা, রয়ালটি পেয়েছিলেন। ভাবো তখনকার দিনের দেড়-দুলাখ! আমি এখনও ভাবতে পারি না যে আজকের দিনে, এখনকার একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীও এই পরিমাণ টাকা পেতে পারেন, বিশেষ করে বাংলা গানের শিল্পী! তবে তখন বাজার খুব বড়ো ছিল। দেশ ভাগাভাগি করে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়নি, ওদিকে মিশর, আফ্রিকা বা আরবের দেশ থেকে অন্যদিকে বর্মা, সিঙ্গাপুর, জাভা, ইন্দোনেশিয়া, মালয় এই বিস্তৃত অঞ্চলে ভারতীয় রেকর্ডের বা হিন্দি, উর্দু ফিল্মের খুব কদর ছিল, চাহিদা ছিল। তার ফলে কানন দেবীর রেকর্ডও বিক্রী হত। আমি এই লাইনে কাজ করছি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে—অনেক দেখেছি। এই অল্প কয়েকটা ছবির গান থেকে এই পরিমাণ টাকা পাওয়া যে সম্ভব, তা এখনও ভাবতে পারি না।

তাঁর গান সে সময়ে মানুষকে কতো নাড়া দিত বা সে গান তাঁদের মনের অন্তঃস্থলে কিরকম স্থায়ীভাবে গেঁথে যেত, তা সাম্প্রতিক কালের একটা বাস্তব ঘটনার কথা শুনলে, হয়ত হৃদয়ঙ্গম হবে।

গুরুতর অসুস্থ স্মৃতিভ্রংশ চলৎশক্তিহীন, প্রায় অচেতন বাক্‌শক্তিহীন সত্তর ছুঁই-ছুঁই শয্যাশায়ী এক রোগিনী হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে যেন বলে উঠলেন আমি—গান শুনব। বিস্ময়ে সবাই চমকে উঠল। ডাক্তারবাবু বললেন অতি সুলক্ষণ। মনে হচ্ছে ব্রেন যেন কাজ করতে শুরু করেছে। বোধশক্তি. বাকশক্তি বোধহয় ফিরে আসছে। এক্ষুনি একটা গান লাগাও!

সঙ্গে সঙ্গে একটা খুব জনপ্রিয় বাংলা আধুনিক গানের ক্যাসেট চালিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু জরাজীর্ণ প্রবীণার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না আবার সেই নিথর, অসাড় অবস্থা। ক্যাসেটের পুরো এক পিঠ শেষ হয়ে গেল তবু রোগিনী ঘোরাচ্ছন্ন. চোখ বোজা। কিছুক্ষণ বাদে আবার শোনা গেল ফিসফিসিয়ে বলছেন কাননবালার গান—'আমি বনফুল গো, আমি বনফুল....' আবার ঢলে পড়লেন চেতনাশূন্য গভীরে। তাড়াতাড়ি কানন দেবীর ওই গানটা জোগাড় করা হল। অমনি বেজে উঠল, এককালের সেই অমোঘ, প্রাণ মাতানো 'আমি বনফুল গো, ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে...' আর সেই সুরে তালে, শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল, চোখ দুটো খুলে গেল—তাতে উপলব্ধির সংকেত। এতদিনের নির্বাক ঠোঁট-দুটো, মনে হল যেন অস্ফুট শব্দে গানের কথাগুলো আওড়াচ্ছে। দেখা গেল কানন দেবীর গানের জাদু, সঞ্জীবনী শক্তি! অবিশ্বাস্য এক গল্পের মত তবু এটা চোখে দেখা নির্ভেজাল সত্য। মনে হয় কানন দেবীর গানের, এর থেকে ভাল মূল্যায়ন, আর হয় না।

বিমান—সেই, যে-কথা বলছিলুম, আবার সেই ভাগ্য পরিবর্তনের কথাই উঠে আসছে। সিনেমার স্টার হিসেবে নামযশ, অত অর্থ, এত জনপ্রিয়তার মাঝখানে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল কলকাতার সম্ভ্রান্ত মহলে, ব্যারিস্টার অশোক মৈত্রর সঙ্গে। গোঁড়া ব্রাহ্ম সমাজের প্রবাদ প্রতিম কট্টর ব্রহ্মবাদী, হেরম্বচন্দ্রর একমাত্র ছেলের বৌ হবার কারণে সে কালের পত্র পত্রিকায়, একেবারে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। এ এক উচ্চতম সামাজিক স্তরে সম্পূর্ণ নতুন জীবনের অধ্যায়। কিন্তু ঘন ঘন ভাগ্য পরিবর্তন—কে আর খণ্ডাবে! শুরু হল অনিশ্চিত একক জীবন। বহু কুৎসা অমর্যাদাকর গুজব, গুঞ্জনের মধ্যে দেখা হয়ে গেল হরিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে, পশ্চিম বাংলার গভর্নর কৈলাসনাথ কাটজুর এ ডি কং, এই সুঠাম সুপুরুষটির সঙ্গে বিয়ে হল ১৯৪৯ সালে—ভাগ্যের আবার একটি পরিবর্তন। একটি ছেলে হল রানা। ছোটবেলা থেকে অসুস্থ একমাত্র ছেলেকে নিয়ে আবার একটা অন্য স্বাদের জীবন। রানাকে নিয়ে একটা গানও তিনি খুব গাইতেন—'বাবলু আমার সোনা আমার'।

এর আগে, ১৯৪৬ সালে বম্বেতে গিয়ে ছবি করার জন্যে চার লাখ টাকা মাইনের প্রস্তাব অনেক সাধাসাধিতেও উনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিছুতেই রাজী হননি। কলকাতার বাইরে যেতে চাননি। ১৯৪৭-এ অশোককুমারের সঙ্গে 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছিলেন, কমল দাশগুপ্তের সুরে, সেই বিখ্যাত গান 'অনাদি কালের স্রোতে।' এ ছবিতে তাঁকে সওয়া লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল, যা সে যুগে ভাবা যেত না।

এরপর তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে আর অন্যলোকের ছবিতে নয়। এবার তিনি নিজেই ছবি প্রযোজনা করবেন। নিজের পছন্দমত ছবি তৈরিতে হাত দেবেন। ইতিমধ্যে তিনি বহু টাকা দিয়ে শরৎচন্দ্রের অনেক গল্প উপন্যাস কিনে রেখেছিলেন। আবার ভাগ্য তাঁর কর্মজীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ১৯৪৮ সাল থেকে তাঁর নিজের শ্রীমতী পিকচার্সের ব্যানারে, পরপর অনেক ছবি পর্দায় আসতে শুরু করল—প্রথম 'অনন্যা' তারপর 'মেজ দিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'নববিধান', 'শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি', 'বামুনের মেয়ে', 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত', 'আশা', 'অভয়া ও শ্রীকান্ত'। প্রযোজনা কানন দেবীর আর বেশির ভাগের পরিচালনায় স্বামী হরিদাস ভট্টাচার্য। 'শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি' যেমন তাঁর শেষ অভিনীত ছবি তেমনি 'অভয়া ও শ্রীকান্ত' তাঁর প্রযোজনার শেষ ছবি। আর জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনায় ছবিতে শেষবার গান গেয়েছিলেন, নিজেরই প্রযোজনায় 'আশা' ছবিতে যেটা একেবারে ফ্লপ হয়েছিল। তবে তাঁর প্রযোজনায় শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো', যাতে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন সুমিত্রা দেবী আর বসন্ত চৌধুরী সেই ছবিটা শুধু রাষ্ট্রপতির পদক পায়নি দেশে-বিদেশে বেশ প্রশংসিতও হয়েছিল। আমি তো বোধহয় এই একজনকেই দেখেছি যিনি ঠিক কোথায় থামতে হয় তা জানতেন। এটা বড় কম কথা নয়। অনেক আগে, গান থেকে সরে এসেছিলেন, গান বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবার অভিনয় থেকেই একেবারে অবসর নিয়ে নিলেন।

কিন্তু গান যা তাঁর প্রাণ, সেই গানও তিনি ছেড়ে দিলেন কেন ? শুনেছিলুম, নিজের অসুস্থ শিশু পুত্রের আরোগ্য কামনায় তিনি নাকি তাঁর সবথেকে প্রিয় জিনিস গান গোপালকে উৎসর্গ করেন, গান ছেড়ে দেবার মানৎ করেছিলেন—তাই কি ?

বিমান—ও নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে আমি যদ্দূর জানি যে 'আশা' ছবিতে নিজের গান শুনে উনি বুঝে নিয়েছিলেন যে—'আমার আর গান গাওয়া উচিৎ নয়। দম কমে গেছে, সুর কমে গেছে, সুর আর ঠিকমত লাগছে না, অতএব আর নয়, এবার গানে ইতি।' একথা উনি নিজে বলেছেন। উনি আরো বলেছিলেন —আমি চাই যে লোকে আমার যৌবনটাকে মনে রাখুক। শিল্পী হিসেবে আমি যে আজ বুড়ো হয়ে গেছি এই ছবিটা, লোককে আমি বুঝতে দিতে রাজী নই।

এ এক আশ্চর্য জীবন। সামাজিক জীবনে, একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে, তিনি জীবনে কী না পেয়েছেন—মান, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি, শ্রদ্ধা কী নয় ? সব কিছু যেন উপছে পড়েছে। চলচ্চিত্রেব সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (১৯৭৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট (১৯৯১) ভারত সরকারের পদ্মশ্রী উপাধি (১৯৬৮) ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ এর স্বাধীনতার মুহূর্তে, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতের হাইকমিশনার কৃষ্ণ মেননের দেওয়া সম্বর্ধনা—এত সব ক'জন মানুষের ভাগ্যেই বা জোটে ?

এই পরিবর্তন, আবার আমি শেষের দিকে দেখেছি। বাড়িতে তিনি তাঁর ঠাকুর গোপাল অন্ত প্রাণ। তাঁকে নিয়েই তাঁর সারাদিনের খেলা। সাজাচ্ছেন, গোছাচ্ছেন,

গান শোনাচ্ছেন গুনগুন করে। শেষের দিকে আমি দেখেছি—একাএকাই তিনি অস্ফুট সুরে গোপালের সামনে গান গাইছেন। পুজোর ঘরে ঢুকতেন এগারোটা সাড়ে এগারোটায়। মাটিতে বসতে অসুবিধে হত তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভজন পূজন করতেন। রবীন্দ্রনাথের গানও করতেন, সেই গানেই গোপালের পুজো হয়ে যেত।

এখানে আমি তোমায় একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলি—আর কারুর সঙ্গে তা মিলবে কি না, জানি না। দেখ, 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে', বা 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে' কানন দেবীর এ গান আমি ১৯৪১ থেকে অজস্রবার শুনেছি। কিন্তু এরকম গান আমি আর কারও কাছে শুনিনি। আজ পর্যন্ত অনেকবার রেকর্ড হয়েছে অনেকেই গেয়েছেন কিন্তু কানন দেবীর মুখে যেমনটা শুনেছি অন্য কারুর গান যেন তেমনটা আর কানে লাগে না। উনি বলেছিলেন তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি উনিও নিজেকে অনেকবার পরিবর্তন করেছেন, নিজেকে যুগপোযোগী করেছেন। ১৯৯১ সালের ১৭ই জুলাই তিনি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। এর ক'দিন আগেই আমি দেখা করে এসেছি। সেদিন বলেছিলুম আমি আপনার গান নিয়ে, আমার ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে একটা প্রোগ্রাম করাব বলে আপনাকে বলতে এসেছি। উনি বললেন—আমার গান তুমি ছেলেদের দিয়ে গাওয়াবে কেন ? তুমি যদি গাও তাতে আমার বলার কিছু নেই। তা না হলে আমার গান মেয়েদের দিয়ে গাওয়ানোই ভাল। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী, কিছু গান ইন্দ্রানী (সেন)কে দিয়ে গাইয়েছিলাম। টিভিতে প্রোগ্রামটা হয়েছিল ১৭ ই জুলাই।

কিন্তু দেখ, কানন দেবী সেদিন ওই ১৭ তারিখেই মারা গেলেন। আমার দুঃখ রয়ে গেল যে এ প্রোগ্রামটা তাঁকে আর দেখাতে পারলুম না। এর কিছু দিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল নন্দনে। সেদিন ওখানে এইচ এম ভি থেকে পণ্ডিত রবিশঙ্করকে সম্বর্ধনা দেবার একটা অনুষ্ঠান ছিল। কানন দেবী ওই সভায় এসেছিলেন ধীর পদক্ষেপে, হাতের লাঠিতে ভর করে। আমার ছোট ভাই নিতাই, সেদিন আমার সঙ্গে ছিল। তাকে কানন দেবীর কাছেনিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম। তাতে ওঁর মুখের স্মিত হাসিটুকুতে যে স্নেহের প্রশ্রয় দেখেছিলুম তা, আজো যেন দেখতে পাই।

তাঁর মত পরিশীলিত সৌজন্যবোধ বিনয় নম্রতা আমি খুব কমই দেখেছি, বিশেষ করে যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে তাঁদের মধ্যে। অথচ কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে তার মধ্যে—দৃঢ়তার অভাবও কখনো দেখিনি। এত পরিমার্জিত ছিল ওঁর সহবত যে, কারুর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ থাকলেও কোনরকম শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া, তাঁর স্বভাবেই ছিল না। ধরো, কেউ তাঁকে দুটো বাজে কথা বলেছে বা রূঢ় কথা শুনিয়েছে। কানন তখন কিন্তু বলবেন, একেবারে তাঁর নিজের ভাষায়—'উনি হয়ত একটু মাথা গরম মানুষ তাই ওইভাবে কথাটা বলেছেন। আমিও তো ওঁর


কৃষ্ণচন্দ্র দে

কাছে হয়তো কতভাবে ঋণী!' বোঝো, শিষ্টতার কি প্রকাশ। আমি গভীরভাবে অনুভব করি যে শিল্পী হিসেবে, আমি যতজনের সংস্পর্শে এসেছি, আমার মনের একটা গভীরতর জায়গায় কানন দেবী, দেবী হয়েই রয়ে গেছেন।

এইরকম আর একজনের কথা, আমার খুব মনে পড়ে। নানা প্রসঙ্গে এঁর কথা আগেও একটু আধটু বলেছি। কৃষ্ণচন্দ্র দে—সে যুগে বাঙালির ঘরে ঘরে মা-ঠাকুমারা ভালবেসে বলত কানাকেষ্ট। রেকর্ডে ছায়াছবিতে লেখা থাকত বাংলায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) আর হিন্দিতে কে সি দে (ব্লাইন্ড সিঙ্গার)। আমার বাবার সঙ্গে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। বহুকাল আগে, আমি যখন কৃষ্ণচন্দ্রর কাছে প্রথম গেছি তখন আমরা সব ছাত্র।

বেসরকারিভাবে সভা করে, কলকাতায় আমরাই প্রথম নজরুলের জন্মোৎসব পালন করতে শুরু করেছিলাম সম্ভবত ১৯৪৮ থেকে। এবং প্রতিবছর এর জন্যে আমাদের অনেক চেষ্টাচরিত্র করে, ব্যবস্থা করতে হত। আমাদের এই ছেলে ছোকরাদের দলে উদ্যোগী ছিল যেমন মতি নন্দী, সুব্রত নন্দী, গোষ্ঠপালের ছেলে জ্ঞানাংশু পালদের মত অনেকে তেমনি কবি শৈলেন রায়, সুরেশ চক্রবর্তীর মত মানুষরাও আমাদের নানাভাবে উৎসাহ দিতে আসতেন। প্রথম প্রথম পাড়ায় ছোট করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। পরে যখন এটা একটু বড়সড়ো হল তখন যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউতে একটা বড় বাড়িতে, এখন যেটা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, সেখানে হত। এটা সতীন্দ্রনাথ লাহা মস্ত বড় শিল্পী, সম্ভ্রান্ত ধনী মানুষের বাড়ির হল ঘর। আমরা সব তখন ছাত্র। কবি শিবশম্ভূ পাল হাতে লিখে কার্ড বা চিঠি তৈরি করে দিতেন—ছাপবার মত পয়সা তো ছিল না। এরকম একবার, জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে কাকে সভাপতি করা যাবে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। সবাই বললে এবার কৃষ্ণচন্দ্র দেকে আনা হোক। কেউ কেউ বললেন উনি কি আসবেন ? বলা যায় না, যা মেজাজী মাথা গরম লোক।

বাবা বললেন—তা যাও না, তোমরা নিজেরা গিয়ে বলে কয়ে দেখ, আসেন কি না। ঠিক আছে। আমি আর সুব্রত নন্দী দুজনে মিলে গেলুম মদন ঘোষ লেনের বাড়িতে। গিয়ে দেখি, উনি তখন খালি গায়ে, একতলার ঘরে বসে তানপুরা বাঁধছেন। আমরা একটু সাড়া দিতেই উনি মুখ তুলে বললেন কে ? কি চাই ? ভয়ে ভয়ে বললুম এই আমরা এসেছি—

জলদগম্ভীর প্রশ্ন তোমরা কারা ?

আজ্ঞে আমরা এই পাড়ার ছেলে। আমরা নজরুলের জন্মোৎসব করব, তাতে আপনাকে সভাপতি হবার জন্যে আমাদের অনুরোধ জানাতে এসেছি।

তা আমি নজরুলের অনুষ্ঠানের সভাপতি হব কেন ? আমি তো সাহিত্যিক নই, আর আমি কোনদিন নজরুলের গানও করিনি যদিও তিনি আমার বন্ধু ছিলেন।

একটু থামলেন। পরে, মনে হয়, পাড়ার ছেলেছোকরাদের কথা বিবেচনা করে বললেন—আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি, পরে বলব'খন।

প্রথম দিনের এই কথোপকথন। বাবাকে গিয়ে সব বললাম, তাঁকেই ধরে পড়লাম। বাবা বললেন ঠিক আছে, দেখছি। আমি গিয়ে বলব'খন।

বাবা গেলেন আমিও সঙ্গে। ডাকলেন কেষ্টদা!

কে ? কে গো ?

আমি বামুন সুবল। তখন দুজন সুবল ছিল—একজন বদ্যি-সুবল, সুবল দাশগুপ্ত আর একজন এই বামুন সুবল।

বাবা বললেন—কেষ্টদা, আমার ছেলেগুলো তোমার কাছে এসেছিল, ওরা নজরুলের অনুষ্ঠানের জন্যে সভাপতিত্ব করতে, তোমাকে বলতে এসেছিল। উনি বললেন হ্যাঁ ওরা তো এসেছিল, তবে আমি তো না করে দিয়েছি। বাবা বললেন—আরে আধ ঘণ্টার জন্যে একটু যান, আমি থাকবো আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। উনি খালি বলছেন নজরুলের গান আমি কখনো করিনি যদিও আমি ওঁর সমসাময়িক, তবু বাবা আবার বলাতে কৃষ্ণচন্দ্র ব্যাপারটা বুঝলেন। বাবার কথাতে উনি রাজী হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তা, ক'টার সময় হবে ?

এই ছ'টায়। আমি বললুম।

তাহলে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমার বাড়িতে গাড়ি নিয়ে আসবে। ঠিক ছ'টায় অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে হবে আর আমি কিন্তু সাড়ে ছ'টার বেশি এক মিনিটও থাকব না। আর ওখান থেকে আমি এক জায়গায় যাবো, পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের তো কোন গাড়ি ছিল না। এদিকে, অনুষ্ঠানের দিন, ট্যাক্সিওয়ালারা কেউ ওইটুকু সামান্য রাস্তা যেতে চায় না, মহামুস্কিল। তখন ট্যাক্সিও খুব ছিল না। খোসামোদ করা হল, না-হয় একটাকা বেশিই দেব! তখন মিটার ডাউন হলেই এক টাকা। এইসব দরাদরিতে ওঁকে আনতে যেতে আমাদের সেই মিনিট পনেরো দেরি হয়ে গেল। পৌঁছতেই তোপের মুখে পড়তে হল—ক'টায় আসবার কথা ছিল, আপনাদের কথার ঠিক নেই।

আজ্ঞে সাড়ে পাঁচটায়—এই গাড়ির জন্যে...

আপনাদের কথার ঠিক নেই, ওসব কথা শুনতে চাই না। এখনই মিনিট পঁচিশ লেট। আমি যাচ্ছি, কিন্তু মনে থাকে যেন সাড়ে ছ'টার পর আমি এক মিনিটও বেশি থাকতে পারব না। আর আমায় ওখানে নিয়ে গিয়ে একদম বসিয়ে রাখবে না।

কৃষ্ণচন্দ্রের নামে সভায় বেশ ভিড়। কবি শৈলেন রায়, কমল দাশগুপ্ত, গায়ক চিত্ত রায়েদের মত অনেক নামী মানুষও আসরে এসে জমিয়ে বসেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র

দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন কিন্তু তাঁর এমন ব্যক্তিত্ব ছিল, হাঁটাচলা কথাবার্তায় এমন একটা আভিজাত্য ছিল যে তাবড় তাবড় শিল্পীরা তাঁকে যে কী সমীহ করতেন তা কি আর বলব। সেদিন কৃষ্ণচন্দ্র যে কি অনবদ্য ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা বলে বোঝাতে পারব না। সে সময় তো টেপ রেকর্ডারের জন্মই হয় নি, তাই তাঁর সেদিনের কথা, সব আমার মনেতেই ধরা আছে। নজরুল সম্বন্ধে কতো কথাই না বললেন—নজরুল বয়েসে ওঁর থেকে ৪/৫ বছরের ছোট ছিলেন। উনি বলছিলেন 'নজরুলের লেখা চিত্রনাট্যে আমি অনেক অভিনয় করেছি। এমনিতে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল। নিউ থিয়েটার্সের 'বিদ্যাপতি', 'সাপুড়ে', অনেক গান লিখেছিলেন নজরুল কিন্তু আমার মুখের গানগুলো লিখেছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। রাইচাঁদ ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক। তাঁকে আমি বলে দিয়েছিলাম নজরুল যদি নিজে ব্যক্তিগতভাবে, তাঁর গান গাইতে আমায় অনুরোধ করেন তাহলে আমি গাইব কিন্তু তা না হলে, আপনি বললে আমি গাইব না। নজরুল তো আমায় কোনদিন গাইতে বলেনি। কোনও কারণে আমাদের দুজনেরই হয়ত পরস্পরের প্রতি অভিমান ছিল'। আমার এখনও, বিশেষ করে এই 'অভিমান' কথাটা মনে আছে। তখন পকেটে গোটা ছ'য়েক টাকা নিয়ে আমরা নেমে পড়েছি। দু'আনা-চারআনা করে, চাঁদা তুলে আমরা অনুষ্ঠান করছি। বাবা দশটা টাকা—দিয়েছিলেন তাইতে যা হোক করে, যা হবার হ'ল। ওঁকে আমরা অনেক অনুরোধ করলুম নজরুলের গান না হোক, যে কোন গান একটা গাইতে। গান গাইতে উনি রাজী হলেন না, বললেন, না সভাপতি কখনো গান গায় না। এখানে তো চিত্ত রয়েছে—চিত্ত, তুমি গাও না! অনুষ্ঠান আজ খুব ভাল হচ্ছে আমার খুব ভাল লেগেছে। তোমরা করো আমি এবার যাবো। আমরা অনেক করে বললুম, একটু চা-টা...

আবার সেই মন্দ্রস্বর না, না। আমি বাইরে কোথাও কিছু খাই না। ওঁর সঙ্গে একটি ছেলে ছিল, তাঁর দাদার ছেলে প্রভাস দে। এর পর তার সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ভাল গায়, খুব ভদ্র। তার সঙ্গে আমার এখনো যোগাযোগ আছে, কথাবার্তা হয়। কাকার কীর্ত্তন গানটা এখনো ও বজায় রেখেছে। মান্নাবাবুর বহু গানের সুর করেছে। ওকে নিয়ে, আমি বছর দশেক আগে টিভিতে একবার কৃষ্ণচন্দ্রের গানের বিষয়ে অনুষ্ঠানও করেছিলুম।

কৃষ্ণচন্দ্রের এক নাতি, তাঁর ভাইপো প্রণব দের ছেলে সুদেব দে- এখন বেশ নামটাম করেছে। ক্যাসেট করেছে, আমার কাছেও কিছুদিন শিখেছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের বড় দাদা ডাক্তার ছিলেন, প্রণব তাঁরই ছেলে। আর এক ভাইপো প্রভাস দে-দের 'জনকল্যাণ' নামে একটা ডাক্তারখানা ছিল চীৎপুরে, গণেশ টকীজের কাছে। ওখানে প্রভাস দে নিয়মিত বসতেন। ওরই খুব কাছাকাছি ছিল হরেন শীলের প্রাসাদোপম বাড়ি। কৃষ্ণচন্দ্র কথাপ্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন গানের ব্যাপারে, প্রথম জীবনে তাঁকে, সব থেকে বেশি সহায়তা করেছিলেন চীৎপুর পাড়ার বিখ্যাত হরেন শীল মশাই। কলকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ধনী বহু দানধ্যান, অকাতরে লোকের উপকারে অর্থব্যয়ের জন্যে, তাঁকে সবাই জানতো। তাঁর বাড়িটা, ছোটলাট সাহেবের

গভর্নমেন্ট হাউসের মত দেখতে। সেইভাবে বিশাল প্রাসাদোপম করে ওটা বানানো হয়েছিল। সেই বাড়িটায় এখন লোহিয়া হাসপাতাল হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে এই বাড়ি নিয়ে যে গল্প শুনেছিলাম তা প্রায় মধ্যযুগীয় রাজারাজড়াদের উপকথার মত।

হরেন শীলের বাড়ির প্রধান গেটটা লাটসাহেবের বাড়ির তোরণের আদলেই গাঁথা হয়েছিল। সেইজন্যে ওই গেটের মাথায় ঠিক লাট ভবনের গেটের মাথার সিংহের মত, অবিকল সিংহ তৈরি করা হয়েছিল। হরেন শীলের স্পর্ধা দেখে ইংরেজ সরকার কোর্টে, হরেন শীলের বিরুদ্ধে লাটসাহেবকে অবমাননার অভিযোগে মামলা ঠুকে দিল। এবং যথারীতি কলকাতার কোর্টে হরেন শীলকে দোষী সাব্যস্ত করে মামলায় হারানো হল। হরেন শীলের গোঁ আমিও ছাড়বো না। আমি ফেডারেল কোর্টে যাব, বিলেতে প্রীভি কাউন্সিলে আপীল করব। ওরা বলুক, আমি কোন্ আইনটা ভেঙেছি ! কিসের দোষে দোষী ?

এখানকার সায়েবরা এবার মুস্কিলে পড়ল। এতো বড় সোজা লোক নয়। তাই মুখ রক্ষার জন্যে ওরা একটা সমঝোতার প্রস্তাব পাঠাল। তারা বলল ঠিক আছে সিংহটা থাক। তবে ল্যাজের ডিজাইনটা একটু বদলে শুধু মুখটা উল্টো দিকে যদি ঘুরিয়ে দাও, যাতে লাট ভবনের সিংহর থেকে এটা একটু আলাদা হয়, তাহলেই হবে। শেষ পর্যন্ত এইভাবে রফা করেই নাকি মিটমাট হয়েছিল। এই গল্পটা বলবার সময় কৃষ্ণচন্দ্রকে খুব যেন গর্বিত মনে হোত।

এই হরেন শীল মশাই, কৃষ্ণচন্দ্রকে গান শেখার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিলেন। ইনি নিজেও খুব গানবাজনার ভক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে এ জগতের অনেকের সঙ্গে তার যথেষ্ট জান-পয়ছান ছিল। তাই কৃষ্ণচন্দ্রের জন্যে, তিনি বড় বড় ওস্তাদদের সঙ্গে গাইবার বা তাঁদের কাছে গান শেখবার ব্যবস্থা সহজেই করে দিয়েছিলেন। সেইজন্যে কৃষ্ণচন্দ্র যে তালিম পেয়ে গান শিখেছিলেন তাতে হরেন শীল মশাই-এর যথেষ্ট অবদান ছিল একথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে।

যাইহোক সেদিন কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু প্রায় সাতটা অব্দি ছিলেন যা তাঁর মত কড়া সময়নিষ্ঠ মানুষের ক্ষেত্রে ভাবা যায় না। উনি চলে গেলেন, সবাই তাঁকে প্রণাম করল। উনি বললেন আমায় ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে না। তোমাদের টাকাপয়সার অভাবের কথা শুনেছি। আমায় তোমরা একটা রিক্সাগাড়ি করে, হরিঘোষ স্ট্রীটের একটা বাড়িতে পৌঁছে দাও, তাহলেই হবে। তখন সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ থেকে হরি ঘোষ স্ট্রীটের চার আনা রিক্সাভাড়া ছিল। একটা মানুষ, কি বিপুল নামডাক, অথচ সব কিছু কি ডিসিপ্লিনে বাঁধা। চোখে দেখতে পেতেন না কিছু, তবু তাঁর সামনে দাঁড়াতে ভয় করত—এমনই তাঁর ব্যক্তিত্ব। বিরাট মাপের এই কৃষ্ণচন্দ্র দে, দৃষ্টিশক্তিহীন কিন্তু মঞ্চ, ছায়াচিত্রের অভিনয়ে, সুরকার ও গায়ক হিসেবে রেকর্ড, রেডিও জলসা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে সবেতে কি দুর্দান্ত প্রতিভার স্বাক্ষর। জনপ্রিয়তা যাকে বলে একেবারে, এক নম্বর। ওঁর মুখে আমি—যেমন


রামতারণ সান্ন্যাল

কতো ধ্রুপদ শুনেছি তেমনি আবার চটুল বাংলা গানও অনেক শুনেছি। নানারকমের হিন্দি গানের জন্যে, নানা ভাষার গানের সূত্রে কলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজে তাঁর সদাব্যস্ত জীবনের প্রায় পঞ্চাশটা বছর কেটে গেছে। কৃষ্ণচন্দ্র দে—এই একটা লোককে দেখেছি যিনি নিজেকে আধুনিক করার জন্যে সব সময় নিজেকে যুগপোযোগী করে নিয়েছেন। ওঁর শিষ্যরা, ছাত্ররা যখন বড় হল, উন্নতি করল তখন উনি কিন্তু সানন্দেই তাদের সুরে গান গেয়েছেন, কখনো ইগোর বশে দ্বিধান্বিত হননি।

এখানে মনে পড়ে গেল, নিউ থিয়েটার্সের রাইকমল ছবিটার কথা। ছবির পরিচালক কচিবাবু অর্থাৎ সুবোধ মিত্র বারবার ওই ছবির সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিককে অনুরোধ করেছিলেন—পঙ্কজবাবু, 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধূ' গানটায় নতুন সুর করে আপনিই এ ছবিতে গানটা করুন। এ ছবিতে ওই গানটা, নতুন সুরে আমি আবার দিতে চাই। পরম বিনয়ী পঙ্কজদা, দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—'ওই অনুরোধটি আমায় করবেন না। ওই গানে কেষ্টদা যে ছাপটা জনমানসে ফেলে গেছেন সেখানে আমি গিয়ে নিজের ক্ষতি করতে পারবো না।' একটা কথা থেকে আর একটা কথা এসে পড়ে। এইরকম 'আলিবাবা' ছবি করার সময় পরিচালক মধু বসু কমল দাশগুপ্তকে ডেকেছিলেন সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করবার জন্যে। মধু বসু বলেছিলেন—কমলবাবু, আপনি 'আলিবাবা'-র গানগুলোর জন্যে নতুন করে সুর করুন—আমার ছবিতে, নতুন সুরের গানগুলো দেব। কড়া ধাতের মানুষ কমল দাশগুপ্ত একেবারে সোজা বলে দিলেন—তাহলে আপনি অন্য মিউজিক ডিরেক্টর দেখুন, অন্য লোক দেখুন। আমি ওতে নেই। দেবকণ্ঠ বাগচী আর রামতারণ সান্ন্যাল এই দুজনে মিলে যে সুর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে করে গেছেন সে সুর এখনো লোকের মুখে মুখে। ওই সুর কিছুতে পাল্টাতে পারবেন না—লোকে গায়ে থুথু দেবে। শেষপর্যন্ত তাই হয়েছিল মধু বসু আর সে চেষ্টা করেননি। তাঁর আলিবাবাতে সেই পুরনো সুরই ছিল—আর সেই সুরই ফের বাঙালিকে মাতিয়ে দিয়েছিল। এমনকি, আরো কয়েক দশক পরে, যখন আবার নতুন করে 'মর্জিনা-আবদ্দাল্লা' ছবি তোলা হয়েছিল তখন নতুন যুগের সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরীও—'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' অংশটুকুর জন্যে সেই পুরানো সুরটা রাখলেন নতুন সুর দেবার কথা ভাবেননি। আমি ভাই এঁদের, মানে এই বড়দের কাছ থেকে একটি শিক্ষাই লাভ করেছি যে নিজের ক্ষমতার বাইরে যেও না। ওই সব আশ্চর্য প্রতিভাধরদের সৃষ্টিকে ডিঙিয়ে যেতে বা উড়িয়ে দিতে যেও না। যাঁরা মাননীয় তাঁদের সম্মান করবে। আর যার যা, অমর সৃষ্টি তাকে অস্বীকার না করে গ্রহণ করবে, সশ্রদ্ধ নিষ্ঠায় তা লালন করবে, পালন করবে। তাহলেই শিল্পী হিসেবে তোমার নিজের মধ্যে সার্থকতার আলোয় আলোকিত হবে। এমন বহু বাংলা গানই তো আমাদেব কাছে রয়ে গেছে, যাকে আজ পর্যন্ত অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি।

১৮৯৩ সালে জন্মাষ্টমীর দিন কৃষ্ণচন্দ্র দের জন্ম হয়েছিল। কৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁরও নাম হল কৃষ্ণচন্দ্র। কৈশোরে চোখ দুটি নষ্ট হয়ে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। তার মানে জন্ম থেকে তিনি এই পৃথিবীর রূপ, রঙ দুচোখ ভরেই দেখেছেন কিন্তু বিধির বিধানে হঠাৎ ওই অল্পবয়সেই তাঁর চোখের আলো নিভে গেল, চিরকালের মত।

আমি যখন তাঁর কাছে প্রথম যাই তখন তিনি পরিণত, প্রতিষ্ঠিত। একজন খ্যাতিমান শিল্পী ৫৫/৫৬র মত বয়েস। নজরুলের জন্মদিন পালন করার অনুষ্ঠান আমরাই যে কলকাতায় প্রথম চালু করেছিলাম তা একটু আগেই বলেছি। আর সেই যে কিভাবে প্রথম, কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্পর্শে আসি সে গল্পও সংক্ষেপে বলেছি।

এবার সেই গল্পের ভেতরে আরো যে সব গল্প সেদিন প্রথম শুনে মজে গিয়েছিলুম —তার কয়েকটা বলতে খুব লোভ হচ্ছে। কেননা সেগুলোর সঙ্গে কিছু কিছু হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকেও আমরা নতুন করে পেয়ে যাব।

আমার বাবার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের বেশ ভাল গল্পগাছার সম্পর্ক ছিল। সেটা ওই প্রথম দিনেই দেখতে পেলুম। নজরুলের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে যাতে কৃষ্ণচন্দ্র রাজী হন সেই কথাটা বলতে, বাবার সঙ্গে আমি আর আমার বন্ধু সুব্রত কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ি যেতেই দেখলুম, কৃষ্ণচন্দ্র ও বাবা ওঁদেরই যতোসব পুরনো গল্পগাথায় মেতে গেলেন। যে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে, ওখানে আমাদের যাওয়া, বাবা সেইসব কথা যেন ভুলে গেলেন। ঘরে ঢুকে, মামুলী কিছু কথার পরই কি করে যেন থিয়েটারের কথা উঠল আর সেই সূত্র ধরে কৃষ্ণচন্দ্র থিয়েটারে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতার কথায় ঢুকে পড়লেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সেই থিয়েটারের গল্প আমারও খুব ভাল লাগছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বলছিলেন—'আমি যখন প্রথম থিয়েটার করতে গেলাম সেই ১৯২৫ সালে তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ী নাট্যমন্দির মঞ্চে (বর্তমানের শ্রী সিনেমার গৃহে) যোগেশ চৌধুরির লেখা 'সীতা' নাটকটি খোলার তোড়জোড় করছেন। আসলে শিশিরকুমার আর সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বলা কওয়াতেই আমার থিয়েটারে ঢুকে পড়া। তারপর তো বহু বছর আমার নাট্যজগতে কেটেও গেছে। শিশিরকুমার আমায় আমেরিকায় নিয়ে যাবেন বলেছিলেন কিন্তু আমি অন্ধ মানুষ। আমেরিকায় গেলে আমার যা অসুবিধে হবে বা আর্থিক ক্ষতি হবে তা বুঝিয়ে বলাতে উনি আমায় নিয়ে যাবার জন্যে আর টানাটানি করলেন না। আমি শিশিরবাবুর নাটকে, অনেক গান করেছিলুম লোকে তার অনেকগুলো, খুবই নিয়েছিল। এই ধরো না সীতা নাটকের গান লিখেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়—'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' বা 'আমার কবিতা হারায়ে ফেলেছি এই বনে'। শিশিরবাবু রবীন্দ্রনাথের গানের খুব ভক্ত ছিলেন। কবির সঙ্গে তাঁর খুব যোগাযোগ ছিল। আমিও তাই শিশিরবাবুর নাটকে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছি। অনেকের ধারণা ছিল যে সীতার গানে আমি সুর দিয়েছি। কিন্তু তা নয়, আমি শুধু গায়কমাত্র—আসলে সুর করেছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বলে একজন সুরকার এখন আর তাঁকে কেউ মনে রাখেনি। ইনি শিশিরবাবুর একজন খুব কাছের মানুষ ছিলেন, তাছাড়া

খুব জ্ঞানী গুণীও বটে। একবার একটা গানের সুর করবার ব্যাপারে শিশিরবাবুরই অনুরোধে তিনি রবীন্দ্রনাথের পরিচিত একটা গানের প্রায় সম্পূর্ণ সুরটাই তাঁর নাটকের গানে লাগিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার' গানটির সুরে তিনি সীতা নাটকের 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' গানটি বেঁধেছিলেন।

এই সুরকার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের একটু পরিচয় বা অন্তত একটা পরিচয় এইখানে না-দিলে চলবে না। সীতার গানের প্রধান সুরকার এবং নাটকটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ, দিনু ঠাকুর। এই তথ্যটি বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আর গুণী সঙ্গীতজ্ঞ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দিনেন্দ্রনাথের শিষ্য ও অনুগত সহকারী হিসাবেই সাধারণতঃ কাজ করতেন। আর সেই সূত্রেই উনি অন্ধকারের অন্তরেতে গানটিতে সুর করার ভার পেয়েছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় এ গানটির গীতিকার। এছাড়াও তিনি এ নাটকের নৃত্য পরিচালক ছিলেন। উনি যে আবার একজন ভাল নৃত্যশিল্পী ছিলেন তা কম লোকই জানে। এতগুলি গুণের কারণে হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে নাট্যজগতের নানাভাবে খুবই যোগাযোগ ছিল। ছোটদের রহস্য রোমাঞ্চের গল্প, বড়দের উপযোগী উপন্যাস, সবেতেই তিনি সিদ্ধহস্ত।

হেমেন্দ্রকুমার থাকতেন বাগবাজারে। সেখানে আমাদের যে বাড়িটি ছিল যেখানে আমার জ্যেঠামশাই থাকতেন, তার ঠিক পেছনের বাড়িটিতে, হেমেন্দ্রকুমার থাকতেন। তাই তাঁর সঙ্গে আমার বাবা জ্যাঠামশাইদের খুব যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব ছিল। অত্যন্ত অমায়িক এবং নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞানের জন্য থিয়েটার বায়োস্কোপের জগতে তাঁর একটা বিশেষ মূল্য ছিল।

তবে এখন আবার কৃষ্ণচন্দ্রের কথাতেই ফিরে আসি। কৃষ্ণচন্দ্র বলছিলেন আমি অনেক নাটকে সুর করেছি। একটা নাটকের নাম ধরো সত্যের সন্ধান। কি সব গান তৈরি হয়েছিল। 'স্বপন যদি মধুর এমন, হোক সে মিছে কল্পনা। জাগিও না আমায় জাগিও না', 'আমার আঁধার ঘরের আলো সখি জ্বালো, সখি জ্বালো' কিংবা 'ওরে ও তরুলতা'।

কৃষ্ণচন্দ্র আর আঙুরবালা দুজনে মিলে দ্বৈতকণ্ঠে এ গানটা গেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আমি, শ্রীমতী আঙুরবালা, আমার আঙুর মায়ের মুখে শুনেছি, এ গানটা গেয়ে স্টেজে কে বেশি এনকোর পাবে তাই নিয়ে আমায় আর কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে বেশ লড়ালড়ি হোত। আর আমি যেদিন বেশি এনকোর পেতুম কেষ্টবাবুরও সেদিন ওইরকম হিংসে হোত। এটা খুব মজার ছিল। আসলে ওঁদের দুজনের মধ্যে এমন সুন্দর বোঝাপড়া ছিল যে সম্পর্কও খুব মধুর ছিল।

শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারে যোগ দিয়ে তিনি স্টেজে অভিনয়ের সঙ্গে নিজেকে এত জড়িয়ে ফেললেন যার জন্যে পরবর্তীকালে উনি থিয়েটার লিজ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, এবং রঙমহল রঙ্গমঞ্চ চালিয়েও ছিলেন।

হ্যাঁ, অভিনেতা রবি রায় আর নিজের ঘনিষ্ঠ কার্তিকচন্দ্র দে, তিনজনে মিলে ১৯৩১ সালের ৮ই আগস্ট যোগেশ চৌধুরীর লেখা শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকের

অভিনয় দিয়ে এই মঞ্চের উদ্বোধন হয়। তবে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য ঘটনা এই যে নাটকটির পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার। তাছাড়া মঞ্চের আলোক সম্পাতের কাজটি করেছিলেন, পরবর্তীকালে বিখ্যাত সতু সেন। এরপর নানা ওঠা-পড়া বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে সত্তর বছর ধরে চলার শেষে, ২০০১ সালের ২৮শে আগস্টে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বিমান—এখানে, মানে রঙমহলে উনি 'রঙের খেলা' নামে একটি নাটক করেছিলেন যার বেশির ভাগ কাজকর্ম দেখাশোনা করেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় মশাই। ওই নাটকের সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু সে নাটকটা আর্থিক দিক থেকে মোটেই চলে নি। কৃষ্ণচন্দ্রকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। বিভিন্ন থিয়েটারের স্টেজে উনি অনেক নাটকে অভিনয় করেছিলেন—'চন্দ্রগুপ্ত', 'অভিষেক', 'সত্যের সন্ধান', 'বসন্তলীলা' এমনি আরো। ১৯৩২ সালে নিউ থিয়েটার্স থেকে ডাক এল চণ্ডীদাস ছবির জন্যে। এ ছবিতে উনি যে গান গেয়েছিলেন তা তো চিরকালীন রেকর্ড হয়ে গিয়েছিল। যেমন, চিত্রা সিনেমা হলে এক নাগাড়ে পঞ্চাশ হপ্তা ধরে দেখানোরও একটা রেকর্ড হয়েছিল। চণ্ডীদাসের গানের প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—চণ্ডীদাসের গান নিয়ে আমরা যখনকার কথা বলছি, তখন বাজারে শুধুই ৭৮ আর পি এম দশ ইঞ্চির রেকর্ড বেরুত। কেবল খুবই সম্মানিত রথী মহারথীদের বেলায়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বারো ইঞ্চির রেকর্ড তৈরি করা হোত। আমার আগে একমাত্র লালচাঁদ বড়াল আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেলায় বারো ইঞ্চির রেকর্ড হয়েছিল। তারপর আমার চণ্ডীদাসের গান ওই বারো ইঞ্চির রেকর্ডে বাজারে বেরিয়েছিল। একপিঠে 'শতেক বরষ পরে' আর অন্য পিঠে 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধু ওইখানে থাকো'। আর এই ছবির 'ফিরে চল আপন ঘরে' বাঙালির ঘরে ঘরে একেবারে তোলপাড় তুলেছিল—লোকের মুখেমুখে ফিরত। শুধু এই গানটা শোনবার জন্যেই লোকে বারবার চণ্ডীদাসের ছবিটা দেখত।

এখানে একটা বিশেষ কথাব উল্লেখ করা দরকার। ১৯৩০ সালে স্টার থিয়েটারে অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা স্বয়ংবরা নাটকে এই 'ফিরে চল' গানটা পঙ্কজ মল্লিকের সুরে এবং সঙ্গীত পরিচালনায় নিয়মিত গাইতেন প্রখ্যাতা অভিনেত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী। সে যুগের চলচ্চিত্র পরিচালক দেবকীকুমার বসু গানটা শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি এই গানটি তাঁর পরিচালনায় নির্মিয়মান চণ্ডীদাস ছবিতে ব্যবহার করার জন্যে সৌরীনবাবুর অনুমতি আদায় করেছিলেন এবং সত্যিই চণ্ডীদাস ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্রকে দিয়ে গানটি গাইয়ে ছিলেন। এর ফল যে কি হয়েছিল তা এখন ইতিহাস। ঘোষিত ভাবে চণ্ডীদাসের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রাইবাবু কিন্তু যে গানটি ছবির সব থেকে বেশি হিট হয়েছিল তার সুরারোপ যে পঙ্কজ মল্লিকের তা ছবিতে উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে রাইবাবুর সহকারী হিসেবেই পঙ্কজ মল্লিকের নাম গৌণভাবে যেটুকু পরিচিতি পেয়েছিল।


'দেশের মাটি' ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্র দে ও উমা শশী

বিমান—চণ্ডীদাসের পর ১৯৩৫ সালে ভাগ্যচক্র ছবি আবার তাঁর অভিনয় জীবনে বিরাট সাফল্যের দরজা খুলে দিল। ছবিতে নায়ক পাহাড়ী সান্যাল কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রকে দেওয়া হল একটা বিরাট রোল প্রায় নায়কের মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর কি সব গান কৃষ্ণচন্দ্রের মুখের—'ওরে পথিক তাকা পিছন পানে' বা 'মনরে আমায় খুলে দে তোর দ্বার', সেযুগে যে কি হিট হয়েছিল তা আর বলবার নয়। তারপর 'বিদ্যাপতি', 'দেশের মাটি', 'সাপুড়ে', 'আলোছায়া' সব ছবিতে অভিনয়ে এবং গানে কৃষ্ণচন্দ্রের জয় জয়কার। এর মধ্যে আলোছায়ার সঙ্গীত পরিচালকও তিনি —যে ছবির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন আর এক বিরাট গায়ক পঙ্কজ মল্লিক। ১৯৩৫ সালের এই 'ভাগ্যচক্র' ছবিটি আর একটি বিশেষ কারণে ঐতিহাসিক মর্যাদায় স্মরণীয় হয়ে রইল। পঙ্কজ মল্লিক, নীতিন বসু ও মুকুল বসু এই তিনজনের মিলিত কলা কৌশলে ভারতীয় ছবিতে প্রথম প্লেব্যাক প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল এই ছবিতে।

হ্যাঁ বাঙলা বা ভারতীয় ছবিতে প্রথম প্লে-ব্যাক পদ্ধতিতে বাণীকুমারের লেখা 'মোরা পুলক যাচি, তবু সুখ না মানি'/'যদি ব্যথায় দোলে হৃদয়খানি' গানটি কোরাসে গেয়ে এ দেশের প্রথম প্লে-ব্যাক গায়িকার সম্মান যে শিল্পীদের প্রাপ্য তাঁদের অন্তত আজকে ভুলে যাওয়া উচিৎ হবে না। তাঁরা হলেন, সুপ্রভা ঘোষ (সরকার) পারুল চৌধুরী (ঘোষ) ও শ্রীমতী উমাশশী এ ছবির গায়িকা-নায়িকা।

তবে যাঁর প্রত্যক্ষ অবদানে এই পদ্ধতির কলাকৌশল যৌথভাবে তৈরি হয়েছিল ভাগ্যচক্রতেও তাঁর ভাগ্যে সেই স্বীকৃতি মেলে নি। এ ছবিতেও তাই ঘোষিত সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। আর পঙ্কজ মল্লিক শুধুমাত্র তার সহকারী। যাক গে, কথা হচ্ছিল কৃষ্ণচন্দ্র দের সম্বন্ধে সেই প্রসঙ্গেই ফেরা যাক্।

বিমান—এই নিউ থিয়েটার্সে সে সময়ে একটা গান নিয়ে দারুন সেন্‌সেশান্ হয়েছিল, 'দেশের মাটি' ছবিতে অজয় ভট্টাচার্যের লেখা 'আবার ফেরে রঙ ফিরেছে'এই একখানি গানে দিকপাল তিন প্রতিভার সঙ্গম ঘটেছিল—কৃষ্ণচন্দ্র, সায়গল ও

পঙ্কজ মল্লিকের আর তাতে গান গেয়ে সঙ্গ দিয়েছিলেন শ্রীমতী উমাশশী। কৃষ্ণচন্দ্র ও পঙ্কজ মল্লিকের এক অপূর্ব সমন্বয়—পঙ্কজ মল্লিকেরই সুরে।

তেমনি আলোছায়া ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গীত পরিচালনায় পঙ্কজ মল্লিক নায়কের ভূমিকায় যে সব গান গেয়েছিলেন সে সব গান আজকের দিনেও তো লোকে কতো শুনতে চায়—'এই তো মিলন শুরু', 'বাঁশি তুই বাজা রাখাল', 'মধুর মাধুরি সনে' বা 'কিবা বঙ্কিমঠাম'। কিন্তু একালে, ক'জন আর শোনবার সুযোগ পেয়েছে এই গানগুলো ?

এরপর কৃষ্ণচন্দ্র বম্বে চলে যান। কয়েক বছর পরে কলকাতা ফিরে নিজের প্রোডাকসনে 'পূরবী' নামে একটা ছবি করেছিলেন। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক তিনি নিজে এবং সহকারী সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন প্রণব দে। ওঁর বড় ভাইপো প্রণব, মান্না দের দাদা। নিউ থিয়েটার্সের অনেক ছবিতে সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করেছিলেন। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রাবতী দেবীর 'প্রিয় বান্ধবী' ছবিতেও প্রণব দে সঙ্গীত পরিচালক। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'সুধার প্রেম', নরেশ মিত্রের 'কঙ্কাল' এসব ছবির সঙ্গীত পরিচালনাতেও ছিলেন প্রণব দে। পূরবী ছবির বাণিজ্যিক ব্যর্থতার পর উনি ছবি থেকে সরে এসে কীর্ত্তন গানে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এমন একজন শিল্পী ছিলেন যিনি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে শুরু করে ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরি টপ্পা কীর্ত্তন আধুনিক সবরকম গানই গাইতেন। এমনকি আমি তাঁকে নিয়মিত ধ্রুপদ গাইতে শুনেছি। এরই পাশাপাশি কৃষ্ণচন্দ্রকে আমি রেকর্ড, রেডিও বা ফাংশানে অত্যন্ত লঘু চালের গান গাইতে শুনেছি। তাঁর কোনরকম গোঁড়ামি ছিল না। কে তাঁর ছাত্র ছিল বা কে তাঁর সহকর্মী ছিল এসব কথা তিনি ভাবতেন না। কাজের সময় সবার অধীনেই কাজ করতে তাঁর কোন বাছ বিচার ছিল না। নির্বিচারে কাজ করেছেন, রেকর্ড করেছেন। আমি একটা ঘটনার কথা বলি, ১৯৫৩/৫৪ সালের কথা—দেবকী বসু তাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ছবিটা করছেন। সঙ্গীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত। এই ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্র একজন গায়ক অভিনেতা হিসেবে, গুণ্ডলের পার্টে অভিনয় করেছিলেন। দেখো সে কি অপূর্ব অভিনয়, কিন্তু এর গান টেক-এ সময় কৃষ্ণচন্দ্র বারবার জিজ্ঞাসা করছেন, বলছেন —কমল ঠিক হচ্ছে কি ? দেখ, ঠিক না হলে, বলো, আমি আবার গাইব। বারবার এভাবে বলাতে কমল দাশগুপ্তই বরং একটু সঙ্কুচিত। কৃষ্ণচন্দ্রের এ ব্যাপারে কিন্তু কোন অহং নেই। তারপর ধরো কতো বড় সুরকার, তাঁর আর একটা বিখ্যাত গান 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে'। এ গানটা স্বাধীনতার ঠিক পরেই রেকর্ড হয়, মোহিনী চৌধুরীর লেখা—নিজের সুরে গাইলেন কৃষ্ণচন্দ্র। ব্যাণ্ডের তালে ছন্দে এ গানটা এই পঞ্চান্ন বছর পরেও শহীদ তর্পণ হিসেবে আমাদের কাছে অমর হয়ে আছে।

তা এই কৃষ্ণচন্দ্রকে, একসময় গ্রামোফোন কোম্পানী বলেছিল আপনাকে আর রেকর্ড করতে হবে না। এই কথা শুনে কার না আঘাত লাগবে! উনি তো এমন অকল্পিত আঘাতে একেবারে পাথর হয়ে গেলেন। এক সময়ে সারা ভারতে বা

তার বাইরেও কে সি দে (ব্লাইণ্ড সিংগার) এর নামেই হু হু করে রেকর্ড বিক্রী হোত। পুরানো রেকর্ডের বুকলেট জোগাড় করতে পারলে দেখবে লেখা থাকত রেকর্ড জগতের রাজাধিরাজ আর সেই রাজাধিরাজকেই মুখের ওপর বলে দেওয়া হল—না, আপনার রেকর্ড আর আমরা করতে পারব না।

ভাবো কি অবাক করা কথা। যে তিনি বাংলা, হিন্দি, উর্দুতে নানান ধরনের অসংখ্য গান গেয়েছেন, অগুন্তি রেকর্ড করেছেন, ভজন যা গেয়েছেন তার তো কোন তুলনা ছিল না, সেই তাঁকে যে এরকম কথা বলা যেতে পারে তা কেউ ভাবতে পেরেছিল ?

তা হঠাৎ এরকম অপমানকর সিদ্ধান্ত রেকর্ড কোম্পানীরা নিল কেন ? কোনও কারণ ছিল ?

বিমান—গ্রামোফোন কোম্পানী যে ওঁর গান আর রেকর্ড করতে চাইল না তার **একটাই** কারণ, যতক্ষণ গরু দুধ দিচ্ছে, যতক্ষণ দুয়ে নিতে পারছ ততক্ষণই তার সেবাযত্ন। যতোদিন তোমার গান ওদের ব্যবসার সাফল্য আনবে বাজার থেকে মোটা লাভের কড়ি ঘরে তুলতে পারবে ততোদিন ওরা তোমায় মাথায় করে রাখবে। আর যেদিন দেখবে তোমাকে দিয়ে আর তেমন লাভের ব্যবসা জমছে না সেদিন থেকে আর তোমার মানসম্মান বলে কিছু থাকবে না, তুমি পাত্তাই পাবে না, মানে, ওরা তোমায় একেবারে বাতিলের দলে ফেলে দেবে। এইটাই হচ্ছে আমাদের এই ইণ্ডাস্ট্রির নিয়ম। তবে আজকালকার শিল্পীরা অবশ্য এদিক থেকে অনেক চতুর বরং বলি সুচতুর।

হ্যাঁ, একটা নামী বই এ ছাপার অক্ষরে পড়েছি যে ওঁর মধ্যে একটা দুঃখ বেদনার হতাশা বিষাদে, তাঁর কাজকর্ম ধীরে ধীরে গুটিয়ে যাচ্ছিল। রঙমহল থিয়েটার ছেড়ে অনেক অর্থদণ্ড দিয়ে সরে আসতে হয়েছিল। শোনা যেত যে ব্যক্তিগত কারণে তখন উনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। রেডিও ও মঞ্চে সাহচর্যের সূত্রে স্নেহধন্যা শ্রীমতী তারকবালা বা মিস লাইটের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ জীবন। একটি পুত্র সন্তানের জন্ম, চোদ্দ বছর বয়সে একমাত্র সেই সন্তানের অকালে হঠাৎ মৃত্যু, তাঁর মনকে যেন গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ২৫শে জুন, এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে, প্রবীণা এই শিল্পী এসব দুঃখের কথা নিজের মুখে জানিয়েছিলেন। সেই নিঃসঙ্গ দুঃখের জীবনে একটা সুখের সান্ত্বনা অবশ্য তাঁর জুটেছিল, যেদিন রবীন্দ্রসদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে তখনকার তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, কয়েকজন বিস্মৃত প্রাচীন কালের শিল্পীদের সঙ্গে এক আসনে, তারকবালাকেও সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। এসব ব্যাপারে তুমি কিছু বলতে পারো ?

বিমান—না, এসব ব্যাপার আমার তেমন জানা নেই তাই এসব নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে এটা ঠিক যে কৃষ্ণচন্দ্র শেষ জীবনে, নানান ধরনের গান থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। শেষের দিকে শুধু কীর্ত্তন গানের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়েছিলেন।

আমার মনে হয় শুধু এক ধরনের গানে এই নিবদ্ধ রাখার কারণেও হয়ত রেকর্ড কোম্পানীরা কিছুটা উদাসীন হয়ে উঠেছিল।

বিমান—সে যাই হোক, তখন কিন্তু তিনি পরিবারের যাঁরা, গান টান গাইতেন তাঁদের তালিম দিয়ে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে সহায়তা দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সব থেকে নামী দামী শিল্পী হিসেবে মান্না দের আজ দেশজোড়া খ্যাতি। তবে মান্নার বড় ভাই প্রণব দে, তিনিও সঙ্গীত জগতে যথেষ্ট ভাল কাজ করেছেন কৃষ্ণচন্দ্রের সহকারী হিসেবে, সিনেমা, গ্রামোফোনের ডিস্কে। তাঁর কাজের কথা আগেই বলেছি। আর এক ভাইপো প্রভাস দে তিনি প্রধানত কীর্ত্তন গান নিয়েই কৃষ্ণচন্দ্রের ধারাকে বজায় রেখেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের গান নিয়ে টিভিতে যে অনুষ্ঠান করেছিলুম তাতে আমি প্রভাসবাবুকে নিয়েছিলাম ওঁদের বাড়ির প্রতিনিধি হিসেবে। কারণ মান্না দে অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, তাঁকে দরকার মত পাওয়া যেত না।

শেষের দিকে কৃষ্ণচন্দ্রের শারীরিকভাবে হয়েছিলটা কী ? হঠাৎ যেন উনি চলে গেলেন,—

বিমান—কি সব অসুখ বিসুখ হয়েছিল। ওঁর বাড়ির লোকেরা খুবই সেবা করেছিল। প্রায় সত্তর বছর বয়েসে, ওই ১৯৬২-র নভেম্বরে তিনি পৃথিবীর পাট চুকিয়ে চলে গেলেন। তবে তাঁর গানের সম্পদ সবই আমাদের জন্যে পড়ে রইল। আমার সঙ্গে ওঁর খুব একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। দু-একবার সঙ্গীত বিষয়ে একটু আধটু কথাবার্তা হয়েছে। চলচ্চিত্রের কথা প্রসঙ্গে আমি একবার ওঁকে প্রশ্ন করেছিলুম—আজকাল মঞ্চে বা ছায়াছবিতে ওঁকে আর তেমন দেখতে পাওয়া যায় না কেন ?

সোজাসুজি ছোট জবাব দিলেন—আমি অনুপযুক্ত বলে।

একথাটায় মনে হল, কোন অভিমান থাকতে পারে কিংবা খানিকটা শ্লেষও থাকতে পারে। ওঁর বাড়িতে, বাবার সঙ্গে যখনই গেছি তখন সে সময়কার বহু শিল্পীদেরই আসতে দেখেছি। এখানে কৃষ্ণচন্দ্র দের আর একটা কথা বলে রাখা উচিত। সেটা হল, নিউ থিয়েটার্স ছাড়ার পর, বম্বে থেকে ঘুরে কলকাতা ফিরে এসে, কৃষ্ণচন্দ্র নিউ টকীজের 'নারী' নামে একটা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এই ছবি দিয়ে ১৯৪২ সালে কলকাতার 'মিনার' সিনেমার উদ্বোধন হয়েছিল।

হ্যাঁ ওই উদ্বোধনের শো-এ আমি ছিলুম। ছবিটা তাই দেখেও ছিলাম।

বিমান—নিউ থিয়েটার্সের বাইরে এই ছবিতে প্রথম রাইচাঁদ বড়াল সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু এই ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্রের গাওয়া একটা গান ছিল 'হে বিশ্বনাথ জ্বালো জ্বালো তব নয়ন বহ্নি জ্বালো'। দারুণ গান কিন্তু এটা কে সি দের নিজের সংযোজন। বোঝ, রাইবাবু মিউজিক ডিরেক্টর অথচ কেষ্টবাবুর করা গান, এতে জুড়ে দেওয়া হল। কেষ্টবাবুর গুরুত্ব তখনো এতটা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ ছবি 'আশাবরী' আমি দেখেছি। ছবিটা হপ্তাখানেকের বেশি চলে নি। কমল দাশগুপ্ত তার সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। তাতে উনি একজন হিন্দুস্তানী ওস্তাদের পার্ট

করেছিলেন, আবার একটা দৃশ্যে উনি তবলা বাজিয়েছিলেন। অবশ্য তবলা উনি ভালই বাজাতে পারতেন।

আচ্ছা, উনি কি কখনো সরকারী স্তরে বা অন্যভাবে কোন সম্মান সম্বর্ধনা বা খেতাব-টেতাব পেয়েছেন।

বিমান—না, উনি সেরকম কোন সম্মান পাননি। পদ্মশ্রীও, ওনার মতন শিল্পী, উনি পাননি, কোনও খেতাবই পাননি। ঐ নামের আগে একটা সঙ্গীতাচার্য বলা হোত। তা সেটা সবাইকেই বলা হয়, তাঁকেও বলা হয়েছে। আর কিছুই তিনি পাননি। অথচ ছায়াচিত্র, স্টেজ, রেকর্ড, রেডিওতে তো একেবারে প্রথম দিন থেকেই যুক্ত ছিলেন। নাটক করেছেন, সবরকম গান করেছেন, কি না করেছেন! তবু জানো, সবচেয়ে আঘাত—শেষ জীবনে, এইচ এম ভি কোম্পানী তাঁর রেকর্ড করা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিল।

অপরাধ ?

বিমান—তাঁর মুখের ওপর ওদের এক অফিসার বলে দিয়েছিল—ওসব কীর্ত্তন-টীর্ত্তন ছেড়ে দিন, হিন্দি গানের বাংলা গাইতে পারবেন ?

উনি এত আহত হয়েছিলেন যে কি বলব! আমি তখন সেখানে, গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্স্যালরুমে বসে, ওই হাতিবাগানের নলিন সরকার স্ট্রীটে। ওখান থেকে বেরিয়ে, গোপাল বাবুর ক্রাউন রেকর্ড কর্নার বলে একটা খুব বড় রেকর্ডের দোকান ছিল, সেখানে এসে কৃষ্ণচন্দ্রকে বসালুম। এ দোকানটার মালিক গোপালদা ছিলেন, এইচ এম ভি-র এককালের ম্যানেজার ভগবতী প্রসাদ ভট্টাচার্যের জামাই। সেই সূত্রে আমায় খুব স্নেহ করতেন। তাছাড়া এইচ এম ভির সব শিল্পীই এ দোকানে ভিড় জমাতেন তাদের স্যাম্পল রেকর্ড শোনবার জন্যে।

ভীষণ ক্ষুব্ধ কৃষ্ণচন্দ্র সকলকে কথাটা শুনিয়ে প্রায় ভ্যাংচানোর সুরে বললেন—আমায় বলে কি না ওসব কেত্তন টেত্তন ছাড়ুন মশাই, হিন্দি গানের বাংলা গাইতে পারবেন ? হিন্দি গানের বাংলা, অ্যাঁ ? আমাকে এত বড় কথাটা ওরা বলতে পারল ?

রাগের মাথায় সেদিন ওখানে কেষ্টবাবু অনেক কথাই বলেছিলেন—জানো, এমন একদিন গেছে যখন আমি বছরে ওদের এক কোটি টাকার ব্যবসা দিয়েছি, আর আজকে আমাকে কিনা তারা এইরকম কথা বলল!

উনিও আর কখনো গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করেননি। এরপর উনি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ওখানে প্রথমে উনি একখানা বাউল গানের রেকর্ড করেছিলেন, যেন একটা তীক্ষ্ণ আত্মসমীক্ষার গান। একখানা গান রেকর্ডের দুপিঠ জুড়ে লিখেছিলেন রাখালবন্ধু নিয়োগী নামে এক ভদ্রলোক। গানটার সুরও তিনিই করেছিলেন—'বাংলা মায়ের অঙ্গনে আজ নামলো অন্ধকার। আয়রে ও ভাই, তোদেব পরেই ভবিষ্যতের ভার'। এই তাঁর শেষ বেলাকাব ছবি। শেষ

জীবনে তাঁকে এইভাবে অপমানিত আহত হতে হয়েছিল। তবে আশ্চর্য, তাঁর নিকটজনেরা এই নিয়ে বা এর বিরুদ্ধে তাঁর হয়ে, কেউ কোনও কথা বলেননি। আমি ভেবেছিলুম কেউ না কেউ মুখ খুলবে এ অপমান সহ্য করবে না। তাই আমি তখন এ নিয়ে কিছু বলি নি। কিন্তু এতদিন বাদে আমি একথাটা না বলে পারলুম না কেননা শিল্পীদের প্রকৃত অবস্থাটা যে কী তাও তো সবাইকে জানানো দরকার।

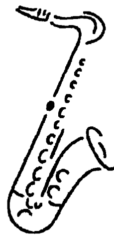
তাইতো। এর থেকে মনে একটা প্রশ্নই জাগে। কৃষ্ণচন্দ্রের মত শিল্পীরও যদি এই পরিণতি হয় তাহলে শিল্পীর ভবিষ্যৎ বলে সত্যিই কি কিছু থাকে নাকি ? সাধে কি শ্রীমতী আঙ্গুরবালার একখানা গান যখন তখন মনে পড়ে যায়—চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। তবে এ হাহাকার মহাকাব্যের ট্র্যাজিক নায়কদের চির সঙ্গী।

কৃষ্ণচন্দ্রের নানা গানের কথায় তার একটা ব্যথা প্রায়ই অন্তর ভেদ করে বেরিয়ে আসত। যেমন—

আমার নিয়েছ নয়ন তারা
দিলে তার দুটি কিনারায়, বাদল বরিষা ধারা।
আসে দিন যায়, আসে বিভাবরী, সকলি আমার সমান শঙ্করী।
কিংবা, ওমা তারা দুখহরা আঁখির দৃষ্টি হরণ করে,
করলি আঁধার বসুন্ধরা।

কোন্ সেই ছোটবেলায়, চোখের আলো হারিয়ে ফেলার বেদনা থেকেই হয়ত এ সব গান উৎসারিত। সেই জন্যে, সবসময় তাঁর গানে যেন উষ্ণ হৃদয়ের মর্মস্পর্শী মন্থন। এ কথাটা আরো বোঝা যায়, তাঁর প্রথম রেকর্ড থেকে যার জন্যে তিনি বেছে নিয়েছিলেন রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ওমা দীন তারিণী তারা—যেখানে তাঁর মনের অনুযোগটি কি স্পষ্ট ভাষায় না ঝরে পড়েছে 'পাঠাইলি যদি এ ভব সংসারে কেন, চিরপরাধীন করিলি আমাকে ?' তবে এ দুঃখ নিয়ে তাঁর শেষ অনুভূতিটি মনে হয়, সম্ভবত তাঁরই লেখা একটি গানে নিবেদিত হয়েছে 'শ্যামা, মায়ের চরণতলে সব করেছি সমর্পণ—আমার হাসি, আমার ব্যথা আমার সাধের দুই নয়ন।'

ইংরেজ কবিও তো বলেছিলেন জীবনের মধুরতম সঙ্গীতগুলো, মনের গভীরতম দুঃখবোধ থেকেই উঠে আসে। অবনমিত কৃষ্ণচন্দ্রের গানও বোধহয় এর থেকে আলাদা কিছু নয়।





অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিমান—কৃষ্ণচন্দ্রের মতন তাঁর সমসাময়িক, আর একজনকেও একই রকম অবমাননা সয়ে, শেষের সে দিনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছিল।

তিনি পঙ্কজকুমার মল্লিক। তবে ও কথাটা এখন নয়, পরে যথাসময়ে। কৃষ্ণচন্দ্রের তুলনায় পঙ্কজ মল্লিক, বলতে গেলে জুনিয়ারদের দলে। তবে তখন, মানে সে যুগটাই এমন ছিল যে লোকে বলত বাংলা গানের রেনেসাঁর যুগ। তখন অনেকেই এসেছেন এবং যাঁরাই এসেছেন তাঁরা সবাই সত্যিকারের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

পঙ্কজ মল্লিক প্রথম রেকর্ড করেছিলেন, জায়োলোফোন নামে একটা জার্মান কোম্পানীতে, ১৯৩০ সালে। বাংলা আধুনিক গানের রেকর্ড বেরিয়েছিল। তবে আমি শুনিনি। কি গান তাও মনে নেই—

পঙ্কজ মল্লিকের লেখায় পড়েছি বাণীকুমারের লেখা এবং প্রথম রেকর্ডেই তাঁর নিজের সুরে, একটা পিঠের গানের কথা ছিল—'নেমেছে আজ নবীন বাদল, ব্যথার গুরুভারে।' উল্টোপিঠের গানের কথা পঙ্কজকুমারেরও মনে ছিল না। এরপর কলম্বিয়া কোম্পানীতে পঙ্কজের দ্বিতীয় রেকর্ড হয়েছিল ১৯৩১-এ। নিজের সুরে বাণীকুমারের লেখা একপিঠে নমো নমো হে ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী আর অন্যপিঠে একটা বাউলাঙ্গ গান যা বাজারে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারেনি। তবে নিজের তৃতীয় আর কলম্বিয়ার ছাপ মারা তাঁর দ্বিতীয় রেকর্ড গায়ক সুরকার পঙ্কজকুমারকে রাতারাতি একেবারে খ্যাতি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল। সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা এবং আবার নিজের সুরে গাওয়া—'ও কেন গেল চলে' আর 'আমারে ভালবেসে আমারে লাগিয়া', যা পঙ্কজ মল্লিককে আর পেছন ফিরে তাকাতে দেয়নি।

বিমান—চণ্ডীসাহার অনুরোধে ১৯৩৫ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ডে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে যে দুইখানি রবীন্দ্রনাথের গান বেরিয়েছিল তা বাঙালির ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথের গানকে যেমন পৌঁছে দিয়েছিল তেমনি পঙ্কজ মল্লিকের নামও লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দুস্থানের ন' নম্বর রেকর্ডের সেই বিখ্যাত গান দুটি ছিল

'প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ' আর 'তোমার আসন শূন্য আজি'।

পঙ্কজ মল্লিক এসেই নতুন অনেক কিছু করেছিলেন। ১৯২৭ সালের ২৬শে আগস্ট কলকাতায় রেডিও চালু হবার একমাসের মধ্যে অর্থাৎ ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে পঙ্কজ মল্লিক বেতারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন। আর তাঁর ওই প্রথম দিনে তিনি রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের দুটি গান গেয়ে, রবি ঠাকুরের গান ছড়িয়ে দেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সেদিন উনি গেয়েছিলেন, 'এমন দিনে তারে বলা যায়' আর 'একদা তুমি প্রিয়ে'।

১৯২৯-এর শেষ দিকে, পঙ্কজকুমার বেতারে এক সম্পূর্ণ অভিনব, নতুন ধরনের সঙ্গীত শিক্ষার আসর চালু করেছিলেন যা একটানা ছেচল্লিশ বছর ধরে প্রতি রবিবার তিনি চালিয়েও গিয়েছিলেন। সারা পৃথিবীতে বোধহয় এর কোন দ্বিতীয় নজির নেই। তাছাড়া গান শেখানোর আগে, প্রতিটি কথার সঠিক বানান ও উচ্চারণ বারবার বলে লিখিয়ে দিয়ে এবং শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি যেভাবে বেতার মারফৎ অসংখ্য শিক্ষার্থীর মনে, গান শেখার আগ্রহ তৈরি করেছিলেন এবং এই আসরকে জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছিলেন তা শুধু পঙ্কজ মল্লিক বলেই সম্ভব হয়েছিল। এর ওপর রেডিওর অনুষ্ঠানসূচী সম্বলিত বেতার জগৎ পত্রিকায় এই আসরে শেখানো গানের স্বরলিপি প্রকাশ করে, গান শেখবার পদ্ধতির যে উৎকর্ষগত মান তৈরি করেছিলেন, তাও ছিল প্রায় অকল্পনীয়।

একজন অনবদ্য সুরকার; একাধারে সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক এবং বিরাট গায়ক পঙ্কজ মল্লিক সব দিক দিয়ে একজন চিরকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম। সঙ্গীত জগতের এক অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। উনি বেসিক রেকর্ডে খুব বেশি সুর করেননি। যা করেছেন নিজের গানেই বেশি করেছেন সেই তুলনায়, অন্যের গানে খুবই কম। তবে তাঁর কন্যাপ্রতিম ছাত্রী ইলা ঘোষের জন্যে দু'চারটে গানের সুর করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ছায়াছবির গানে মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে বাংলা এবং হিন্দিতে সুর করার ব্যাপারে, তিনি কিন্তু অনেকের মধ্যে ছিলেন—বিশেষ এবং বিশিষ্ট একজন।

মুক্তি থেকে মহাপ্রস্থানের পথে, বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা—সাফল্যের এক সুদীর্ঘ পথ। তবে পঙ্কজদার সুর করার প্রসঙ্গে আমি, একটা বিশেষ কথা এখানে বলে রাখতে চাই। সেটা হল নজরুল ইসলামের গানে, পঙ্কজদা বোধ হয় একবারই সুর করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের দিকশূল ছবিতে, নজরুলের লেখা একটা গানে উনি ভারী সুন্দর সুর দিয়েছিলেন, যেটা ছবিতে ইলা ঘোষ প্লেব্যাক গেয়েছিলেন : ফুরাবে না, ফুরাবে না মোর মালা গাঁথা।

সত্যিই অপূর্ব সুর। আমার তো মনে হয়, নজরুলের গানটায় একটা আলাদা স্বাদের মাত্রা যোগ করেছিল।

তবে ভাই, আমিও এখানে একটা প্রায় না জানা বা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া একটা তথ্য নতুন করে তুলে ধরতে চাই—যা অনেককে হয়ত চমকে দেবে। সেটা হল ওই 'দিকশূল' ছবিতেই নজরুলের আর একটি গানে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে,

পঙ্কজকুমার মল্লিক সুর দিয়ে ছিলেন, ছবিতে গেয়েছিলেন পঙ্কজকুমার নিজেই 'ঝুমকো লতায় জোনাকী, মাঝে মাঝে বৃষ্টি।' এরকম একটা জবর খবর দেবার পর, একটাই বড় দুঃখ যে, পঙ্কজ মল্লিকের নিজের গাওয়া দুর্লভ এ গানটা শোনবার সৌভাগ্য কিন্তু আমাদের কারুরই হয়ত আর হবে না। কেননা, এর রেকর্ড বা 'দিকশূল' ছবি—কোনটাই পাবার সম্ভাবনা আর নেই বলেই তো মনে হয়।

বিমান—তাই তো বলছিলাম যে, বাংলা, হিন্দি সব ছবিতে এক নাগাড়ে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে, তিনি আগাগোড়া একেবারে প্রথম সারির পুরোভাগে নিজের আসনটি অটুট রেখেছিলেন। বলতে গেলে, সিনেমায় মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে, তখন যা করেছেন, সবই হিট হয়েছে। এ বড় কম কথা নয়। আবার ধরো রবীন্দ্রনাথের গানের কথা। সন্তোষ সেনগুপ্ত, অনেকদিন আগে আমায় একদিন বলেছিলেন দেখ, খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্যে সেন্ট প্যলস্, সেন্ট জেভিয়ার্সরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারের ক্ষেত্রে পঙ্কজ মল্লিক, সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বাঃ, আমার তো মনে হয় পঙ্কজ মল্লিকের মূল্যায়নে, এর ওপর আর কথা হয় না।

বিমান—তাইতো। যখন রবীন্দ্রনাথের গান, রবি ঠাকুরের গান বলে চলত—তখন, সত্যিকারের বলতে কি, আঙুল গুনে বলা যেত—ঠাকুর বাড়ির কয়েকজন ছাড়া আর ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের কয়েকজন গায়ক ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের গান বড় একটা আর কেউ গাইত না। এর পেছনে অবশ্য নানারকম সামাজিক কারণ ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষভাবে রাবীন্দ্রিক আওতার বাইরে থেকে এবং শান্তিনিকেতনী শিক্ষার কোন ছাপ না নিয়ে, উত্তর কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির একটা ছেলে পঙ্কজ মল্লিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের জন্যে সারাজীবন একনিষ্ঠভাবে যা করেছেন, তার কোনও তুলনা নেই। তাই তা ভোলবারও নয়।

দ্বিতীয় কথা, ছায়াছবিতে যথাযথভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রয়োগ তিনি যেভাবে করে দেখিয়ে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন তার সপ্রশংস স্বীকৃতির কথা, রবীন্দ্র সংস্কৃতির ইতিহাসে লেখা হয়ে গেছে। যদিও তাঁর এই কাজে তিনি প্রমথেশ বড়ুয়া বা নিউ থিয়েটার্সের কর্মকর্তাদের তাঁর পাশে পেয়েছিলেন তবু তাঁর ঐকান্তিক রবীন্দ্রভাবনা এবং কবির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ, এই কাজে তাঁকে যে বিরাট সহায়তা জুগিয়েছিল তার কোন পরিমাপ হয় না।

হ্যাঁ, সারা জীবন ধরে তন্ময় নিষ্ঠায় এরকম যথার্থ রবীন্দ্র চর্চার স্বীকৃতিতে তাঁকে যে ১৯৭৪ সালে রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছিল—গভীরতর তাৎপর্যে, তার অনন্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই। এখানে একটা তথ্য মনে রাখলে পঙ্কজকুমারের ভূমিকার মূল্য ঠিকমত বোঝা যাবে। ১৯৩৭ সালে মুক্তি ছবির অনেক আগে নিউ থিয়েটার্সের নটীর পূজা বা চিরকুমার সভা ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান তো অনেক ছিল। কিন্তু লোকে সে ছবি বা গান কোনটাই নেয়নি। তখন

থেকেই পঙ্কজ মল্লিক ভাবতে শুরু করেছিলেন যে কেন রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ সৃষ্টিও লোকের মনে ধরছে না ? ওঁর মনে হয়েছিল হয়ত সিনেমার অভিনয়, সিচুয়েশনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে, মানানো যায় নি বলে লোকে শুনেও শোনে নি, এড়িয়ে গেছে। এখন পঙ্কজ স্থির করলেন যে সিনেমার উপযোগী করে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলে লোকে তা নেয় কি না, সেটা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে সেভাবে ইচ্ছেমত, একটু আধটু বদল বা পরীক্ষা করা তো সম্ভব নয়। তাই ঠিক করলেন রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের অনুকরণে এবং সাহায্য নিয়ে (যাতে দরকার মত কিছু কিছু স্বাধীনতা নেবার ব্যাপারে বাধা না আসে!) কোনও গান সিনেমাতে ব্যবহার করে, আর একবার তা পরখ করবেন। অতএব রবীন্দ্রনাথের 'চলে যায় মরি হায়, বসন্তের দিন চলে যায়' গানটির কথা ও সুরের আদলে বাণীকুমারকে দিয়ে লেখানো হল, 'চলে যায়, মরীচিকা মায়া অজানা, চলে যায়'। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'রূপলেখা' ছবিতে (১৯৩৪) পঙ্কজ নিজের মত করে, গানটা গাইলেন—বলতে গেলে কথা ও সুরে প্রায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। কিন্তু আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে তা দারুণ হিট হয়ে গেল। পঙ্কজ মল্লিক বুঝে গেলেন যে সিনেমার উপযোগী সুপ্রযুক্তির সঙ্গে, সুপরিবেশনার গুণ থাকলে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরও ছবিকে যেমন ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করতে পারে তেমনি তা লোকে নেবেও। বাণিজ্যেও হয়ত জোয়ার আসবে। এই নবলব্ধ বিশ্বাসই বোধহয় 'মুক্তি' ছবিতে পঙ্কজকুমারকে নতুন করে উজ্জীবিত করেছিল।

বিমান—হ্যাঁ, মুক্তি ছবিতে পঙ্কজদা রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম সার্থক প্রয়োগ এনে একেবারে হৈ চৈ ফেলে দিলেন। এখানে আমরা দেখলুম এক পাহাড়ী মাতালের ভূমিকায় পঙ্কজদার অভিনয় আর তাঁর মুখে শুনলুম রবীন্দ্রনাথের কথা-সুর-তাল-ছন্দে 'আমি কান পেতে রই' আর পঙ্কজদার নিজের তৈরি সুরে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'—যা হাজার প্রশংসা, সমালোচনার ঝড়েও, পরবর্তী কালে এক ইতিহাস হয়ে গেল।

কি নিপুণ প্রয়োগে, মুক্তিতে তিনি কানন দেবীকে দিয়ে গাওয়ালেন—আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে আর তার বিদায় বেলার মালা খানি। মুক্তি থেকে পঙ্কজদা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বাংলা সিনেমার অপরিহার্য এবং দুর্নিবার আকর্ষণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। সেই সঙ্গে এসব গান একেবারে অমর হয়ে গেল।

কেন, ওই প্রায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের মত কানন দেবীর গাওয়া—ওগো সুন্দর মনের গহনে তোমার মুরতি খানি ? সজনীকান্তের লেখা এ গানটা অনেকেই সে যুগে ভাবতো রবীন্দ্রসঙ্গীত। কথা ও সুরে, সত্যিই সেরকম মনে হত।

বিমান—আবার দেখ, একজন অবাঙালি ছেলে সায়গল। তাকে দিয়ে জীবনমরণ ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান কি ভালভাবেই না, কি অপূর্ব পঙ্কজদা গাইয়েছেন : 'আমি তোমায় যতো', 'তোমার বীণায় গান ছিল'। পঙ্কজদাকে আমি দেখেছি কি পরম বৈষ্ণব, ভক্তিমান পুরুষ। ঠাকুর-দেবতায় অসামান্য ভক্তি ছিল। অত্যন্ত

বিনয়ী, সাজ পোশাক, কথাবার্তা, লোকটার সবই যেন শিল্প। একবার আমাদের বাড়িতে উনি এসেছিলেন, কি একটা পুজো উৎসবে, বোধহয় দোল উপলক্ষে। বাবা ওঁকে এনেছিলেন। দোলের সময়, আমাদের বাড়িতে বেশ জমজমাট উৎসব হোত। অনেক শিল্পীরা আসতেন, গান বাজনা খুব বেশিই হোত। আসর পরিচালনা করতেন গোপাল লাহিড়ী, তুলসী লাহিড়ীর ভাই, মস্ত ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে যাঁর বিষয়ে আগে অনেক কথা বলেছি। বাড়ির সদর দরজায় নেমে পামশু জুতো পা থেকে খুলে সরিয়ে রাখলেন। বাবা তাড়াতাড়ি বললেন থাক না, থাক না, সবাই তো জুতো পরে ঢুকছে।

না, না, আমি জুতো পরে দেবালয়ে যাব না। সদর দরজা থেকে ঠাকুর ঘর পর্যন্ত রাস্তাটা, উনি নগ্নপায়ে এসে ঠাকুরের সামনে, জোড় হাতে চোখ বুজে উনি অন্তত মিনিট পনেরো প্রণাম করেছিলেন। কি প্রার্থনা করেছিলেন তা জানি না। কিন্তু তাঁকে অবাক চোখে দেখেছি। তারপর যখন নাম সংকীর্ত্তন হচ্ছে তখন তিনি গভীর ভাবাবেগে মন্দ্রস্বরে, সকলকে বলছেন আপনারা সব ধ্বনি দিন, ধ্বনি দিন।

এ তাঁর নিজস্ব অর্চনার ভাষা—আর শুনিনি।

পূজা অর্চনার শেষে, চলে যাবার সময় অন্যদের সঙ্গে বাড়িতে কাজ করার মহিলারাও পঙ্কজদার পায়ের ধূলো নিয়েছিল। পঙ্কজদাও তাদের সমাদরে সম্ভাষণ করেছিলেন—কেমন আছেন মা, আপনারা ভাল থাকুন মা। এমনিধারা তাঁর কথা ছিল, এত হৃদয়স্পর্শী।

আমরা ভাবতে পারি নি। বাবা বললেন আহা, উনি যে কি পরম বৈষ্ণব।

পঙ্কজ মল্লিককে আমরা, সেযুগের নানা আসরেও দেখেছি। তখন উত্তর কলকাতায় অনিল স্মৃতি বাসর বলে একটা অনুষ্ঠান হোত—বিখ্যাত সুরকার অনিল ভট্টাচার্যের স্মরণে। তাঁর বিখ্যাত ভায়েরা, গায়ক সুরকার নির্মল ভট্টাচার্য, ক্রিকেটার ভাষ্যকার কমল ভট্টাচার্য এঁরা এই আসরের আয়োজন করতেন। আমরা, ছেলেছোকরারা সব ভলান্টিয়ারী করতুম, গানটান শুনতুম।

নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে, পঙ্কজদা গাইছেন, 'সবার মাঝে যে গান গাহি, শুধু সে তোমারে শোনানো, প্রিয় হে, তুমি কি জানো' ?

এত কথা, পঙ্কজ মল্লিক বলেই এসব খুঁটিনাটি বলছি, শিল্পী কি করে হতে হয় বা শিল্পী কারে কয়—তা পঙ্কজ মল্লিকের গান থেকে বা পঙ্কজদার কাছ থেকেই কেবল শেখা যায়।

মানে, আপাদমস্তক একজন শিল্পী। তাই বোঝাতে চাইছ তো।

বিমান—হ্যাঁ, একটা আসরে পঙ্কজদা গাইছেন। ধনঞ্জয়, হেমন্তদা উইংসের পাশে, আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন পঙ্কজদার গান শুনবেন বলে। পঙ্কজদা সেদিন এত ভাল গাইলেন যে সবাই একেবারে মুগ্ধ, কারুর মুখে শব্দ নেই। গান শেষ করে পঙ্কজদা চলে যাবার সময়, ধনঞ্জয় তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে মুখ ফুটে বলে ফেললেন—



দুর্গা সেন

পঙ্কজদা, আপনি কি আমাদের এখনো হিংসে করেন? আপনার এই গানের পরে, আমরা আর কী গান গাইব?

পঙ্কজদা থাকলে ব্যাপারটা এইরকমই হোত—এমন বড় মাপের মানুষ এমন বড় মাপের শিল্পী। আর একটা ঘটনার কথা বলি—দুর্গা সেন—আহিরীটোলা পাড়ায় নিমু গোস্বামী লেনে তাঁর বাড়ি। তখন উনি মস্ত সুরকার। ওঁর পাড়ায় পুজোর পর বিজয়া সম্মীলনীতে তৎকালীন সব নামকরা শিল্পীদের উনি নিয়ে আসতেন। জমজমাট জলসা হোত। ৫০ কি ৫১ সাল হবে—তখন রাস্তাঘাটের অবস্থা আর কহতব্য নয়—গর্ত, ভাঙাচোরা, ইট পাথর নোংরার ডাঁই। জলসাতে আমন্ত্রিত হয়ে সুবল দাশগুপ্ত এসে গেছেন। পঙ্কজদাকে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তখনো এসে পৌঁছন নি। সুবল দাশগুপ্ত হলের ভিড়ে তাই ঢুকতে রাজী হলেন না। পাশেই একটা বাড়ি উঠছিল একজায়গায় চুন, সুরকি রাবিশ ঢালা একটা ঢিবি। সুবল ভেতরে যাবেন না, বাধ্য হয়ে দুর্গা সেন ওই উঁচু ঢিবির ওর একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে দিলেন। তার ওপর সুবল দাশগুপ্ত চেলাচামুণ্ডাদের নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলেন। ওদের সঙ্গে গল্পস্বল্প করছেন এই অবস্থায় পঙ্কজদা এসে গেলেন। গাড়ি থেকে নেমেই সুবল দাশগুপ্তকে ঢিবির মাথায় বসে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে বললেন এই যে ছোড়দা, ওখানে বসেছেন কেন?

আরো জানোই তো শরীর-টরীর খারাপ, ওই ভিড়ের ভেতর বসে থাকতে পারব না। তাই ভেতরে যাইনি।

পঙ্কজদা তখন পা টিপে সামলাতে সামলাতে ওই ঢিবির ওপরে উঠে গেলেন। সুবল দাশগুপ্তের সামনে অত লোকের দৃষ্টির মাঝখানে, পঙ্কজদা উবু হয়ে বসে পড়লেন। খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলবার পর, সুবল দাশগুপ্তকে বললেন, 'আমার গান না শুনে কিন্তু এখান থেকে যাবেন না। আপনার মত শ্রোতা পাওয়া তো আমার বড় ভাগ্যের কথা! এরা সব ছেলেমানুষ শ্রোতা, এরা তো শুনবেই। কিন্তু আপনিও শুনবেন, আমি পরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, কোথায় কি দোষত্রুটি হল আমার গানে'। সুবল দাশগুপ্ত অভিভূত, ভাবাবেগে মুখে আর কথা নেই। এইভাবে পঙ্কজদা সুরকার হিসেবে, সতীর্থ হিসেবে, তবলিয়া হিসেবে সুবল দাশগুপ্ত কেন, যার যেখানে যতটুকু, মানসম্মান পাওনা, উনি তাঁকে দরাজ হাতে, উজাড় করে তাই দিতেন।

সুবল দাশগুপ্ত কি পঙ্কজ মল্লিকের থেকে বয়সে বড় ছিলেন, যে পঙ্কজ মল্লিক ছোড়দা বলে ডাকতেন?

বিমান—না, না উনি পঙ্কজদার থেকে অনেক ছোট ছিলেন। পঙ্কজদা মজা করে

ওরকম, ছোড়দা-টোড়দা বলতেন। আরে কমল দাশগুপ্তও পঙ্কজদার থেকে ছোট ছিলেন। আসলে, সুবল দাশগুপ্ত কতো বড় একজন সুরকার, শিল্পী অতএব তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্যে পঙ্কজদা ওইভাবে বলবেন—এই তাঁর স্বভাব। পঙ্কজদা বরাবরই একরকম বিনীত সৌজন্যের, নিপাট প্রতিমূর্তি ছিলেন। এর জোড়া আর দেখিনি।

কিন্তু ভাই, পঙ্কজদার কথা কতো আর বলব! কৃষ্ণচন্দ্র দে যেমন যতোবার অবহেলার কষ্ট পেয়েছেন, পঙ্কজদার ভাগ্যেও সে রকম ব্যাপার কম ঘটেনি। সব থেকে ভালবাসার যে জিনিসটা পঙ্কজদা, তিন তিল করে নিজের হাতে গড়েছিলেন সেখান থেকে পঙ্কজদাকে আচমকা, একদিন কোন চিঠিপত্র না দিয়ে, আগাম একটুও আঁচ না দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়; অন্য সব রোববারের মত যথারীতি উনি সঙ্গীত শিক্ষার আসরে গান শেখাতে গেছেন। তাঁকে মুখের ওপর বলে দেওয়া হল, আজ থেকে আর আপনার গান শেখানোর আসর হবে না। বোঝো কি মর্মান্তিক। তা আমার কথা হচ্ছে, আমি অনেক শিল্পীকেই এরকম অবহেলা পেতে দেখেছি। দুঃখ পেয়েছি আঘাত পেয়েছি।

কিন্তু পঙ্কজকুমারের মত বিরাট শিল্পী মানুষের, শেষ জীবনে কেন এরকম হেনস্থা হবে ? এটাই সকলের প্রশ্ন। এই দারুণ আঘাত তিনি সহ্য করতে পারলেন না—তাঁর স্ট্রোক হয়ে গেল। পীড়িত অবস্থায় পড়েছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেন নি।

তাঁর তো কোন অহমিকা ছিল না। সবাইকেই তিনি আপন ভেবেছেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্র দের সুরে গান গেয়েছেন, তিমিরবরণের সুরে গান গেয়েছেন 'অধিকার' ছবিতে। রাইচাঁদের সুরে 'মায়া'-তে। ভাবাবেগ প্রবণ মানুষটির সঙ্গে কোথাও তো কারুর সম্পর্ক বেসুরো হয়নি তবু তাঁর এই পরিণতি।

এর পরেও মন্মথ রায়ের উদ্যোগে এবং ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আগ্রহে, শেষ বয়সে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরি নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার অধিকর্তার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। বেশ কয়েকটা কাজ করেছিলেন যা খুব প্রশংসাও কুড়িয়েছিল। বিধানচন্দ্র পঙ্কজ মল্লিকের গান শুনতে ভালবাসতেন। সকলের অগোচরে মাঝেমধ্যেই বিধান রায়ের বাড়িতে গিয়ে পঙ্কজ মল্লিক গান শুনিয়ে আসতেন। এমনকি বিধানচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়ার পর প্রায়ই পঙ্কজকে ডাকতেন—'আমি গান শুনব।' বিধানচন্দ্রের ইচ্ছে অনুযায়ী, ক্রুশ্চেভ বুলগনিনের কলকাতা পরিদর্শনের সময় পঙ্কজদা কলকাতার বড় বড় আর্টিস্টদের ট্রেনিং দিয়ে ভারতের এবং রাশিয়ান ভাষায় সোভিয়েট দেশের জাতীয় সঙ্গীত গাইয়েছিলেন।

পঙ্কজদার এরকম কাহিনীর শেষ নেই। পঙ্কজদা একদিন গল্পচ্ছলে বলেছিলেন যে কলকাতার বাইরে দিল্লি, বম্বে গেলে লোকে ঝাঁপিয়ে পড়ত চেঁচাত পঞ্চম মল্লিক আ গয়া। পঙ্কজ উচ্চারণটা জড়িয়ে যেত। কিন্তু ভালবাসা পঙ্কজ মল্লিককেও জড়িয়ে ফেলত। রসরসিকতা মজা করতেও পঙ্কজের জুড়ি ছিল না। কেউ কিছু

মনে করত না বরং পরে উপভোগ করত।

জগন্ময় মিত্র এরকম একটা গল্প করেছিলেন।

হাতিবাগানে গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্স্যাল রুমে দেখা হয়েছে পঙ্কজদার সঙ্গে। জগন্ময়দা থাকতেন চেতলায়, পঙ্কজদা পণ্ডিতিয়ায়। উনি বললেন, চল আমার গাড়িতে। হাজরার মোড় পর্যন্ত একসঙ্গে যাই। পঙ্কজদা তার উলসলি গাড়ি চালাচ্ছেন, জগন্ময়দা তাঁর পাশে বসে গল্প করছেন। হঠাৎ পঙ্কজদা বললেন জগন্ময় তুই এখানে নেমে যা, আমার একটা কাজ বাকি রয়েছে, মনে পড়ে গেল। আমাকে ওখানে যেতে হবে, বাড়ি যাওয়া হবে না।

নাও ঠ্যালা। জগন্ময়কে সেখানে নামতে হল। জগন্ময় বললেন—বেশ দাদা, তুমি আমায় মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছ। এখন আমি ট্যাক্সি পাবো কোথায়, বাড়ি যাই কি করে ? কিন্তু এতে জগন্ময়ের রাগ হয়নি কেননা পঙ্কজদা যে ভালবাসায় বাঁধা।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গানকে প্রচার ও পরিচিতি দেবার প্রচেষ্টায় পঙ্কজ কুমারের আর একটা যে ভূমিকা ছিল সে ব্যাপারটা সম্বন্ধে এবার কিছু বলা দরকার। এ ব্যাপারে পঙ্কজকুমারের ভাবনা চিন্তা যেন সময়ের অনেক আগে আগে কাজ শুরু করেছিল। সারা ভারতে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে উনি আমাদের প্রধান যোগাযোগের ভাষা হিন্দিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর জন্যে গোড়ার দিকে তাঁকে কম সমালোচনা, ঠাট্টা বিদ্রূপ শুনতে হয়নি।

বিমান—হ্যাঁ, চল্লিশের দশকে পঙ্কজদা প্রথম 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' এই গানটা অনুবাদ করিয়ে হিন্দিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের দারুণ একটা প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাতে সর্বভারতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বেশ সফলও হয়েছিলেন। এর ওপর ফ্রান্সিস ক্যাসানোভার বিশ জনের বিশাল অর্কেস্ট্রার সাহায্য নিয়ে যেরকম ওয়েস্টার্ন অর্কেস্ট্রেশনে হিন্দিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের সাহস দেখিয়েছিলেন, তাঁর জন্যে তাঁকে হয়ত যথেষ্ট ধকল পোহাতে হয়েছিল। কিন্তু—তার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সামনে বিস্তৃততর সাংস্কৃতিক ভাবনা আর বিরাট বাণিজ্যিক সম্ভাবনার দরজা যে, কি রকম খুলে দিতে পেরেছিলেন—সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এসবের জন্যে পঙ্কজদারই ছিল অগ্রণী ভূমিকা। তবে অর্কেস্ট্রার কথা যখন উঠল তখন বলি, এই পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রেশনের ব্যাপারে পঙ্কজদার দুর্দান্ত ধারণা ও দখল ছিল। আমি তাই সকলকে বলব 'মুক্তি' ছবির গান কলাম্বিয়ার সাদা লেবেলের রেকর্ডে, পঙ্কজদার গাওয়া 'কোন লগনে জনম নিলাম' আর উল্টোপিঠে 'তুমি ভুল কোরো না পথিক' শুনে দেখুন তিন মিনিটের সময় সীমার মধ্যে বাংলা গানে অর্কেস্ট্রা যে কী হতে পারে তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন পঙ্কজদা রেখে গেছেন। হ্যাঁ সিনেমার পর্দায় যদিও পঙ্কজদার সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গান দুটি গেয়েছিলেন অভিনেত্রী মেনকা দেবী, রেকর্ড করার সময় কিন্তু পঙ্কজদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছিলেন রাধারানী। কথাটা বলে রাখা দরকার, তা নইলে ভবিষ্যতে হয়ত আবার এ নিয়ে বিভ্রান্তির কচকচি শুরু হয়ে যাবে।

পঙ্কজদা চলে গেছেন বছর চব্বিশ হয়েও গেল। আমার একটা বিশেষ অভিমান আছে। যে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে পঙ্কজদা অত কাজ করেছিলেন সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের এখন না হয় অনেক চর্চা হচ্ছে কিন্তু আধুনিক বাংলা গানেও যে পঙ্কজদার কতো অবদান, বা কী অবদান তাঁ নিয়ে তো কেউ উল্লেখ করে না! কিন্তু একে কি অস্বীকার করা যায়—না, উচিৎ ?

পঙ্কজদার—'ও কেন গেল চলে; জনমমরণ জীবনের দুটি দ্বার' কিংবা ধরো, 'চৈত্রদিনের ঝরাপাতা'—যেটি উনি ১৯৪০ সালে করেছিলেন তা কি ওই সময়ে আর কেউ ভাবতে পেরেছিল ?

উদাহরণ দিতে গেলে শেষ হবে না। তবু হঠাৎ হঠাৎই আমার মনের মাঝে, তাঁর যে সব গান বাজে, তাতে যে আমার মনের আপন কথাই শুনতে পাই। কবির গানের কথাগুলো ধরেই আমার প্রাণের কথাগুলো বলছি কেননা পঙ্কজ মল্লিকের কাব্যসঙ্গীত নির্মাণের আধুনিকতা, আর কোনও ভাষায় ঠিক বোঝাতে পারব না। অন্তত কয়েকটা গান তো উল্লেখ না করে পারছি না, 'ওরে চঞ্চল', 'যবে কন্টক পথে হবে', 'আমি আজ নিয়ে যাই', 'অশ্রুকণার মেলা নয়নে', 'মরণ রে তো এল পাশে', 'ঘন ঘন ধ্বনিছে', 'আজি বসন্ত জাগিল কুঞ্জদ্বারে', 'জীবনে জেগেছিল মধুমাস', 'যেদিন তোমার গাইল বীণা'।

বিমান—এখানে মুস্কিলটা কি জানো, এ সব গান তোমার আমার কাছে অনবদ্য। কিন্তু ভাই, আমাদের পরে আরো চারটে প্রজন্ম চলে গেছে। তাই বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে এগুলো আর 'জেম' নয়।

এতে তাদের দোষ কি! তাদের তো এগুলো শোনাতে হবেই না হলে, তারা কি করেই বা বুঝবে, অনুভব করবে ? এর জন্যে আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। গেয়ে গেয়ে, তাঁর ওইসব গান শুনিয়ে শুনিয়ে, লেখালেখি করে পঙ্কজদার কাজকে তো মেলে ধরতে হবে। কিন্তু ঘণ্টাটা বাঁধবে কে ? সেই লোকের তো অভাব। সুদূর পশ্চিম ভারতে সেই ১৯৭৮-এই 'পঙ্কজ মল্লিক মিউজিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' হয়েছে। গুজরাতের শেঠ-দম্পতিদের গড়া সঙ্গীতভবন ট্রাস্টের অধীনে পঙ্কজ মল্লিকের গানের চর্চা হচ্ছে—ক্যাসেট বেরুচ্ছে। লাইব্রেরী হয়েছে। সংরক্ষণের আর্কাইভ-ও একটু একটু করে বাড়ছে। এমনকি ১৯৮২তে আমেরিকাতে এদের প্রশাখা খুলেছে। রেডিও, সঙ্গীতানুষ্ঠান সভাসমিতিতে টেপকৃত কতো না-শোনা গানের সংগ্রহও বাড়ছে। কিন্তু এখানে ? কলকাতায় কিই বা হয়েছে ? গত দুতিন বছর ধরে কলকাতা রেডিওর এফ্ এম মারফৎ পঙ্কজ মল্লিককে কখনো সখনো হয়ত সামান্য হাজির করা হচ্ছে। সেইটুকুই যেন ঘনকালো মেঘের কোলে একটুখানি ক্ষীণ আলোর রেখা।

বিমান—তবে, মহালয়ার মহিষাসুরমর্দিনী মনে হয়, বাঙালির মন থেকে কিছুতেই পঙ্কজ মল্লিককে মুছে যেতে দেবে না। এখানে, পঙ্কজ মল্লিক যেন প্রবাদ প্রতিম সাধকশিল্পী বা সুরকারদের বিস্ময় হয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবেন। কিন্তু একটা

কথা পরিষ্কার করে জানা দরকার। মহিষাসুরমর্দিনীর সব গানের সুর কিন্তু সেই গোড়া থেকে একা পঙ্কজদার নয়। সেই গোড়ার যুগে তখনকার দিনের সাগিরুদ্দিন খাঁ নামে একজন শিল্পী ওই মহালয়ার টিমে ছিলেন। তিনিই 'অখিল বিমানে তবজয় গানে'—গানটার সুর করেছিলেন। সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠের বিখ্যাত গান, 'বাজল তোমার আলোর বেনু' এ গানটার সুর খানিকটা পঙ্কজদার খানিকটা রাইচাঁদ বড়ালের। হ্যাঁ, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন পঙ্কজদা, সব স্তোত্রের সুরও তাঁর—তবে এটা ঠিক যে সামগ্রিকভাবে সুররচনার কাজ প্রত্যক্ষভাবে বা অপ্রত্যক্ষভাবে পঙ্কজদাই করেছিলেন। তাঁর কৃতিত্বকে কোন মতে খাটো করার জন্যে একথা বলা নয়, সে প্রশ্নই ওঠে না। বারেবারে কতো গান যোগ হয়েছে আবার কোনবার পঙ্কজদা যেমন মনে করেছেন, দু'চারটে বাদ দিয়েছেন। পঙ্কজদাই ট্রেনিং দিতেন মহালয়ার আগে, প্রতিবার তিনমাস ধরে সকলকে জড়ো করে, রোজ প্রাণপাত করে মহলা দেওয়াতেন। এত কড়া নিয়ম যে, কারুর কোনরকম ছাড় বাহানা চলবে না। কারুর এতটুকু দেরিতে আসা বরদাস্ত করবেন না। জবরদস্ত ডিসিপ্লিন।

যতদিন লাইভ অনুষ্ঠান হোত, ততদিনই এরকম কড়াকড়ি সবাইকে মানতে হোত। কিন্তু তাতে শিল্পীদের এক আধ সময় হয়ত অসুবিধে হোত কিন্তু তার জন্যে সবাই মিলে সর্বাঙ্গসুন্দর করে পরিবেশন করার যে আনন্দ—তাতে কোন দিন কমতি হয়নি। পঙ্কজদার ডিসিপ্লিনের এইটা ছিল মজা বা বৈশিষ্ট্য। এটা শুধু তাঁর মত মানুষের ব্যক্তিত্বের জন্যেই সম্ভব হোত। এটা তাঁর একটা অনন্য অবদান যার দ্বিতীয় আর একটা আজও সম্ভব হল না।

কিছু আমলাতান্ত্রিক কারসাজিতে মাত্র একবারই চেষ্টা হয়েছিল পঙ্কজ মল্লিককে হটিয়ে 'দেবি দুর্গতি হারিনীম্' নামে একটা অনুষ্ঠান করার সেই ১৯৭৬ সালের মহালয়াতে। তখন উত্তমকুমার, হেমন্তকুমাররা সব পপুলারিটির তুঙ্গে। ভাবা হয়েছিল, তাঁদের নামডাক, বাজারদরের চাপে সেকেলে পঙ্কজ মল্লিককে বাতিল করে, মাটি চাপা দিতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু একবার মাত্র প্রচারের পরে ওই দেবির যে কি দুর্গতি হয়েছিল তা সবাই জানে। সমস্ত মানুষ তাতে খেপে উঠে এমন সোচ্চার হয়েছিল যে, আবার সেই মহিষাসুরমর্দিনীকে বাধ্য হয়ে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। টেপে বাজিয়ে হলেও আজ এই ২০০২ সালে এটা যেমন বেজেছে, মনে হয় যতদিন মহালয়া থাকবে ততদিন এটাও বোধহয় একই ভাবে আলোর বেণু বাজাবে। কেননা ওটা যে বাঙালিদের জীবনে একটা অপরিহার্য রিচুয়ালের মত হয়ে গেছে! অপমানে জর্জরিত, ১৯৭৬-এ অপসারিত পঙ্কজ মল্লিকের দেহমনে, মহিষাসুরমর্দিনীর পুনর্বাসন যেন সঞ্জীবনীর মত কাজ করেছিল। অসুস্থ পঙ্কজ মল্লিক ১৯৭৭-এর সাবেকী মহালয়া অনুষ্ঠান শেষে, তাই বিমল ভূষণকে ফোন করেছিলেন। ক্লান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন বিমল, প্রাণে বড় কষ্ট নিয়ে গত একটা বছর যে কি করে কাটিয়েছি। আজ আমার মন প্রাণ ভরে গেল। তার মানে, এইরকম মান-অপমানের জোয়ারভাঁটা, পঙ্কজ মল্লিকের ভাগ্যে, সারা জীবনভর তাঁকে কান্নাহাসির দোলায়

দুলিয়েছে। তা না হলে, সম্মানও তো তাঁর বরাতে কম জোটে নি। মাত্র ২৪ বছর বয়সে ১৯২৯ সালে, সারস্বত মহামণ্ডল থেকে সুরসাগর উপাধি পাবার পর, যত বয়স বেড়েছে একটার পর একটা সম্মানের শিরোপা নিয়মিত ব্যবধানেই তাঁর মাথায় উঠেছে। যেমন সঙ্গীত রত্নাকর (১৯৫৬) পদ্মশ্রী (১৯৭০) দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসায়েব ফালকে পুরস্কার (১৯৭২)—এ কী চাট্টিখানি ব্যাপার।

আবার এর উল্টোটাও যে পঙ্কজ মল্লিককে বরাবর তাড়া করে বেড়িয়েছে—তার কথা আর নতুন করে বলার দরকার নেই। কিন্তু এই পৌষ-ফাগুনের পালা নিয়েই তো মানুষের জীবন। তাই পঙ্কজ মল্লিকই বা কি করে, এর বাইরে থাকবেন!

বিমান—তা, পঙ্কজ মল্লিকের কথা যখন হচ্ছে তখন তাঁর পরিমণ্ডলের কথা বা ছাত্রছাত্রীর কথাও এইখানে একটুখানি বলে নেওয়া ভাল।

কলকাতা বেতারে যখন পঙ্কজ মল্লিক বাণীকুমার নজরুল ইসলাম বীরেন ভদ্রদের মত মানুষদের সর্বময় প্রভাব, সেই চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, যে কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান এঁদের অধিনায়কত্ব ছাড়া হোত না। তখন মেয়েদের মধ্যে তিনজনকে প্রায় সব সঙ্গীতানুষ্ঠানেই পাওয়া যেত শৈলদেবী, সুপ্রভা ঘোষ, ইলা ঘোষ। এঁরা রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুলের গান, আধুনিক বাংলা গান কোনটাতেই বাদ থাকতেন না। এদের মধ্যে ইলা ঘোষ পঙ্কজ মল্লিকের কাছে অনেক তালিম পেয়েছিলেন। যেহেতু অন্যদের তুলনায় এখন আর ইলা ঘোষের বিশেষ পরিচিতি নেই তাই ইলা ঘোষের কথা দিয়েই শুরু করো না।

বিমান—পঙ্কজদার খুব স্নেহের পাত্রপাত্রী ছিল, তাঁর বন্ধুপুত্র ও কন্যা, সুনীল ঘোষ ও ইলা ঘোষ। ওরা উত্তর কলকাতায় নবকৃষ্ণ স্ট্রীটেই থাকত। আমার সঙ্গে ওদের বেশ যোগাযোগ ছিল। ইলা ঘোষ পরে ইলা মিত্র হয়েছিল। তখন রেকর্ডে, রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত বা বাংলা আধুনিক গানে ইলা ঘোষের খুব নাম। রেডিও বাদে 'ডাক্তার' ছবিতে পঙ্কজদার সুরে, 'আমি বন বুলবুল গাহি গান' খানা গেয়ে সে সময়ে সঙ্গীত জগতে সাংঘাতিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর তার ফলে, তাকে নিয়ে বড় বড় সুরকারদের ডাকাডাকি টানাটানি পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইলার বাবা ছিলেন খুবই গোঁড়া। উনি বলেছিলেন পঙ্কজবাবু না বললে, ও অন্য কারুর সুরে গাইবে না। এই গানের সুবাদে গ্রামোফোন কোম্পানী ওকে নিয়ে নিল। ওখানে কাজী নজরুল ইসলাম ওকে যেসব গান নিজে শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে মমতাজ, নূরজাহান, খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। বোধহয় ওই ভিন্ন গোত্রের ওই ধরনের গানের একটা নতুন ধারাও চালু হয়েছিল। ইলা ঘোষের জন্যে নজরুল গোটাকতক গান লিখে, কমল দাশগুপ্তকে সুর করে ইলাকে দিয়ে গাওয়াবার জন্যে ভার দিয়েছিলেন। তার দু'একটার উল্লেখ করছি—'আমি যার নূপুরের ছন্দ, বেণু তার সুর, কে সেই সুন্দর, কে ?' বা 'কেন মন বনে, মালতী বল্লরী দোলে জানি না, জানি না।'

এখনো এসব গান যাকে বলে দুর্দান্ত সুপারডুপার হিট। এগুলো কিন্তু প্রথমে

ইলাদিরই গাওয়া গান—যার আকর্ষণ আজও কমে নি। পঙ্কজদা, ইলাদির সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে, দেশের মাটি ছবির বিখ্যাত গান, 'আবার যেরে রঙ ফিরেছে ধূলার ধরণীতে' রেকর্ডে গেয়েছিলেন। সিনেমাতে পঙ্কজদার সুরে এ গানটা কিন্তু তিনজনকে দিয়ে গাওয়ানো হয়েছিল—কৃষ্ণচন্দ্র, উমাশশী আর সায়গল।

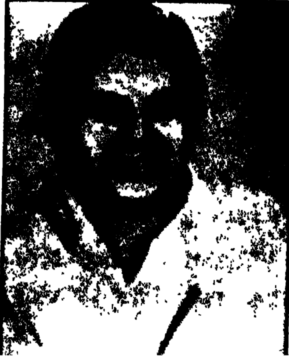
ইলাদির ভাই সুনীল ঘোষ—তিনিও ভাল গাইতেন। পঙ্কজদার ট্রেনিং-এ সুনীলদা রেকর্ড করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু'। ইলাদি ও সুনীলদা অবশ্য আরো অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে অদ্ভুত প্রশিক্ষণ ছিল ইলাদির। এরপর দুইপুরুষ ছবিতেও পঙ্কজদার সুরে ইলাদি দারুণ সব গান গেয়েছিলেন যে গুলোর জনপ্রিয়তা আজও অটুট রয়েছে—'হে বিজয়ী বীর ফিরে এস', 'ওরে আমার গান কোথায় যাবি বল', কবি শৈলেন রায়ের লেখা দারুণ সব গান। ইলাদি ছায়াছবিতে নেপথ্য গায়িকা হিসেবে বেশি ছবিতে প্লে-ব্যাক করেননি। তিনি বেশ বাছবিচার, বাছাই করে তবে গাইতে রাজী হতেন। হিন্দি 'ডাক্তার' ছবিতেও পঙ্কজদা ইলাদিকে দিয়ে গান গাইয়েছিলেন 'আমি বন বুলবুলের' হিন্দিও। এছাড়া পঙ্কজের সুরে 'ইয়ে তিতলি' গানটাও সেযুগের লোকে খুব পছন্দ করেছিল।

ইলাদির বিয়ে হয়ে গেল কলকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী, মিত্র পরিবারে। সেখানে বোধহয় গানের বিশেষ আদর ছিল না, তাই বিয়ের পর তাঁর গানের প্রবাহ ক্রমশই শুকিয়ে এল। তাই পরে রেকর্ড করাও আর বিশেষ হয়নি। আসলে উনি গানটাকে কখনো পেশা হিসেবে নেননি। খুবই হাল্কা চালে যখন ইচ্ছে হল তখন হয়ত গাইতে বসলেন।

কমল দাশগুপ্ত কোনসময় যেন বললেন, ইলা একটা গান করো তো রেকর্ড করব। কমল দাশগুপ্তর সঙ্গীত পরিচালনায় কথামত গেয়ে দিলেন। রেকর্ড হয়ে গেল—হয়ত খুব ভাল বিক্রীও হল।

কিন্তু ইলা ঘোষ গানের আনন্দেই গান গাইতেন। বাণিজ্যিক বাজারে নিজেকে সেভাবে জড়াতে চাননি। পঞ্চাশের দশকের একদিন প্রায় চুপিসাড়ে, পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ইলাদি চলে গেলেন। তখন কতো আর বয়েস, বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। ছিলেন অনেক সম্ভাবনার অভিযাত্রী কিন্তু-বিকাশের লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে তাঁকে, অকালে নীরব হয়ে যেতে হল।

না, নীরব নয়। এই ক'দিন আগে, ডাক্তার ছবিতে অনেক দিন বাদে আবার শুনলুম পঙ্কজ মল্লিকের সুরে নায়িকার মুখে। ইলা ঘোষের গভীর অনুভূতির গান 'সে দিন শুধাল বাঁশি, কে দিল আমায় সুর', সঙ্গে অর্কেস্ট্রাতে পঙ্কজ মল্লিকের অনুপম কম্পোজিশান। যাঁদের এই গান আর তার আবহ সঙ্গীতটা খুব স্পষ্ট ভাবে মনে আছে, তাঁরা আমার কথায় সায় দেবেন বলেই, আমার বিশ্বাস। ও গানের মূর্চ্ছনা এমন যা আজো মিলিয়ে যায় নি বরং তার অনুরণনেই ইলা ঘোষের কথা মনে পড়ে, খুব মনে পড়ে।


যূথিকা রায়

বিমান—যে সময় ইলাদি চলে গেলেন সে সময় বরাবর, আর একজন শিল্পী যিনি সারা দেশে তো বটেই বরং ভারতের সীমানা ছাড়িয়েও নানা দেশে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর কথাটা এইখানে বললে বোধহয় যথাযথ হবে। তিনি যূথিকা রায় সৌভাগ্যক্রমে যিনি আশির কোঠায় চলতে চলতে এখন আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এখনো ঘনিষ্ঠ, আমাদের পরিবারের সঙ্গেও তাই।

যূথিকাদি, কমল দাশগুপ্ত আর সুবল দাশগুপ্ত এই তিনজনকে নিয়ে একটা দারুণ গ্রুপের মত তৈরি হয়েছিল। তাই এই তিনজনের কথা একসঙ্গে বললে, বোধহয় একটা যুগের ইতিহাসকেই ছোঁয়া হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন যূথিকাদি আমাদের কাছাকাছি থাকতেন। ওই জয় মিত্তির, না, গোকুল মিত্তির লেনে। যূথিকাদিদের আদি বাড়ি হাওড়ার আমতায়। বাবা, সত্যেন্দ্র রায় ছিলেন সাব-ডিভিসনাল স্কুল-ইনস্পেকটর—বদলীর চাকরি গোটা বাংলা জুড়ে। গানবাজনাতে বাবা-মার খুব আগ্রহ ছিল—বাবা ভাল তবলা বাজাতেন। ঠাকুর্দার দেওয়া চোঙাওলা কলের গানে মা বাজাতেন আঙুরবালা, ইন্দুবালা, বেদানা দাসী, কমলা ঝরিয়া, কে মল্লিক, অমলা দাস, কৃষ্ণচন্দ্রের গান। সেই গান শুনে শুনে রেনুর (যূথিকাদির ডাকনাম) সামনে গানের ভুবনের দরজা খুলে যাচ্ছিল। বাবা-মা চাইতেন রেনু ভাল গানটান করুক। রেকর্ড করুক। সাত-আট বছর বয়সে অডিশনে পাশ করে, রেডিওতে প্রথম গান। সেদিন গেয়েছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত—'আর রেখো না আঁধারে'। তবু সারাজীবনে, আর কখনো রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড করার সুযোগ পান নি। এনিয়ে তাঁর মনে একটা দুঃখ রয়েই গেছে। সে যাই হোক, বাবা আবার ময়মনসিংহে বদলী হতেই, মা সেনহাটির বাস উঠিয়ে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতা চলে এলেন। ওদের তো মানুষ করতে হবে। যূথিকার তখন বয়স দশ/এগারো হবে। বরানগরে থাকতেন জ্ঞানরঞ্জন সেন। সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে বেশ সুনাম ছিল। কাজী নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। এর কাছে যূথিকার গান শেখা শুরু হল। এবার বাবা জ্ঞানরঞ্জনবাবুকে ধরলেন—মেয়ের একটা রেকর্ড যদি হয়। জ্ঞানরঞ্জনের বাড়িতে নজরুল যূথিকার গান শুনলেন। তাঁর ভাল লাগল। অতএব রেকর্ড হবার সুযোগ হয়ে গেল। যূথিকাদির গান প্রথম রেকর্ড হয়েছিল ১৯৩৩ সালে জ্ঞানরঞ্জনের লেখা ও সুরে। তবে সে রেকর্ড শেষ পর্যন্ত বাজারে বেরোয় নি। ১৯৩৪ সালে যূথিকাদির যে রেকর্ড প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ভগবতী ভট্টাচায্যির উদ্যোগে এবং কমল দাশগুপ্তর ট্রেনিং-এ তা সঙ্গে সঙ্গে হিট হয়ে, একেবারে চিরকালীন সুপারহিট হয়ে রইল। প্রায় ৭০ বছর পরে এ গান আজও লোকে শুনতে চায়, রেডিওতে বাজে। একাধিকবার রি-মেকও হয়েছে—'সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে' আর 'আমি ভোরের যূথিকা'।

এই সময় পর্যন্ত আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালাদের বা ধীরেন দাস, হীরেন বসু, কৃষ্ণচন্দ্র দে বা মৃণাল কান্তি ঘোষদের গান ও তাঁদের গায়ন শৈলীতেই ছিল তখনকার দিনের বাংলা গান বলতে যা বোঝায়—সেই বাংলা গানের পরিচিতি বা চিহ্নিত স্বাক্ষর। তাঁদের গানের কথা, সুর, উচ্চারণ রীতি এবং গায়ন ভঙ্গি শোনামাত্রই বোঝা যেত এত ভাল কথা সুর আর গানের গায়ন, শিল্পীর সমাহার, সব মিলিয়ে এ গানের এমন অতুল ঐশ্বর্য্য তবু এ যেন আমার রোজকার জীবনের সঙ্গে মনের কামনা-বাসনা, মুখের ভাষার সঙ্গে ঠিক মিলছে না। তাই মন চাইছিল এমন গান যার কথা ভাবনা গায়ন ভঙ্গি সব যেন মনে হবে এ আমার নিজের মুখের কথা। নিজে যেভাবে বলি, ভাবি তার সবটুকু নিয়েই আমায় এ গান—এমন গানের জন্যে যখন মধ্য তিরিশের বাঙালি মন, তৃষিত চাতকের মত, সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষায় ছিল, তখনই হঠাৎ যূথিকা রায় এসে পড়লেন। এবং এলেন, গাইলেন আর জয় করে নিলেন গোটা গান পাগল বাঙালি জাতটাকে। প্রণব রায়ের কথা আর কমল দাশগুপ্তের সুরে 'সাঁঝের তারকা' আর 'আমি ভোরের যূথিকা'—এই দুটি গানে বাঙালির সাঁঝ-সকাল যূথিকাই ভরিয়ে রাখলেন। শ্রোতারা হঠাৎ মুখোমুখি হল চলতি গানের ছাঁচ ভাঙা শাস্ত্রীয় বা দেশজ গানের প্রভাব ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসা, এমন এক জাতের গানের যা বাংলা গানের ঠিকুজি-কুলুজি সমেত গানের ভোলটাই যেন পাল্টে দিল। আধুনিক গানের ভূমিষ্ঠ হবার কান্নাহাসি শোনা নিয়েছিল। এ নিয়ে অবশ্য কিছু কিছু মতভেদ বা বিতর্ক যে হয়নি তা নয়। বরং সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তবু প্রণব-কমল-যূথিকার যৌথ সৃষ্টি, ১৯৩৪-এর এই মাইলফলক যে নাকচ হয়ে যায় নি—তার গুরুত্বও তো অস্বীকার করা যায় না।

বিমান—যূথিকাদি নিজে আমাদের পাড়ায় যখন এলেন তখনই ওঁর খুব নাম ধাম হয়েছে। আমি প্রথম যূথিকাদিকে দেখেছি স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সালে। আমাদের পাড়ায় অতবড় একজন নামী শিল্পী থাকেন, এতে পাড়ার লোক হিসেবে আমাদের রীতিমত গর্ব হত। তখন দেখেছি, কমল দাশগুপ্তর গাড়ি যূথিকাদির বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই যূথিকাদির সঙ্গে এখন আমার নিবিড় সম্পর্ক। এখন আমি বাড়িতে না থাকলেও, উনি টেলিফোনে আমার বোনেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। উনি এই কিছুকাল আগে আমাদের বাড়িতে এসে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছিলেন। দুপুরবেলা শুয়ে বসে সারা দিনটা কাটিয়েছিলেন। কারণটা বলি। আমার ওপর একটা তথ্যচিত্র তোলা হচ্ছিল। আমার সম্বন্ধে এটা সেটা কিছু বলার জন্যে ছাত্রছাত্রী যেমন ইন্দ্রানী সেন, পূরবী দত্ত তারা সবাই এসেছিল। যূথিকাদিও এসেছিলেন। এসেছিলেন বেঙ্গল মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষা, রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপিকা উৎপলা গোস্বামী, রেডিওর মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়।

যূথিকাদির কাছে শুনেছিলাম গ্রামোফোন কোম্পানীতে উনি অডিশনে পাশ করেছিলেন ১৯৩৩ সালে। এর আগে উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া অন্য গানও যথেষ্ট গাইতেন। কমল দাশগুপ্তর ট্রেনিং-এই ওকে দেওয়া হল। কমল দাশগুপ্ত তখন প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন উঠতি সুরশিল্পী। উনি নতুন দুখানা গান, নতুন আঙ্গিকে তৈরি করলেন।

নতুন উঠতি গীতিকার প্রণব রায় আর সুরকারও নতুন উঠতি শ্রীমান কমল দাশগুপ্ত, ওঁর জন্ম ১৯১১ সালে কিনা।

ওই যে বছর মোহনবাগান শীল্ড পেল ? বাঃ বেশ মজা তো!

বিমান—১৯৩৩ সালে বাইশ বছর বয়েস, তাই মাস্টার কমল দাশগুপ্ত! যূথিকা রায়ের নামে বাজারে রেকর্ড বেরুল—আমি ভোরের যূথিকা আর ওই বিখ্যাত সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে—যে গানটাকে এখনকার গবেষক বিশেষজ্ঞরাও অনেকে, আধুনিক বাংলা গান সরনীটির প্রথম মাইল ফলক বলে চিহ্নিত করেছেন। কারুর কাছে এটা হয়ত প্রশ্নাতীত নাও হতে পারে, তবু এ গান যে ইতিহাসের উপাদান হয়ে গেছে—তাতে কিন্তু কোনরকম দ্বিমত নেই। সেই বোধহয় রেকর্ডের বাংলা গানে, প্রথম অর্কেস্ট্রা তৈরি হল। সঙ্গে রঞ্জিত রায় পিয়ানো আর পরিতোষ শীল বেহালা বাজালেন। আর লক্ষ্য করবার মত হল এ দুটো গানে তবলা বাজল না। পিয়ানোতেই তবলার রিদম, তাল রাখা হয়েছিল। দারুণ একটা নতুনত্ব হল। তখন নতুন রেকর্ড বাজারে ছাড়ার আগে, বড় বড় নামকরা ডিলারদের ডেকে স্যাম্পল রেকর্ড শোনাতে হোত, বিশেষ করে নতুন শিল্পীদের ক্ষেত্রে তো বটেই। তখন আর একটা নিয়ম ছিল কলকাতার ডিলারদের নাকি নতুন রেকর্ড বেরুলে প্রত্যেককে অন্তত দশ কপি করে রেকর্ড বিক্রী করতেই হবে, এ ধরনের কোন শর্ত থাকত। আর সেইজন্যে বাজারে ছাড়ার আগে ডিলারদের ডেকে স্যাম্পল রেকর্ডের গান শোনার ব্যাপারটা চালু ছিল।

তা, আমি যূথিকাদির কাছেই শুনেছি, যে ডিলাররা এই গান দুটো শুনে একবাক্যে বলে দিল—না, এ গান দুটো একদম চলবে না। এ না হয়েছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত, না হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, না হয়েছে রাগপ্রধান না, না এ চলবে না।

শ্রীমান কমল দাশগুপ্ত আমতা আমতা করেছিলেন, এই গানগুলোতে আমি তিনরকম গানের ঢং পাঞ্চ করে নতুন ধরনের গান তৈরি করেছি। বাংলা গানে এরকমটা এই প্রথম।

ডিলাররা অনড়। দুবার-তিনবার শুনে আবার রায় দিলে না, এ চলবে না, মোটেই বিক্রী হবে না।

সেই সময় হঠাৎ কাজী নজরুল ইসলাম, সেই ঘরে আবির্ভূত হলেন। তিনি বললেন আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলুম, কী ব্যাপার বলোতো, কার গান হচ্ছিল ? কী অপূর্ব গেয়েছে। কে ? কে গেয়েছে ?

যূথিকা রায়।

কে যূথিকা রায় ? নজরুলের প্রশ্ন।

ও একটা বাচ্চা, পুঁচকে মেয়ে একেবারে নতুন।

তাই নাকি, বাঃ কি সুন্দর গেয়েছে। মেয়েটি কোথায়, ডাকো, ডেকে পাঠাও।

তা ওকে এখানে, এখন তো ডাকা যাবে না। এটা আমাদের ডিলারদের মিটিং।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নজরুল বললেন—আরে এ গান এখুনি বাজারে রিলিজ করাও। আমি বলছি এ রেকর্ড খুব ভাল, দারুণ বিক্রী হবে। ডিলাররা মুস্কিলে পড়ে গেল। তাই তারা বললে—আমরা কিন্তু কেউ এর জন্যে দায়দায়িত্ব নিয়ে ঝুঁকি নেব না। সে সময় নতুন রেকর্ড বাজারে বেরিয়ে, দুশো কপি বিক্রী হলেই কোম্পানীর খরচ উঠে যেত, লোকসানের ভয় থাকত না।

তা, রেকর্ডখানা বাজারে বেরুল। আর মাত্র তিন মাসের মধ্যে যূথিকাদির এই রেকর্ডখানা ষাট হাজার কপি, হ্যাঁ ষাট হাজার কপি বিক্রী হয়ে গিয়ে বাজারে রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিল। রাতারাতি যূথিকাদি হয়ে গেল আর্টিস্ট, স্টার।

নজরুল ইসলাম যূথিকাদিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন আমার গান রেকর্ড করো, কমল সুর করবে। কাজী, তাঁর লেখা দু'খানা গান যূথিকাদির হাতে ধরিয়ে দিলেন। যূথিকাদি গান দুখানি মার হাতে দিয়ে কাজী নজরুলের সব কথা জানালেন। কাজী তখন বাগবাজারে থাকতেন। যূথিকাদির মা, বাগবাজারের বাড়িতে গিয়ে কাজী সায়েবকে বললেন—কাজী সায়েব, আমার মেয়ে তো এত ছোট, ওকে ওই যে গানগুলো দিয়েছেন তার বদলে যদি দু' একটা ঠাকুর দেবতার বা ভক্তিমূলক গান লিখে দেন তাহলে—

নজরুল বললেন ওই তো ওখানে আমার গানের খাতাগুলো আছে, মা। আপনি আমার খাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখুন না, যে গান আপনার পছন্দ হবে, ভক্তিমূলক বা যাই হোক, আপনি বলুন, আমি তাই করাব।

কিন্তু যূথিকাদির মা একটু দেখেই, বললেন—না, আমার কোনটা পছন্দ হচ্ছে না —আপনি নতুন করে কিছু লিখে দিন্। নজরুল দুটো গান লিখে ফেললেন। কমল দাশগুপ্তকে দিয়ে সুর করালেন। যূথিকাদি রেকর্ড করলেন—'ওরে নীল যমুনার জল, বলরে মোরে বল্'—উল্টো পিঠে, 'তোমার কালোরূপে যাক না ডুবে, সকল কালো মম, ওগো কৃষ্ণ প্রিয়তম'।

আবার সঙ্গে সঙ্গে হিট।

এরপর ১৯৩৫ সাল। সে বছর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী। সে বছর নজরুল দু'খানা গান লিখলেন। লিখে বললেন—এ দুটো গান কমল আর যূথিকা দুজনে মিলে, ডুয়েটে গাইবে। একটা, পরমপুরুষ সিদ্ধ যোগী, মাতৃভক্ত যুগাবতার, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম, নমস্কার।

অন্য দিকে 'জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর, চির গৈরিক ধারী', দ্বৈত কণ্ঠে, দুজনে গান দু'খানি রেকর্ড করলেন। আবার দারুণ 'সেনসেশনাল' হল। এ তরঙ্গ আর রোধিবে কে!

তখন যূথিকা রায়ের রেকর্ড কবে বেরুবে তার জন্যে লোক অপেক্ষা করে থাকত, তাই বিক্রীও ছিল প্রচণ্ড।

সায়েবকর্তারা এবার কমল দাশগুপ্তকে বললে যূথিকার গলাটা ভারী মিষ্টি ওকে হিন্দি, উর্দু ভাল করে শেখাও দিকি। ওকে দিয়ে ভাল করে হিন্দি গান করাও।

তখন কমল দাশগুপ্ত হিন্দি গীত ও ভজন গানে যূথিকাদিকে লাগিয়ে দিলেন কনসেনট্রেট করালেন।

অল্প সময়ের ভেতর, যূথিকাদির রেকর্ড সারা ভারত ছাপিয়ে বর্মা, জাভা, ব্যঙ্কক, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ল। যে রেকর্ডের দৌলতে দেশ বিদেশ জুড়ে যূথিকাদির এত নাম পরিচিতি, তাঁর মুখ কিন্তু সেভাবে লোকের কাছে পরিচিত ছিল না। কেননা যূথিকার বাবা-মার আপত্তিতে রেকর্ডের কভার খামের ওপর বা রেকর্ডের নানা পুস্তিকা বা বই-এ যূথিকাদির ছবি ছাপানো সম্ভব হয় নি। যূথিকাদির দুইভাই ছিল একজন প্রোফেসর আর অন্যজন চাকুরীজীবি। এঁরা চলে যাবার পর বাড়িতে পুরুষ মানুষের অভাবে যূথিকাদিকে যথেষ্ট অসুবিধের মধ্যে থাকতে হয়। দুই বোনের একজন, যিনি এখনো যূথিকাদির সঙ্গে আছেন—তিনিই একমাত্র যূথিকাদির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গী। রেকর্ডের রয়ালটি ঠিকমত না পেলে তাঁকে যে এখনো এক এক সময় সমস্যায় পড়তে হয়। সেটা স্বাভাবিক। আমিও যূথিকাদির প্রাপ্য টাকা যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য কখনো কখনো হয়ত দরকারমত চেষ্টা করেছি। রেকর্ড কোম্পানীর অমল ব্যানার্জিও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

কতো কথাই তো আমাদের বিস্মরণ হয়ে গেছে!

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কমল দাশগুপ্ত রবীন্দ্র-স্মরণে দু'খানা গান করেছিলেন—'দিন চলে যায়, হে কবি বিদায়' আর 'সন্ধ্যা নামিল গঙ্গার তীরে।' প্রথমটা প্রণব রায়ের আর দ্বিতীয়টা শৈলেন রায়ের রচনা। কালোপযোগী এ গান তখন সুপারহিট হয়েছিল। এরপর ধরো দেশ স্বাধীন হবার সময়টা, ভারতবর্ষ যেদিন স্বাধীন হয়েছিল সেদিন যূথিকাদিকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী তাঁর ভজন খুব ভালবাসতেন, জহরলালেরও তাঁর গান খুব পছন্দ। গান্ধীজীর আশ্রমে গিয়ে যূথিকাদি তো কতোবারই ভজন শুনিয়ে এসেছেন। তখন তাঁর গানের এত কদর, তাঁর এত মানসম্মান যে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার দিন তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হল। বলা হল, ওই ১৪ই আগস্ট বিকেল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত যতোক্ষণ না আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়, ততক্ষণ যূথিকাদিকে একটানা, একাদিক্রমে দেশাত্মবোধক, ভক্তিমূলক, ভজন ইত্যাদি গান গেয়ে যেতে হবে। এমন এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এটা তাঁর জীবনের এক অনন্য সম্মান, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

যূথিকাদি জীবনে কমল দাশগুপ্তর সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে অজস্র রেকর্ড করেছিলেন বিশেষ করে হিন্দি উর্দুতে গীত, গজল ভজনের। তখন ডুয়েট গানের একটা আলাদা চল ছিল, বাজার ছিল। সে সব গান বৃহত্তর ভারতের মানুষের কাছে 'যূথিকা অউর কমল'-এর গান হিসেবে ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। সেই সময় থেকে কমল দাশগুপ্ত অন্তত গোটা চল্লিশ বাংলা-হিন্দি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে সুর করেছিলেন। প্রায় প্রতিটি ছবিই তাঁর গানের জন্যে হিট হয়েছিল আর গানগুলো হয়েছিল সুপারহিট। কানন দেবী বা রবীন মজুমদার ছাড়া কতো আর্টিস্টকে দিয়ে



কাজী নজরুল ইসলাম

যে সেই সব ছবিতে উনি প্লে-ব্যাক করিয়েছেন। কিন্তু উনি যূথিকাদিকে দিয়ে কোনো ছবিতে, কোন দিন প্লে-ব্যাক করান নি, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার! অথচ যূথিকাদি তাঁর এতদিনের, এত প্রিয় শিষ্যা ছিলেন। গান্ধীজী মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে 'ডুব গয়া কিসমৎ' গানটা রেকর্ড করার জন্য উনি যূথিকাদিকেই বেছে নিয়েছিলেন, অন্য কাউকে ভাবতে পারেননি। অথচ সিনেমার প্লে-ব্যাকের জন্যে উনি কখনো যূথিকাদিকে ডাকেন নি। তাই মনে হয় যে কোন কারণেই হোক, পরের দিকে কমল দাশগুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে যূথিকাদিকে যেন খানিকটা উপেক্ষা করতেই শুরু করেছিলেন।

আমারও অভিজ্ঞতা একটু বলি। আমাদের ছোটবেলা থেকে দেখেছি যে সভা সমিতি, জলসা, অনুষ্ঠান এ সব যেন যূথিকা রায় সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। সামনে বসে, কোন অনুষ্ঠানে উনি গান গাইছেন তা—খুব কদাচিৎ ঘটেছে। এক আধবার হয়ত দেখেছি কিন্তু খুব কম। ব্যাপারটা কি বলো তো।

বিমান—হ্যাঁ খানিকটা সেরকমই বটে। তবে আমরা এলিট সিনেমাতে বা নিউ এম্পায়ারে যূথিকাদিকে প্রোগ্রাম করতে দেখেছি সঙ্গে অর্কেস্ট্রার দলবল। কমল দাশগুপ্ত ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। যূথিকাদির পোশাক আসাকও বরাবর অন্যরকম —ধপধপে সাদা, কালো ইঞ্চিপেড়ে শাড়ি। কোন প্রসাধনের বালাই নেই, চুলটা এলো খোঁপা করে বাঁধা। ব্যস—কিন্তু স্টেজে যূথিকাদিই প্রথম বাঙালি আর্টিস্ট যিনি অর্কেস্ট্রা নিয়ে গান করতেন আর সে দলে থাকতেন পরিতোষ শীল, রাজেন সরকারের মত ডাক সাইটে যন্ত্রশিল্পী। কখনও, কমল দাশগুপ্ত কণ্ডাক্ট করতেন, তা নইলে যূথিকাদি একাই বসে গান গাইতেন। তবে অর্কেস্ট্রা থাকতোই। সত্যি কথা যে, যূথিকাদি কম ফাংশান করতেন। নিজেকে যেন একটু সরিয়ে রাখতেন, আলাদা করে। এখন তো ওঁর ৮০ বছর হয়ে গেল, বোধহয় ১৯২০-এ জন্ম। উনিই প্রথম বাঙালি মহিলা গায়িকা যাঁকে সরকার পদ্মশ্রী উপাধিতে সম্মানিত করেছিল।

কমল দাশগুপ্তের কোনও ছবিতে নেপথ্য শিল্পী হিসেবে প্লে-ব্যাকের সুযোগ পাননি বটে কিন্তু তাঁর একদা সহকারী, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় দেবকী বসুর হিন্দি 'রত্নদীপ' ছবিতেই যূথিকাদি প্রথম প্লে-ব্যাক করেছিলেন (১৯৫২)। এরপর রাজেন সরকারের সঙ্গীত পরিচালনায় 'ঢুলি' ছবিতে (১৯৫৪), সুচিত্রা সেনের মুখে। এ গানও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সঠিক বলা শক্ত তবু স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে যূথিকাদির হিন্দি-বাংলা রেকর্ডের সংখ্যা মোটামুটি শ'পাঁচেকের কাছাকাছি তো হবেই। সে সব রেকর্ডের সবগুলো হয়ত আর হাতে পাওয়া যাবে না কিন্তু যূথিকাদি খুব যত্ন করে একটা খাতায় অন্তত গানগুলো সব তুলে রেখেছেন।

যূথিকাদি একসময় নিজের সুরেও বেশ কিছু আধুনিক গান রেকর্ড করেছিলেন।


কে.মল্লিক

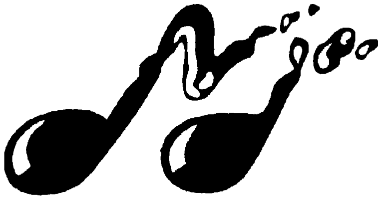
শ্যামল গুপ্তর লেখা, 'দীপ যদি নিভে যায় রাতের ঝড়ে' বা 'স্বর্গ কোথায় আমি জানি না মাগো শুধু তোমায় জানি'। সে সময় অবশ্য কমল দাশগুপ্তর সঙ্গে একরকম ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

একসময় আপামর বাঙালি শ্রোতৃমহলে কিন্তু ধারণা ছিল একদিন না একদিন বিবাহসূত্রে ওঁরা বাঁধা পড়বেন। কিন্তু যে কারণেই হোক সেটা শেষ পর্যন্ত আর হয়নি বলে এককালে বাংলা গানের ভক্ত মানুষজনের মনে সাধারণভাবে একরকম দুঃখবোধ বা কৌতূহল বড় কম ছিল না। কারণ তারা গানের জন্যে, যূথিকা রায়কেও আপনার জনের মতই ভালবাসত। এইরকম একটা সময় থেকে, যূথিকাদি রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গানে মগ্ন হলেন—রেকর্ডও করলেন। প্রথম রেকর্ড রজনীকান্তের 'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়' আর অতুলপ্রসাদের গানের প্রথম রেকর্ড 'হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে' ? যূথিকাদিই এ গান প্রথম রেকর্ড করেছিলেন। অবশ্য পরে আরো অনেকে করেছেন।

বিমান—যূথিকাদি সাঁইবাবার পরমভক্ত, সাঁইবাবার ভজনও তাঁর জীবনের সঙ্গী। সাঁইবাবার আশীর্বাদ, বিভূতিও তাঁকে সাধনার পথ দেখিয়েছে। আমার সঙ্গে যূথিকাদির সম্পর্ক অতি মধুর। যূথিকাদির কাছে আমার কোন গানের প্রয়োজন হলে, আমি তাঁর কাছে অবলীলায় চলে গেছি। উনিও রেকর্ড, ক্যাসেটে তুলে আমাকে দিয়েছেন। আবার যূথিকাদির প্রয়োজনে, অতুলপ্রসাদ বা অন্য কারুর গান আমি যূথিকাদিকে দিয়ে এসেছি। এখনও যূথিকাদি গান নিয়েই থাকেন কিন্তু বয়স তার কণ্ঠে চেপে বসেছে। আগের মত কণ্ঠ থেকে আর তেমন সুর বেরোয় না। এই তো স্বাভাবিক।

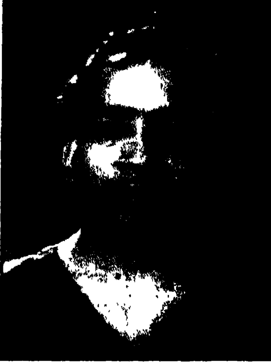
একসঙ্গে আমরা রেডিওতে কতো প্রোগ্রাম করেছি। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যূথিকাদি আর তাঁর গান্ যেন আমাদের মধ্যে এমনি ভাবে আরো অনেক দিন ধরে থাকে।





নবম পরিচ্ছেদ

বিমান—এখন একটা জিনিস, গানের জগতে খুব আলোড়ন তুলেছে, তোলপাড় করছে। কাগজ-পত্রের লেখালেখিতে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছে—২০০১ সালের ডিসেম্বরের পর, রবীন্দ্রনাথের গানের কপিরাইট উঠে গেলে কী হবে ? অনেকে বলছে খুবই খারাপ হবে আবার কেউ কেউ অতটা দুশ্চিন্তার মত কিছু দেখছে না। তবে আমার মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গানকে বিকৃত করবার চেষ্টা খুব একটা হবে না। কেননা রবীন্দ্রনাথের গান, বাঙালি তথা ভারতবাসী তথা সারা পৃথিবীতে ছড়ানো অসংখ্য মানুষের মনে এমন একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, কোন অর্বাচীন যদি কিছু বাড়াবাড়ি বা পাগলামো করে—যেমন সেদিন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি একটা পাগলা হঠাৎ আমার গায়ে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিল —তাতে এমন কিছু এসে যাবে না। আসলে রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথেরই থাকবে। এই যেমন আলিবাবার গানই আমরা পাল্টাতে পারি না তো রবীন্দ্রনাথের গান পাল্টাবো কি করে ? আমরা জয়দেব কবির সেই গান ওই, রতিসুখসারে গতমভিসারে সেই পুরোন সুরেই গাইছি। ধরো না সেই গানটা 'আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা, আমি হবো নাতো গৃহবাসিনী' কিংবা ধরো, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সেই 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হোল'—এও তো রবিশঙ্করজীর সঙ্গীত পরিচালনাতেও সেই দুশো বছর আগেকার সুরেই গানটা গাওয়ানো হয়েছে। তাই আমার মনে হয় —'ভারতবর্ষে'র সেই বিখ্যাত যে ট্রাডিশান সমানে চলছে যা আমাদের বাঙালিদের প্রাণের ভেতরে ঢুকে আছে, মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে—সেটা থাকবে, ঠিকই থাকবে—তা সে রবীন্দ্রসঙ্গীত হোক কিংবা পল্লীগীতি, আধুনিক যাই হোক না কেন। একবার যখন হঠাৎ বেশ রি-মেক গানের হুজুগ উঠেছিল তখন মহম্মদ রফির মত গাইয়েকে বলা হয়েছিল সায়গল সায়েবের 'নাইবা ঘুমালে প্রিয়' আর 'এখনি উঠিবে চাঁদ' এ গান দুটো আবার রি-মেকে গাইতে। তাতে উনি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে—'ওইটি উচ্চারণ করবেন না, সায়গলের গান আর শচীন দেব বর্মনের বাংলা গান অন্য কারুরই গাওয়া ঠিক হবে না। দয়া করে, আমায় বলবেন না'। আসলে, ভাল গান বোঝবার জন্যে বা তার প্রকৃত মর্যাদা দিতে হলে


পাহাড়ী সান্ন্যাল

কেবল অনুরাগী শ্রোতা হলেই হবে না কিছুটা সাঙ্গীতিক বোধও থাকা দরকার। এরকম একজন মানুষ, ধরো আমি যদি পাহাড়ী সান্ন্যালের কথা একটু বলি তাহলেই ব্যাপারটা বুঝবে। দেখ, পাহাড়ী সান্ন্যালের মত একজন ডাকসাইটে হিরো একদিকে যেমন দারুণ রসিক সঙ্গীতজ্ঞ অন্যদিকে তেমনি বিরাট হৃদয়বান মানুষ। যেখানেই গান বাজনা হচ্ছে সেখানেই তিনি পাগলের মত গিয়ে হাজির, সামনের আসনে মুখভরা পান নিয়ে বসে গানের রসে মশগুল হচ্ছেন। যাকে বলে, একেবারে খানদানী মেজাজ। সে পূর্ণদাস বাউলের গান শুনেও হায় হায় করছেন আবার ভীম সেন যোশীর গানেও কুর্নিশ করছেন, বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ খুব- বলে বাহবা দিচ্ছেন। আরে, ভীমসেনের কথায় গল্পের মধ্যে আবার অন্য একটা গল্প এসে পড়ছে।

তখন পাহাড়ী সান্ন্যালের কলকাতার বাসায়, গদা বলে ডাকনাম, একটা ছেলেকে ঘরের কাজের লোক হিসেবে রাখা হয়েছিল—বাসন মাজা, ফাইফরমাস খাটা, ঘরদোর পরিষ্কার করা এইসব কাজ যেমন হয় আর কি। বোঝাই যেত ছেলেটা কোন ঘরপালানো ছেলে। বাড়িতে কাজ করতে করতে ছেলেটা অনবরত পাহাড়ীর গান, গলাসাধা, রেওয়াজ নিঃশব্দে মন দিয়ে শুনত। একবার অতি সঙ্কোচের সঙ্গে, মনিব যদি ওকেও একটু শেখান—এরকম একটা দুঃসাহসিক আবদার পেশ করে ফেলেছিল। কিন্তু অতি ব্যস্ত মনিব তা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। এটাই বরং স্বাভাবিক, বাড়ির নোকরকে কি কেউ অত আমল দেয় ? কিন্তু ছোটবেলা থেকে গদা তো গানের জন্যেই পাগল। গান শেখার জন্যে সে সব কিছু করতে পারে, ঘর ছেড়ে পালিয়েওছে সেই জন্যে। অতএব ঘরদোরের কাজের ফাঁকে, আড়াল থেকে কান পেতে সে রাগরাগিনীর কতো ঠাটবাট, যতটুকু সম্ভব গুনগুনিয়ে সব মনের কোণে তুলেও রাখছে। বেশ কিছুদিন এইভাবে চলার পর গদা একদিন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর দিনে দিনে পাহাড়ীর সর্বভারতীয় নাম ডাক হয়েছে।

বম্বেতে বাসা নিয়ে অনেকদিন ধরে থাকতে হচ্ছে। পাহাড়ীর হাতে অনেক হিন্দি ফিল্মের কাজ। তা সত্ত্বেও ওখানে সব গানবাজনার আসরের মধ্যমনি, মহফিল মজলিশের প্রায় অবধারিত শ্রোতা। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েটদের অন্যতম, সেইরকম লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজের, প্রথম ব্যাচের উচ্চতম উপাধি-ধারী 'সঙ্গীত বিশারদ'-দের অন্যতম এই পাহাড়ী। সব আসরকে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে মাতিয়ে রাখেন। কোথাও হঠাৎ আবার তবলাতেও বসে পড়েন —তবলা তো তিনি ভালই বাজাতেন। এইরকম একটা উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসরে গান গাইছিলেন বিখ্যাত ভীমসেন যোশী, দুর্দান্ত জমিয়ে। শ্রোতাদের মুগ্ধ করে ফেলেছেন। দারুণ আনন্দে পাহাড়ীও পাগলের মত বহুৎ আচ্ছা, কেয়াবৎ বলে



ভীমসেন যোশী

বারবার চিৎকার করে উঠছেন। গান শেষ হল। হাততালি হর্ষধ্বনি থামছে না, ভীমসেন মঞ্চ থেকে নেমে এসে পাহাড়ী সান্যালের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন—'বাবু, (হ্যাঁ, বাবু কথাটাই উচ্চারণ করেছিলেন) আমায় চিনতে পারছেন ?' প্রথমে উনি চিনতে পারেননি। সাধারণত উনি যেমন তাড়াতাড়ি কথা বলতেন, সেইভাবে তড়বড় করে বললেন

—কে ? তুমি, তুমি কে ?

তখন ভীমসেন বললেন—আপনার সেই ভীম গদাকে মনে নেই ? আমি আপনার বাড়িতে কাজ করতুম, বাসন মাজতুম, হারমোনিয়াম ঝেড়েমুছে এগিয়ে দিতুম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তুই... আরে তুই—

—আজ্ঞে, আমি সেই ভীম। আপনি আমায় গান শেখাতে চান নি।

আর বলার অবকাশ হল না। ভীমসেন যোশী ততক্ষণে পাহাড়ী সান্যালের বুকের ভেতর দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

—চল, চল আমার বাড়িতে চল। সেই উচ্ছ্বাস, পাহাড়ী সান্যালের সমঝদারী—সব আবার ভীমসেন যোশীকেও আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর খাবার টেবিলে দু'জনের একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া, গানের কথায় ডুবে যাওয়া। পাহাড়ী সান্যালের সমঝদারী বরাবরই এইরকম সোচ্চার, বাঙময়, কূল ছাপানো।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে মুখুজ্জে পরিবার বলে একটা ছবিতে একটা হোরি ঠুংরি জাতীয় গানে সুর করেছিল। গানটা প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় আর নির্মলা মিশ্র দুজনে মিলে গেয়েছিল 'আবীরে রাঙালে কে আমায় ললিতা গো'। প্রেস শো হচ্ছে, ছবিতে গানটা শেষ হবামাত্রই পাহাড়ীদার চীৎকার অ্যাই, কোথায় মানব, মানব কোথায়, ডাকো তাকে শীগগির। ত্রস্ত হয়ে মানব এল।

—তুই, তুই এত ভাল সুর করেছিস ? হ্যাঁ, উঃ কী দারুণ হয়েছে। বা-বা, তা হ্যাঁরে তবলা বাজিয়েছে কে ?

—রাধাকান্ত নন্দী।

—অ্যাঁ রাধাকান্ত নন্দী। তাকে ডাক, এখুনি ডাক। আহা কি বাজিয়েছে। এই হল একজন গুণীর অ্যাপ্রিসিয়েশন। কি আদর, ভালবাসা কি আন্তরিক স্বীকৃতি। এর কোনও দাম হয় না! কিন্তু শুধু প্রশংসাতে তো হবে না। এর উল্টোটাও দেখেছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমি নিজে একবার ছোটখাট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে গেছি। রঙ্গনা হল ভাড়া করে অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমি গান গাইতে বসেছি। তখনো আমি বিমান মুখোপাধ্যায় হই নি। 'ওই বিমান, আজকাল গাইছে টাইছে' এইরকম গোছের আর কি। অতি কষ্টে একটা চান্স পেয়েছি। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গাইবে, তার

আগে একটু সময় রয়েছে। ওই ফাঁকটুকুতে আমি গান ধরেছি। সঙ্গে তবলা কে বাজাচ্ছিল তা ঠিক মনে নেই তবে বুঝতে পেরেছিলুম ঠিক বাঁধা হয়নি। কি আর করব গানটা শুরু করেছি। কিন্তু শুরু করেছি কি করিনি, হঠাৎ দেখি ধনঞ্জয়দা সামনের সারি থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে মঞ্চে উঠে আসছেন—'এই থাম, চুপ কর। চুপ কর। তবলা সুরে নেই আর তুই বেসুরো গাইছিস, কি হচ্ছে কী!' ওপরে উঠে বাঁ হাতে তবলাটা টেনে নিয়ে আবার এক ধমক তবলচি ছেলেটাকে—তুমি তবলা বাঁধতেই পারো না। তবু তবলা বাজাতে এসেছ ? এখনো কিছু বাঁধতে শেখো নি—আগে ভাল করে শিখে এসো, তারপর কাজ করো, ফাঁকি দিয়ে হয় না। সোজাসুজি বড় স্পষ্ট কথা। উনি নিজেই তবলাটা ঠিকঠাক করে নিয়ে আমায় বললেন নে এবার গা, ঠিক করে গা। আমি বাজাচ্ছি। একটা সভার মাঝখানে, ধনঞ্জয়দার এমনি ধারা কথায় কিচ্ছু মনে করার আছে বলে, আমি মনে করি নি। আমি তো এইগুলো আশীর্বাদ বলেই গ্রহণ করি। বরং আজকে আমি মনে করি, আর একটা পাহাড়ী সান্যাল, আর একটা কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক বা কমল দাশগুপ্ত আবির্ভূত হোন। তাহলে বর্তমান সঙ্গীত জগতের ছেলেমেয়েরা একটু উপকৃত হবে। স্টেজে বসে ভুল গাইছি অথচ সেই ভুল শুধরে দেবার মত গুরুদের তো আর পাচ্ছি না। এভাবে আমরা কতোভাবেই তো বঞ্চিত হচ্ছি। আজকাল গান শুনতে শুনতে যদি বেসুরো লাগে, তো আমরা তাদের কিছু বলতে ভরসা পাই না, ভয় পাই—যদি কিছু খারাপ হয়! সত্যিই তখনকার দিনের ওইসব মানুষরা কি উদার ছিলেন, তাঁরা সত্যিই আমাদের মঙ্গল চাইতেন। তাই অমন আপন করে বকা-ঝকা করতে পারতেন। কি তাঁদের মনের জোর ছিল, কি আস্থা, কি বিশ্বাস শিল্পের প্রতি কি অনুরাগ!

শিল্পের প্রতি অনুরাগ এই কথাই তো বলছো। বেশ, এবার তাহলে তুমি, তোমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলো। তোমার মধ্যে এই অনুরাগ কিভাবে এসেছিল ? তুমি তোমার, কলেজ জীবনে সেই যে গান শুরু করেছিলে, তার পরে অনেক দিন ধরে, চলতে চলতে আজকে, এইখানে যে ভাবে এসে পৌঁছেচো, দাঁড়িয়েছো সে সম্বন্ধে একটু বলো তো।

বিমান—সে তো দীর্ঘযাত্রা পথের কথা। তা দেখ এই যাত্রা আমি শুরু করেছিলাম যতো আনন্দের সঙ্গে, আমার জীবনের মধ্যিখানে একটা অধ্যায়ে আমি আজকে বলছি যে—আমার দিন খুব কষ্টে গেছে। আমি গান করছি, ধরো ১৯৫৬/৫৭ সাল থেকে। ওই বছরে আমার নিজের রেকর্ড বেরোলো (কৃষ্ণরূপে দাঁড়াও কালী শ্যামাসঙ্গীত) সেই রেকর্ড আমার বাবার সুরে। বাবা জোর করে আমাকে বললেন—না, আধুনিক গান গাওয়া হবে না। তখন শ্যামা সঙ্গীতের রেকর্ড হল। তখন আমার অল্প বয়েস। ওই বয়সে শ্যামাসঙ্গীতের রেকর্ড বেরোতে বন্ধুবান্ধবরা হাসিঠাট্টা করে বলতে লাগল—এই, দক্ষিণেশ্বরে একটা চাকরি নে; কেউ বললে কালীঘাটে যা, কালীমন্দিরে পূজারীর কাজ কর, কেউ টিপ্পনী কাটল, লাল কাপড় পর,

কইরে তোর সিঁদুর টিপ কোথায় গেল ? এত বিষয় থাকতে, এই কম বয়সে এত সব বন্ধুবান্ধবী থাকতে—তুই যা পেয়েছি মাগো, দাও দাও বলে গাইছিস, এই করে বেড়াবি নাকি ? তারপরে রেডিওতে গান গাইতে গেলাম। অডিশন দিয়েছি, পাশ করেছি। বাবাকে না জানিয়ে দুপুরবেলা আধুনিক গান গাইবার প্রোগ্রাম পেয়েছি। পঞ্চাশের দশকে আমার প্রথম প্রোগ্রামের প্রথম গানটার কথা ছিল—'জ্যোৎস্না হাসে আকাশে, আধখানা চাঁদ বাতাসে।' এ ব্যাপারে আগে একটু বলেছি। তবু এখানে আবার প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে বলছি অন্য কারণে। এখনকার বাজারে একবার রেডিওতে নাম শোনার বা টিভিতে মুখ দেখাবার জন্যে যে বিশ্রী হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, তার ক্ষতিকর দিকটা এ যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে একটু তুলে ধরতে চাই। এটা যে তাদেরই স্বার্থে, সেটাও তো বোঝানো দরকার।

আমাদের ওই সময়ে, রেডিওতে একমাস দুমাস অন্তর ঠিক প্রোগ্রাম পাওয়া যেত। কিন্তু আমার প্রথম প্রোগ্রামের পর আর ডাক আসে না। অপেক্ষা করে বসে থেকে থেকেও, ডাক আসছিল না বলে একদিন, অধৈর্য হয়ে রেডিও অফিসে গেছি। তারা আমায় সোজাসুজি বলে দিলে—তুমি এখানে আর এসো না। তোমার বাবা এখানে এসে, তোমার কাজ-টাজ সব ক্যানসেল করে দিয়ে গেছেন। এখানে অডিশনে পাশ করলে যে কার্ড পাওয়া যায়, যে কার্ড দেখে প্রোগ্রাম দেওয়া হয় তোমায় তা দেওয়া যায় নি। তোমার বাবা বারণ করে গেছেন। তুমি তাই প্রোগ্রাম আর পাচ্ছ না। সেইজন্যে এখানে একদম আর আসবে না।

আমি তো অবাক। আমি বাবাকে গিয়ে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করলুম। বাবা বললেন —এখনো তুমি রেডিওতে গান গাইবার উপযুক্ত হওনি। তুমি তো গান সিলেকশন করতেই শেখোনি। দুপুরবেলা তুমি গান গাইছ—'জ্যোৎস্না হাসে আকাশে'। তুমি আগে শিক্ষালাভ করো, মন দিয়ে লেখাপড়া করো, কোথায় কি করতে হবে তা বুঝতে শেখো, আগে শেখো হাউ টু ডিমনস্ট্রেট। আমি তো তোমার গান শুনে, দেখলুম তোমার উচ্চারণের দোষ ছিল, তোমার এক্সপ্রেশানের ত্রুটি ছিল, তোমার নিঃশ্বাস নেওয়ারও গণ্ডগোল ছিল। আসলে তোমার গানের এখনো কোনো ম্যাচ্যুরিটি আসেনি।

আমার খুব কান্না পেয়েছিল। আমি খুব কেঁদেছিলাম। মনে মনে সেদিন বাবাকে প্রচণ্ড গালাগালও করেছিলুম—রেডিওতে আমার প্রোগ্রাম এভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে।

তখন বাবা আরও বললেন—আমার ছেলে অডিশন দিয়ে, রেডিওতে গান গাইবে না। এমনভাবে তৈরি হবে, যাতে ওরা রেডিও থেকে তোমায় ডেকে নিয়ে যাবে।

আমি রেগে বললুম—তোমাদের সময় আর্টিস্ট ছিল না, তেমন গাইবার মত লোক ছিল না, তাই ওরা ডেকে নিয়ে যেত। এবার বাবা আরো তীক্ষ্ণস্বরে বললেন সেইরকম গান না-গাইতে পারা আর্টিস্ট আগে হও। তুমি যদি ওঁদের মত না-গাইতে পারা আর্টিস্ট হতে পারো, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। এখন

তোমার কোন কিছুর দরকার নেই। এখন তুমি কেবল শিখে যাও, ভাল করে তালিম নাও আর দেখো বড়োরা কোন্ কাজটা কিভাবে করে। আগে অভিজ্ঞতা অর্জন করো, বয়স হতে দাও, তারপর ম্যাচ্যুরিটি আসুক। এখন গান গাইলে পাঁচ বছর পর লোকে তো তোমায় ভুলে যাবে। আমি চাই, তুমি এমন গান করবে যে, তোমায় লোকে অনেকদিন মনে রাখবে। হাজার হাজার শিল্পীর একখানা রেকর্ড হয়েই আর হয়নি, বন্ধ হয়ে গেছে। রেডিওতে বিশ বছর ধরে গান গাইছে অথচ কেউ তাদের রেকর্ড এখন আর শুনছে না এমন তো অনেকে আছে।

বাবার এসব কথা শুনে তখন আমার খুব খারাপ লেগেছিল।

—মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম। যাই হোক তখন অনেক বন্ধুবান্ধব হয়েছে, গান বাজনাও চলছে, বেশ আনন্দে আছি। যাকে বলে একরকম ভালই আছি। কিন্তু ঊনিশশো সাতষট্টি সালে, মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে, হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। বাবা যে বেশ খ্যাতিমান লোক ছিলেন সাংস্কৃতিক জগতে, তাঁর যে বহু বন্ধুবান্ধব ছিল তা ইতিমধ্যে মাঝেমাঝেই বলেছি। এর বাইরে ডাক্তার বা অন্যান্য মহলেও তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তাঁদের মধ্যে আমার খুব মনে পড়ছে তখনকার দিনের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, সন্তোষকুমার দাসকে। কিন্তু বিধির বিধান কে আর খণ্ডাবে। তাই বাবাকে অসময়েই যেতে হল। বাবা মারা যাবার পর আমি তো একেবারে অথই জলে পড়লাম। দাদা অবশ্য তখন জীবিত, আমার থেকে মোটামুটি বছর দুই-এর বড়। সংসারটাও বিরাট আমাদের। আগেই বলেছি আমার বাবা চাকরি বাকরি করতেন না। পুরোন যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল তাই নাড়া-চাড়া করে বা সেইসব ভাঙিয়ে যা হোক করে সংসার চালাতেন। এইরকম একটা অনিশ্চিত অবস্থায় আমরা আরো নানাভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছিলুম। হঠাৎ কেউ কেউ এসে বললেন যে—'তোমার বাবা বাড়ি বন্ধক দিয়ে গেছেন'। আবার কেউ দাবী করলেন 'তোমার বাবা এত টাকা ধার করেছিল।' বোঝো কি সাংঘাতিক ব্যাপার। আমি আর আমার দাদা একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম—এই বিপদ থেকে কি করে পার পাব, তাই ভেবে আমরা কূলকিনারা পাচ্ছিলুম না। যদিও এইসব পাওনা গণ্ডা নিয়ে কোনো লেখাপড়া বা কাগজপত্র ছিল না কিন্তু তখনকার দিনে এইরকমই তো সব ঢিলেঢালা ছিল। বাবা ছেলেমেয়েদের কিছু জানান নি বা বলেন নি বটে তবু একটুও জানা থাকলে, আমরা যাহোক একটু তৈরি হতে পারতুম, তাহলে অতটা কষ্ট পেতুম না।

তখন আমরা ভাইবোনেরা—যার যা কোয়ালিফিকেশন, যতো সামান্যই হোক, সেইটুকুই সম্বল করে আমরা কাজে নেমে পড়েছিলুম। দাদা সারাদিন ছেলে পড়াতে লাগল। আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গান শেখানোর টিউশনিতে নেমে পড়লুম। আমার ছোট ভাই তখন, সদ্য স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার পড়ার জন্যে, সংসারে গ্রাসাচ্ছনের জন্যে, আমরা ভাই-বোনেরা সবাই একসঙ্গে জীবিকার সন্ধানে, টাকা রোজগারের কাজে লেগে গেলুম। বোনেরা গান, সেলাই

যা শিখেছিল সব কিছু সংসারের জন্যে লাগালো। আমরা সবাই মিলে যা উপার্জন করেছি, সত্যি বলছি, প্রায় একবেলা খেয়ে বাকি টাকা আমার বাবার ওইসব তথাকথিত দেনাশোধের জন্যে, সব এককাট্টা করে জড়ো করেছি। এর ওপর তখন কিছু সুযোগ সন্ধানী লোক আমাদের বাড়িটা যাতে বাগিয়ে নেওয়া যায়, আমাদের যাতে ঘর ছাড়া হয়ে পথে বসতে হয়, সেই মতলবে নানাভাবে আমাদের ওপর চাপ দিচ্ছিল। এসব ঘটছিল ১৯৬৯ সালে। বাবা মারা গিয়েছিলেন ১৯৬৭তে। ৬২ বছর বয়সে। এই ক'বছর সকাল থেকে রাত অবধি আমি ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ এক একদিন, এক একদিকে চষে ফেলেছি টিউশানী করে করে। যতোটা পারি মুখের রক্ত তুলে দু'চার পয়সা জড়ো করতে। পিতৃদায় থেকে উদ্ধার পেতে, সংসারে ভাইবোনদের দাঁড় করাতে দিবারাত্র পরিশ্রম করেছি—নিজের জন্যে আর কিছু ভাববারও সময় পাই নি। তখন আমি এইটাই আমার সব থেকে জরুরী কাজ বলে মনে করেছি।

এই সময় কালীঘাটের একটা বাড়ির সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়ে গেল। সেই বাড়ির একটি মেয়ে তার নাম হিমা—সে একটা জায়গায় আমার গান শুনে আমায় সরাসরি বললে আপনি আমায় গান শেখাবেন ? আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতেই তার বাবা-মা সবাই আমার গান শুনতে চাইলেন। কি রকম মাস্টার হবে, তা একটু দেখে নিতে হবে তো! আমার গান শুনে হিমার বাবা-মা কি যে মুগ্ধ হলেন যে একদিনেই, আমায় পুত্রস্নেহে কাছে টেনে নিলেন। হিমা কিন্তু তখনই 'কিছু কিছু ফাংশানে গান করত, জ্ঞানপ্রকাশের কাছে শিখত আবার রেডিওতে মাঝে মধ্যে গান গাইত।

হিমার ডাক নাম ছিল ডল। তার বাবা সন্তোষকুমার গাঙ্গুলি মশাই একদিন মেয়েকে বললেন ডল্, এই ছেলেটির মধ্যে সত্যিই জিনিস আছে এর কাছে তুমি শিখতে পারো। অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবার। ছেলেদের একজন আমেরিকায় থাকে, ছোটটা একেবারে বাচ্চা। এখন সে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার মস্ত অফিসার। আমার সঙ্গে এখনো যোগাযোগ আছে। আর সেই মেয়ে হিমা, এখন সে কানাডায় থাকে—সেখান থেকে ফোনে আমার সব খবরাখবর নেয়। এখন আমার চোখের গোলমাল, শরীরের গোলমাল—সেখান থেকে সে আমার চোখের জন্যে কি করব, হার্টের জন্যে কোন্ ডাক্তারকে দেখাবো, সব কিছুর ব্যাপারে কি করব—সব বলে দেবে। আমি নিজে কিছু করি না, বলি, ছেড়ে দাও তো! কিন্তু দু' এক বছর বাদে বাদে যখন সে কলকাতায় আসে, তখন সে নিজে থেকে আমায় সঙ্গে করে ডাক্তার বদ্যির কাছে নিয়ে যায়, যা করবার করে। সত্যি কথা বলতে কি, এখন যাদের আমার প্রতি কিছু কর্তব্য আছে তাদের ক'জন আর আমার সেভাবে খোঁজ খবর নেয় ? কিন্তু এই মেয়েটি অত দূরে থাকে তবু আজও সে আমার জন্যে এত ভাবে, খোঁজ খবর নেয়, আমি কি খাব তাও বলে দেয়—এসব তো বললে তোমার হয়ত বিশ্বাস হবে না। দেখ, এ কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজন কেউ নয়, অথচ এখনো আমার জন্যে এত করে মরে। বিদেশে থাকে, তার সংসার আছে, ছেলে আছে।


সন্তোষ সেনগুপ্ত

সেও এখন বড় হয়েছে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। আমায় চিঠি লিখে জানাল যে আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে সে মানুষের মত মানুষ হয়।

তখনকার ওই টিউশানী করার সূত্রে আমার আর এক ছাত্রীর কথাও এখানে বলতে হবে। তার নাম মীরা দাশগুপ্ত। সে এখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যায়ের বাংলা গানের এক অধ্যাপিকা। তার স্বামী নীতিশ দত্তরায়, সেও আমার ছাত্র। সেই মীরা এখন মীরা দত্ত রায়, একদিন আমার জীবনে এক অবিশ্বাস্য বার্তা নিয়ে এল।

একদিন আমি ভাত খেতে বসেছি সামান্য দুটি ভাত, তার ওপর একটু ডাল আর একটা যাহোক তরকারি, তবে তখন অন্ততঃ দুবেলা খাবার জুটছে। তা, ১৯৬৯ সালের সেই রকম একদিন, আমি খেতে বসেছি হঠাৎ মীরা এসে আমায় বললে বিমানদা, আপনাকে সন্তোষ সেনগুপ্ত ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনি চলুন, এক্ষুনি।

এ বলে কি! ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। এর পরে বুঝেছিলুম ব্যাপারটার একটা প্রেক্ষাপট ছিল। সেই সময় যেন বাজারে বাংলা আধুনিক গানের রমরমা বেশ কমেছে। সেই ফাঁকে সন্তোষ সেনগুপ্ত আধুনিক গানের বদলে নজরুলের গানকে কাজে লাগিয়ে, তার একটা বাজার তৈরির কথা ভাবছিলেন। নজরুলের গানকে একটা বিশেষ মর্যাদায় তুলে ধরবার ছক করছিলেন। তিনি তখন এইচ এম ভির রেকর্ডিং ম্যানেজারের পদে এসেছেন, সেখানে তাঁর অগাধ প্রতিপত্তি। উনি নজরুলের কিছু গান আগে রেকর্ড করেছিলেন—কমল দাশগুপ্ত, আঙ্গুরবালা দেবী আমার আঙুরমা, অনিল বাগচী ও নিতাই ঘটকের ট্রেনিং-এ। রেকর্ডগুলো খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এ সময়টায় বাজারে নতুন ধরনের রেকর্ড বেরিয়েছে—একটার নাম লং প্লেয়িং আর একটাকে বলে এক্সটেনডেড প্লে বা ই. পি। প্রতি মিনিটে প্রথমটা ঘোরে ৩৩$^{১/৩}$ বার আর অন্যটা ৪৫ বার। ই. পিতে থাকত চারখানা গান আর লং প্লেয়িং-এ থাকত মোটামুটি গোটা বারো।

তা, সন্তোষ সেনগুপ্ত আমায় ডেকেছেন কেন তা ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। তবে জানতুম যে সন্তোষ সেনগুপ্তর সঙ্গে আমার বাবার একটা যোগাযোগ ছিল। তা, বাবা ওই যে স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে খুবই যাতায়াত করতেন সেই সূত্রে অনেকেই বাবাকে জানতেন। বাবা একটু কুড়ে টাইপের লোক ছিলেন, তাই সব জায়গায় বড় বেশি একটা যেতেন না। ঘরে বসে বসে গান গাইলেন, কি অভিনয় করলেন, সে অন্য কথা।

যাই হোক বাবার সঙ্গে সন্তোষ সেনগুপ্তর জান-পয়ছানের কথা মনে করে, আমি তো তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলুম।

—তুমি সুবল মুখার্জির ছেলে ? সন্তোষ সেনগুপ্ত সরাসরি প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এই শুনে উনি বললেন—তোমার বাবা মারা গেছেন, কথাটা মীরা আমায় বলল।

আমি বলুলম, হ্যাঁ তা বছর দুয়েক হল, উনি মারা গেছেন। সন্তোষ সেনগুপ্ত এবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, তাঁর কাছে তো নজরুলের অনেক গান ছিল। সে সব গান, তোমার কাছে কি, কিছু কিছু আছে ? আমি বললুম—হ্যাঁ, তা প্রায় সবই আছে।

বেশ, উনি বললেন, তাহলে তুমি ওই গানগুলো, আমাদের কোম্পানীতে ট্রেনিং দেবে ?

আমি তো ভাই, যেন চাঁদ হাতে পেলাম, এযে কল্পনারও বাইরে।



মানবেন্দ্র মুখার্জ্জী

মনে হল, এযে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আমার মুঠোয় এসে গেল! উনি বললেন—তাহলে, তুমি মানবেন্দ্র মুখার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করো, ওরই প্রথম এল পি বেরোবে।

এই শুনে, আমি একটু ইতস্তত করে বললুম দেখুন, মানবেন্দ্র মুখার্জির বাড়ি আমি যাবো না। একবার আমি ওর বাড়ি গিয়েছিলাম তখন উনি আমায় বলেছিলেন আপনার চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি আপনি কি রকম গান জানেন, আপনি যান —বলেই, আমার মুখের ওপর উনি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

—ও, আচ্ছা! তুমি আজ আর একবার যাও।

কি আর করা যাবে, সন্তোষ সেনগুপ্তর মত মানুষের কথা!

কয়েকদিন বাদে, একদিন ছাতা হাতে করে যাদবপুরে মানব মুখুজ্জের বাড়িতে আবার গেলুম। বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিলুম। ভেতর থেকে আওয়াজ এল দরজা খোলা আছে, ভেতরে চলে আসুন। আমি ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালুম, দেখি তিনি বসে আছেন-- সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

আমায় দেখেই উনি বললেন, আপনি আগে একবার এসেছিলেন না ? তা আপনি নজরুলের গান জানেন ? তা, কি গান জানেন ? বসুন তো—এই বলে, তিনি নিজে একটা হারমোনিয়াম প্রায় এক হাত দূর থেকে আমার সামনে ঠেলে দিলেন। নিজে একটা মোড়া টেনে বসে, বললেন কি, কি গান গাইবেন, গান।

আমার বেশ মনে আছে প্রথম গান আমি গেয়েছিলাম—'সহসা কি গোল বাধালো পাপিয়া আর পিকে।' শেষ হল। উনি আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন —আর একটা গান করুন তো। এইভাবে করতে করতে, চার-পাঁচখানা গাওয়ার পর, আমার কাছে এগিয়ে এলেন, এসেই আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তারপর একেবারে আপনি থেকে তুই, বললেন—ওরে আমি যে তোকেই খুঁজে মরছিলাম, তোর কাছে এত গান রয়েছে—তোর কাছেই যে আমার মারণাস্ত্র। হ্যাঁরে, তোর

বাড়িতে কি টেলিফোন আছে ? আরে তোকেই কিনা, আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম!

না, আমাদের বাড়িতে ফোন নেই। আমি চার আনা বাস ভাড়া দিয়ে, এখানে এসেছি।

এবার সম্বোধন তুমি। তোমার বাড়িতে ফোন নেই, আশেপাশে কারুর বাড়িতে ফোন নেই ? বাড়িতে একটা খবর দেবে কি করে ?

আমি বললুম উপায় নেই।

তোমার ওই প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা বা বিতাড়িত হবার অভিজ্ঞতা এতদিন বাদে, দূরবীনের উল্টো দিক থেকে দেখলে, কেমন দেখায়, তা দেখতে খুব মজাই লাগবে। তাই এ ঘটনার কথা মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত রসজ্ঞ, সুধী মানুষ, সুধীর চক্রবর্তীকে যেভাবে, বাইশ বছর আগে বলেছিলেন তা এখানে মানবেন্দ্রর ভাষায় (শারদীয় পরিবর্তন ১৩৮৭) শোনালে বোধ হয়, বেশ ভালই লাগবে—পরিপূরক মনে হবে। সুধীর চক্রবর্তীকে মানবেন্দ্র বলছেন—'১৯৭২ সালে গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে সন্তোষ সেনগুপ্ত অফার দিলেন নজরুল গীতির লং প্লেয়িং করবার। কিন্তু আমি থমকে গেলাম। কী গান গাইব ? নজরুলের কটা গান আমি জানি ? পুরনো চেনা গানগুলোই আবার গাইতে হবে নাকি ? তাতে মৌলিকতা থাকবে কি করে আর বিক্রীই বা হবে কেন ? চিন্তায় তখন রাতের ঘুম চলে গেছে। সন্তোষ সেনগুপ্তকে অনুরোধ করে অনবরত রেকর্ডিং-এর তারিখ পাল্টাতে হচ্ছে। এমন সময় একদিন বিমান মুখোপাধ্যায় নামে আনইম্প্রেসিভ চেহারার এক শীর্ণ ব্যক্তি, আমার বাড়িতে এলেন। তাঁর কাছে নাকি নজরুলগীতির দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গান আছে। ক'দিন ধরেই মেজাজটা খারাপ ছিল। তাই ভদ্রলোককে দুর্ব্যবহার করেই তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু বিধির নির্বন্ধ তাই ক'দিন বাদে, বিমান আবার এলেন। এবার এলে, ভদ্রলোককে বললাম খুব রাগতস্বরে—করুন তো দেখি। কি গান আছে আপনার। বিশ্বাস করুন, শুনলাম আর চমকে উঠলাম। আরে এই গানই তো আমি খুঁজছি। বিমানের বাবা সুবল মুখুজ্জে ছিলেন উত্তর কলকাতার খানদানী সমঝদার। তাঁর বাড়িতে কাজী সাহেব আসতেন, সুবল দাশগুপ্ত ওঠাবসা করতেন। বিমানের বাবা নজরুলের গানের ভাঁড়ারী। বিমানকে সেই সব গান আর সুর দিয়ে গেছেন তার বাবা। দেখুন ডেসটিনী কারে বলে। আমি যাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি—তার কাছেই গচ্ছিত রয়েছে আমার ভবিষ্যৎ। ১৯৭০ থেকে আজ পর্যন্ত যত নজরুলগীতি রেকর্ড করেছি, তার সব-এর ট্রেনার বিমান মুখার্জি। তার নামটা লিখবেন। গ্রামোফোন কোম্পানী প্রথমে তার নাম ছাপেনি, এখন ছাপে।

বিমান—ঠিক কথা। সে যাই হোক, আমার ফোন নেই, বাড়িতে খবর দেবার উপায় নেই, এসব জেনে নিয়ে উনি বললেন তুমি আমায় কতক্ষণ সময় দিতে পারবে ? মানে তুমি কতক্ষণ থাকতে পারবে ? যখন আমি গেছি তখন দশটা হবে, তাই বললুম একটা দেড়টা পর্যন্ত থাকতে পারব। আজকে মানব নেই, মনে পড়ে

কি তাড়াতাড়ি উনি গান তুলতে পারতেন। আমায় বললেন, একখানা করে গান ধরো, হ্যাঁ এখনই। তখন টেপরেকর্ডারের চল হয়নি। আমি আগে গানটা তার খাতায় লিখে নেবার জন্যে, বলে গেলুম। তারপর একবার, দুবার, তিনবার গাইলুম। মানব খুব তাড়াতাড়ি গান তুলে নিতে পারতেন। কোনটার ক্ষেত্রে হয়ত বললেন আর এক বার গাও তো। কখনও আপনি বলছে, কখনও তুই, আবার কখনো তুমি।

বেলা দুটোর মধ্যে মানব কিন্তু সেদিনই ন'খানা গান তুলে নিল। এর মধ্যে আবার বেলা একটা নাগাদ গ্রামোফোন কোম্পানীতে সন্তোষ সেনগুপ্তকে ফোন করল। বলল, কাল স্টুডিও খালি আছে ? কোনো মিউজিসিয়ান লাগবে না। শুধু রাধাকান্ত নন্দী আর নির্মল বিশ্বাসকে দিয়ে দাও তাহলেই হবে। আমি কাল নজরুলের এল পি রেকর্ড করে ফেলবো। রাধাকান্তর তবলা আর নির্মল বিশ্বাসের সেতার বা দিলরুবা এতেই সঙ্গত হয়ে যাবে।

সন্তোষ সেনগুপ্ত বললেন—হ্যাঁ, ঠিক আছে। কাল স্টুডিও খালি আছে, তুমি চলে এসো, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।

এখানে নজরুলের গানের রেকর্ড সংক্রান্ত তখনকার প্রেক্ষাপটটা একটু বিশদ করে বোঝানো দরকার। নজরুলের গানের তখন ২/৩খানা রেকর্ড হয়ে গেছে। সে গানগুলো আবার গাইতে ওঁর ভাল লাগছিল না। কিছু গান তো সে সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল যেমন—'শাওন আসিল ফিরে', 'কাবেরী নদীজলে' কিংবা 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর'। মানবেন্দ্র কিন্তু বললেন যে, অন্যলোক যে গান আগেই গেয়েছে সেইসব স্ট্যাম্প মারা গান আমি গাইব কেন ? আমি মানব মুখোপাধ্যায়—শুনেছি নজরুলের আড়াই তিন হাজার গান আছে, সে সব গেল কোথায় ? সে সবের সংগ্রহ থেকে এবার আমি এমন সব গান গাইব...

তার কথা থামিয়ে দিয়ে সন্তোষদা রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করলেন তা, সেরকম গান কার কাছে পেলে ? এবার উনি দরাজ স্বরে বললেন—জানো, উত্তর কলকাতা থেকে একটি ছেলে এসেছে। রোগা, দুব্‌লা চেহারা, শারীরিক খুব একটা মজবুৎ নয়—তার কাছে প্রচুর ভাল গান আছে।

সন্তোষ প্রশ্ন করলেন—কি নাম ?

বিমান মুখোপাধ্যায়।

তখন সন্তোষদা বললেন—আরে, সে তো আগেও তোমার কাছে গিয়েছিল। এবার দেখ, সবেতে কি অত মাথা গরম করলে চলে ? কার ভেতর কি আছে সেটা বুঝতে হবে তো! ওকে আমিই তোমার কাছে পাঠিয়েছি। কালকেই রেকর্ডিং হবে। কোন চিন্তা নেই।

এসব কথাবার্তা সব আমার সামনেই হচ্ছে, আমি তো তখন ওখানে বসে। এবার মানবেন্দ্র আমায় বললেন—এই নাও ধরো, পঞ্চাশটা টাকা রাখো, তুমি কাল একদম স্টুডিওতে চলে আসবে। তাহলে তুমি কিন্তু আমার ট্রেনার হচ্ছ, ভুলচুক

. হলে সব ঠিক করে দেবে। তাই যখন রেকর্ডিং হবে তখন তুমি সেখানে থাকবে।

তখন আমার অভিজ্ঞতা কম হলেও খুব আনন্দ হল। আমি এইচ এম ভির ট্রেনার হয়ে কাজ করব, মানবেন্দ্রর মত শিল্পীর ট্রেনার হব, তার ওপর মানবেন্দ্র যে ব্যক্তিগতভাবে নিজের তরফ থেকে আমায়, পঞ্চাশটাকা দিলেন তার দামও তো তখনকার দিনে বড় কম ছিল না!

রাধাকান্ত নন্দী আমাকে দেখে বললেন অ্যাই হালায়, তুই হালায়, তুই আবার বিমান মুখার্জি হইলি কবে ?

এখন কথাটা হচ্ছে, ওর বাবা ছিলেন রোহিনীকান্ত নন্দী—শ্রীমতী ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কি ওই বাঈজীপাড়ায় উনি তবলা বাজাতেন, গুণীলোক ছিলেন। উনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। রাধাকান্ত নন্দীকে (১৯২৮-১৯৮৪) এই গান-বাজনার কমার্শিয়াল লাইনে যিনি নিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন সুবল দাশগুপ্ত। আমাদের বাড়িতে রাধাকান্ত যখন থেকে, আসতে আরম্ভ করেছিল তখন তার যথেষ্ট নামটাম হয়েছে। রেডিও, রেকর্ড চারদিকে খুব কাজ করছে, চেহারাতেও মোটা হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র দে থেকে শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র, কি সন্ধ্যা মুখার্জি পর্যন্ত সকলের সঙ্গে বাজাচ্ছে, সঙ্গত করছে, রীতিমত ডাকসাইটে ব্যস্ত লোক। আমি অবশ্য তখন, ভয়ের চোটে তার কাছে বড় একটা যাই না। যদি আমায় চিনতে না পারে—এইরকম একটা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স আমাকে সঙ্কুচিত করে রাখত।

তাই আমার মজা লাগল, যখন আমায় দেখতে পেয়েই, সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—শুনলুম—তুই আবার বিমান মুখার্জি হলি কবে ? তোর কি যেন একটা নাম ছিল—অ্যাঁ, নন্তু! নির্মল বিশ্বাস বললে—আরে, তুই মাইরি এত বড় একটা মিউজিক ডিরেক্টর হয়ে গেলি জানতেও পারলুম না অ্যাঁ।

আমিও মজা করে বললুম—শালা!

মানব বললে দেখ কি রকম আবিষ্কার করেছি। যাকে বলে ছাই চাপা আগুন। সন্তোষ সেনগুপ্তকে অবশ্য আমরা বেশ সমীহ করে চলতাম। উনি এলে আমরা সব তটস্থ হয়ে থাকতুম। এসে পড়েই উনি বলতে আরম্ভ করবেন—কি হচ্ছে কী, গল্প হচ্ছে ? একটু মন দিয়ে কাজকর্ম করো। রিহার্স্যাল-টিয়ার্স্যালগুলো একটু ভাল করে করো........

সে রেকর্ডিং হল।

কি গান ছিল ?

বিমান—গানগুলো খুব হিট করেছিল কিন্তু আমার মাথায় তখন যেন বজ্রাঘাত হল। দেখলুম আমার নাম কোথাও পাওয়া গেল না—না কভারে, না লেবেলে। বিমান মুখার্জি যে ট্রেনার তা কোথাও লেখা হয়নি। আসলে রেকর্ডের লেবেলে তো ছাপা থাকার কথা—ট্রেনার বিমান মুখার্জি।

আমি তখন এইচ এম ভির অফিসারদের কাছে গিয়ে এই ব্যাপারটার কথা বললুম।

তারা দিব্যি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেছিল আপনার নামটা দেওয়া যাবে না।

সন্তোষ সেনগুপ্তকে বললুম, উনিও ওইভাবে বললেন—একটু অসুবিধে আছে। দাদা তখন বেঁচে, দাদার মনের অবস্থাও আমার মতন। দাদা বললে ওরে পাগলা, (দাদা এই নামেই আমায় ডাকতেন) তোর নামটা দিল না—লোকে জানবে কি করে বল্‌তো! আমি বড় মুষড়ে পড়লুম—নীরবে এই উপেক্ষা সয়ে যেতে হল। এভাবে তিন চার বছর গড়িয়ে গেল তবু আমার নাম আর দেওয়া হচ্ছিল না। তখন একবার মানবকে বললুম। সে বললে—এটা তো আমার কাজ নয় রে, এটা তো অফিসারদের কাজ। এইভাবেই চলছিল। ১৯৬৯ সালে ঢুকেছি, আমার ট্রেনিং-এ রেকর্ড বেরুল সত্তর সালে। এইচ এম ভি আমাকে তখন কিছু ট্রেনিং ফিও দিত। সে সময় অবশ্য ট্রেনিং ফি দুরকম ছিল। যেমন কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত এঁদের রয়ালটি ট্রেনার হিসেবে ফি দেওয়া হত আর আমার মত যাঁরা, তাঁদের অন্যরকম। আমি নতুন বলে, আমার জন্যে ওরা প্রতিটি গান পিছু তিরিশটা করে টাকা বরাদ্দ করেছিল। আমি দাদাকে একদিন বললুম—তাহলে কি আমি এখানকার কাজটা ছেড়ে দেব ?

দাদা বললে না, না তা করিস নি। এটা একটা বড় সংস্থা—অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। কত লোকের সঙ্গে কিংবা সংস্থার সঙ্গে চেনাজানা হবে, সম্পর্ক তৈরি হবে। এতো একটা খুব ভাল জিনিস। তাই এ কাজটা শুধু শুধু হাতছাড়া করবি কেন ? অতএব কাজটা করেই চললুম, এদিকে মানবের লংপ্লেইং রেকর্ডটা খুবই হিট হয়ে গেল! আর তখন দেখা গেল সন্তোষ সেনগুপ্ত যেন অন্যান্য ট্রেনারদের কাজ বেশ কমিয়ে দিচ্ছেন। এবং এরপর পূরবী দত্ত, অনুপ ঘোষাল, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, মীরা দত্তরায়, নীতিশ দত্তরায় এঁদের রেকর্ড একটার পর একটা বের হতে লাগল। ট্রেনার প্রায় সবক্ষেত্রেই বিমান মুখোপাধ্যায়, এমন দাঁড়ালো যে এইচ এম ভির নজরুলগীতি মানেই হয়ে গেল—বিমান মুখোপাধ্যায়।

এ সবই আমায় করেছিলেন—সন্তোষদা। তাই এই ট্রেনারের নাম কেন যে ছাপা হচ্ছে না—তা সন্তোষদাকে বলতে, উনি বললেন আমি বলছি। তবে তুমিও অফিসারদের বা পাঁচজনকে বলো, দেখা যাক কি হয়। কিন্তু সন্তোষদা অল্পদিনের মধ্যে অবসর নিলেন। তার জায়গায় এলেন রেডিও থেকে বিমান ঘোষ। তিনিও আমায় চিনতেন। তবে ওঁর চেনার ব্যাপারটা বেশ মজার। উনি এমন অদ্ভুত মানুষ যে হয়ত সকালে চিনলেন কিন্তু বিকেলে চিনতেই পারলেন না। সকালে দেখা হতে কত গাল-গল্প অথচ বিকেলে এক বিয়ে বাড়িতে দেখা হয়ে গেল, অথচ তিনি চিনতেই পারলেন না। কথাও বললেন না।

বিমানদার আর একটা প্রায় মুদ্রাদোষের মত ছিল, সব সময় উনি কাজের ব্যাপারে বলতেন—দেখি কি হয় বা দেখি কি করা যায়। এইরকম।

তাঁর এই 'দেখিটা' বড় একটা দেখা হয়ে উঠত না, ফলে কাজের কাজও বিশেষ কিছু হোত না। শেষপর্যন্ত মানবকেই আবার একদিন বললুম—দেখ ভাই, এভাবে

আর হবে না, আমার ছাত্রছাত্রীরাই আর বিশ্বাস করতে পারছে না যে আমি এতগুলো গানের ট্রেনার। এবার মানব খানিকটা গালে হাত দিয়ে বসল। সময়টা ১৯৭৪ সাল। তখন আর এক রকম রেকর্ড বেরোচ্ছে সুপার সেভেন। তাতে ছ'খানা করে গান হোত এপিঠ-ওপিঠ মিলিয়ে। মানবেরও ছ'খানা গান বেরোবে শীগগির। রাধাকান্ত নন্দীকে মানব বলল, বিমান এরকম করছে, কি করা যায় বলতো রাধু। রাধু জবাবে বলেছিল দেখ এদের সঙ্গে শয়তানিতে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না। বিমানের ওপর নিশ্চয়ই কেউ কোন কারণে বিরূপ আছে। তখন মানব বললে আচ্ছাঃ, যা হবার হবে, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। মানব তো কাঠ গোঁয়ার!

সেদিন দমদমে, মানবের রেকর্ডিং হচ্ছে অনেকে আছে সবাই খাওয়া দাওয়া করছে। মানব আমায় তাদের ভেতর দিয়ে, অফিসারদের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে চলল। ভীরু মনে, আমি একটু আস্তে আস্তে হাঁটছি।

মানব আমায় বললে—তুই অত ভয়ে ভয়ে হাঁটছিস কেন ? তুই তো কোম্পানীকে যথেষ্ট ব্যবসা দিস, লাভ দিস। তবে ? মাথাটা তুলে চল।

তখন পি. কে সেন চলে গেছেন, এ সি সেনের কাছে গিয়ে মানব আমায় দেখিয়ে বললে এই যে, একে চেনেন ? এই ছেলেটার নাম বিমান মুখোপাধ্যায়। প্রত্যেকটা আর্টিস্ট এর ওপর নির্ভর করছে। প্রত্যেকটা আর্টিস্ট এর কাছে ট্রেনিং নেয়। সবার রেকর্ড ও করায় আর আপনারা ওকে তিরিশটা করে টাকা দেন। এর কিছু অভাব অভিযোগ আছে। আপনারা যদি রেকর্ডে এই ছেলেটার নামটুকু একটু দেন তাহলে অন্তত টিউশানির বাজারটা এর একটু ভাল হয়। অথচ এতদিন ধরে সেটুকুও হচ্ছে না, কেন বলুন তো ব্যাপারটাই বা কী ? এস সি সেন একটু থেমে বললেন —ঠিক আছে, আপনি এ বাড়ির অন্যসব আর্টিস্টদের একটু বলুন তাঁরাও যাতে কথাটা কর্তাদের বলে। আমি একা বললে হয়ত তেমন কিছু হবে না। আমি অবশ্যই জেনারেল মিটিং-এ কথাটা তুলবো। তবে আপনাদের তরফ থেকেও কথাটা উঠলে সুবিধে হবে।

মানব আমায় বললে—এই, তুই সব আর্টিস্টদের গিয়ে বল্ যে তারা যেন প্রত্যেকেই কথাটা কর্তাদের কানে তোলে। সেইমত আমি বলাতে, তারা সবাই আমাকে বলেছিল হ্যাঁ আমরা নিশ্চয় বলব। কিন্তু শেষপর্ন্ত তারা কে কি বলেছিল বা আদৌ বলেছিল কি না তা আমি আজও জানি না। তবে, অল্প কিছুদিন পরে দেখা গেল, একখানা লং প্লেয়িং রেকর্ডের লেবেল ছাপা হচ্ছে এদিকে ছ'খানা, ওদিকে ছ'খানা। ওই ১৯৭৪-৭৫ সাল, মানবেরই রেকর্ড-ওই যাতে একটা গান ছিল 'কার মঞ্জীর রিনিঝিনি বাজে চিনিচিনি'—সেই তাতে প্রথম আমার নাম বেরোলো—'পরিচালনায় বিমান মুখোপাধ্যায়।'

আর তারপর থেকে, সব রেকর্ডে আমার নাম ছাপা হতে শুরু হল। ওই রেকর্ডগুলো দেখে, আমার বাড়ির সবাই, আমার ছাত্রছাত্রীরা সকলে দারুণ খুশি। ছাত্রীদের

অভিভাবকরাও আশ্বস্ত। তাঁদের একজন সন্তোষকুমার গাঙ্গুলি আমায় বলেছিলেন বিমান, আগুন কখনো চিরকাল ছাইচাপা থাকে না। আশীর্বাদও করেছিলেন।

আমার দাদা তখন বেঁচে, তাঁর কি গভীর স্যাটিসফ্যাকশান! মা-ও ছিলেন—তাঁর আনন্দে আবেগ আর ধরে না। খুশি হয়ে মা বলেছিলেন আহা তোমার মৃত বাবা তোমায় আশীর্বাদ করছেন। তখন আমার বাড়িতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত নন্দীর মত আর্টিস্টরা সব নিয়মিত আসছেন, আমার এই ভাঙা ঘরটায়। অনুপ ঘোষাল, পূরবী দত্ত, মাধুরী চট্টোপাধ্যায় এঁরা সবাই আসছেন। আমি তাঁদের গান শেখাচ্ছি। এবার তাই আস্তে আস্তে একটু হাল ফিরল। এসে গেল ১৯৭৭ সাল। আর ওই সময়ে দাদার ক্যানসার ধরা পড়ল। ভগবান আমাদের সুখ-শান্তি সব কেড়ে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা অহরহ আমায় তাড়িয়ে নিয়ে যেত—

'শান্তি কোথায় মোর তরে হায়—বিশ্বভুবন মাঝে,
অশান্তি যে আঘাত করে, তাইতো বীণা বাজে'।

ছোটভাই তখন ইস্কুলে পড়ে। আমার বাবার যেসব ডাক্তার বন্ধু ছিলেন তাঁরাও অনেক সাহায্য করলেন, আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তখন আমার রোজগারও এতই কম যে ওই খরচটাও যেন আর চালাতে পারছিলুম না। ধার দেনাও আবার বাড়তে লাগল, ১৯৭৮ সালে যে বছর কলকাতায় খুব বন্যা হোলো, সে বছরই আমার দাদা গোলক মুখোপাধ্যায় মারা গেল ২৬শে সেপ্টেম্বর মা'র কোলে মাথা রেখে। আমার দাদা যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল তখন তার মাথাতে আমার মা হাত বুলোচ্ছেন। শোকে আমাদের বাড়িটা যেন খান খান হয়ে গেল। একদিনে মা আমার পাগল হয়ে গেলেন। ওপরের বারান্দা থেকে চেঁচাচ্ছেন —ওরে রান্না বান্না কর, খোকা খাবে আমার খোকাকে ওরা নিয়ে চলে যাচ্ছে রে। এরপর যখন এরা দাদার প্রাণহীন দেহটাকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে, মা উন্মাদ হয়ে ওপরের বারান্দা থেকে একেবারে নিচে ঝাঁপ দিলেন। এ আবার, আর একটা বিপর্যয় কাণ্ড। মা সেই যে শয্যা নিলেন তারপর অসুস্থ হয়ে অনেক দিন শয্যাশায়ী অবস্থায় জীবিত ছিলেন।

মা মারা গেছেন ১৯৮৯ সালে। ততদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। মাথার গোলমালটা ছিল, উল্টোপাল্টা কথা বলতেন। এইরকম দুঃখজনক অবস্থাটা যখন চলছিল সেই সময়ে কিন্তু রোদ বৃষ্টি, ঝড়বাদলের ভেতরে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর রাধাকান্ত নন্দী প্রায় নিয়মিতই আমাদের বাড়ি আসতেন, কত রকমে যে আমায় সাহায্য করতেন তা আর কি বলব। রাধাকান্ত নন্দী তো সব সময় ভরসা দিত তোর ভয় কি। আমি রয়েছি—মানব আছে—বলনা কি করতে হবে ? মানবও তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সবসময়েই বলত, বল তোর কি দরকার ভয় কি। আমি রয়েছি, বল না কি করতে হবে। তোর কিসের ভাবনা ? আজ এই ঘরে বসে মনে হয় মানব নেই, রাধাকান্ত নেই, নির্মল বিশ্বাস নেই এঁরা অনেকেই আর নেই কিন্তু তাদের কথাগুলো তো কিরকম থেকে গেছে! যেন সেই আদ্যিকালের রামপ্রসাদের কথা—'সময়তো

থাকবে না গো, মা, কেবল কথা রবে, কথা রবে, কথা রবে'........

কোন কোন সময়ে বিশেষ দরকারে—মানব আমায় কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিল কিন্তু আমার নিজের তাতে বড় সঙ্কোচ হোত। আমি যেভাবে মানুষ হয়েছি, আমার মনে হ'ত আমি যেন ভিক্ষা গ্রহণ করছি। কিন্তু মানব জোর করে, নানান ছলছুতো, হ্যাঁ নানা ছলছুতো করে আমায় সাহায্য করতো। যেমন ধরো—আচ্ছা আগে, রাধাকান্ত নন্দীর একটা কথা বলে নিই। একদিন রাধাকান্ত বলল—বিমান তুই তো অনেক রকম গান জানিস! একটা জায়গায়, চল্ না—আমার সঙ্গে সেখানে গান গাইবি। তুই গান করবি আমি বাজাব। তোরও কিছু হবে আমারও কিছু হবে। এইভাবে আমায় অনেক জায়গায় নিয়ে যেত। সেই ভাবে গান-টান করে, তখন আমি সংসার চালিয়েছি। মানব আবার অন্যরকম কায়দা করত। সে নানা জায়গার ফাংশানে আমায় নিয়ে যেতো, তার পাশে, মঞ্চে আমায় বসাতো। একবার স্টার থিয়েটারে মানবের একক অনুষ্ঠান। দুর্গাপুজার আগে, আগস্টের শেষে বা সেপ্টেম্বরের গোড়ায়। গান গাইতে গাইতে মানব ঝপ্ করে একটু থেমে বলতে লাগল এই যে গান গাইছি, এর সমস্ত কিছু কিন্তু বিমানের দেওয়া। প্রত্যেকটি কথা সুর ও বলে দিয়েছে। এভাবে প্রায়শঃই ও বলেছে, লোকের মধ্যে আমার পরিচিতি তৈরি করে দিয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে, হাতিবাগানের মোড়ে এসে মানব বললে—তুই আমার সঙ্গে গাড়িতে ওঠ। আমার বাড়ি চল। ওখান থেকে তোকে আমি ট্যাক্সি করে দেব, তুই বাড়ি চলে যাবি। আমি বললুম এখনই ১টা বাজে, এখন তোর বাড়ি যাব, তারপর তোর ওখান থেকে আমার বাড়ি ফিরতে তো অনেক দেরী হয়ে যাবে।

আরে চল না, চল না করতে করতে, আমায় ঠেলে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে বাড়িতে চলে এল। সেখানে হৈ চৈ করে হাজারো গল্প জুড়ে দিল—তা হ্যাঁরে, তোর কথা ওখানে কি রকম বললুম বলতো ? কতো লোক তোকে চিনলো, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর গা থেকে জামা টামা খুলে বসল। বসবার সময় ওই জামার পকেট থেকে কিছু টাকা—

কতো টাকা ?

বিমান—না, না সে কথা বলব না। টাকার পরিমাণটা না হয় থাক না!

তা কেন ? ওটা দিয়ে তো একজন মানুষের অন্তঃকরণের পরিমাপটাও মেলে ধরা যাবে।

বিমান—জামার পকেট থেকে মানব পাঁচ হাজার টাকার তাড়াটা বের করল, যেটা সে স্টার থিয়েটারের অনুষ্ঠান থেকে পেয়েছিল। আমার হাতে পুরো টাকাটা গুঁজে দিয়ে আমায় বললে তুই ওর থেকে আমায় এক হাজার টাকা দে। নে, নে তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। আমার চোখ ততক্ষণে জলে ভাসছিল আর ও তখন অপার আনন্দে হাসছিল। আমায় এবার তাড়া দিয়ে বললে, তুই আমায় হাজারটা টাকা দে—এর থেকে তবলা বাজিয়েছে রাধু, রাধাকান্তকে কিছু দেবো।

তার পর গাড়ির ড্রাইভারকে আর পেট্রোল খরচা যা হয়েছে সেটা দিয়ে, বাকি যা থাকবে, তা সংসারের জন্যে দেবো।

তখনকার দিনে চার হাজার টাকা সে কি চাট্টিখানি ব্যাপার! আমি বললুম এ যে অনেক টাকা, এত টাকা নিয়ে আমি কি করব ?

মানব বললে, কেন সামনে পুজো, ভাইবোনেদের জন্যে কিছু কিনে দিবি না ?

মানব-চরিত্র, মানে মানবেন্দ্রর চরিত্রের এই যে একটা দারুণ উন্মোচন হল, এতো প্রায় অবিশ্বাস্য গল্পের মত।

বিমান—তাহলে বুঝতে পারছ, মানবের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল। যখন তখন আমাদের বাড়িতে চলে আসত। কতো যে আড্ডা, গান, মজা হত ভাবা যায় না। একবার এরকম একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল—ঘটনা না বলে, দুর্ঘটনা বললেই বোধহয় ঠিক হবে। তখন ১৯৮৩-৮৪ সাল। মানবেন্দ্রর যা স্বভাব, ওর এক এক সময় হঠাৎ হঠাৎ, কোনও না কোনও কারণে ভীষণ মাথা গরম হয়ে যেত আর তখন হয়ত একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড বাধিয়ে বসত। ওই সময় একদিন হৈমন্তী শুকলা আর অনুপ ঘোষালকে নিয়ে এইচ এম ভি কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, অনিল ভট্টাচার্য এঁদের পুরনো কিছু হিট গান লং প্লেয়িং রেকর্ডে বের করার তোড়জোড় করছে। রাসবিহারীর কাছে, সতীশ মুখার্জি রোডে তখন এইচ এম ভির রিহার্স্যাল রুম। ওখানে আমি সেদিন হৈমন্তী আর অনুপকে রিহার্স্যাল দেওয়াচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ, মানব এসে সেখানে হাজির বলল—আরে তোর গলার আওয়াজ শুনে আমি চলে এলাম। আমি বললুম কেন, কী ব্যাপার ?

বেশ খুশির মেজাজেই বলল—দ্যাখ বিমান, এক সময় এই গ্রামোফোন কোম্পানী তোকে খুব হেনস্থা করেছিল, উপেক্ষা করেছিল, তাই না ? আর আজ দ্যাখ, সেই তোকে না হলে আর চলছে না। এর জন্যে আমার এত আনন্দ হচ্ছে! ঘটনাচক্রে ওখানে তখন এইচ এম ভির এক বড় অফিসার, আমি তাঁর নামটা এখন আর বলতে চাই না, তিনি বসে ছিলেন। তিনি মানবের ওই উচ্ছ্বাসের কথা শুনে, কি রকম যেন একটু গর্বের সঙ্গে মন্তব্য করে ফেললেন—'আরে হবে না কেন ? ওকে কে আবিষ্কার করেছে ? হুঁ এটা তো আমিই করেছি'। হয়ত একটু মজা করেই বলেছিলেন কিন্তু কথাটা শুনে মানব হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে গেল যাকে বলে, একেবারে খেপে গেল। আর তারপর এমন হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়ে বসলো—যে এখানে আমি মানবের বিপক্ষেও, আজকে একটু বলব।

মানব ওই কথা শুনে, খুবই আজেবাজে, খারাপ ব্যবহার করে, প্রায় মারামারি বাধাবার উপক্রম করে ফেলল। আমি অপ্রস্তুত। মানবের ওই ভীষণ মূর্তি দেখে হৈমন্তী, অনুপরা তো থতমত খেয়ে গেছে। হৈমন্তী করুণ স্বরে বললে, বিমানদা আজকে বোধ হয় আর....আমি বরং বাড়ি যাই। আমি হৈমন্তীকে বললুম—হ্যাঁ আজ আর হবে না আজ চলে যাও। অনুপ একটু সাহস করে মানবকে থামাতে

গেল। মানব তাতে হুঙ্কার ছাড়ল—অ্যাই, যা এখান থেকে চলে যা, খবরদার আমাকে জ্ঞান দিতে আসবি না। বলেই মানব দুম করে চলে গেল। যাকে বলে একটা বিশ্রী অবস্থা। আমি দেখলুম এখন চুপ করে থাকাই ভাল। আচমকা, মিনিট পাঁচ-ছয় পরেই, আবার মানব ঝড়ের মত ওখানে ফিরে এল। ফিরে এসেই, আবার সেই অফিসার ভদ্রলোককে নানারকম চার্জ করতে লাগল। ওকে আর কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। রীতিমত অপমানকর কথা ছিটিয়ে—ওই লোকটিকে সে বিঁধে চলেছে—আরে মশাই, আপনি আর কি ঘোড়ার ডিম পারেন ? আপনার ক্ষমতা আমার সব জানা আছে। ছ্যাঃ, ছাড়ুন তো মশাই। বলেই আবার একটা তুলকালাম কাণ্ড করে, দুম করে চলেও গেল।

আমি তখন ওই অফিসার ভদ্রলোককে বললুম নাঃ, আজ থাক, আমি এখন যাই।

আমি বেরিয়ে এসে দেখলুম পকেটে তখনো গোটা দশেক টাকা রয়েছে। সে সময় রাসবিহারী থেকে মানবের বাড়ি যাদবপুরে যেতে, ট্যাক্সিতে ওইরকমই লাগত। অতএব ট্যাক্সিতে ওর বাড়ি তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেলাম। আমায় দেখামাত্র মানব —চিতাবাঘ খেপে গেলে যেমন করে, সেইভাবে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল—তুই, তুই কি করতে এসেছিস ? শয়তানটার হয়ে দালালি করতে এসেছিস ? গ্রামোফোন কোম্পানী তোকে গিলে খেয়ে নিয়েছে। আজ তুই আবার গ্রামোফোন কোম্পানীর হয়ে, আমারই এগেনস্টে বলতে এসেছিস, অ্যাঁ ? আমি বললুম, আমি কেন তোমার বিরুদ্ধে বলতে যাব ? কিন্তু ভেবে দেখো, তুমি যাঁর সঙ্গে এই ব্যবহারটা আজ করলে, তিনি আমাদের থেকে বয়সে কতো বড়। বয়সে অত বড়, তাঁর তো একটা প্রভাবপ্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা আছে! তোমার শিল্পীমনে যদি এরকম একটা অশান্তি হয় তাহলে সেটা তো আমারও কম দুঃখের নয়। এর জন্যে আমারও কি খুব কষ্ট হচ্ছে না ?

কিন্তু মানব কোন কথা বুঝবে না, শুনতেও চাইছে না। তার স্ত্রী এসে বললেন—বিমান, কী হয়েছে বলো তো ? তোমার মানবদাদা বাড়িতে ঢুকে এস্তোক, এমন চেঁচামেচি-চীৎকার করছে কেন ?

মানব আরো যেন ফেটে পড়ল—তুমি ভেতরে যাও। আমাদের প্রফেশনাল ব্যাপারে তুমি কোন কথা বলতে এসো না।

আমি দেখলুম মহা মুস্কিল—একে এখন আমি কি করে যে সামলাই, ঠাণ্ডা করি। আবার একটা হুঙ্কার ছাড়ল—আমাকে এবার তুই কী করতে বলছিস, অ্যাঁ ? আমি একটু নরম করে বললুম—কাল সকালে আমি এখানে চলে আসব। আমরা কাল দুজনে একসঙ্গে ওখানে যাব, আমি তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবো। গিয়ে বললেই হবে—সব সময় মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে না, আপনি কিছু মনে করবেন না। আবার খিঁচিয়ে উঠল, তুই কী বলতে চাইছিস ? আমাকে তুই ক্ষমা চাইতে বলছিস!

আরে, ক্ষমা নয় একটু কমপ্রোমাইজ, একটু মানিয়ে গুনিয়ে নেওয়া আর কি। অ্যাপলজি-ট্যাপোলজি নয়।

কিন্তু বেজায় মাথা গরম, কিছুতেই বুঝতে চায় না। কিন্তু তারপর হঠাৎই আমায় বললে তোর তো খাওয়া-দাওয়া হয়নি, এখন চল্, আমার সঙ্গে ভাত খাবি।

আমি বললুম না। আজ আমি আর খেতে পারব না। তুমি আগে বলো যে কাল আমার সঙ্গে যাবে—

অমনি মানব হেসে ফেলল—আচ্ছা যা, তুই যা বলছিস তাই হবে। কাল আমি গিয়ে ওটা ম্যানেজ করবোখন। তোকে এতদূর আর আসতে হবে না। তুই ঠিক এগারোটার সময় রিহার্স্যাল রুমে থাকবি।

পরদিন, আমি তো সাড়ে দশটাতেই সতীশ মুখার্জি রোডের অফিসে ঢুকে পড়েছি। একটু আগেভাগে এসে, ওই অফিসার ভদ্রলোকটিকে বোঝাবার জন্যে, একটু প্রশমিত করার জন্যে, নানারকম মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছি যাতে ব্যাপারটা মিটে যায়। মিথ্যে কথা আমি বলি না কিন্তু মানবের জন্যে আজকে না বলে আর অন্যপথ ছিল না। মানবকে আমি জানি, তাই বুঝি, যে মানবের মনের ভেতরও কম তোলপাড় হয়নি। আর সেই আহত কর্তাব্যক্তি মানুষটিও যেন, হৃদয় খুঁড়ে বলে চলেছেন—জানো, মানব যখন এই এত্তোটুকু, তখন থেকেই ওকে আমি জানি। তখন মানব কীর্ত্তন গাইত ওর কাকা রত্নেশ্বরের সঙ্গে, এখানে ওখানে আমি গাইতে নিয়ে যেতুম। মানব এরকমই পাগল, এরকম পাগলামো করেই থাকে। আমি জানি। তবে এখানে এখন যারা আসে তারা একেবারে ছেলেমানুষ। হৈমন্তী, অনুপ এরা তো নতুন এসেছে, ভীষণ জুনিয়র—ওদের সামনে মানব যা করলো..

আমি বললুম হ্যাঁ, মানব কিছু না ভেবেই, ওরকম করে ফেলেছে। তবে ও আজ ঠিক আসবে—ওরও খুব দুঃখ হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেও...

না, না, এখানে এসে ওর ক্ষমা চাইবার কোনো দরকার নেই, আমি তো ওকে জানি—অফিসারটি বললেন।

সিতাংশু, ভাই তোমায় বলব কি, এগারোটায় আসার কথা, পৌনে বারোটা নাগাদ একটা গরদের পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি পরে, গট্‌গট্ করে এসে একেবারে—হ্যাল্লোও, হ্যালো দাদা বলেই ভদ্রলোকের পিঠে হাত দিয়ে বললে—আচ্ছা দাদা, কালকে কি এমন হয়েছিল বলুন তো। কথাটা শেষ করেই আবার হো হো করে হাসি। এই দেখে ভদ্রলোকও হেসে ফেললেন। মানব বলেই চলেছে—দাদা, আগেও তো আপনার সঙ্গে অমন একটু আধটু কখনো হয়েছে কিন্তু কালকে ঝুটমুট ওরকম, অত বেশি বেশি কেন হয়ে গেল বলুন তো।

এবার ভদ্রলোক একটু কপট গম্ভীর মুখ করে বললেন—না, তুমি আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

আরে কথা, আপনি না বললে কি হবে, আমি তো বলবই। আরে মশাই, দাদা ভায়ে কি এরকম হয় না ? আমি ছোট ভাই। আমার বাবা-কাকাদের মধ্যেও তো এমন কতো হোত।

মানবকে থামিয়ে আমি বললুম—দেখ মানব, তুমিই তো অন্যায় করেছিলে। মানব হা হা করে উঠল। আরে বিমানটাই হল আসল কালপ্রিট ওর জন্যই যতোসব এইরকম। ওর গলায় এখন মজার সুর।

তারপরেই অফিসার ভদ্রলোককে বলল, আপনি তো এখানে রোজ হোটেলের খাবার খান। আমার বৌ আজ বাড়িতে ঝোলভাত রেঁধেছে, আজকে আপনি আমাদের বাড়িতে খাবেন, কি খাবেন তো! এর ওপর আর কথা নেই। হৈ চৈ করে আমাদের ওর বাড়িতে নিয়ে গেল, দিব্যি ঝোলভাত খাওয়ালো, আবার সবাইকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিল। তার আগে মানবের বাড়িতে ঢুকে অফিসার ভদ্রলোক মানবের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি একে (মানবকে) নিয়ে ঘর করো কি করে ?

'এই তো দাদা, বুঝতেই তো পারছেন। আপনিও তো ওকে নিয়ে ঘর করছেন বুঝতে পারছেন না কি ? এই আগুন এই জল। এমনি মানুষ'—বৌদির সতৃপ্ত জবাব। যাবার আগে ভদ্রলোক কাজের কথায় এলেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন ও তাহলে কবে নাগাদ ডেট দিতে পারবে ? মানব তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, ওসব যা করবার আপনি আর বিমান করবেন। আমি শুধু যেদিন বলবেন, গেয়ে দিয়ে আসব। এই হলেন মানুষ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আমার বন্ধু মানব। কিন্তু এর কথা আর বেশি বলতে পারছি না। মনে পড়ে যাচ্ছে, ১৯৯১ সালের কালীপুজোর দিন সকালবেলা, কলের তলায় নাইতে গিয়ে হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে। আমি রাত্তিরে একটা অনুষ্ঠানে গাইতে গেছি সেখানে ফোন করে ওর মেয়ে বাপুন (মানসী) বলল, বাবা একটু অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছে, তবে এমন কিছু নয়। তোমার ভাববার কিছু নেই। তুমি কিছু ভেবো না।

আমি বললুম আমি দেখতে যাবো। সেই সময় মানব নট্ট কোম্পানীতে যাত্রার অনেক কাজ করতো, বেশ ব্যস্ত থাকতে হত। এর ভেতরে নার্সিং হোমে গিয়ে দেখলুম ওকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। হাতে-নাকে কতো নল-টল লাগানো রয়েছে। ইনটেনসিভ কেয়ারের যে নার্স ছিল সুচিত্রা, তার সঙ্গে আমার আর মানবের চেনাশুনো ছিল। তখন মানব চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই দেখে আমি চুপচাপ চলে আসছিলুম। হঠাৎ পেছন থেকে চেনা স্বরের কথা কানে এল কে, কোথা যাচ্ছিস ? ফিরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালুম। অমনি মানব ওর ডান হাত দিয়ে আমার ডান হাত জোরে চেপে ধরেছে—হাতের মুঠোয় বেশ চাপ রয়েছে। বললে—দ্যাখ, আমি সত্যিই ভাল আছি। মেয়েরা জোর করে আমায় শুধু শুধু ইনটেনসিভ কেয়ারে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তুই গান বেছে রাখ, আমি ভাল হয়ে এখান থেকে বেরিয়েই রেকর্ডিং করব। আমি বললুম হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হবে তুই তাড়াতাড়ি বাড়ি আয় আগে। আমি বেশ আনন্দের মন নিয়ে বাড়ি চলে এলুম। কিছু দিন বাদে সেও বাড়ি ফিরে এসেছিল। তারপর একদিন আবার শুনতে পেলুম—ওর শরীরটা ফের বেশ খারাপ হয়েছে। এবার দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হয়ে, অসুস্থতাটা গুরুতর বলে মনে হচ্ছে। কথাবার্তাও, কিরকম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। তখন ডিসেম্বরের শীত। হপ্তায় অন্ততঃ ৪/৫ দিন ওর কাছে যেতাম। ওর

পাশে একটা হারমোনিয়াম রাখা থাকতো। ওখানে গেলেই আমাকে, গানের পর গান গাইতে হোত। এইরকম একটা শনিবার ১৮ই জানুয়ারি, অনেকগুলো গান হয়েছে, তারপর আমি যতবার বলি—এবার আমি যাই, ততোবারই ও মাথা নাড়ে। বলতে চাইছে—না, যাবি না। বৌদি বললেন—না, না তুমি চলে যাও, নাহলে তোমার দাদা তোমায় কিছুতেই ছাড়বে না। যেতে দেবে না। আমি ভারাক্রান্ত মনে চলে এসেছি। পরদিন ১৯ শে রবিবার সকাল দশটা/সাড়ে দশটা হবে—মনীন্দ্র নট্ট, যে তবলা বাজাতো—সে আমায় বললে, বিমানদা চলুন মানবদার শরীরটা ফের আবার খুব খারাপ হয়েছে, আমি যাচ্ছি। আমার বড় নার্ভাস লাগছিল, উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—

কেন রে, কি হল রে আবার ?

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি করে ওর বাড়িতে পৌঁছে গেছি। সেখানে দেখি, বাড়ি ভর্তি সব লোকজন, থমথমে চাপা আবহাওয়া। তখনি সব বুঝে নিয়েছি, সব শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি দেখলুম শেষবারের মত সাজানো গোছানো হচ্ছে। সেটা রবিবার—যতো মিউজিসিয়ান, আর্টিস্ট সবাই এসে গেছে। সেই ভিড়ে আমায় দেখেই সকলে বলে উঠল এই যে বিমানদা এসে গেছে। আসলে সবাই তো আমাদের সম্পর্কটা জানতো। তারপর দেখতে দেখতে ন'দশ বছর হয়ে গেল। মানব আমায় প্রায়ই বলত সংসার টংসার থাক। তোতে আর আমাতে একটা জায়গা দেখে, একটা বাড়ি করব। সেখানে শুধু আমরা দুজনে, দিনরাত কেবল গান গাইব, গান গেয়েই কাটাব। এইরকমই গান তার প্রাণ।

কোনদিন হয়ত ওর সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছি। সে বলত চুপ করে আছিস কেন, গান কর না। আমি মজা করে ওরই সুর করা পুরোন কোন আধুনিক গান হয়ত ধরলুম। ওর একটা গান ছিল, 'কুয়াশা ঘেরা নীল পাহাড়ে'। আমি গলা ছেড়ে ধরেছি। ও বলে উঠল এই, দ্রুত গাইছিস যে, আরে অত দ্রুত কেন রে!

এ সময়টা আমার জীবনের একটা পর্ব। দাদার চলে যাওয়া, মানবেন্দ্রর চলে যাওয়া, মা তার আগেই চলে গেছেন। মার শ্রাদ্ধে মানব এসে, অনেকভাবে সাহায্য করেছে। মার শ্রাদ্ধের দিন জগন্ময় মিত্র, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভি. বালসারা, পূরবী দত্ত, মানব এমনি আরো অনেক শিল্পীরা এসেছিলেন। ইন্দ্রাণী তখন সবে এসেছে, ইন্দ্রানী সেন তখন বাচ্চা মেয়ে, ছেলেমানুষ। সেই ইন্দ্রানীকে নিয়ে এখন কতো অনুষ্ঠান করছি। এমনি একটা অনুষ্ঠানে ইন্দ্রানী একদিন বলল—বিমানদা আমায় নাম ধরে একদিনও ডাকে না, বিমানদা সব সময় আমায় বাঁদরী বলে ডাকে। সবাই খুব মজা পেয়েছিল। আর আজ এমন হয়েছে যে, কোন অনুষ্ঠানে আমি আছি আর ইন্দ্রানী যেই না এসে পড়েছে, পাবলিকে অমনি চেঁচিয়ে উঠেছে এই যে বিমানদার মেয়ে এসে গেছে। আবার দেখ হেমন্তদাকেও পেয়েছি।

হেমন্তদা চলে যাবার পর, আধুনিক গান কি রকম যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হেমন্তদা আধুনিক গানের, বলতে গেলে, নিজেই একজন প্রতিষ্ঠান বিশেষ যেমন



হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

উত্তমকুমার বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে—কত বড় একজন আর্টিস্ট হলে এরকম হয়....

একটা দরকারে হেমন্তদা আমায় ডেকেছিলেন।

মানব সেই সময় একটা ছবি করতে শুরু করেছিল —ছবির নাম 'মায়ামৃগ'। উত্তম ছিলেন কিন্তু নায়ক নয়। উত্তম স্বেচ্ছায় একটা আপনজন খেদানো আধা ভবঘুরে একটা চরিত্রের ভূমিকা বেছে নিয়েছিলেন। নায়কের একঘেয়েমি কাটাতে উত্তম নিজে বিশ্বজিৎকে নায়কের রোলটা দেবার জন্যে মানবকে বলেছিলেন —মানব আবার ওই ছবির সুরকার ছিল। উত্তমের সঙ্গে ওর যথেষ্ট বন্ধুত্বও ছিল।

এই ছবিতে একটা গান ছিল—'শোন শোন গেরোবাজ, খোপ থেকে বেরো আজ' —মানবের সুর। হেমন্তদা তখন কলকাতায়। ঠিক হয়েছিল, হেমন্তদা একদিনে গানটা তুলে নিয়ে, রেকর্ড করে দিয়ে বোম্বাই চলে যাবেন। গানটা শুনে হেমন্তদা মানবকে বললেন এই মানব, এ গান কি আমি গাইতে পারবো ? তুমি এ গান আমাকে দিয়ে গাওয়াতে চাইছ কিন্তু আমার মনে হয়, এ গানটা তুমি গাও, আমার থেকে অনেক ভাল গাইবে। মানব বললে না, গানটা উত্তমের গলায়, ওটা আপনি গাইলেই ঠিক হবে, ভালই হবে। হেমন্তদা বললেন—গানটা একটু শক্ত হবে, একদিনে আমি এ গানটা গাইতে পারবো না। পাঁচের দশকের শেষে তখন রেকর্ডিং-এ তো তেমন উন্নতি হয়নি। হেমন্তদা ক্রমাগত খুঁত খুঁত করছেন। আবার বললেন দেখ মানব, এত গান গেয়েছি কিন্তু এই গানটা গাইতে গিয়ে আমায় একটু থামতে হচ্ছে। তবু মানবের চাপাচাপিতে হেমন্তদা গানটা গাইলেন এবং নিঁখুৎই গাইলেন। তবু নিজে থেকে বললেন মানব, আর একটা টেক নিয়ে রাখো। তাতে তোমার কাজের সুবিধে হবে।

হেমন্তদা একদিন নিজে আমায় এ গল্পটা বলেছিলেন। সেদিন তখন মানব, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ মশাইরা সব উপস্থিত ছিলেন। এই গল্পের আসরে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম হেমন্তদা, আপনি তো বহু মিউজিক ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করেছেন কলকাতাতে, বম্বেতে। তাছাড়া আপনি নিজেও একজন ভীষণ বড় সুরকার। বিশেষ করে, হলিউডের একটা ছবি 'গুরু'তে কাজ করার পর বলতে গেলে বিশ্ব চলচ্চিত্রেরও একজন সেরা সঙ্গীত পরিচালক। তাই এদের ব্যাপারে দু এক কথা একটু বলুন না।

হেমন্তদা শুরু করলেন—শোনো গো, আমি প্রথম থেকে যে সব বড় বড় সঙ্গীত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছি তখন তাঁদের সময়ে অত পাবলিসিটি ছিল না, কাজের এত পরিধিও ছিল না। বরং প্রচার বা পরিচিতি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তাই আমরাও অনায়াসে দিব্যি কাজ করে গেছি। আমি তো কাং নজরুলের

সঙ্গে কাজ করেছি, কখনো কিছু ভাবতে হয়নি। কিন্তু সব চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছি কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে। আমাদের সময়ে সেই ১৯৪০-এর কালে, সারা ভারতে কমল দাশগুপ্তর নামে থরহরি কম্প হোত। মানে, তাঁর এত নামডাক, দুর্দান্ত প্রতিপত্তি ছিল। সবাই ধরে নিত যে, একবার কমল দাশগুপ্তর সুরে—পরিচালনায় রেকর্ড করতে পারলে, শিল্পীর ভবিষ্যৎ একেবারে তৈরি হয়ে যাবে। তখনকার দিনের শিল্পীদের যেমন এরকম একটা বিশ্বাস ছিল, তেমনি বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীর মালিকদেরও এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল। কিন্তু সবার পক্ষে তো আর কমল দাশগুপ্তর কাছে পৌঁছনো সম্ভব হ'ত না, আমাদের সে সময়ে। জগন্ময় মিত্রর হিন্দি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। জগমোহন নাম নিয়ে সেসব গীত, গজল, দাদরা ভজন গোটা দেশে তখন খুব চলছে। আমি তাই গ্রামোফোন কোম্পানীতে গিয়ে ওখানে যে বড় অফিসার কর্মকর্তা ছিলেন, তাঁকে বললাম, 'আমি হিন্দি গান করব কেননা তার বাজার তো সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে রয়েছে। সেইজন্যে আমাকে আপনারা কমল দাশগুপ্তের কাছে রেফার করুন যাতে ওঁর পরিচালনায় সুরে আমি গাইতে পারি'। সেই কর্মকর্তা, খুব সম্ভব নিমেষ ঘোষ মশাই বললেন অমি কমলবাবুকে একবার বলব'খন, তবে আপনিও একবার নিজে গিয়ে বলুন। অতএব আমি গেছি। প্রথম দিন বলে, আমি তো কমলবাবুকে কিছু বলতেও পারছি না—উনি খুব রাশভারী লোক ছিলেন কি না! ঘরে এত লোকজন সেটাও একটা কারণ। পরে কমলদাকে বললাম কমলদা, 'আমি হিন্দি গান গাইতে চাই, ওটা আপনি না করালে হবে না।

কমলদা আমাকে গাইতে বললেন। মন দিয়ে আমার গান শুনলেন। তারপর আমি আগে কি গান করেছি, কার কাছে কাজ করেছি, শিখেছি এসব উনি জানতে চাওয়ায় সব কথা জানিয়ে দিলুম। বললুম আমি আগে গুণী সুরকার শৈলেশ দাশগুপ্তর কাছে কাজ করেছি। সেদিন পর্যন্ত আমি যেটুকু করতে পেরেছি তা সবই শৈলেশ দশগুপ্তর জন্যে। তিনিই আমায় স্বরলিপি পড়তে শিখিয়েছেন, স্বরলিপি দেখে, গান তুলতে শিখিয়েছেন। এবং ওরই চেষ্টায় আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভালবাসতে শিখেছি।

একটু থেমে, একটু অন্য কথায় গেলেন হেমন্তদা। মানবেন্দ্রকে বললেন—শোনো গো মানব, রবীন্দ্রসঙ্গীতটা একটু অভ্যেস করো, এর অনেক সুবিধে। সুরের অনেক ইন্ধন পাবে। সুরকার হতে গেলে ওটার খুব প্রয়োজন হবে।

আবার কমলদার কথায় ফিরলেন—কমলদা তখন আমায় চেপে ধরেছেন। রেকর্ডে গাইবার আগে আমাকে কমলদার কাছে গলা সাধতে হবে—সারেগামা করতে হবে। আমার তখন অত সময় কোথায়, আমি কখন ওসব প্র্যাকটিস করব ? আমি তাই সেদিন পালিয়ে গেছি। তারপরেও কমলদাকে দেখলেই পালাই।

একদিন কমলদাই আমায় ধরেছেন—অ্যাই, তোকে যে ডেকেছিলুম, হিন্দি গান করবি বললি, তোর জন্যে হিন্দি গান তৈরি করে রেখেছি। অথচ তোরই দেখা

নেই। তুই কোথায় না হিন্দি গানটা তৈরি করে ফেলবি—না, তোকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। যাক গে আজই চলে আয়।

অতএব কমলদার কাছে ভয়ে ভয়ে গেছি। উনি আমায় দুটো গান দিলেন। একটা গজল, 'ও প্রীত নিভানে ওয়ালে' আর অন্যটা গীত 'কিৎ না দুখ ভুলায়া তুমনে পেয়ারী'। এমনিতে খুবই আদর করে উনি গানটা আমায় শেখালেন কিন্তু রেকর্ডিং-এর সময় অন্যমূর্তি। এ কমলদা আর সে কমলদা নয়—যেন একটা দৈত্য দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, পান থেকে চুণ খসার উপায় নেই। কমলদা নিজে মাইক্রোফোন অ্যাডজাস্ট করলেন, সব যন্ত্রীদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা নির্দেশ, কড়াকড়া কথা। নির্দেশেরও শেষ নেই যেন। এই কথাটা ওখান থেকে ধরবে, ওইখানটায় এইটুকু থামবে—এমনি সব চলেইছে আর কি। এখন আমি তোমাদের বলছি যে আমি যত খোশমেজাজে গাই তখন অত মেজাজে গাইতে পারিনি, ভয়ে ভয়ে গেয়েছি। গাইবার পর বোধহয় প্রত্যেকটা গান দুটো-তিনটে করে টেক করলেন। তখন ওই থেকেই ওয়াক্স-এর রেকর্ডিং হোত। যেদিন ওই.... রেকর্ডিং-এর স্যাম্পল কপি এসেছে, সবাই জড়ো হয়েছে সেদিন। কমলদার ঘরে বসে শোনা হচ্ছে। বড়কর্তা রাইট সায়েবও রয়েছেন। সবাই কমলদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কমলদা কি রায় দেন! হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ঘোষণা হল—ফার্স্ট প্রিন্ট, কুড়ি হাজার।

বিস্ময়ে আমি আনন্দ করব, না কাঁদব ভেবে পাচ্ছি না। তখনকার দিনে, প্রথম প্রিন্ট কুড়ি হাজার ভাবা যায় না, একটা অবাক করার মত ব্যাপার! সেদিন হেমন্তদা একথাটা বলেছিলেন। তারপর হাসতে হাসতে সবাই এর দিকে তাকিয়ে বললেন—কি গো মাতব্বররা, তোমাদের ফার্স্ট প্রিন্ট কতো হয়েছিল ? আজকে আমি বলছি—ওই গান তখন, বেশ কিছু কাল ধরে লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছিল। এমনকি আজও ভালই বিক্রী হয়। ১৯৪১ সালের রেকর্ড। হেমন্তকুমার চলে গেছেন—প্রায় বারো বছর হলো। হেমন্তদার সেইগান আজ বোধহয় কোটিতে পৌঁছে গেছে। আজও, সিতাংশু তুমি যা বললে এ রেকর্ড অলটাইম গ্রেটদের একটা হয়ে রয়েছে। কমল দাশগুপ্তর সুরে হেমন্তদা আরও অনেক গান করেছিলেন। এ নিয়ে হেমন্তদা একদিন বলেছিলেন কমলদা একবার রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেঙে, আমাকে দিয়ে একটা গান করিয়েছিলেন—'সেদিন নিশীথে বরিষণ শেষে, চাঁদ উঠেছিল বনে।' আমার জীবনের স্মরণীয় গানগুলোর মধ্যে এটাও একটা। পরবর্তী সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানী আমায় যখন, আমারই আগেকার গাওয়া কিছু গান রি-মেক করতে বলেছিল তখনও আমি সুবোধ পুরোকায়স্থর লেখা এই গানটা আবার গেয়েছিলুম।

হেমন্তর সঙ্গে তোমার প্রথম আলাপটা কিভাবে হয়েছিল বলো তো!

বিমান—হেমন্তদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ গ্রামোফোন কোম্পানীতে। আমার বাবা মাঝেমধ্যেই গ্রামোফোন কোম্পানীতে বেড়াতে যেতেন। এইরকম একদিন

বাবা ওখানে গেছেন, সঙ্গে আমিও গেছি। সন্তোষ সেনগুপ্ত বাবাকে শৈলেশ দত্তগুপ্তর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমিও গেলুম।

বাবা শৈলেশ দত্তগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন ?

আমার শরীরটা আর ভালো যায় না। একটু পূর্ববঙ্গীয় ভাষার টানে শৈলেশ জবাব দিলেন। তারপর একজন সুপুরুষ ভদ্রলোককে দেখিয়ে বাবাকে বললেন—একে চেনেন ?

বাবা বললেন—উনি হেমন্তবাবু আমি জানি। তবে তেমনভাবে কোনদিন ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। বাবা তারপর হেমন্তবাবুকে নানাকথা বলতে বলতে, আমাদের বাড়ির গোপীমাধবের কথা বলতেই হেমন্তবাবু সোৎসাহে বলে উঠলেন—যে জয়নগরে তাঁদের দেশের বাড়িতেও দধিমাদন নামে পৈতৃক ঠাকুর আছে। বল্লেন —আমরাও খুব কৃষ্ণ ভক্ত। জানেন, আমার ঠাকুরমা সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেছিলেন। শেষ সময়ে উনি ক্রমাগত বলছিলেন আমায় তোমরা গঙ্গায় নিয়ে চলো, তবে আমার প্রাণ বেরোবে। হয়েও ছিল নাকি তাই। মুখে হেমন্তর সেই স্মিত হাসি। আমি হেমন্তদাকে সেই প্রথম দেখি। তারপর দ্বিতীয়বার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা আর ঘনিষ্ঠতা হল—সে আর একটা গল্প। সেই গল্পের সূত্র ধরেই ব্যাপারটা বলি।

তখন উত্তর কলকাতার বাগবাজারে প্রয়াত গীতিকার অনিল ভট্টাচার্যর স্মৃতিতে প্রতিবছর বেশ একটা জমজমাট জলসার আসর বসত। আর সে ব্যাপারে অনিল ভট্টাচার্যের ভাই বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং বেতারে ধারাভাষ্যকার কমল ভট্টাচার্য এবং ছোট ভাই নির্মল ভট্টাচার্য, যার ডাক নাম ছিল বিনু, যিনি তখনকার একজন বেশ নামকরা সুরকার ছিলেন তাঁরাই সব যোগাড়-যন্তর-ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করতেন। আমরাও পাড়ার ছেলেরা খুচ্খাচ্ ফাই ফরমাস খাটতুম ভলান্টিয়ারি করতুম। ফলে নামকরা গাইয়ে-বাজিয়েদের দেখতে পাওয়া বা তাঁদের গানবাজনা শোনার খুব সহজ সুযোগ জুটে যেত। সেই বিনুদা মানে, নির্মল ভট্টাচার্যর সুর দেওয়া অনেক গান তখন খুব বিখ্যাত হয়েছিল, যেমন সুপ্রভা সরকারের 'এ পথে যখনি যাবে', তালাত মাহমুদের 'আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়' এমনি আরো সব কতো গান! তা, সেই বিনুদা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে দুটো গান রেকর্ড করছিলেন—'আমি বন্ধুবিহীন একা' আর 'বেলা যে ফুরায়, আঁধার ঘনায় মোর দ্বারে এলে কেন পান্থ।' রেকর্ড বেরুবার পর গানগুলো সে সময় মোটামুটি চলেছিল —তবে যে দারুণ সুপারহিট হয়েছিল তা বলবো না। সেই রেকর্ডিং-এর সময় হেমন্তদা ভীষণ ব্যস্ত মানুষ—প্রায় রোজই বম্বে-কলকাতা করতে হচ্ছে। তখনো এইচ এম ভির রিহার্স্যাল রুম নলিন সরকার স্ট্রীটেই ছিল।

এরকম একদিন বিনুদা বললেন চল্ বিমান, হেমন্তকে দিয়ে আজ দুটো গান তুলিয়ে দিয়ে আসি।

রিহার্স্যালে বিনুদা হেমন্ত মুখার্জিকে গান তোলাচ্ছেন, এটা সেটা কথাবার্তাও চলছে মাঝখানে উনি বললেন শোনো বিনু অমুক দিন আমার ছেলের পৈতে।

চলে আসবে কিন্তু, বলা রইল কিন্তু। গান আমি তুলছি, আমি এর ফাঁকে ঠিক গেয়ে দেব, ভেবো না। তারপর হঠাৎ আমায় দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আরে, এ ছেলেটি ? এ ছেলেটি কে ? আমি বলে ফেললুম আপনি আমায় আগেও দেখেছেন। বিনুদাও বলে দিলেন এর নাম বিমান, বিমান মুখোপাধ্যায়।

হ্যাঁ গো, অনেক দিন আগে বোধহয়—তা তুমি কি গানটান করো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি জবাব দিলুম।

তার পরেতে অনেক দিন কেটে গেছে। নানাক্ষেত্রে হেমন্তদার সঙ্গে কথা হয়েছে, দেখা হয়েছে। তবে হেমন্তদার সঙ্গে আমার শেষ দেখাটা বড় মধুর। সেইটা এখানে বলি। তখন হেমন্তদার শরীরটা খারাপ চলছে। তবু কাজ পাগল লোক, শরীরকে অগ্রাহ্য করে কাজ নিয়েই থাকতে ভালবাসতেন। হয়ত কখনো বলতেন, আমাকে আবার কেন, অন্য কাউকে দিয়েই গাওয়াও না। এমনি অনেক কথাই মনে পড়ে, বলা যায়। এবারের কথাটা না বলে পারছি না। তখন, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে এবং সঙ্গীত পরিচালনায় প্রণব রায়ের লেখা রামকৃষ্ণায়ণ গীতিনাট্য রেকর্ড হচ্ছে। বিমান ঘোষ মশাই খুব উৎসাহ নিয়ে এটা করাচ্ছেন। সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটার জন্যে প্রচলিত সুরের বদলে, নতুন একটা সুর তৈরি করেছিলেন। সেটা শুনে মানব তো চেঁচামেচি করে, প্রায় মারামারি করে আর কি! এমন কি হারমোনিয়ামটা শুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দেবার উপক্রম করছে। গলা ফাটিয়ে বলছে, স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া সুর, চেঞ্জ করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে মশাই ? এই গান আমি, আমার কাকাদের, আমার মাদের কাছে শিখেছি। এক তালে, সেই মন চল নিজ নিকেতনের মডার্ন সুর করেছেন—চালাকি নাকি ? মানব যাকে বলে একেবারে হৈ চৈ, তুলকালাম লাগিয়ে দিলে। তখন আমি হেমন্তদার একটা মূর্তি দেখেছিলাম—সেই মূর্তিটা শিব এবং সুন্দরের মূর্তি। উনি দাঁড়িয়ে উঠে, প্রশান্ত কণ্ঠে সকলকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন—'মানব, রবিদা আমরা এখানে গান করতে এসেছি, ঝগড়া বিবাদ করতে নয়। আর এখানে মানব যেটা বলছে সেটা মেনে নেওয়াই ভাল'। ট্রাডিশনাল গান, স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া, যে গানটার অরিজিন্যাল সুর আমরা পাচ্ছি—সেটার জন্যে নতুন করে সুর করার দরকার কি, কেনই বা করব ? মানব যখন বলছে ওর কাছে সেই পুরোন দিনের অরিজিন্যাল সুরটা আছে তখন ও গানটা মানবই গাক না। রবিদা, আপনার সুরে আমরা তো অন্য অনেকগুলো গানই গাইছি'। হেমন্তদার এমন যুক্তিপূর্ণ বুঝিয়ে বলা কথার পর পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হল। আর শেষপর্যন্ত হেমন্তদার কথামত, মানবই সেই আদি সুরে গানটা গাইলও।

তবে রবীন চট্টোপাধ্যায়, বোধহয় মানব মুখুজ্জের এ দিনের ব্যবহারটা ভাল মনে নিতে পারেননি কিংবা ভুলতে পারেননি। কারণ তার পরে, উনি অনেক ছবিতেই সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কিন্তু মানবকে আর কখনো প্লে-ব্যাক করতে ডাকেন নি। নিশ্চয়ই, ইগোতে খুব লেগেছিল।

আমার মনটা সেদিন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমন দুর্ভাগ্য যে, সেদিন আবার আমি ইন্দ্রানী সেনকে গান শেখাচ্ছি ওখানে সতীশ মুখার্জি রোডে এইচ এম ভির রিহার্স্যাল রুমে। তোলাচ্ছি নজরুল গীতি। ইন্দ্রানী তখন নতুন এ লাইনে। হেমন্তদা ইন্দ্রানীকে স্নেহ করতেন কারণ ওর মা (সুমিত্রা সেন) হেমন্তদার সঙ্গে একসঙ্গে অনেক গানটান করতেন। হেমন্তদা অবশ্য অনেক সিনিয়র ছিলেন। মনে পড়ছে হেমন্তদার কি আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ কথাবার্তা—কি গো, কি গান ওকে শেখাচ্ছ। কিরে, তুই গাইছিস, বাঃ, বাঃ খুব ভালো। গা, খুব ভাল করে গা আর বিমান যখন রয়েছে তখন নিশ্চয়ই নজরুল গীতি হবে। তা, হ্যাঁগো বিমান সহজ গোছের নজরুলগীতি কিছু আছে—এই, আমি গাইতে পারি এমন। কাজকর্মে যা ব্যস্ত, তাতে সময় নেই, গাইতে পারি না। তাই খুব সহজ দেখে, চারটে গান আমার জন্যে তৈরি করো না, গেয়ে দিই।

হেমন্তদার কথা। আমি খুব সহজ চারটে গান হেমন্তদার মতো করে, তৈরি করে ফেললুম, কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য যে হেমন্তদা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

এখানে আমার একটু জানার আছে। নজরুলের গান শক্তই বা কি আর সহজই বা কি ? বিশেষ করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মত শিল্পী যখন গাইতে চাইছেন ? ব্যাপারটা তাই একটু বুঝতে চাইছি।

বিমান—দেখ, নজরুলের বহু গানই খুবই বৈচিত্র্যময়। যেমন ধরো, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী যে গানগুলো গেয়েছেন সেগুলো রাগপ্রধান, যথার্থ খেয়াল অঙ্গের। আবার ধরো, শচীনদেব বর্মনের 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া'।

হেমন্তদার গায়নের বা গানগুলোর যে চরিত্র, সে গানগুলোর সঙ্গে এ গান ঠিক মিলবে না। নজরুলের আবার অন্যধরনের কিছু গান আছে, যেমন 'একাদশীর চাঁদ ওই রাঙা মেঘের পাশে', 'কি আসে রজনী সন্ধ্যামনি প্রদীপ জ্বালো' এই ধরনের গানগুলো হেমন্তদার খুব পছন্দ ছিল।

হেমন্তদা কখনোও নিজেকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করতেন না। নিজের পছন্দ, সাধ এবং সাধ্যের মধ্যেই থাকতে ভালবাসতেন।

এই হেমন্তদার সঙ্গে আমার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু অল্পসময়ে তাঁকে যেটুকু দেখেছি, তাঁর যা গুণের পরিচয় পেয়েছি তা ভোলবার নয়। আর, কি তাঁর অন্তরঙ্গ কথাবার্তা—শোনো গো, আমি জীবনে কোনদিন সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা-সাধিনি।

অথচ ওই লোকটাই যে কি করে মনিহার ছবির গানের মত ক্ল্যাসিক্যাল সুর, রাগপ্রধান সুর কি করে করেন, তাতে অবাক হতে হয়। উনি নিজেই আর একদিন বলছেন—আমীর খাঁ সায়েব, মাঝে মাঝে বম্বেতে, আমার বাড়িতে চলে এসে আমার গান শুনতে চাইতেন।

তাই আমার বিশ্বাস, হেমন্তদা সত্যি কথা বলেননি—নিশ্চয় ভাল ভাবেই, সব শিখেছিলেন। আরও যেটা বড় কথা। সেটা হল নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা


প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়েই জন্মেছিলেন—তা নাহলে এত এত চিরকালীন শ্রেষ্ঠ সুর তিনি তৈরি করলেন কি করে ? আর একটা কথা, কি তাঁর বিনয় নম্র ব্যবহার—সবসময় নিজের সম্বন্ধে কি অহংশূন্য স্বীকারোক্তি—না না, আমি এটা পারি না, আমি এটা জানি না, নিজের সম্বন্ধে এ ধরনের অকপট স্বীকারোক্তিতে মানুষ হিসেবে তাঁর জন্যে একটা আলাদা মর্য্যাদা গড়ে উঠে ছিল।

এবার সেই শেষ সাক্ষাৎকারের কথায় আসি। এর কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে হেমন্তদার আর একবার দেখা হয়েছিল ১৬ নং অক্রূর দত্ত লেনের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে, ভি. বালসারার অফিসে যেখানে, একটা খুব বড়োসড়ো পিয়ানো ছিল। আমি তখন ইনরেকো কোম্পানীতে খুব কাজটাজ করি। ওখানে আমি যেতেই, বালসারার অফিসের কাজকর্ম যিনি দেখাশুনো করতেন, তিনি বললেন—একটু দাঁড়ান, আমি দাদাকে (বালসারাকে) খবর দিচ্ছি, এখন ঘরে হেমন্তবাবু রয়েছেন।

বালসারা খুবই ভদ্রলোক—ওঁরই দেওয়া টাইমে আমি গেছি। উনি তাই তাড়াতাড়ি, নিজে উঠে এসে, পর্দাটা তুলে বললেন —বিমানদা, চলে আসুন। এই দেখুন, ঘরে কে আছেন। আমি ঘরে ঢুকে বসলুম। তারপর দু একটা মামুলী কথার পর বালসারা বললেন, যে জন্যে আসতে বলেছি সে কথাটা বলি। আপনি হেমন্তদার জন্যে বেশ কয়েকটা রাগপ্রধান, ক্ল্যাসিক্যাল গান বের করুন তো। হেমন্তদা গাইবেন। হেমন্তদা তখন মুখ তুলে নিঃশব্দে হাসছেন আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। এবার আমায়, সেই পরিচিত ভঙ্গিতে বললেন—কী গো, তুমি এখানেও কাজ করছ—বেশ, বেশ ভাল করে করো, ভালো করে করো।

এর কিছুকাল আগের ঘটনাটা, এই প্রসঙ্গে এখানে বলে দেওয়া দরকার। সেদিন এইচ এম ভির রেকর্ডিং রুমে আমি, বিমান ঘোষ, মানব, রাধাকান্ত নন্দী, নির্মল বিশ্বাস সকলে একটা রেকর্ডিং-এর কাজে জড়ো হয়েছিলুম। রেকর্ডিং-এর কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াতে আমরা সবাই মিলে সতীশ মুখার্জি রোডের রিহার্স্যাল রুমে চলে এলুম। ওখানে তখন হেমন্তদাও এসে হাজির হলেন।

হঠাৎ কি একটা কাজের কথা মানবের মনে পড়ে যাওয়ায় ও আমাকে বললে—চল্ আমার সঙ্গে, রেকর্ডিং হয়ে গেছে, আজ তো আর কাজ নেই। তুই এখন আর কি করবি ? আমার সঙ্গে চল।

আমি আমতা আমতা করে বললুম—এখন আমি টিউশনিতে যাব; ছাত্রছাত্রীরা সব বসে থাকবে। হেমন্তদা চুপ করে সব শুনছেন, দেখছেন। আমাদের সঙ্গে একটাও কথা বলছেন না—যেন আমাদের উনি চেনেনই না।

মানব আবার হৈ চৈ করে বলে উঠল—ছাড় তোর টিউশনি। তুই চল্ আমাদের সঙ্গে একটু জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।

রাধাকান্ত যোগ করলে—হ্যাঁ, চল্ চল্ আজ কষে আড্ডা মারুম। আমরা যে হলঘরে বসেছিলুম তার পেছনের ঘর থেকে বিমান ঘোষ মানবকে ডেকে পাঠালেন। মানব বড়কর্তার ঘরে ঢুকে যেতেই হেমন্তদা মুখ খুললেন। একটা অদ্ভুত সম্বোধনে আমায় বললেন—'এই যে ভরদ্বাজ, শোনো তোমায় একটা কথা বলি। দেখ, লক্ষ্মীর পুজোটি ছেড়ো না। নুন ভাত, শাকভাত যা হোক ওরাই দেবে। গ্রামোফোন কোম্পানীও দেবে না আর কোন ফাংশানওলারাও দেবে না। তোমার বন্ধু আজকে তোমার গান গেয়ে, নাম করছে, তার গান হিট করছে তাই তোমায় নিয়ে যাবে। ঠিক আছে। কিন্তু কাল তোমার গান ফ্লপ করলে, আর ও তোমায় ডাকবে না। তাই বলছি, ও সব আড্ডা-ফাড্ডা বাদ দাও, ওদের এড়িয়ে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের টিউশানিটাই করো। এটা কখনো অবহেলা কোরো না'। দিস ওয়াজ হেমন্ত মুখার্জি। আজও আমি হেমন্তদার এ কথাটা মনে রেখেছি, যথাসম্ভব তা মেনেও চলি।

যাই হোক, বালসারার ঘরে, হেমন্তদার ওই রেকর্ড করার কথাবার্তার পরই বালসারা আমায় বললেন—তাহলে বিমানদা, আপনাকে আজ আর বেশিক্ষণ আটকাবো না। তখন আমি ব্যাপারটা বুঝে গেলুম—বালসারার সঙ্গে হেমন্তদার নিশ্চয় কোন বিশেষ কথাবার্তা আছে তাই এবার আমার ওখান থেকে সরে পড়া দরকার। আমি উঠতে যাচ্ছি সে সময় বালসারা আবার আমায় বললেন, আপনার বাড়িতে কাল সকালে দুজন আর্টিস্ট যাবে তাদের চারখানা করে গান তুলিয়ে দেবেন আর তারপর যতো তাড়াতাড়ি পারেন, রেকর্ডিং করিয়ে ফেলবেন। বালসারা তখন ইনরেকোর রেকর্ডিং ম্যানেজার, রেকর্ডিং-এর সব কিছু কন্ট্রোল করেন—যাকে বলে সর্বেসর্বা। বলে দিলেন, আর্টিস্টদের একজন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় আর একজন সনৎ সিংহ। প্রথমজন গাইবেন নজরুলের ক্ল্যাসিক্যাল জাতীয় গান আর অন্যজন গাইবেন হাসির গান।

পরদিন সকালে প্রসূন ব্যানার্জির যে টাইমে আসার কথা, তার অনেক দেরি করে তিনি এলেন। সময়টা ১৯৭৭ সাল, আমার দাদা তখন খুব অসুস্থ তবে তখনো বেঁচে ছিলেন। মনে পড়ে, প্রসূনবাবু আসতে, দাদা অসুস্থ শরীর নিয়ে নিচে নেমে এসেছিলেন। দাদা প্রসূনবাবুর ঠুংরি খুব ভালবাসতেন। আমি প্রসূনবাবুকে নজরুলের চারটে রাগপ্রধান গান ধরে ধরে তুলিয়েছিলাম। তখন তো আর টেপ-রেকর্ডারে তুলে গান শেখার ব্যবস্থা ছিল না। প্রসূনবাবুর মত আর্টিস্ট বললেন এত কঠিন গান, আমি কি গাইতে পারবো ? আমি বললুম এ গান তো যেন আপনার জন্যেই তৈরি, আপনি গাইবেন না তো, কে গাইবে ? চারখানা গান চারদিন ধরে তুলতে লেগেছিল। তারপর দাদার সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। তখন উনি বড়ে গোলাম আলি খাঁর কাছে গান শিখছেন, স্বভাবতই গোলাম আলি খাঁ সায়েবের কতো গল্পই না বলেছিলেন। দাদা অসুস্থ তবু দাদার অনুরোধে প্রসূনবাবু দাদাকে কয়েকটা ঠুংরিও শুনিয়ে ছিলেন। উনি মানুষটি এমন মিশুকে ছিলেন।

এদিকে সনৎ সিংহও এসে গেছে। সনৎকেও আলাদা করে হাসির গান তোলাতে হল। দুজনের দুটো রেকর্ডই খুব হিট করেছিল।

প্রসূনবাবু গেয়েছিলেন 'কেঁদে যায় দখিন হাওয়া', 'মধুর নূপুর রুমু ঝুম্ বাজে', 'বোলো না বোলো না ওলো সই' আর 'কেন মেঘের ছায়া চাঁদের চোখে'। আর সনৎ গেয়েছিল 'আমার খোকার মাসি', 'ওরে হুলো তুই রাতবিরেতে', ও 'তুই উল্টো বুঝলি রাম'। বহুদিন আগে জ্ঞান গোঁসাইও, প্রসূনের জন্য গানগুলো রেকর্ডে গেয়েছিলেন। এতদিন বাদে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানও লোকে সমান সমাদরে গ্রহণ করেছিল, আর সনৎ সিংহ গেয়েছিল—ওই সব গান। এগুলোও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

এখানে আমায় বলতেই হবে যে—বালসারা এই সময় আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। আমার দাদাও, সেই সময় বরাবর মারা গেল। সাংসারিক দুর্যোগে তখন রীতিমত অসহায় বোধ করি। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত, সাত-আটটা বছর ধরে বালসারা নানান কাজ দিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে যে কতোভাবে সাহায্য করেছিল, তার কথা আমি ভুলতে পারিনি।

যেমন ধরো, পূরবী দত্তর কথা। সেই সময় কোনো কারণে এইচ এম ভিতে ওর রেকর্ড করা বন্ধ হয়ে যায়—বাড়িতে বসে ছিল। আমি বালসারাকে বললুম পূরবী দত্ত বসে আছেন, তাকে দিয়ে লং প্লেয়িং রেকর্ড করাবো।

উনি কি করবেন ?

আমি বললুম—হ্যাঁ, করবে। তারপর তার লং প্লেয়িং রেকর্ড হয়ে গেল। এমনি আমার ছাত্রী খেয়া চ্যাটার্জি। ১৯৮০ সালে, আমার কথাতেই, তাকে দিয়েও উনি রেকর্ড করিয়ে নিলেন। এছাড়া বহু জায়গাতে উনি আমায় ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিয়েছেন, আমার কাজে উনি খুশি হয়েছেন। অনেক দিন বাদে সম্প্রতি জুলাই (২০০১) মাসের ২৬ তারিখে, বাংলা আকাদেমির একটা অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল। তারপরও এই সেদিনও আবার দেখা হল রবীন্দ্রসদনে। হেসে হেসে মজা করে বললেন—'মেরা পেয়ার মুঝে লোটা দো'। বড় ভাল লেগেছিল। কদিন আগে শুনলুম একটু অসুস্থ—আমার আর দেখতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তার পরে পরেই, সেদিন গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনে দেখলুম ঐ অসুস্থ শরীর নিয়েও কি দারুণ পিয়ানো বাজালেন।

বিস্ময় লাগে, নিজের চোখে এই একটা লোককে দেখেছি--বেহালা, পিয়ানো, ইউনিভক্স সিন্থেসাইজার, সেতার, তবলা, বাঁশি, অর্গান মেলোডিকা—সব বাজাচ্ছেন। এই মেলোডিকা হিমাংশু বিশ্বাসও বাজাতো।

আমার এক বন্ধু ছিল সুব্রত নন্দী। আমরা শ্যামবাজারের একই ইস্কুলে পড়তুম। ওর এক বোন বীথি নন্দী এখন দাস, রেডিওতে গান টান গাইত, বিনুদার ছাত্রী ছিল। একদিন ওদের বাড়িতে গেছিউ সুব্রত বললে এখন ঘরে ঢুকিস নি—বীথি গান শিখছে। সুরকার নির্মল ভট্টাচার্যের কাছে তো ও গান শেখে, উনি এখন রয়েছেন।

আমি বললুম--চল গিয়ে আলাপ করি। সেদিন সুব্রত বিখ্যাত নির্মল ভট্টাচার্যের

সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ করিয়ে দিল। উনি খুব খুশি—আমিও কাছাকাছি পাড়ায় থাকি। আমায় দেখিয়ে সুব্রতকে বললেন ওকে একদিন আমাদের চায়ের দোকানের আড্ডায় নিয়ে আয়। দেশবন্ধু পার্কের পাশের একটা বাড়িতে উনি থাকতেন। আর তার সামনেই একটা চায়ের দোকান ছিল—নদীয়া কেবিন। এখন আছে কিনা জানি না। ওখানে নেতা মিহির লাল গঙ্গোপাধ্যায়, এম পি প্রোডাকসনের খগেন চাটুজ্জের ছোট ভাই, এমনি অনেকে ওখানে আড্ডা মারতেন। তাছাড়া রবিবার তো ওখানে রীতিমত তাসের আসর জমে যেতো। ওখানে একটা বেঞ্চি পাতা থাকতো। সবাই বসলে, ফুটপাতটাকে মনে হোত যেন বাড়ির বৈঠকখানা। আমি যেদিন প্রথম ওখানে গেলুম সেদিন উনি কাউকে বললেন—অ্যাই, একটা বড় কেকের মাথা নিয়ে আয়। আমাকে এতবড় একটা কেকের খণ্ড দিয়ে বললেন নে, কেকের মাথাটা খা। এই থেকে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। সে সম্পর্কে কিছু কিছু কথা আগেই বলেছি।

ওঁর কাছে গান পেয়েছি, অনেক স্নেহ পেয়েছি, আমরা যখন প্রথম নজরুল জয়ন্তী করি, তখন নজরুল জয়ন্তীর রেওয়াজ চালু হয়নি, কেউ করত না। কাকতালীয় হলেও একটা ঘটনা খুব মনে দাগ কেটেছিল। বিনুদা যেদিন মারা যান সেদিন উত্তমকুমারও মারা গিয়েছিলেন। নিজের কথা বলতে হলে, বিনুদা বলতেন আমি ছাপাখানায় চাকরি করি, গান বাজনা আর কি করব! আসলে উনি তখন যুগান্তর কাগজে চাকরি করতেন যার অফিস ছিল বাগবাজারে। আর তারপর তো যুগান্তর উঠে গেল, বিনুদাও চলে গেলেন। তাঁর কথা, তাঁর অনেক দান আজ আর কেউ মনে রাখে নি। এই যদি হয় ওঁদের পরিণতি তাহলে শিল্পীর ভবিষ্যৎ বলতে যে, সত্যি সত্যি কি বোঝায়, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না।





দশম পরিচ্ছেদ

বিমান—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যরও এই এক প্রচণ্ড অভিমান ছিল। তাঁর কথা এখানে তাই একটু বলতে ইচ্ছে করছে। একসময় ওনার রেকর্ড বাজারে বেরুনোমাত্র হুহু করে বিক্রী হয়ে যেত, রেডিও রেকর্ড, সিনেমার প্লে-ব্যাকে তাঁর কি নামডাক, চাহিদা। উনিও হাতে ধরে ধরে, নতুন শিল্পীদের অনেককে রেকর্ডের জগতে নিয়ে এসেছিলেন। অথচ এ লাইনের এমন ব্যাপার যে, একসময় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের গান রেকর্ড করাও, এইচ এম ভি বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই তাঁর মতন প্রথম সারির অগ্রগণ্য শিল্পীকে খুব ছোট, অনামী সব কোম্পানীতে রেকর্ড করতে হয়েছিল। এক সময় যাঁরা, এইচ এম ভির বলতে গেলে প্রাণপুরুষ ছিলেন যেমন ধনঞ্জয়, বেচু দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, জগন্ময় মিত্র, ভাবতে পারো যে এক এক করে একদিন এঁদের সবায়েরই রেকর্ড করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ? এই দেখে দেখে, আমি একটা জিনিস বুঝেছিলুম যে এই কোম্পানী মালিকরা শুধু ব্যবসা করতেই জানে কিন্তু শিল্পীর মর্যাদা দিতে জানে না। আজকে আমার নাম আছে—ওরা ডাকাডাকি করছে। কালকে আমার কথা, ওরা কেউ আর মনেও রাখবে না। আমার বাবার মুখে শুনেছি কে মল্লিক সায়েবেরও নাকি এ অবস্থা হয়েছিল। শিল্পী জীবনের এ এক এমন অভিশাপ, যার মনে হয় শেষ নেই। এর থেকে দুঃখ বা লজ্জার আর কিছু আছে কি!

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য। সত্যিকারের গুণী জনপ্রিয় শিল্পী, কিন্তু ভাগ্যের চক্রান্তে বরাবর তাঁকে মার খেতে হয়েছে। তাঁর গানের কদর দেখে গ্রামোফোন কোম্পানী, ওদের অল্প কয়েকজন এক্সক্লুসিভ বা নিজস্ব হাত-পা বাঁধা শিল্পীর সঙ্গে গৌরীকেদারকেও এক্সক্লুসিভ ছাপমারা আর্টিস্টের দলে; বেঁধে রেখেছিল। এর আসল গূঢ় অর্থ যে কী তা গৌরীদা ধীরে ধীরে বুঝেছিলেন। নামে 'নিজস্ব শিল্পী' হবার দরুণ তাঁকে মাসে মাসে রিটেইনিং ফি হিসেবে, যৎসামান্য কিছু দিয়েই কাজ করানো যেত। রেকর্ড বিক্রীর টাকার ওপর প্রাপ্য রয়ালটি দেবার প্রশ্ন উঠত না। তার ওপর প্রতিদিন নিয়ম


ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

করে, চার-পাঁচ ঘণ্টা হাজিরা দেবার বাধ্যবাধকতা ছিল। তাছাড়া কোম্পানী ওঁকে দিয়ে, যখন তখন যা খুশি, ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নিতে পারতো। সেইজন্যে ওঁকে দিয়ে অন্য নামে, হিন্দি গানেরও রেকর্ড করানো হোত। যেমন গোলাম কাদের নাম দিয়ে অনেক হিন্দি বা উর্দু গানের রেকর্ড, তাকে দিয়ে করানো হয়েছিল—বাজারে হিন্দি বা উর্দু গানের চাহিদা বুঝে। এতে ওর নামও হোত না আর পেটও ভরত না। অনেক পরে অবশ্য ওঁকে রয়ালটি দেওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু শিল্পী জীবনের বেশির ভাগই তো তাঁকে বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকতে হয়েছে। অথচ যাকে বলে নাকে দড়ি দিয়ে খাটানো প্রায় সেই অবস্থায় তাঁর দিন কেটেছে। তেনজিং, হিলারীর সঙ্গে এভারেস্টের চূড়োয় উঠল (১৯৫৩) সঙ্গে সঙ্গে ডাকো গৌরীকে। নিজস্ব আর্টিস্ট গৌরীকে দিয়ে গান রেকর্ড করিয়ে বাজারে বের করা হল। নেতাজীর নেতৃত্বে আই এন এর সংগ্রামের খবরে বা দিল্লিতে আই এন এ বীরদের বিচারে, দেশজুড়ে যে হৈ চৈ আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল তা থেকে, বাণিজ্যিক লাভ উসুল করতে গৌরীকে ধরে আনো। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের জয়গান রেকর্ড করিয়ে গরম গরম বাজারে ছাড়ো। বাজারে দারুণ হিট-করা ফিল্মের গান, লোকের মুখে-মুখে ফিরছে। তাহলে সেই সুরে বাংলা গান হ'লে, লোকে তা আরো আঁকড়ে ধরবে। অতএব তখনকার দুর্দান্ত জনপ্রিয় হিন্দি ছবি রতন-এর গানের বাংলা অনুবাদে গান বাজারে ছাড়ো। হাতের কাছেই তো রয়েছে গৌরী কেদার— ওকে দিয়েই গাওয়াও। গৌরীদা বোধহয় তাই কলকাতার প্রথম গায়ক যিনি প্রথম হিন্দি ফিল্মের গান বাংলাতে গেয়ে রেকর্ড করেছিলেন। এর আগে যে এরকম চেষ্টা একেবারে হয়নি, তা নয়। তবে সেটা প্রকারান্তরে একটু অন্য ধরনের হয়েছিল—রতনের গানের হুবহু কার্বন কপির মত নয়। অনেক দিন আগের, তিরিশের দশকের বম্বে টকীজের অচ্ছুৎকন্যা ছবির বিখ্যাত গান অশোককুমার-দেবিকারানীর গাওয়া ম্যয় বন্‌কী চিড়িয়া, বনকী বন্ বন্ এর অনুসরণে বাংলা গান হয়েছিল অনিল ভট্টাচার্যের লেখা ও সুরে। সে গান রেকর্ডে গেয়েছিলেন শীলা সরকার। যেমন ভাবা গিয়েছিল এ গান সেরকম পপুলারও হয়েছিল—আমার কৃষ্ণ, কানাই এলো রুনুঝুনু রুনুঝুনু বোলে রে। অবশ্য বলতেই হবে যে, এ গানের চরিত্র মূল গানের থেকে অনেকটাই অন্যরকম হয়েছিল।

তবে গৌরীদা, 'রতন' ছবির যে গানটার ভার্সান গান করেছিলেন সেটা বাজারে কাটতির দিকে নজর রেখে নিছকই অনুকরণ—'যব তুহি চলে পরদেশ' এই গানটার বাংলা হয়েছিল 'যদি তুমিও দূরে চলে যাও'—প্রথম ঝোঁকেই আশানুরূপ বিক্রী হয়ে গেল। গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের মত শিল্পী তাঁর যে কোন রেকর্ড তখন অনায়াসে কমপক্ষে বিশ-পঁচিশ হাজার কপি বিক্রী হয়ে যেত। গৌরীদার গানের


শ্রীপঞ্চানন

এমনই চাহিদা ছিল। কিন্তু একসময়ে সেই গৌরীদার গান ওই কোম্পানী আর রেকর্ড করতে চাইল না। রেকর্ড করা বন্ধ করে দিল—ক্রীতদাসের মত সারা জীবনের নীরব সেবার বদলে প্রতিদানে এই অপমান। ভাবা যায়। গৌরীদা নিজে আমায় বলেছেন যে ১৯৫০ সালে উনি অনেক লড়ালড়ি করে রয়ালটি আদায় করতে কিছুটা সফল হয়েছিলেন। তার আগে মাসিক সামান্য কিছু ফি-র বদলে, তাঁকে দিয়ে শ'য়ে শ'য়ে রেকর্ড করিয়ে নেওয়া হয়েছে। এইরকম অবহেলা আর বঞ্চনা তাঁকে মুখ বুজে সয়ে যেতে হয়েছে, বছরের পর বছর, তাঁর জীবনের সেরা সময়ে—একি কম দুর্ভাগ্য।

এখানে প্রাসঙ্গিক বোধে আমার অর্ধশতাব্দীর বন্ধু একান্ত-আপন আর একজনের কথা খুব মনে পড়ছে। তাঁর অবশ্য এই গানবাজনার লাইনের থেকে ফিল্মের লাইনে অনেক বেশি প্রভাব প্রতিপত্তি। আর তার জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হয়েছে। পত্রপত্রিকা, কাগজে সবাই তাকে, শ্রীপঞ্চানন নামেই জানে। সে আমাকে দাদা বলে, আমার থেকে বয়েসে সামান্য একটু ছোট হবে। কিন্তু সিনেমার লাইনে, খুব অল্প বয়স থেকে সে প্রচার সচিব হিসেবে খুব নাম করেছিল। উল্টোরথ, রূপাঞ্জলি এইসব পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিল। উত্তর কলকাতার ছেলে বাগবাজারে থাকে। তার সব থেকে বড় কৃতিত্ব যে তার চেষ্টায় বাংলা ছবি 'রামমোহন'-এর প্রদর্শনকে প্রথম করমুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। ও রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঘনঘন গিয়ে মাননীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, অনেক অনুরোধ উপরোধে, সরকারকে শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়েছিল। অন্য একটা বিশেষগুণ, সদুদ্দেশ্যে কিছু করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাওয়াটা ওর একটা স্বভাব। এইরকম অনেক শিল্পীর জন্যে সে যে কতো সময়, কতো কি করেছে তা বললে সে রেগে যায়। কিন্তু আমার জন্যে সে যা করেছে তা আমি না বলে কি পারি ? আমার অনেক দুঃসময়ে, নানানভাবে, কতো জায়গায় যে সে আমার সহায়তা করেছে তা বলে শেষ করতে পারব না। চল্লিশ বছরেরও বেশি তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা, সে সম্পর্ক আজও অটুট। এমন মানুষ যে, আমি বাড়িতে ঘরের ভেতর গান শেখাচ্ছি, তখন ফিল্ম জগতের অত বড় একজন ডাকসাইটে লোক হয়ত আমার বাড়িতে এসেছে। কিন্তু সে উঠোনের ধারে বসে থাকবে, ঘরে ঢুকবে না। ভেতরে ডাকলে বলবে—গুরু একটা ভালো গান শুনিয়ে দিও, তা শুনে আমি বাড়ি চলে যাব। আমার কাজে পাছে ব্যাঘাত হয় তার জন্যে তার এত বিবেচনা! আসলে পুরনো শিল্পী আর পুরনো দিনের গানের ওপর ওর কি অমানুষিক টান! সে চেষ্টা করছে, বাংলা বেসিক বা ফিল্মের গান—সেই প্রথম যুগ থেকে এই ষাটের দশক পর্যন্ত যতো ভাল ভাল গান হয়েছে সেগুলো জড়ো করে, যাতে এখনকার শিল্পীদের দিয়ে নতুন করে গাইয়ে ভিডিওতে তুলে রাখা যায়। একাগ্র হয়ে চেষ্টা করছে, পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

সে একটা গানের লিস্টও তৈরি করে আমায় দিয়েছে। বাংলা গানের যে কতো বৈশিষ্ট্য কতো বিচিত্র ধারা—কতো রকমের গান ছিল সে সব পঞ্চা খুঁজে খুঁজে বের করেছে—ছাদ পেটার গান, বেদেদের গান, আগেকার দিনের বাসনওলা, ফেরিওলাদের গান এরকম নানান ধরনের গান সে উদ্ধার করেছে। সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে এমন মনসা পুজোর গান, জামাইষষ্ঠীর গান এসব হারিয়ে যাওয়া জিনিসের অন্তত একখানা করে নমুনা—উত্তর কালের জন্যে থাক্। এখনই তো আমরা এসব হারিয়ে ফেলেছি ভুলে যাচ্ছি। দুঃখের কথা যে বেশি দিন নয়, পঞ্চাশ-ষাটের দশকের, নামকরা নায়ক নায়িকাদের নামও এখন লোকে ভুলে গেছে। কোনো প্রযোজককে ধরে, বা স্পনসর জোগাড় করে, পঞ্চা এসব সংগ্রহ ভিডিওতে তুলে সিরিয়াল তৈরি করার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করছে। যদি বারবার ছোট বা বড় পর্দায় এগুলো দেখানো যায় তাহলে বিগত দিনের বিস্মৃত সম্পদকে আমরা ফিরে পাব—লোকের চেতনা বাড়বে। প্রস্তুতির কাজ চলছে—সে আমায় রোজই তাগাদা মারছে তুমি কিছু এগোচ্ছ না, খালি আমিই একা খেটে মরছি। কিছুকাল আগে একটা আঘাত পেয়ে সে অনেক দিন শয্যাশায়ী ছিল। ঈশ্বরের কৃপায় সে এখন সেরে উঠেছে, আবার কাজে লেগেছে। কাজও যে কতোরকম তার মাথায় খেলে তার ঠিক নেই। এই ধরো না, বছর দুয়েক আগে (২০০০) সরস্বতী পুজো আর নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষ করে, বেলেঘাটার একটা অনুষ্ঠানে এমন একটা দারুণ কাণ্ড করেছিল যেটা আমার জীবনে বা অভিনেত্রী ভারতী দেবীর জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রয়েছে। ভারতী দেবী এককালে গান গাইতেন এবং 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে অসিতবরণের সঙ্গে তিনি একটা ডুয়েট গানও গেয়েছিলেন—'রাজার মেয়ে কাহার লাগি গাঁথছ মনিহার।' অসিতবরণ আজ আর নেই। পঞ্চা জোর করে স্টেজের ওপর, আমাকে দিয়ে ভারতীদির সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে সেই গানটা গাইয়ে নিয়েছিল। খুব মজা হয়েছিল তো বটেই—আমি খুব গর্বিতও হয়েছিলুম ভারতীদির সঙ্গে একসঙ্গে গানটা গেয়ে। ভারতীদি এখনো আমার সঙ্গে যোগাযোগটা রেখেছেন। ভারতীদি সেই চল্লিশের দশকে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। আর পঙ্কজদার ট্রেনিং-এ ও সঙ্গীত পরিচালনায় 'ডাক্তার' ছবিতে 'আমি বনবুলবুল গাহি গান'—এই গানটা গেয়ে রাতারাতি একেবারে স্টার হয়ে যান। ভারতী দেবী গাইতে পারলেও ছবিতে অবশ্য এ গানটা প্লে-ব্যাক গেয়েছিলেন পঙ্কজদার ছাত্রী ইলা ঘোষ। কিন্তু ভারতীদি এমনভাবে পর্দায় গেয়েছিলেন যে লোকে ধরে নিয়েছিল যে উনিই গানটা গেয়েছেন। দেখ, এত দিন ধরে, মানে ১৯৪০ সাল থেকে এই এখন (২০০২) পর্যন্ত ভারতীদির সব কিছু আগেকার মতই আছে। সেই একইরকম ছোট্টটি আছেন, সেইরকম দুরন্ত আছেন, তেমনি স্মার্ট শুধু চুলটা যা সাদা হয়ে গেছে। আর কিছু পরিবর্তন হয়নি। পঞ্চাননের সূত্রে ভারতীদির কথা এসে পড়ল বলে তাঁর কথা একটু বললুম। এমনি হঠাৎ হঠাৎ আরো কতো কথাই তো মনে এসে পড়ে।

আচ্ছা, ওই সময় বরাবর গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য বেশ জনপ্রিয় ছিলেন বলেই তো

মনে আছে। একটি গান, 'এনেছি আমার শতজনমের প্রেম' তো প্রায়ই রেডিওর অনুরোধের আসরে বাজানো হোত। আর একটা ছিল, 'মোর ফেলে আসা পথে' সেটাও শোনানোর জন্যে খুব অনুরোধ আসতো। পরে অনেকদিন ধরে, যখন তাঁর গান আর শোনা যাচ্ছিল না, তখন শোনা গেল যে হঠাৎ নাকি তিনি সব ছেড়ে ছুড়ে সাধু হয়ে চলে গিয়েছেন। ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলো তো—

বিমান—হ্যাঁ, উনি সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। তবে উনি সাধু বা সন্ন্যাসী হবার পরেও আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তখন উনি থাকতেন তারাপীঠে—কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হোত। সন্ন্যাসী হবার পরে তিনি একটা নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর বড় ছেলে, আকাশ অসময়ে মারা গেল। উনি আমাদের কিছু বুঝতে দেননি তারপর থেকে গৌরীদা ভক্তিমূলক গান ছাড়া আর কোন গান গাইতেন না। স্বেচ্ছায় রেডিওতে গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। রেকর্ড করা আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ লোকের সঙ্গে যোগাযোগও আর ছিল না।

তাঁর সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে চাই। শুধু গান নয়—উনি কিন্তু বেশ কয়েকটা ছবির সুর রচনা করেছিলেন। তাছাড়া গোপেন মল্লিকের সহকারী হয়েও কয়েকটা ছবির সুর করেছিলেন। নিজে যে সব ছবিতে সুর করেছিলেন—তার মধ্যে একটা ছবির গানের কথা আমার খুব মনে আছে। একবার সন্ধ্যা মুখার্জিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—আপনার সেই গান মনে আছে ? তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ, আমার বেশ মনে আছে। 'পরশ পাথর' বলে, ১৯৪৯ সালে একটা ছবি হয়েছিল (সত্যজিৎ রায়ের ছবিটা নয়)। তাতে শৈলেন রায়ের লেখা গানে গৌরীদা সুর দিয়েছিলেন —'অঞ্জনা নদীর তীরে বাঁধিব শুধু একটি ছোট বাসা'। ইস্টার্ন টকীজ স্টুডিওর আরো দু'একটা ছবিতে তিনি সুরকারের কাজ করেছিলেন। তাছাড়া প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসেবেও অনেক ছবিতে গান করেছিলেন। তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য অশোককুমার ও কানন দেবীর 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে, কমল দাশগুপ্তর সুরে ওঁর একটি অনবদ্য গান—'তুমি কি জানোরে বন্ধু, কান্দালে আমায়-আমার মনের কোণে বাউরি বাতাস কান্দিয়া লুকায়।' আকাশের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই গৌরীদা (১৯১৬-১৯৮৩) এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান। ওঁর পরিবারের সঙ্গে আজও আমার সম্পর্ক বজায় আছে। গৌরীদার পুত্রবধূ মঞ্জুলী আর ওঁর নাতনী সুমনা এখনও আমার কাছে মাঝে মাঝে আসে, গান-টান শেখে—বৌদির সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। এইরকম আর একজন বিস্মৃত শিল্পী বেচু দত্ত (১৯১৮-১৯৯১)। এঁর পরিবারের সঙ্গেও আমি যোগাযোগ রাখি। কিন্তু এসব আর কতোদিন। তবে বেশি যোগাযোগ রয়েছে জগন্ময়দার সঙ্গে। জগন্ময় মিত্র এমন একটা নাম যাঁকে সহজে ভোলা যাবে না। বলতে গেলে, গাইয়েদের মহলে উনি সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ। উনি বম্বেতে অনেকদিন ছিলেন। বছর চার-পাঁচ হল, উনি বোম্বাই ছেড়ে আহমেদাবাদে আছেন, স্ত্রী বিয়োগের পর উনি কেমন একা একা, সব কিছুতে নির্লিপ্ত হয়ে গেছেন। ছেলেমেয়েদের বিয়ে থা দিয়েছেন, তারাও বেশির ভাগ বাইরে বিলেত-


জগন্ময় মিত্র

টিলেতে থাকে। তাই একাই থাকেন—মাঝে মধ্যে কলকাতায় এলে আমাকে ডাকেন। কখনও হোটেলে ওঠেন, কখনো বা কোন বন্ধুর বাড়ি। কলকাতায় কোন বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে উনি এখনো গান-টান গাইতে আসেন। একটা কথা বলি এখনও ওঁদের যে কি জনপ্রিয়তা তা, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এই গত বছর (২০০১) মে মাসে, লেকের নজরুল মঞ্চে একটা অনুষ্ঠানে জগন্ময়দা আর মান্না দে দু'জনে গান করেছিলেন। প্রথমে মান্নাবাবু গাইলেন আর তারপরে জগন্ময়দা। আমি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম যে এত কাল পরে এখনো তাঁদের গান কি সাবলীল, স্বচ্ছন্দ। আর সেই গান শুনে লোকের কি দারুণ উচ্ছ্বাস—তাঁদের জনপ্রিয়তা এখনো কিরকম অটুট। দেখলে বিস্মিত হতে হয়। মান্নাবাবু তো পঞ্চান্ন বছরের বেশিদিনের শিল্পী আর জগন্ময়দা আরো অনেক সিনিয়র। কিন্তু এখনকার দিনেও, জগন্ময়দার নামেও কি উচ্ছ্বাস। ১৯৪৬ সালের রেকর্ডে তাঁর চিঠি গানটি যেমন গেয়েছিলেন ২০০১ সালেও ঠিক একইরকম গাইলেন। আমি অবাক হয়ে সেদিন এ জিনিসটা প্রত্যক্ষ করেছি। অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন জগন্ময়দার বাড়িতে গেছি। তখন উনি থাকতেন বাগবাজারে। ওখানে গিয়ে দেখি আর এক মুখুজ্জে সেখানে বসে আছে। দ্বিজেন মুখার্জি। বলতে গেলে, আমরা প্রায় একই পাড়ার লোক—ওর শ্যামপুকুরে আর আমার এই শোভাবাজারে। সেদিন আমরা তিনজনে মিলে বসে, অনেকক্ষণ ধরে পুরোন দিনের গান, গল্প, পুরোন বন্ধু তাদের স্মৃতি—এইসব নিয়ে কতো গল্পই না হল। কি যে ভাল লাগছিল—গল্প যেন আর শেষ হতে চায় না। আমি ওখানে গেছি সাড়ে দশটা নাগাদ আর দ্বিজেন মুখুজ্জে যখন বললেন—'এবার আমি ভাই পালাই অনেক কাজ পড়ে আছে' তখন বেলা প্রায় একটা বাজে। আমি কিন্তু তারপরেও আরো ঘন্টাদেড়েক ধরে জগন্ময়দার সঙ্গে গল্প করেছি। জগন্ময়দার কিছু পুরনো গান আমি গাইলুম। জগন্ময়দা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন—আরে, তুমি তো আমায় বিপদে ফেল্লে। এসব গানের রেকর্ড আমার কাছেও তো নেই আর গানগুলো আমার খাতাতেও খুঁজে পাচ্ছি না।

আমার গর্ব যে আমার সঙ্গে ওঁর এইরকমই সম্পর্ক। জগন্ময়দার একটা কথা আমার খুব ভাল লাগে। উনি সব সময় বলেন—'দেখ বিমান, যখন আমি গান গাইতে এসেছি তখন আমার গুরুরা গান গাইছেন। আর আমার সেই গুরুরা যে কারা তা তো জানো—ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডীচেরির দিলীপকুমার রায়দের মত সব মহান সঙ্গীতগুরুরা। ওই রকম সব গুরুদের সঙ্গে একসঙ্গে গান গেয়েছি এ কি আমার কম গর্বের। তারপর ধরো, পঙ্কজদা রেকর্ডিং করছেন। আমায় বললেন জগৈন্ (আমায় উনি জগন্ বলে ডাকতেন) তুমি রেকর্ডিং-এর সময়

থাকো। আমার রেকর্ডিং তুমি কনডাক্ট করো—যদি কোনও দোষ ত্রুটি হয়, তুমি আমায় সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিও। আমি, আবার তা করব।

আমি বলতুম—কী পঙ্কজদা, আপনি কি যে সব বলছেন ? পঙ্কজদা তাতে বলতেন —'না, গো তোমার ওপর আমার বিরাট আস্থা'। এ জীবনে এইসব পেয়েছি—এত কিছু পেয়েছি।

জগন্ময়দা আবার একটা অদ্ভুত গল্প বলেছিলেন—'জানো বিমান, 'চিঠি' রেকর্ডটা বেরোবার পর ছ'মাসের ভেতর রেকর্ডটা আশি হাজার কপি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। সেটা চল্লিশের দশকের শেষাশেষি। আমার খুব আনন্দ হয়েছে। আমার তাই খুব ইচ্ছে করছে কথাটা সুরকার সুবল দাশগুপ্তকে জানাই। তাকে এই সাফল্যের কথাটা বলি। কিন্তু মজা এই যতোবার বলতে যাই সুবলদা এড়িয়ে যান। আমায় কথাটা বলবার সুযোগই দেন না। প্রথম দিন বলতেই পারলুম না। দ্বিতীয় দিনও উনি শুনতে চান না, খালি খালি অন্য কথা বলে আমাকে বলতে দেন না। মহা মুস্কিল।'

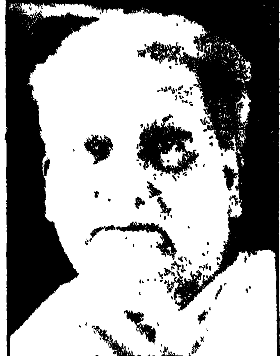
আমায় উসখুস করতে দেখে, উনি আমায় বললেন—কী-ই, কী বলতে চাইছ, কাল থেকে ? আমি অত্যন্ত বিনীত স্বরে বললুম সুবলদা, চিঠি রেকর্ডটা শুনলুম আশি হাজার বিক্রী হয়েছে।

সুবলদা আমায় থামিয়ে বললেন—এই কথা ? তুমি এই কথাটা আমায় গর্ব করে, আবার বলতে এসেছ ? আমি যেমনটা বলেছিলুম তুমি তো সেভাবে গাইতেই পারলে না, সেটা পারলে তো এক লাখ ডিঙিয়ে যেত। আশি হাজারে আমি খুশি নই—আমার তো আশা অনেক বেশি ছিল।

তখনকার দিনের ট্রেনার হিসেবে, সুবলদার এই কথাটা থেকে, সেকালের গানের মান কোন স্তরে যাচাই করা হোত—তার একটা ধারণা করা যায়। 'তা, হ্যাঁ গো বিমান—এখন সব শিল্পীরা কথায় কথায়, সোনার থালা-টালা পায় তা আমার চিঠি রেকর্ডটা তো প্রায় বাইশ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছিল কিন্তু আমায় তো কেউ একটা লোহার থালাও দেয় নি'। এইরকম রসিক লোক জগন্ময়দা, এমন আনন্দময় পুরুষ। জগন্ময়দা আর দ্বিজেন মুখার্জি দু'জনেরই স্ত্রী বিয়োগ হবার পর দু'জনেই মনের ব্যথায় যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। তবে এখন তাঁদের শিল্পীসত্তা ধীরে ধীরে আবার যেন স্বাভাবিকত্ব ফিরে পেয়েছে।

এইখানে আর একজনের কথা আমার বলা দরকার। আমার প্রতিবেশী, আমাদের বাড়ির সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ। আমার বাবার সঙ্গেও ছিল, আমার সঙ্গেও আছে। শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, উনি কিন্তু আমার নাড়ুকাকা—আমার বাড়ির পাশেই থাকেন। উনি আমার বাবাকে দাদা বলতেন সেই সূত্রে আমি ওঁকে কাকা বলি। নাড়ুকাকা কিন্তু ভারি গুণী মানুষ। এক কালে, এমন দিন গেছে যে আমার বাবার কাছে উনি সকালে এসেছেন, বিকেলে কিছু সময়ের জন্যে বাড়ি গিয়ে আবার রাত্রি ন'টায় ফিরে এসেছেন—রাত্তির একটা-দেড়টা পর্যন্ত কাটিয়েছেন—

সর্বক্ষণ ওই শুধু গান নিয়েই থেকেছেন। তখনকার এক একটা দিনের ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। যেমন, একদিন সন্ধেবেলা, আমাদের বাড়ির বড় বৈঠকখানা ঘরে পরেশ ধর জমিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছেন। বাঁশীতে ওঁর ভীষণ খ্যাতি কিন্তু সুরকার হিসেবেও কম যান না। হেমন্ত মুখার্জির গাওয়া 'শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি' বা 'ফুলের মত ফুটলো ভোর', এসব বিখ্যাত গানের সুর তো ওঁরই দেওয়া। ওখানে তখন আরও রয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেচু দত্ত আর দুর্গা সেন ওঁরাও বসে বসে বাঁশীর সুর শুনছেন, তাতেই মগ্ন। আর আমার বাবা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন, আর মাঝে মাঝে, তারিফ করছেন। সুরে সুরে ভরপুর আসরটা যেন জমে গেছে।


রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

তখনই ওই সব ডাকসাইটে শিল্পীরা বলছেন—এত জায়গায় আমরা গানবাজনা করি কিন্তু এইখানে, এই জায়গায় বসে গান করলে আর এই লোকটা (আমার বাবা) শুনলে যা আনন্দ হয়, মজা হয় সে রকম মজা আর কোথাও পাই না। এমন মধুর আমাদের সম্পর্ক ছিল। রামকুমারবাবুর বিয়ে হওয়া আমার মনে আছে আবার কাকীমার চলে যাওয়াটাও আমার মনে আছে। রামকুমার আগে খুব গজল গাইতেন। প্রথম যুগে তবলাও বাজাতেন। অনেকের সঙ্গে তবলা বাজিয়েছেন তাতেই ওঁর বেশি নাম হয়েছিল। কিন্তু গানও করতেন চিরকাল। তাই আমার জ্ঞানে যতোটা বুঝেছি, বেসিক্যালী উনি কিন্তু গায়কই ছিলেন।

যেমন কালোদা (অসিতবরণ), সুবল দাশগুপ্ত, তারাপদ চক্রবর্তী এঁরা সবাই গান করতেন কিন্তু বেসিক্যালি এঁরা আগে তবলিয়া। তারাপদ চক্রবর্তী রেডিওতে তবলা বাদকের চাকরি করেছেন। অসিতবরণও তাই। তবে উনি রেডিও, গ্রামোফোন কোম্পানী দু'জায়গাতেই তবলচীর কাজ করেছেন। শিল্পীরা এভাবেই এগোন। একটা থেকে আর একটায় নিজেদের খুঁজে নেন। অসিতবরণ আমায় একটা অপূর্ব কথা বলেছিলেন—আচ্ছা, আমি কবে থামবো, বলতে পারো ? আমার বোধহয় থামা আর হবে না। কথা বলতে বলতে, কালোদা বলছিলেন—'একটা গানে কমলদা সুর করছেন, আমি ঠেকা দিচ্ছি। যূথিকা রায়ের জন্যে গান, গানের মধ্যে অনেক তাল ফেরতা আছে—অর্ধেকটা আমি বাজাচ্ছি আর অর্ধেকটা বাজাচ্ছে সুবলদা।' মাঝখানে খানিকটা খোল ছিল। খোল আর বড় মুখের তবলাটা সুবল দাশগুপ্ত বাজাচ্ছে, আর আমি বাকিটা বাজাচ্ছি। তবলা বাজানো চলছে, তার সঙ্গে কমলদার অর্কেস্ট্রা আছে। গানের সুরটা আমার খুব ভাল লেগেছে। কমলদা একটু বাইরে গেছে আর আমি নিজের মনেই গানটা গাইছি। আমি কিন্তু তখন রেডিওতে গানও করি। কমলদা আমাকে তবলচী হিসেবেই জানতেন। আর দেখতেনও সেইভাবে। হঠাৎ ঘরে ঢুকে কমলদা আমায় বললেন—কেলো তুই এত ভাল গান

করছিস্! তোর গলাটা তো দারুণ লাগল—তা, তুই রেকর্ড করিস নি কেন ? আমি আর কি বলব—বললুম, আমি তো তবলা বাজাই।

কমলদা বললেন—আরে আমি বলছি, তুই রেকর্ড করিসনি কেন ? তখন আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম আপনি তো আমায় এ নিয়ে কখনো কিছু বলেন নি।

তখন রেকর্ড কোম্পানীতে কমলদাই সব। অফিসাররাও কমলদার নামে তটস্থ। কমল দাশগুপ্ত কিছু বললেই হল সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর। তখনই উনি প্রণব রায়কে ডেকে বললেন কেলো, প্রথম রেকর্ড করবে। তার জন্যে একটা গান লেখো তো। গান লেখা হল কমল দাশগুপ্ত সুর করলেন—আমার প্রথম গান, 'তোমারে শোনাব বলে আমি জেগে আছি সারা নিশি, তুমি এখনি যেও না চলে।' যোগিয়া আর ভৈরবী এই দুই সুর মিশিয়ে কমলদা সুরটা করলেন জীবনে প্রথম, সেই আমি রেকর্ড করলুম। কমলদার এই আশীর্বাদ, সহযোগিতা বা সহানুভূতির কথা আমি ভুলতে পারি না। এর প্রায় পনেরো বছর পরে এই গানটা সম্বন্ধে কমলদা বললেন —'কেলোর তো এটা প্রথম গান ছিল সেইজন্যে একটু জড়তা আছে।' এবার এই গানটা তিনি আবার গাওয়ালেন—শীলা সরকারকে দিয়ে। আর মজার কথা যে এবার তার সঙ্গে আমিই তবলা বাজালুম।

এই দেখ শীলা সরকারের কথা এসে পড়ল। ওঁর অনেক গান ছিল কিন্তু এখন আর কেউ ওঁর নামও জানে না।

এই প্রসঙ্গে আমার, শীলা সরকারের সমসাময়িক আর একজন সে সময়ের জনপ্রিয় শিল্পীর কথা মনে পড়ছে—পদ্মরানী চট্টোপাধ্যায়। তার কথাও কেউ এখন আর বলে না।

বিমান—ঠিক, পদ্মদি এখনও আছেন। কিন্তু শীলা সরকার আছেন কি না আমি জানি না। তবে শীলা সরকারের কথা বলতে গেলে খুব বিখ্যাত একটা গান প্রথমেই মনে পড়ে—'মাধবী রাতে মম মন বিতানে মল্লিকা মঞ্জরী মুঞ্জরে হায়, সে তোমারে চায়, সে তোমারে চায়।' আর একটা ছিল 'আলো ঝলমল পূর্ণিমারই জ্যোছনা রাতে।'

রবীন্দ্র সঙ্গীতেরও রেকর্ড ছিল। খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে', 'আর মম চিত্তে নিতি নৃত্যে'এ দুটো গান শীলা সরকারই প্রথম হিজমাস্টার্সে রেকর্ড করেছিলেন।

বিমান—শীলা সরকার, বলতে গেলে অনিল ভট্টাচার্যেরই ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু খেয়াল, ঠুংরি উনি রীতিমত তালিম নিয়ে শিখেছিলেন আচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী আর সুনীল বসুর কাছে। উনি পূর্ববঙ্গের এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে, ছোটখাটো চেহারা। ওঁকে দেখতে যেমন সুন্দর ছিল তেমনি গানের গলাও ছিল মিষ্টি। অনিল ভট্টাচার্য তাঁকে দিয়ে নানানরকমের পরীক্ষামূলক গান করিয়েছিলেন। যেমন ঝুলনের গান 'বাজে মোহনিয়া এল ঝুলনীয়া' বা 'বাদলের মাদল যে বাজল ঝুলনের উৎসবে সজনিরা সাজল।' এইরকম দোলের গানও করেছিলেন। শীলাদি এইরকম

অনেক সুপারহিট হিন্দি গীত রেকর্ড করেছিলেন। ওঁর বাবা কর্মসূত্রে, ওঁদের নিয়ে কলকাতার বাইরে-টাইরে থাকতেন। বাংলার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় থাকার সূত্রে শীলাদির হিন্দি উচ্চারণও যথেষ্ট ভাল ছিল। সুবল দাশগুপ্তের সুরে শীলাদির একটা হিন্দি গীত সে যুগে বাজার মাত করে দিয়েছিল--টুট গয়ি মনবীণা, টুট গয়ি। বেহালা বাদক পরিতোষ শীল এই গানের সঙ্গে গীটার বাজিয়েছিলেন।

পদ্মদিরও বহু বিখ্যাত জনপ্রিয় গান ছিল। তবে উনি বেশি দিন গান নিয়ে থাকেন নি। কম বয়সেই বিয়ে হয়েছিল তখনকার কালে যেমন হোত। পদ্মরানী চট্টোপাধ্যায় থেকে পদ্মরানী গাঙ্গুলি হয়ে যাবার পর সংসারে ঢুকে উনি গান ছেড়ে দিয়েছিলেন। গ্রে স্ট্রীটে, আমাদের কাছাকাছি পাড়াতেই তাঁর বাড়ি। নজরুলের জন্মদিন, এখন তাঁর ছেলেরা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই পালন করে।

রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের গান প্রকাশ করার একেবারে প্রথম দিকে, পদ্মরানীর গাওয়া 'এস নীপবনে ছায়া বীথি তলে' বা 'বাদল বাউল বাজায়রে একতারা' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এইরকম তাঁর গাওয়া শ্যামাসঙ্গীত 'ওমা তোর পূজা' বা 'দিন গেল মা'—এগুলোও লোকের খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু তাঁর নামের সামান্য রকমফের একজনের যাকে লোকে সব সময়, পদ্মরাণীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলত তাঁর একটা খুব ভাল গান ছিল যা এখন আর শোনা যায় না। এমনকি তুমি, বিমান মুখুজ্জেও সেটার উল্লেখ করলে না। সেই গানটা হল 'বাইরে বাদল কাঁদে'। কথায় এবং সুরে গানটা শুনলে, মনও যেন কাঁদে। শ্রীমতী পদ্মরেণু চট্টোপাধ্যায়ের সেই গানটা—কীই, মনে পড়ে ? শুনেছি গানটির রচনা ও সুর দুটোই এক ভদ্রলোকের—যার নাম হল শ্রী বিমান মুখোপাধ্যায়। চেনো নাকি ?

বিমান—(হাঃ হাঃ) দেখো ভাই সিতাংশু, এই পদ্মদি, যূথিকাদি, শীলাদি, ইলাদি বা সাবিত্রী ঘোষ এঁরাই ছিলেন প্রথম, যাঁরা গেরস্থ পোষা, মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির ঘরোয়া অবস্থা থেকে রেডিও, রেকর্ড, সিনেমা ইত্যাদি প্রফেশনাল লাইনে গান গাইতে এসেছিলেন। শিক্ষিত, অভিজাত বাড়ির মেয়েদের জন্যে এঁরাই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। যার ফলে বালা, মালাদের একচেটে যুগের অবসান হয়েছিল।

কিন্তু এই নতুন আলোর দিশাতে কিছু কিছু রঙীন পথও কখনো করুণ বিয়োগান্তক হয়ে উঠেছিল। তার একটা গল্প আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে। এই ফাঁকে সে গল্পটা আজ এখন না বলে পারছি না। তার পরে না হয় পদ্মদি, সাবিত্রী ঘোষদের মত যুগসন্ধির শিল্পীদের কথায় আবার ফিরে আসব। আগেই বলেছি বালা-মালা-দাসীদের যুগে ইতি টানবার সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা এই রেকর্ডের জগতে আসতে শুরু করল। সেই স্রোতের টানে একদিন কমল দাশগুপ্তর কাছে এলেন তাঁর এক পুরনো মাস্টারমশাই। বহুকাল আগে যশোরে উনি কমল দাশগুপ্তর শিক্ষক ছিলেন—

কমল দাশগুপ্তর নামডাক, প্রতিষ্ঠার কথা উনি শুনেছিলেন। সোজাসুজি উনি বললেন—আমার মেয়ে মীনা। তুমি যদি তার একটা রেকর্ড করিয়ে দাও তাহলে

ওর বিয়ে-টিয়ের একটু সুবিধা হয়। মাস্টার মশাই এর আবেদন কমলদা ফেলতে পারলেন না। উনি একদিন কিশোরী মীনার গান শুনলেন। শুনে বললেন ঠিক আছে, রেকর্ড করিয়ে দেব'খন। কাজী নজরুলের একখানা গানের খাতা মীনাকে দিয়ে বললেন—দ্যাখ্ তো, তোর কোন্ দুটো গান পছন্দ। মীনা যে দুটো গান দেখালো তার একটা ছিল 'আর কতদিন বাকি/তোমারে পাবার আগে বুঝি, হায় নিভে যায় মোর আঁখি'।

কমলদা নিজে এ গানের সুর করলেন—ধরে ধরে মাস্টারমশাই-এর কিশোরী কন্যাকে শেখালেন। কয়েকবার রিহার্স্যাল হল—রেকর্ডিংও হয়ে গেল। তখনকার দিনে গান রেকর্ডিং হবার পর, অন্তত মাস তিনেক লেগে যেত সেই রেকর্ড বাজারে রিলিজ হতে। এর মধ্যে একদিন মাস্টার মশাই এসে খবর দিলেন যে বসন্ত রোগে মীনা ভীষণ অসুস্থ শয্যাগত। একবার যদি কমল দাশগুপ্ত মীনাকে দেখতে যান—উদ্বিগ্ন বাবার একটু আকৃতি। কমল দাশগুপ্ত যেদিন তাকে দেখতে গেলেন, তখন মীনা প্রায় অচেতন। একবার একটু অস্ফুট স্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করল—আমার রেকর্ডটা... কমলদা আর শুনতে পারলেন না। বিষাদ ভারাক্রান্ত মনে, চলে এলেন। ক'দিন পরে, খবর পেলেন মীনা আর নেই। যুঁই ফুলের কুঁড়িটি ঝরে গেল। তার সৌরভ নিয়ে কিছুদিন বাদে সেই রেকর্ডটা বাজারে বের হ'ল। অনবরত বেজে যাচ্ছিল—'তোমারে পাবার আগে বুঝি হায়, নিভে যায় মোর আঁখি—আরো কতদিন বাকি'।

এর জবাব কমল দাশগুপ্তর কাছে তো ছিল না—জীবনে আর কোনও গান, বোধহয় কমল দাশগুপ্তর ওপর এমন করে আছড়ে পড়েনি।

এতো রীতিমত নাটক।

বিমান—হ্যাঁ, তাই তো। যা চাই নি তা-ই ঘটে গেল, যা ভাবিনি তাই হয়ে গেল। এই নিয়েই তো জীবনের নাটক আর তার এত মজা। আমি তো সাবিত্রী ঘোষের কথা বলছিলুম। শুধু উনি কেন, তাঁর সময়ের আরো দু'চারজনের কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে—তাহলে তাদের কথাও তো একটু আধটু বলতে হবে। এক মুহূর্তের এই মনে করা, তবু তো সেই বিস্মৃতদের, শুধু একটু গণ্ডূষ জলে, একটুখানি অন্ততঃ স্মৃতিতর্পণ করা যাবে।

তাহলে শিক্ষিত পরিবারের ঘরোয়া মেয়েদের সামনে বাংলা গানের সিংহদ্বারের দরজা সেদিন যে সাহসিকা গায়িকারা হাট করে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সাবিত্রী ঘোষের নামটা তুমি সব শেষে বলেছিলে। এবার তাই সাবিত্রী ঘোষের কথা একটু শোনা যাক। বিশেষ করে উনি যখন আমার পাড়ার বাসিন্দা—যদিও কেউ কাউকে আমরা চাক্ষুষ চিনি না।

বিমান—হ্যাঁ, সাবিত্রী ঘোষ এখন বয়সের ভারে আর বেশি বাইরে বেরোতে পারেন না। টেলিফোনে কখনো সখনো কথা হয়, কদাচিৎ কোথাও হয়ত দেখা হয়ে গেল। মনে পড়ছে যে প্রথম আমি সাবিত্রী ঘোষের নাম, খোঁজখবর পাই রেকর্ডের লিস্ট

থেকে—সেই ১৯৩৫ সালে। তার মানে উনি আরো আগে থেকে গাইছেন। তাঁর রেকর্ডে লেখা থাকত সাবিত্রী ঘোষ (চামেলী)

সে কি, চামেলী লেখা থাকত ? বলো কী ?

বিমান—অন্ততঃ একখানি রেকর্ডে তো আমি নিজে এমন নাম পেয়েছি—সাবিত্রী ঘোষ (চামেলী)। কাজী নজরুল ইসলামের কথা 'বিদেশী তরী এল কোথা হতে' এইচ এম ভির রেকর্ডে সুর করেছিলেন নরেন মুখোপাধ্যায়। কাউকে এসব কথা উল্লেখ করতে শুনিনি। তবে আমার মনে হয় সাবিত্রীদির যে গানের রেকর্ড সব থেকে বেশি হিট হবার রেকর্ড করেছিল সেটা হল 'কাঙালের অশ্রুতে যে রক্ত ঝরে ভগবান, ও ভগবান দেখেও তুমি দেখো না'। এরকম উনি অবশ্য অনেকেরই সুরে অনেক রেকর্ড করেছেন কিন্তু নানা ব্যক্তিগত কারণে বরাবর উনি সভাসমিতি এড়িয়ে গেছেন, কেমন যেন আড়ালে আড়ালেই থেকেছেন।

প্রথম জীবনে হিমাংশু দত্তর কাছে বহুদিন শিখেছেন—হিমাংশু দত্তর সুরে অনেক গান গেয়েছেন। হিমাংশু দত্তর প্রায় সব গানের কথায় চামেলীর উল্লেখ। লোকে বলত হিমাংশু দত্তর চামেলী বিনা গীত নেই। পরে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে পঞ্চাশের গোড়া পর্যন্ত শিখতেন অনুপম ঘটকের কাছে। দুর্গা সেনের সুরেও অনেক গান করেছেন। তার মধ্যে দুর্গা সেনের সুরে একটা গান ছিল—'বাদলের রাতি সাথী হারা কেটে যায় যায়' যা আমার এখনো খুব শুনতে ইচ্ছে করে কিন্তু এখন ওসব গান হারিয়ে গেছে। তবু আজো যে মাঝে মাঝে রেডিওতে ওঁর গাওয়া 'ওগো মৌসুমী সমীর', 'যাদের ওই অনেক আছে' বা 'কোথা বেনু সুর তোলে'—এসব গান শোনা যায় তার মানে সাবিত্রী ঘোষকে বাঙালি শ্রোতা আজও ভোলেনি। এই প্রবীণ বয়সে, সাবিত্রী ঘোষের সেটাই বোধহয় বড় প্রাপ্তি।

বিমান—ওই সময়ের আর একজন শিল্পীর কথা, সিতাংশু তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে—বীণা চৌধুরী। আমি তো বলি তিনি একজন সত্যিকারের কমপ্লিট আর্টিস্ট। সব রকম গানই তিনি গাইতেন এবং খুব ভালই গাইতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান যে কি অসাধারণ গাইতেন, তা বলে বোঝাতে পারব না। সে যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীতে কনক দাসের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিতেন বললে হয়। অসাধারণ সুন্দরী, বীণা চৌধুরীর বিয়ে হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার এক স্বচ্ছল পরিবারে। দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি শ্বশুর বাড়িতে তিনি থাকতেন। তাঁর স্বামীকেও আমি দেখেছি—তাকে আমরা দাদা বলতাম। শৈলেশ দত্তগুপ্তর কাছে তিনি অনেক তালিম নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া তিনি অন্যদের সুরেও অনেক গান করেছিলেন। তবে শৈলেশ দত্তগুপ্তর সুরেই উনি বেশি গেয়েছেন। তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ সালে একটা গান খুব সাড়া জাগিয়েছিল 'প্রথম জীবনে যে দিয়েছে মনে দোলা তারে যে গো যায় না ভোলা' মোহিনী চৌধুরীর লেখা শৈলেশ দত্তগুপ্তর সুর। হিমাংশু দত্তর সুরেও একটা গান বিখ্যাত হয়েছিল—'পথিক আমি ফিরি একাকী দুয়ার খোলে, আজি এ রাতে/ তোমার চোখে নামিল ঘুম আমি যে কাঁদি বেদনাতে।' অজয় ভট্টাচার্যের লেখা

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর মেশানো এক অদ্ভুত ছন্দের দোলা সে সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

আর রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথা উঠলেই কানে বাজে—ওঁর গাওয়া 'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে করব নিবেদন' একেবারে অনবদ্য। এই গানটা আমি রেকর্ডে প্রথম বীণা চৌধুরীর গলায় শুনেছিলাম। আমার বাবা, মা-ও এ গানটা বড় ভালবাসতেন। আসলে উনি বড় একটা বাইরের আসরে অনুষ্ঠানে যেতে ভালবাসতেন না। ওঁর শেষ রেকর্ড হয়েছিল ১৯৪৬ সালে তারপর আর উনি গান টান করেন নি। তার কারণ উনি সংসারে জড়িয়ে পড়ছিলেন—দিনে দিনে ছেলেমেয়েরাও বড় হচ্ছিল। তাছাড়া শরীরও ভাল যাচ্ছিল না। একটু একটু করে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত, বলতে গেলে, অকালেই মারা গেলেন। এইভাবে অল্প বয়সে যে ইলা ঘোষ, বীণা চৌধুরীরা চলে গেলেন তাতে বাংলা গানেরই ক্ষতি হয়েছিল। কেননা শিল্পীদের বিকাশের ক্ষেত্রে, সময় একটা বড় সহায়ক। আমি রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝাতে পারি।

দেখছ তো রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ছাড়া, বাংলা গানের কোন আসর এখন হয় না। এই রামকুমারবাবু যখন নাম করেছেন তখন ওনার চুল পেকে গেছে। অথচ চিরকালই উনি গান করে এসেছেন। উনি অবশ্য অনেক সময় বলেছেন বেসিক্যালি আমি তবলা বাজিয়ে। কিন্তু আমি বলছি (আমার এই কথা শুনে উনি কী বলবেন, তা অবশ্য আমি বলতে পারব না!) উনি গোড়া থেকে মজ্জায় মজ্জায় গাইয়ে। আসলে তখনকার প্রায় সব শিল্পীরাই ভাল তবলা বাজাতেন। ভাল গাইয়ে হতে গেলে তবলা শিখতে হোত, মোটামুটি বাজাতেও পারতে হোত—না হলে চলত না। ভীষ্মদেব বলো, কি রাইচাঁদ, সুবল দাশগুপ্ত বলো—সবাই অসাধারণ তবলা বাজাতেন। সুধীরলাল চক্রবর্তীকেও আমি দেখেছি—কি ভালো তবলা বাজাতেন।

মনে পড়ছে, হিন্দুস্থান কোম্পানীতে একটা অর্কেস্ট্রার রেকর্ড হয়েছিল, অর্কেস্ট্রার কম্পোজিসন করেছিলেন খুব সম্ভব গোপাল লাহিড়ী (তুলসী লাহিড়ীর ভাই, যাঁর কথা আগে দু'একবার বলেওছি)। আর সেই সমবেত বাদনের সঙ্গে তবলা বাজিয়েছিলেন সুধীরলাল এবং দারুণ বাজিয়েছিলেন! এই দলে আর যাঁরা বাজিয়েছিলেন তাঁরা হলেন অমিয় অধিকারী (গীটার), দক্ষিণামোহন ঠাকুর (তার সানাই) বঙ্কিম দে (ক্ল্যারিওনেট) এঁদের মতন সব ডাকসাইটে শিল্পী। অসিতবরণের তো কথাই নেই। আধুনিক সুরকারদের মধ্যে নচিকেতা ঘোষ তো ছিলেন একেবারে পাকা তবলচি। সুবল দাশগুপ্ত নচিদার তবলা এমন পছন্দ করতেন যে, হয়ত গানের সুর করছেন, নচিদাকে দেখতে পেলেই বলতেন অ্যাই নচি, এদিকে আয়, একটু ঠেকা-দে তো। আমি রাধাকান্ত নন্দী আর নচিকেতা ঘোষকে এক সঙ্গে যুগলবন্দী, তবলা বাজাতেও দেখেছি। আর একজন সুরকার ছিল সুধীন দাশগুপ্ত —তবলা, ঢোল, সেতার সবগুলোই অসাধারণ বাজাতো।

আর সলিল চৌধুরী ?

বিমান—আরে তাঁর কথা তো সবাই জানে। তাঁর কথা তাই আলাদা করে আর বলছি না। দরকারও নেই।

আচ্ছা, কমল দাশগুপ্তর পরিচালনা ও সুরে কোন একটা গানে, যেন তবলায় তাল ফেরতার কথায়, অসিতবরণের গল্পটা বলতে গিয়ে তুমি সেদিন, অসিতবরণেরই প্রথম গান রেকর্ডিং-এর কথায় চলে গিয়েছিলে। সেটা কি ব্যাপার ছিল বলো তো।

বিমান—কালোদা বলছিলো—ওই গানটা হচ্ছিল যূথিকাদির জন্যে—'মুসে কহাঁ না যায়, কহাঁ না যায়'। এটা রেকর্ড করবার জন্যে, একটা তিন মিনিটের গানে, তিনজন তবলা বাজিয়েছিল—এক একজন এক একটা তালে ছন্দে। সেই তিনজনের একজন অসিতবরণ, একজন সুবল দাশগুপ্ত আর তৃতীয়জন ছিলেন মহম্মদ হানিফ। গ্রামোফোন কোম্পানীতে তিনি ছিলেন একজন উচুঁদরের তবলা বাদক। তা, অতগুলো তাল ফেরৎ হয়ে গানটায় শেষ পর্যন্ত লেগে গেল তিন মিনিট দশ সেকেণ্ড। তা হলে কি হবে ? তখন রেকর্ডের বাইরে কিনারে একটা কালো বর্ডারের মত থাকত। শেষ পর্যন্ত এই বর্ডারের একটু কমিয়ে ওই বাড়তি দশ সেকেণ্ডকে খাপ খাওয়াতে হয়েছিল। কিন্তু যূথিকাদির সে গানটা এমন হিট করে গেল যে অতসব কায়দাকানুন, পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত সত্যিই সার্থক হল।

তা, যে কথা হচ্ছিল, তাইতে আবার আসা যাক। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথাই বলছিলে—তাই থেকে তবলা, তবলা বাজাতে জানা এই সব কথা হচ্ছিল। এবার তুমি তারপর থেকে বলো—

বিমান—আসলে কথাটা হচ্ছিল ভাল গাইতে হলে ভাল তালজ্ঞানেরও দরকার। আর সেই ব্যাপারটা আগেকার শিল্পীরা বেশ মন দিয়েই শিখতেন, রেওয়াজ করতেন। গত বছর (৫ ৯ ২০০১) টিভিতে এই নিয়ে সুপ্রীতি ঘোষের সঙ্গে আমার ঠিক এই কথাটাই হচ্ছিল।

রামকুমারের প্রসঙ্গে তাই বলছি যে উনি প্রথম বয়সে চমৎকার গজল টজল গাইতেন, তারপর তবলায় নাম হল। তারও পরে তাঁর প্রথম আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ড হল। কমল দাশগুপ্তর সুরে সে রেকর্ড খুব একটা চলে নি। এরপর একটা শ্যামাসঙ্গীতের রেকর্ড করলেন—'ডাক দেখি মন, মনে মনে।' এটাও তেমন কাটল না। কিন্তু ওই যে আগে বলেছি শিল্পের ক্ষেত্রে সময়ের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। তাই সময় একটু লাগতেই পারে। অতএব এইরকম টুকটাক চলতে চলতে একটা রেকর্ড দারুণ লেগে গেল—'মাছি করে রাখলি মা, করলি না তো মৌমাছি' আর অন্যদিকে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' ব্যস্ পুরনো দিনের বাংলা গানে বাঙালির যে নিজস্ব মজা, মনের ঘনিষ্ঠ যোগ—তাতেই বাঙালি শ্রোতারা মজে গেল। আগে যেসব গান উনি ভালই গাইতেন ঠুংরি, দাদরা, গজল লোকে যেন তা ভুলে গেল। কিন্তু পুরাতনী গান, বৈঠকী গান, শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তি সঙ্গীত টপ্পা, কীর্ত্তনাঙ্গ এসবে তাঁর এমন জনপ্রিয়তা তৈরি হল যে আর তাঁকে পেছনে তাকাতে হয়নি। এখন যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। আমার বাবার সময় থেকে, আমাদের বাড়ির


ভবানীচরণ দাস

সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা। বাবার কাছ থেকে কিছু কিছু পুরনো গানও উনি সংগ্রহ করতেন। খুবই গুণী মানুষ, এখনো আমাদের সঙ্গে সেইরকম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই বয়সেও একবার আসরে হারমোনিয়াম ধরলে, এক মুহূর্তে আসর জমিয়ে দেবেন। লোকেও তাঁকে ছাড়বে না।

তাছাড়া রেডিও, টিভি, পত্র পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, সেকালের সামাজিক বা মাইফেলি জীবনের স্মৃতিকথায় সব মিলিয়ে আমার যেন মনে হয় প্রবীণ এই শিল্পী বাঙালি সংস্কৃতির এখন এক অবিসম্বাদী ফাদার ফিগার হয়ে উঠেছেন। তাই না ?

বিমান—নিশ্চয়ই। আমি তাঁকে কাকা বলি, তাই এর বেশি আর কি বলব। তবে ভাই, বাংলা গানের ভুবনে আমাদের এত গুণীজনের সমাবেশে কার কথা বলব আর কাকেই বা বাদ দেবো! মনের মধ্যে এত নাম এত স্মৃতি হুড়মুড়িয়ে এসে যাচ্ছে যে ঠিক সাল তারিখ মিলিয়ে বা কালানুক্রম অনুসারে সাজিয়ে, সে সব কথা ভাই বলতে পারছি না। আমি তো ইতিহাস লিখতে বসিনি। যে সুরটা যখন মনে আসছে, যে পর্দাটা যখন মাথায় বাজছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে তা তোমাকে পরিবেশন করছি। তা নইলে তো এসব বহুদিনের হারানো, ছড়ানো স্মৃতির টুকরোগুলো কুড়িয়ে বাড়িয়ে আর জড়ো করতে পারবো না। আমারও তো বয়স হয়ে গেল—সময় হয়ে আসছে।

বেশ তো, তোমার যখন যাঁকে বা যেমন যেমন কথা মনে পড়বে, তুমি সেইভাবেই বলো না। ইতিহাসের উপাদান, তাতে বিরস হবে না।

বিমান—রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদাহরণ দিয়ে আমি যেমন একটা আলোর দিশা দেখিয়েছি এবার আমি তার উল্টো একটা অন্ধকারের ছবি তুলে ধরব। বাংলা গানে যাঁর বহুমুখী দক্ষতা, এমন একজন শিল্পী কি রকম অবহেলা অনটনে আর কিছুটা নিজের অবিমৃষ্যকারিতায়, চরম দুর্দশা এবং উপেক্ষিত অবস্থায় শেষ হয়ে গেছেন, তাঁর কথাই বলব। তিনি ভবানীচরণ দাস। লোকের মুখে মুখে সর্টকাটে তাঁর নামটা হয়ে গিয়েছিল ভবানী দাস। অনন্যসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী ভবানী দাসকে যে একখানা মাত্র গান দিয়ে আমরা চিহ্নিত করে রেখেছি, সেটা হল ওই 'অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা, অন্ন দে মা অন্ন দে'। এই সামান্য প্রার্থনাটিও যে অন্তত তাঁর ব্যক্তিজীবনে কোন কাজ দেয় নি—এটা তোমার আমার বা আমাদের সকলের কাছেই দুঃখের। অথচ ইনি কোন সাধারণ মেঠো গায়ক ছিলেন না। অনেক বড় বড় ওস্তাদের কাছে রীতিমত শিখেছেন। অপূর্ব গলা উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে, গলায় দারুণ তানবাটের কাজ, খুব ভাল গাইতেন। বরং বলা যায়, সব ধরনের গান উনি গাইতেন যেমন সাবলীল তেমনি অবলীলায়। এমন কি আমার কম বয়সে আমি ওঁর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত পর্যন্ত শুনেছি। তাঁর কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীতেব রেকর্ড আমি

খুঁজে, কিন্তু, পাই নি। তবে মনে পড়ে রেডিওতে, ভবানী দাসের মুখে রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বকর্ণে আমি কতবার শুনেছি। একবার তো দুর্গা পুজোর আগে, পরিষ্কার মনে আছে একটা রবিবারের দুপুরে, অনুরোধের আসরের পরই ছিল ভবানী দাসের গান। সেদিন উনি বাউলাঙ্গের ঢং-এ গেয়েছিলেন—'আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে' আর 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ।' কি ভাল যে গেয়েছিলেন তা এখনো আমার স্পষ্ট কানে বাজে। উনি থাকতেন টালার কাছে। এলোমেলো প্রকৃতির অপরিণামদর্শী জীবন—বেশিদিন বাঁচেননি। আসলে তখন, শিল্পীদের সামনে অনেক রকম বদ প্রলোভন থাকত। পরিবেশ দোষে, নানারকম নেশার পাল্লায় পড়ে শরীরের আর কিছু থাকত না। সে যুগে অনেক শিল্পীকেই এভাবে নষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবার কথা, শোনা যেত। আজ এ কথাটা বলতে আমার খারাপ লাগছে যে, আমার এই পিতৃবন্ধু এভাবেই প্রলোভনের শিকার হয়ে, নির্বিচারে গান গেয়ে গেছেন—টাকা পয়সা, ভবিষ্যৎ কোন কিছুর চিন্তা না করে। তখন দিনকাল এরকমই ছিল—ভবানী দাসও এ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন নি। অকালে চলে গেলেন —কোনও খান থেকে একটু সমবেদনা, একটু সাহায্যও পান নি।

অথচ আমি তোমায় বলি যে উনি তো সব সুযোগ পেয়েছিলেন। রেডিও রেকর্ডে অত গান গেয়েছেন, সিনেমার পর্দায় নেমেছেন, মঞ্চেও অভিনয় করেছেন ওই অল্প পরিসরের জীবনে।

১৯৩৬ সালে পপুলার পিকচার্সের শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই' ছবিতে প্রথম পর্দায় 'এলেন। সতু সেনের সেরা তারকা ঃ মেলায। অভিনয়ে অন্যরা ছিলেন—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তিনকড়ি চক্রবর্তী, শান্তি গুপ্তা, রানীবালা বা প্রভাদেবীর মতো শিল্পীরা। কমল দাশগুপ্তর সঙ্গীত পরিচালনায় উনি দু'খানা গান গেয়েছিলেন এ ছবিতে। মিনার্ভা থিয়েটারের মঞ্চে অনেক নাটকে গান, অভিনয় করেছেন। নানা ধরনের গানে. বিশাল বঙ্গদেশের গাঁয়ে গঞ্জে—ভবানী দাসের জনপ্রিয়তা ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। ভক্তিগীতি, দেহতত্ত্ব, পল্লীগীতি, শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী বা নজরুলের গান মিলিয়ে তাঁর রেকর্ডও ছিল অনেক। তাছাড়া সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ আমলে, একটা রেকর্ডের দুপিঠ জুড়ে পুরো বন্দেমাতরম গানটা গেয়ে তিনি রীতিমতো হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। তার ওপর যখন সায়েব কর্তাদের হুকুমে, মেগাফোনের সেই রেকর্ড বিক্রী বন্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা হল, তখন তো ভবানী দাসের নামেতেই একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। অনেক পরে অবশ্য, এ রেকর্ড আবার প্রকাশিত হয়েছিল।

আরে, আমারো তো মনে আছে, তাঁর গাওয়া—'দেবার মতো অবিরত,' 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা,' 'এমন দিন কি হবে তারা', 'ভয়ঙ্করীকে বলে মা' এসব গান লোকের ঘরে ঘরে বাজত। এতই চাহিদা ছিল তাঁর গানের, কলের গানের রেকর্ডের।

বিমান—অথচ এমন দুর্ভাগ্য যে এইরকম চৌকশ একজন গায়ক, নিজের অবিবেচনার শিকার হয়ে, মাত্র ৪২/৪৩ বছর বয়সেই, এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ১৯৪৩ সালে যেদিন চলে যান সেদিন তাঁর পাশে কিন্তু কেউ ছিল না। আমি তো বলি ওটা মারা

যাওয়া নয় ওটা আত্মহত্যা। আমার বাবার কাছে আসতেন। আমি যা দেখেছি, খুব দারিদ্র্যের মধ্যেই ছিলেন। বরং আজকে বলেই ফেলি যে, আমার বাবাও ওইসব দোষের জন্যে, ইদানীং যেন একটু অপছন্দ করছিলেন। কিন্তু তাঁর গানকে বাবা ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। আসলে গান গাইলে লোকটা একেবারে অন্য মানুষ। অথচ সমসাময়িক কালে তো আর একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন তিনিও দারুণ জনপ্রিয় ছিলেন—মৃণালকান্তি ঘোষ। তিনি কিন্তু যথেষ্ট সাবধানী, বুঝে চলার লোক ছিলেন আর সিনেমা, রেডিও, রেকর্ড গান সব মিলিয়ে মৃণালকান্তির একটা ভক্তভক্ত ভাবমূর্তি ছিল। তার মানে ভাগ্য তাঁকে সাহায্য করেছিল। ভবানী দাসের কিন্তু এই সুবিধেটা ছিল না, তাই এত গুণী হয়েও, তাঁকে অনেকাংশে উপেক্ষিত থাকতে হয়েছে, সারাজীবন প্রবঞ্চিত হয়ে, কপর্দকশূন্য অবস্থায় শেষ হয়ে যেতে হয়েছে। তা নইলে, ভবানী দাস যে সমস্ত দিকপাল ওস্তাদদের কাছে তালিম নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন তা কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। শুধু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উনি কার কার কাছে শিখেছিলেন, জানো ? আবিদ হোসেন খাঁ, তারপর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বোঝো তাহলে। ভীষ্মদেবের সুরে এবং পরিচালনায় ভবানী দাসের রেকর্ডও বেরিয়েছিল। এক পিঠে 'পূজিব তোমারে শ্যামা,' অন্যপিঠে সেই বিখ্যাত গান 'দেবার মত অবিরত'। এতে সামান্য একটু যা তানপাটের বাহার দেখিয়েছিলেন, তাতে সে সময়ে অনেকে বুঝতে পারতো না ওটা ভীষ্মবাবু করছেন, না ভবানী দাস করছেন।

ওঁর গাওয়া মেগাফোনে বেরিয়েছিল নজরুলের অনেকগুলো গান যেমন, 'কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায়', 'তোমার কুসুম বনে' ইত্যাদি। আর একটি মজার রেকর্ড হয়েছিল—নজরুল স্বকণ্ঠে ব্যাখ্যা করে একটু একটু সংলাপ পড়ছেন আর ভবানী এক লাইন করে গাইছেন 'শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে, কাল নদীতে দুলি।' আমি অনেক খুঁজেও রেকর্ডটা আর পাই নি। আর একটা গান খুব বিখ্যাত হয়েছিল 'মাতৃনামের হোমের শিখা, আমার বুকে কে জ্বালালো' ? এইচ এম ভি থেকেও বেরিয়েছিল নজরুলের লেখা, সুবল দাশগুপ্তর সুরে 'মাগো আমি মন্দমতি' আর অন্য পিঠে, 'তোর নামেরই কবচ দোলে'। এমনি কতো বলব।

অনিল বাগচীর সুরে, সুবোধ পুরকায়স্থর লেখা 'একলা বসি তোমার কুসুম বিতানে' ভবানী দাসের এই রাগপ্রধান গানটা দারুণ চলেছিল। কিছুকাল আগে (সেপ্টেম্বর ২০০১) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিতে গিয়ে অনিল বাগচীর ছেলে, অধীর বাগচীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি তাকে বললুম হ্যাঁরে, অনিলকাকার ওই গানটা তোর মনে আছে ? অধীর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল আরে বিমানদা, আমি তো ও গানটা কলেজের ছেলেদের শেখাচ্ছি। খুশির জোয়ারে, অধীর আমায় জোর করে মিষ্টিও খাইয়ে দিয়েছিল। আমাদের সম্পর্কটাই এই রকম। তাহলে বোঝো, ভবানী দাসের গান কেমন ছিল। তাই এবার বলব এমন একটা কথা—যা শুনলে সকলেই চমকে উঠবে। কারণ এটা প্রায় কারুরই জানা নেই। ১৯৩৬ সালে বাণীকুমারের লেখা, পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরে, ভবানী দাস দুটি গান রেকর্ড

করেছিলেন, মেগাফোনে। আজ বোধহয় অনেকের বিশ্বাসই হবে না। রাগাশ্রিত কীর্ত্তনের সুরে সেই আশ্চর্য গান দুটো হল 'মঞ্জুল মধুবন কতো ফুলে সাজিল' আর 'জেনো গো দিন আসবে যবে, তোমায় যেতে হবে।' ভবানী দাসকে লোকে ভুলে গেছে একথা সত্যি। প্রকৃতির নিয়মে যা হবার তা হয়েছে কিন্তু পঙ্কজ মল্লিকের সুরে, ভবানী দাসের গানের সেই রেকর্ডটা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এটা মেনে নেওয়া যায় না। জানি না, এমন কেউ আছেন কিনা যিনি, এই অমূল্য সাঙ্গীতিক সম্পদটি উদ্ধারের কাজে, বিশ্বস্তভাবে উদ্যোগী হবেন।

এসব দেখে, একটা কথা খুব মনে হয়। ওই সময়ের শিল্পীরা নিজেদের আখের নিয়ে ভাবতে শেখেননি, জীবনটাকে গুছিয়ে নিয়ে চলতে পারেন নি। নিজের শিল্পকৃতি ছাড়া আর কিছুতে মন দেননি। তাই বলি, এঁরা শিল্পী হিসেবে হয়ত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন কিন্তু জীবনে তাঁরা বিশেষ কোন স্বীকৃতি বা পুরস্কার যেমন পাননি তেমনি পাবার দিকে, তাকিয়েও থাকেননি। যুগটা এমন ছিল যে, কেউ রেডিওতে গান করে বললে, লোকে কেমন যেন এক বাঁকা চোখে দেখত। ভাবতো লোকটা বুঝি অধঃপতনের পথে যাচ্ছে। ফলে, জীবনে তাঁরা অনেকেই হতাশা, অনটন, অনাদরে, ছন্নছাড়া হয়ে গেছেন। অবহেলায় চলে গেছেন—কেউ তাঁদের খবর রাখেনি, তবে কি জানো, তখনকার দিনে সাধারণভাবে, অনেক শিল্পীদের কিছু দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তি থাকতো, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে। বলেই ফেলছি যে, বাজে নেশা ভাঙ্ বা অন্যান্য বিচ্যুতি এসবের বাইরে নিজেকে রাখার চেষ্টা, কখনো করেননি ভবানী দাস। আসলে নিজের সর্বনাশ থেকে নিজেকে বাঁচানোর কথা ওঁরা ভাবতেনই না। কোনও চতুর খলিফা, নেশাটেশার জিনিস সাজিয়ে দিয়ে ভবানী দাসকে সামনে বসিয়ে দিল। তারপর একের পর এক গান গাইয়ে নিয়েছে—একটা পয়সাও আর দেয়নি। স্বাধীনতার আগে এরকম একটা রেওয়াজই ছিল। স্বাধীনতার পর বরং, শিল্পীরা অনেক সচেতন হয়েছে। সাবধান হতে শিখেছে। তবে সেকালের ওই গাইয়েরা কেবল গান নিয়েই মজে থাকতেন। ঘর-সংসার, পরিবার এসবে তাঁদের তেমন নজর থাকতো না। কিন্তু এখন শিল্পীরা অনেক সতর্ক, তাঁদের বিষয়বুদ্ধিও যথেষ্ট। এটা ভালোই হয়েছে। এখন বড় বড় শিল্পীরা অনেকে, গান ছাড়াও চাকরি করে, ছোটখাটো ব্যবসা বা যে যা পারে, বাড়তি উপার্জনের জন্যে, তাই করে। আসলে যুগের হাওয়ার সঙ্গে এঁদের পাটোয়ারী বুদ্ধিও খুব পরিণত হয়েছে। সেকালে আমরা অনেককে দেখেছি না খেতে পেয়ে, থাইসিসে ভুগে মরে যাচ্ছে। এখন এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এটা, খুব সুখের কথা। তবে বেহিসেবী টাকার নেশায়, শিল্পীসত্তা বা সৃজন ক্ষমতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে কিনা, সেটা অবশ্য অন্য ভাবনা।

এ ব্যাপারে শুনেছি অহীন্দ্র চৌধুরিই নাকি পথ দেখিয়েছিলেন—তিনি টাকাপয়সা নষ্ট করার পথে কখনো পা বাড়ান নি যার জন্যে অবশ্য আড়ালে আবডালে শিল্পীমহলে, ওঁকে নিয়ে কম হাসি-ঠাট্টা হোত না।

বিমান—সে যাঁই হোক, আজ আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি তাই জোর দিয়েই

বলতে পারি যে—ওঁরা নিজেদের নষ্ট করেও, আমাদের সংস্কৃতির জন্যে তবু যা রেখে গেছেন, আমাদের তা সযত্নে মাথায় করে রাখা উচিৎ। কেননা তার মধ্যেই আমাদের বাঁচবার রসদ রয়েছে—এগিয়ে চলবার মতো জ্বালানির যোগান রয়েছে।

এখানে বেচু দত্তর কথা, আমার মনে পড়ছে। কি সুন্দর গলা, আর কি ভালো ভালো সব গান ওঁর ছিল। বেচু দত্তর (১৯১৮-১৯৯১) 'পাহাড়ী ঝর্ণা' 'যাই তবে চলে যাই', 'উদাসী পথিক শুনেছি তোমার', 'বাঁকা পথ গেছে', 'এই সে বকুল তলে আগেরই মতন' এসব গান যে এখন শোনা যায় না তাতে একালের শ্রোতাদেরই ক্ষতি। কিন্তু তার জন্যেও তো বলতে দ্বিধা নেই—তাঁর শৃঙ্খলাহীন জীবন যাত্রাও অনেকটা দায়ী। তাই বড় দুঃখ হয় এঁদের জন্যে। তুমি হয়ত এমনি আরো অনেকের কথা জানো—এই মুহূর্তে কারো কথা মনে পড়ছে ?

বিমান—আমার তো মনে করতে কষ্ট হচ্ছে—এইরকম আর একটা প্রতিভা এভাবেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুধীরলাল চক্রবর্তী (১৯১৬-১৯৪৯)। সুধীরলাল অল্প বয়স থেকেই কলকাতাতে ছিলেন। .এখানে গান-টান শিখেছেন তবু ঢাকা রেডিও স্টেশন খোলার সময় থেকেই উনি ঢাকা-বেতারের আর্টিস্ট ছিলেন। কলকাতা রেডিওতেও গাইতেন। ঢাকায় প্রোগ্রাম পড়লে, ওখানে গিয়ে গান করে, কলকাতায় ফিরে আসতেন। এত গুণী, শিল্পী মানুষ তবু নিজের স্বভাবের জন্যে, মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে, তাঁকে আমাদের হারাতে হয়েছে। সেই দুরবস্থায় আর জি কর হাসপাতালের বিছানাই হয়েছিল তাঁর শেষ শয্যা। অকূল পাথারে রেখে গেলেন স্ত্রীকে। আর বেদনাহত স্তব্ধ ছাত্রছাত্রী, অনুরাগীকে।

কলকাতায় থাকার কারণে সুধীরলাল তরুণ বয়স থেকে আচার্য গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তীর মত গুরুর কাছে উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অনেক দিন ধরে শিক্ষা করেছিলেন। অনেকেই জানে না, সুধীরলাল কতো উঁচু মানের খেয়াল, ঠুংরি গায়ক ছিলন।

হ্যাঁ আমি তো নিজে এককালে রেডিওতে মাঝেমাঝেই ওঁর খেয়াল, ঠুংরির অনুষ্ঠান শুনেছি। পুরোন বেতার জগৎ এর পাতা হাতড়ালে, সে সব প্রোগ্রামের হদিশ হয়ত এখনো পাওয়া যাবে।

বিমান—তাঁর আর একটা গুণ ছিল। উনি ভীষণ ভালো তবলা বাজাতে পারতেন। সেই গোড়ার যুগে হিন্দুস্থান কোম্পানীতে একবার একটা অর্কেস্ট্রার রেকর্ড হয়েছিল—যার কম্পোজিশন করেছিলেন, যতদূর মনে পড়ছে গোপাল লাহিড়ী। আর এই অর্কেস্ট্রাতে দারুণ তবলা বাজিয়েছিলেন সুধীরলাল। কাগজে কাগজে সেই অর্কেস্ট্রার দলের ছবি বেরিয়েছিল তাতে তবলচি সুধীরলালের ছবি আমার যথেষ্ট মনে আছে। পরবর্তীকালে উনি মস্ত বড় সুরকার হলেন। তবে তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো আত্মপ্রকাশ, অবশ্যই গায়ক হিসেবে। ওঁর প্রথম রেকর্ডের গানটাই ওঁর পরিচিতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। তার সুরটা এত সুন্দর ছিল যে আমি এখনো সেটা, সময় সময় নিজের মনেই গাই—'রজনী গো যেও না চলে, এখনো যায় নি লগন'।

তবে দেখ আমরা বাঙালি শ্রোতা সুধীরলালকে কেমন একটামাত্র গানে বেঁধে

রেখেছি—মধুর আমার মায়ের হাসি, যেন ওঁর আর কোনও তেমন উল্লেখ করবার মত গান নেই! অথচ আমি তো না ভেবেই এমন কতকগুলো গানের কথা বলতে পারি—যেগুলো বারবার শোনবার মত, মনে রাখবার মতো। ধরো যেমন—কেন ডাকো পিয়া পিয়া, গান গেয়ে মোর দিন কেটে যায়, এ দুটি নয়ন পলকে, খেলাঘর মোর, ছাইল অম্বর ঘন মেঘে, বনভূমি শ্যামায়িত আকাশ মেঘ মেদুর—এমনি আরো অনেক।

বিমান—সত্যি, ওই যুবা বয়সে চলে গেলেন—অথচ তারই মধ্যে একাধারে একজন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিল্পী, আধুনিক বাংলা গানের জনপ্রিয় গায়ক, প্রতিষ্ঠিত সুরকার, সুদক্ষ তবলিয়া, উচ্চাঙ্গের শিক্ষক। আর সকলে জানে না, আপাদমস্তক একজন নিপাট ভদ্রলোক। আমার মনে আছে, আমি তখন একটু একটু যাতায়াত করি আমার কাকার বন্ধু, দুর্গা সেনের কাছে।

একদিন ওঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি যে, ঘরে একজন ভদ্রলোক চুপ করে বসে রয়েছেন। দুর্গা সেন বললেন—কিরে, সুধীর কি ব্যাপার ? কি রকম যেন ছেলেমানুষি আবদারের সুরে উনি বললেন আমার দুটো গানে তুমি সুর করে দাও!

দুর্গা সেন বললেন—তুই নিজে কতো ভাল সুর করছিস, কত বড় বড় আর্টিস্টরা সেই সুরে গান গাইছেন—

না, সুধীর বললেন, নিজের জন্যে করতে পারি না। ওটা তুমি করে দাও। দুর্গা সেন, ওর জন্যে, দুটো গানে সুর করে দিয়েছিলেন—প্রথম দিনের প্রথম সে পরিচয়, আর মিলনের গান তোমার আমার নয়। গান দুটো প্রণব রায়ের লেখা। একবার ইচ্ছে হল হিন্দি গান গাইলে হয়! গাইলেন রেকর্ড বেরুল—'খানে দো জারা' আর 'টুট চুকে হ্যায়'। সুপারহিট হয়ে গেল। আজকে আমার বলতে একটুও বাধো বাধো ঠেকছে না, আমাদের তখন বয়েস ২৩/২৪ বা একটু কমও হতে পারে। গানের ক্লাসে বসে আমরাও শিখছি—আর সুধীরলালও সেখানে বসে আমাদের সঙ্গে গাইছে, প্র্যাকটিস করছে, আহিরীটোলায় দুর্গা সেনের গানের ক্লাসে। ভবিষ্যৎকালের উত্তমকুমারের মামার বাড়ির পেছন দিকে, দুর্গা সেনের বাড়ির একটা ঘরে। সেখানে আমরা গান শিখছি আর বুড়ো (এখনকার তরুণকুমার) ওদের বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে শুনছে। তখনো অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা পোর্ট কমিশনারের অফিসে, ক্যাস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করছে। আর সেই সঙ্গে স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটকে উত্তমকুমার—নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছে। দুর্গা সেন আবার ওই নাটকের সুরকার। কোন কোনদিন অবশ্য বুড়ো দুর্গা সেনের বাড়িতে এসেও বসত, তাও মনে পড়ে।

এই সুধীরলাল অত বড় সুরকার কিন্তু তার ছাত্রছাত্রীদের জন্যে তাঁর যে কি ভালবাসা, আগ্রহ বা ভাবনা চিন্তা, তা এখনকার দিনে ভাবা যায় না। আর সেই ছাত্রছাত্রীদের শুধু নামগুলো শুনলেও আজকে যেন শিহরণ জাগে—উৎপলা সেন ছাড়াও শ্যামল মিত্র, অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়, নীতা বর্ধন, মানব মুখুজ্জে, অপরেশ

লাহিড়ী, গায়ত্রী বসু কতো নাম বলব! এঁরা সবাই কোন না কোন সময় সুধীরলালের কাছে অল্পবিস্তর তালিম নিয়েছেন, শিখেছেন। এক একটা গান তো এঁদের একেকজনকে চিরকেলে শিল্পীর প্রতিষ্ঠা দিয়েছে—যেমন ধরো নীতার ওই গানটা 'ওগো নয়নে আবীর দিও নাকো শ্যামরায়'।

আমি জানি, আর এক দুর্দান্ত গুণী উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পী উমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে। হাওড়ার বাসিন্দা, এখন একেবারে বিস্মৃত। সেই চল্লিশের দশকের গোড়ায়, সদ্য সুধীরলালের কাছ থেকে টাটকা টাটকি শিখে 'ওগো নয়নে আবীর' উনি এই গানটা উত্তর হাওড়ার কাছারি বাড়ির কালীপুজোর জলসায় গেয়ে—সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। ওই আসরে সেদিন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখুজ্জে, বেচু দত্ত, বিনয় অধিকারী এঁরা সব বসে। তা, উমাশঙ্করও (লোকে বলত শঙ্কুদা) ওই একই দোষে নিজেকে শেষ করে ফেলেছিলেন। মূলতঃ আচার্য গিরিজা শঙ্করের ছাত্র উমাশঙ্করও চল্লিশ ছুঁতে না ছুঁতে, ভবানী দাস, সুধীরলালদের মত অকালে চলে গিয়েছিলেন। পরে এই গানটাই নীতা বর্ধন রেকর্ড করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন এবং এখনো লোকে ওই গান দিয়েই তাঁকে মনে রেখেছে।

বিমান—সুধীরলাল যাঁদের অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন তাঁদের প্রথমে ছিলেন পঙ্কজদা। তাই তিনি অনায়াসে ছাত্রী উৎপলা সেনকে পঙ্কজদার কাছে নিয়ে গিয়ে বলতে পারলেন—মেয়েটি গায় ভাল, গলা ভাল। পঙ্কজদা, যদি ছবিতে উৎপলাকে গাওয়ার সুযোগ করে দেন। এমনি শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন—কমল দাশগুপ্ত, দুর্গা সেন। এঁদের কাছে সুধীরলাল অনুরোধে, আবদারে বরাবর অনুগত থেকেছেন।

এঁদের কাছেও সুধীরলাল এমন প্রিয় পাত্র যে জগন্ময় মিত্রর জন্যে তৈরি করা গান সুধীরলালকে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে ফেললেন দুর্গা সেন—'খানে তো জারা'। সঙ্গে সঙ্গে গানটা এমন হিট হয়ে গেল যে জগন্ময়ের বেশ অভিমান হল। দুর্গা সেন তখন জগন্ময়কে সামলাবার জন্যে তাঁকেও একটা গান, তৈরি করে দিলেন, 'উলফৎকে সাজাদো'। এও দারুণ হিট। তখনকার দিনে এমনি কত মজাই যে হোত।

এই দেখ, একজনের কথা বলতে গিয়ে পাঁচজনের কথা এসে পড়ছে। কারণ, তখনকার দিনে, গানের পরিবেশটা অন্যরকম ছিল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা যেন ইনস্টিটিউশনের মত চলত। এরা কেউ কোনদিন কেবল নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্যে গলা ফাটায়নি। 'আমি এই জানি', 'আমি ওই জানি' বলে আত্মজাহির করেনি। বরং ওঁরা বলতেন আমি কিছুই জানি না, আমার শেখবার অনেক বাকি আছে। এইরকম। এখন যেটা দেখি, টিভিতে একবার মুখ দেখাবার জন্যে কি কাণ্ড না হচ্ছে। কোন ফাংশানে একবার গাইতে বসতে পারার জন্যে কি না করছে—তা বললে খারাপ লাগবে। কিন্তু ওই চল্লিশের দশকে ওরা কেবল গান কি করে ভাল গাইব, তাই নিয়ে রগড়ে পড়ে থাকত—অন্য কোন চটকদারীর পরোয়াই করত না। তাই ওঁদের কারুরই সাংসারিক অবস্থা কোনদিন

ফেরেনি যেমন ভবানী দাস তেমনই সুধীরলাল—দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্যেই তাঁদের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। সুধীরলাল বন্ধু রবীন চট্টোপাধ্যায়কে বললে, আমার জন্যে একটা গজলের সুর করো তো। আসলে ভালবাসা, হার্দ্যিক সম্পর্কের জোরেই এরা একজন আর একজনকে এমনি করে বলতে পারতো। এঁরা কখনো নিজেদের সবজান্তা দিগগজ ভাবতেন না, ভাল কিছু দেবার জন্যে সব সময় নতুন কিছু শিখতে উৎসুক থাকতেন। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁরা যা কিছু রেখে গেছেন, আজও ওই ভাঙিয়েই আমাদের চলছে। পুরোন বলে, কই, এখনকার এত ডামাডোলের বাজারেও তো সেগুলোকে ফেলে দিতে পারছি না।

তা তোমার এই উপলব্ধিটা কি এখনকার শিল্পীদের জন্যেই বলছো ?

বিমান—তা একটু বলতে পারো। তবে আমার এত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে, যা বুঝেছি তা বলতে পারলে মনের ভার তো নিশ্চয়ই একটু হাল্কা হয়। আমার এ কথাগুলো কে, কতটুকু শুনবে তা জানি না তবু এ প্রজন্মের শিল্পী, শিক্ষার্থীদের ভালবাসি বা তাদের ভাল চাই বলে, আমার উপলব্ধির কথা না বলেও পারলুম না। যাইহোক, এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা এখানে এসে যাচ্ছে—চিত্ত রায়। ইনি সেযুগের একজন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। সেইসঙ্গে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, ফ্রিডম ফাইটারও—যার জন্যে সারাজীবন তাঁকে দেখেছি খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবীতে, মাথায় খাদির টুপি। যেমন বিনয়ী তেমনি গুণী—কাজী নজরুল ইসলামের একসময়ের একেবারে ডানহাত। নজরুলের বহু গানের তিনি সুর করেছিলেন যা এখন খুব বিখ্যাত কিন্তু তাঁর কথা এখন আর কেউ তেমন বলে না বা সবাই তাঁকে ভুলে গেছে বললেই হয়। অথচ শেষের দিকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বা প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটা সুপারহিট গানের সুর তিনিই দিয়েছিলেন। অথচ এমন মজা যে, আমরা সে সব গানকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান বলেই জানি। কিন্তু সেই গানের সুরকার যে চিত্ত রায়—সে কথা ক'জনই বা জানি।

চিত্ত রায়ের সুরে সন্ধ্যা গেয়েছিলেন নজরুলের—'গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে' অরূপ ভট্টাচার্যের লেখা 'রাতের শেফালী ঘুম ভেঙে বলে' আর প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছিলেন এই অরূপ ভট্টাচার্যের লেখা—'কে তুমি প্রিয়ে এলে ঘুম ভাঙাতে' বা 'এলো ঘনিয়ে বরষা।' এগুলো শুধু উদাহরণ। উনি বেশ কয়েকটা ছায়াছবির গানেও সুর করেছিলেন। 'নিশির ডাক', 'নতুন ইহুদী' এরকম কয়েকটা। তবে একটা ছবির গান ১৯৫০ সালে মধু বসুর মাইকেল মধুসূদন ছবিতে—উৎপল দত্তর মুখে, হেমন্তদা গেয়েছিলেন—'তুমি যে আমার কবিতা'। প্রণব রায়ের লেখা, চিত্ত রায়ের সুরে এ গানটা তো চিরকালের ফেভারিট হয়ে রয়েছে। হেমন্তদারও এ গানটা এত প্রিয় ছিল যে রেডিও, নানা ফাংশানে উনি যে কতবার এ গানটা গেয়েছেন তার ঠিক নেই। এ হেন চিত্ত রায় আমার খুব দুঃখ হয় যে আজকে তাঁকে কেউ চেনে না। ভাই, কতো উদার প্রাণ বিনয়ী মানুষ যে তার একটা ঘটনা আমি আজ এই প্রথম বলছি—যে এখনকার বিখ্যাত ফিরোজা বেগম অরিজিন্যালী


অনন্তবালা বৈষ্ণবী

চিত্ত রায়ের ছাত্রী। অনেক দিন ধরে, একেবারে ভিত থেকে শেখানোর পর, ফিরোজাকে চিত্ত রায় নিজেই প্রথম কমল দাশগুপ্তের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। কমল দাশগুপ্তকে বললেন, 'আমার যা বিদ্যে ছিল একে তা, যা পেরেছি দিয়েছি। এবার আমি, তোমার কাছে একে এনেছি। এখন থেকে তুমি ওকে শেখাও'। তাহলে বোঝো, এও সেই একই কথা। সুধীরলালের সম্বন্ধে যে কথা বলেছি—চিত্ত রায় সম্বন্ধেও সেই কথা। জীবন ধারণের প্রয়োজনে শেষ বয়সে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখাতে তাঁকেও চাকরি নিতে হয়েছিল। তখনো পঙ্কজদা ওখানকার একজন কর্তাব্যক্তি মুরুব্বী। চিত্ত রায় শৈলজানন্দর 'বন্দী' ছবিতে পর্দাতেও নেমেছিলেন। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক গিরিন চক্রবর্তীর সুরে চিত্ত রায়কে গানের সঙ্গে নাচতেও হয়েছিল। চিত্ত রায়ের সঙ্গে নেপথ্য কণ্ঠে গানটা ডুয়েট গেয়েছিলেন ঝর্না দেবী—'চোখে চোখে রাখি হায় রে তবু তারে ধরা যায় না।' আর পর্দায় এই গানের সঙ্গে চিত্ত রায়ের সঙ্গে নেচেছিলেন সন্ধ্যারানী পরবর্তীকালের বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী। তখন বিখ্যাত গাইয়েরা অনেক সময় এরকম টুকরো টাকরা ছোট্ট ভূমিকায় পর্দায় নামতেন শুধুমাত্র গান গাইবার জন্যে। যেমন ধরো, দু' একটা ছবিতে শচীনদেব বর্মনকেও দেখেছি। ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'জীবনসঙ্গিনী' ছবিতে, হিমাংশু দত্তর সুরে ওঁকে এইরকম একটা গান গাইতে পর্দায় দেখা গিয়েছিল—'বাংলার মেয়ে বাংলা তুমি'।

তবে বলে রাখি যে ১৯৩৪ সালে মধু বসুর 'সেলিমা' ছবিতে শচীনদেব প্রথম ছবিতে নামেন এক ভিখিরীর ভূমিকায় আর গানও গেয়েছিলেন। তারপর বড় ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ১৯৩৫ সালে ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলির (ডি. জি) তোলা 'বিদ্রোহী' ছবিতে।

বিমান—দেখ ভাই বর্তমানে আমাদের তো স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে অতীতকে একবাক্যে অস্বীকার করা বা অতীত স্মৃতিকে উড়িয়ে দেওয়া। কি বলব, আমি তো লেখক নই আর পুরোপুরি শিল্পীও নই। তবু অনেক লেখক বা শিল্পীরই সান্নিধ্য পেয়েছি বা অনেকের চরণ স্পর্শ করবার সুযোগ পেয়েছি। এরকম একজনের কথা আজকে আমার খুব মনে পড়ছে। এর আগে বোধহয় এঁর কথা কিছু কিছু বলেছি। তবু অন্য এক বিস্মৃত শিল্পীর সূত্রে আবার একবার তাঁর কথা এখানে উঠছে। মেগাফোনের মালিক জিতেন ঘোষ মশাই, প্রায়শঃই পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বিশেষ একজন শিল্পীকে কলকাতায় আনাতেন। কখনো কখনো আবার নিজেও তাঁকে নিয়ে আসতেন। তাঁর নাম ছিল শ্রীমতী অনন্তবালা বৈষ্ণবী—এখন কি কেউ তাঁর নাম শুনেছে ?

তাঁর গানের সঙ্গে আমার ছেলেবেলা থেকেই পরিচয় ছিল। কিন্তু রূপদর্শী গৌরকিশোর

ঘোষ অনন্তবালার গান মন দিয়ে শোনবার জন্যে আমাকে রীতিমত জোর দিয়ে খোঁচাতেন। পুরোন দিনের বাংলা গানে, গৌরকিশোরের যে গভীর জ্ঞান ও ভালবাসা ছিল এবং দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডের সংগ্রহ ছিল, তা কম লোকই জানত। সেই বিজ্ঞ সুধী মানুষটি যে ভাষায় অনন্তবালার গানের প্রশংসা করতেন, তাই থেকে আমিও একটু একটু করে অনন্তবালার গানের প্রকৃত মূল্য বুঝতে শুরু করেছিলুম।

বিমান—অনন্তবালা ছিলেন মনে প্রাণে একজন খাঁটি বৈষ্ণবী। সাজ পোশাকে বৈষ্ণবীদের দু'রকম পোশাকই তিনি পরতেন। ধবধবে সাদা থান ধুতি নয়ত গেরুয়া রঙের জামা ধুতি। মাথায় সবসময় ঘোমটা টানা, কপালে তিলকফোঁটা। দেহতত্ত্ব, পল্লীসঙ্গীত বা ইসলামী সঙ্গীত তাঁর গলায় সবই অপূর্ব শোনাতো, একেবারে অকৃত্রিম মাটির গন্ধ ছড়ানো যে গানের, কোন তুলনা ছিল না। সে সব গানের কথাগুলোও ছিল ওইরকম—মণিহারা ফণীর মত দিশেহারা হই।

এমন গান যে আমার তো গানের কথাগুলো মনে হলেই, সুরগুলো এখনো কানে বাজে। এক একটা গানের আর্তি যেন হৃদয় খুঁড়ে চোখ জলে ভিজিয়ে দেয়, যেমন —'কালা আমায় পাগল', 'যশোদা মা তোর কৃষ্ণধনদের গোষ্ঠে নিয়ে যাই', 'নিমাই দাঁড়ারে'।

বিমান—অনন্তবালা এরকম অজস্র গান গেয়েছেন। তখন তো অখণ্ড বাংলার বিশাল বাজার ছিল। তখনকার পূর্ব বাংলায় তাঁর গানের বিক্রী ছিল অসাধারণ।

কিন্তু অনেক পরে আমরা জেনেছিলুম যে অত বিপুল সংখ্যক রেকর্ড বিক্রী হলেও —দেশগাঁ থেকে কলকাতায় যাতায়াতের গাড়িভাড়া আর হাতে দশ বিশটাকা নিয়েই তাঁকে ঘরে ফিরে যেতে হত। তখন মাইকের সুবিধে ছিল না, উনি খালি গলায় গান গাইতেন আত্মহারা হয়ে। অত্যন্ত মিষ্টি কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গিতে ঘাসের রম্যতা। এক নাগাড়ে, প্রাণমন ঢেলে স্রোতস্বিনীর মত গেয়ে যেতেন। উনি মারা গেছেন—আমরা খবর পেয়েছি অনেক পরে। গান নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁদের কাছ থেকে অনন্তবালা এই প্রতিদানই পেয়েছেন। আমি কমলা ঝরিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম হ্যাঁ মা, অনন্তবালা বৈষ্ণবীর খবর কি বলোতো ?

উনি বললেন—'সে তো মারা গেছে, বাবা। আত্মহারা হয়ে কেবল গানই গেয়ে গেছে। কি গান যে গাইতো! সে নিজেও জানতো না যে সে কি করে গেল।' এও শুনেছি, সব গানের রেকর্ডের স্যাম্পল কপি, যা শিল্পীদের প্রাপ্য ছিল—তাও সবসময় অনন্তবালার হাতে পৌঁছত কিনা সন্দেহ, তবে তাঁর গানের এত ডিমাণ্ড ছিল যে রেকর্ডের কভারে তাঁর ছবি ছাপানো থাকত। অনেক বড় বড় দোকানে, অনন্তবালার ছবি ভবানী দাস, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা এঁদের সঙ্গে পাশাপাশি শোভা পেত। খাঁটি বৈষ্ণবী হলে কি হবে, প্রকৃত শিল্পী হিসেবে, বেশ কিছু ইসলামী গানও তিনি রেকর্ডে গেয়েছিলেন। একটা গান তো খুব জনপ্রিয় হয়েছিল—'ও রসুল আমার প্রাণ, ও রসুল আমার ধ্যান।' গানের কথা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, উনি গাঁয়ের চাষাভূষোঁদের কাছ থেকে, নিজে সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। আর সুরও

সেইরকম, সেইখান থেকে অরিজিন্যাল সুরটাই গলায় তুলে নিয়ে আসতেন। তবে মেগাফোনে পরেশ দেব নামে একজন ট্রেনার ছিলেন, তিনি ওই গানকে একটু ঘষে মেজে গ্রামোফোনের রেকর্ডের উপযোগী করে তৈরি করে দিয়ে অনন্তবালাকে দিয়ে রেকর্ড করাতেন, প্রথমে গানের কথাগুলোকে একটু ঠিকঠাক করে মুখস্ত করাতেন। তারপর ভালমত রিহার্স্যাল দিইয়ে রেকর্ডিং করে ফেলতেন। সে যুগে অন্যান্য সুরকাররা—যেমন তুলসী লাহিড়ী, জ্ঞান দত্ত এঁরাও ওই একই পদ্ধতিতে কাজ করতেন। এইসব দুর্দান্ত শিল্পী গায়িকাদের লেখাপড়া কতদূর কি ছিল তা বলতে পারবো না। তবে এঁদের নিজস্ব কোন গানের খাতাপত্র ছিল বলে কিছু, আমি তো দেখিনি।

ওঁর সমসাময়িক, আব্বাসউদ্দীন, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা এঁদের সঙ্গে অনন্তবালার মেলামেশা ছিল না ?

বিমান—না, আমি সেরকম কিছু দেখিনি। উনি কেমন যেন একপাশে, একঘরের মতই থাকতেন। আর্টিস্ট মহলেও তেমন খাতির-টাতির পেতে দেখিনি। উনি আসতেন, গাইতেন আর চলে যেতেন। সত্যিই উনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী শিল্পী, কলকাতা রেডিওতে উনি কত গান করেছেন—সে সব এখন হারিয়ে গেছে। আসলে উনি নিজেও তো হারিয়ে গেছেন, তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে, বসিয়ে গান গাওয়ানো হোত। একেবারে খাঁটি জিনিসের নির্যাস—কোনও দুধ চিনি মেশানো নয়। একেবারে র, তাই নির্ভেজাল ধূলোমাটির গান।

তাই এর সঙ্গে সমসাময়িক, মৃণালকান্তি ঘোষকে মনে পড়ে। ভবানী দাসের কথা আগে বলেছি। তাঁর মতই মৃণালকান্তি শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, লোকসঙ্গীত আধুনিক, নজরুলগীতি—সবরকম গানই গাইতেন। তাঁর গাওয়া অনেক গান—বাঙালির ঘরে ঘরে নিয়মিত বাজতো।

আরে ওঁর 'বল রে জবা বল্' বা 'মহাকালের কোলে' এখনো তো লোকে ভুলতে পারেনি। তবে আমার আর একটা কথা খুব মনে পড়ছে। মূলত যাঁরা গায়ক তাঁদের মধ্যে মৃণালকান্তি বোধহয়, সবচেয়ে বেশি ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন। শুধু যে, গান গাইতে হবে এমন চরিত্রের ভূমিকায়, তা নয়। গান গাইতে হবে না —এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন—যেমন ১৯৩৫ সালে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা বিখ্যাত ছবি 'মানময়ী গার্লস স্কুল' (কানন, জহর, রাধারানী অভিনীত) ছবিতে মৃণালকান্তি চরিত্রাভিনেতা হিসেবে রাজেন-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাছাড়া তিরিশ চল্লিশের দশকে তোলা যত পৌরাণিক ছবিতে নারদের চরিত্র থাকতো তাতে হয় মৃণালকান্তি নয়ত ধীরেন দাসের যেন একচেটে অধিকার ছিল।

আর রেকর্ডে তাঁর গাওয়া 'শ্যামা আমার নীরব', 'পৃথিবীর মায়া কাটাব বলে', সিবাজদ্দৌলা নাটকের 'একূল ভাঙে ও কূল গড়ে' ,মধু বসু-সাধনা বসুর 'রাজনর্তকী' ছবির 'দুয়ার খানি খুলল না' কিংবা 'অন্ন দেখা অন্নপূর্ণা' বা এইরকম অনেক গান এখনো মাঝে মাঝে রেডিওতে যে শোনা যায় সেটা বড় কম কথা নয়।

বিমান—হ্যাঁ তবে এটা ঠিক যে, নানাকারণে ভবানী দাসের তুলনায় মৃণালকান্তি অনেক বেশি প্রচারের আনুকূল্য পেয়েছিলেন যার জন্যে উনি আজকের দিনেও ততটা অপরিচিত নন।

ভবানী দাসের নামটা আবার একবার এসে পড়ল। সেই সূত্রে আমার অন্য আর একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। তুমি আগে বলেছিলে যে ১৯৩৬ সালে ভবানী দাস পঙ্কজ মল্লিকের সুরে একখানা রেকর্ড করেছিলেন যাতে একটা বাউলাঙ্গ আর একটা কীর্ত্তনাঙ্গ গান গেয়েছিলেন। যেহেতু এরকম একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা একালে বিশেষ কারুর জানা নেই তাই পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা একটু বলো না।

বিমান—কথাটা হল যে ওই সময়টায়, পঙ্কজ মল্লিক তখন বিভিন্ন কোম্পানীতে ট্রেনারের কাজ করছিলেন। মেগাফোনে, হিন্দুস্থানে আর কলাম্বিয়াতে। আমার মনে আছে ১৯৩৫-৩৬ সালে উনি, মেগাফোনে, ফুল্লনলিনীর একখানা রেকর্ডের গানে সুর করেছিলেন। তবে এটাও ঠিক যে, সাধারণতঃ উনি ট্রেনার হতে চাইতেন না, তবু অনেক অনুরোধ, জোরাজুরি করে, তাঁকে রাজী করানো হোত। হিন্দুস্থানে তাঁকে এরকম ডাঃ সুধামাধব সেনগুপ্ত (সুরসাগর হিমাংশু দত্তর শৈশব সুহৃদ), বীরেন বল (নিউ থিয়েটার্সে পঙ্কজ মল্লিকের প্রিয় সহকারী) আর পাহাড়ী সান্ন্যালের একখানা বেসিক গানে সুরারোপ এবং ট্রেনারের কাজ করতে হয়েছিল। এ ছাড়া এইচ এম ভিতে, অল্প হলেও, কয়েকবার অনুরোধে পড়ে এ কাজ করেছিলেন। ভবানী দাসের রেকর্ডও সম্ভবত ওইরকম কোন ঘটনার ফসল। আসলে না চাইলে কি হবে, পঙ্কজ মল্লিক মানুষ হিসেবে এত ভদ্র, ভালমানুষ এবং সর্বজন শ্রদ্ধার মানুষ যে অনেক সময় তিনি পরিস্থিতির বিচারে এবং চাপে কারুর কারুর অনুরোধ ঠেলতে পারতেন না।

একসময় কলম্বিয়া যখন এইচ এম ভির থেকে আলাদা ছিল তখন এইচ এম ভিতে গান রেকর্ডিং-এর সব কিছু ভার ছিল কমল দাশগুপ্তর ওপর। গান রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে কমল দাশগুপ্তর কথাই ছিল শেষ কথা।

অথচ দেখ, এই কমল দাশগুপ্তকেও এখন লোকে সেভাবে চেনে না। তাই এই ফাঁকে তার সম্বন্ধে দু একটা কথা স্মরণ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যশোহরের ছেলে। ত্রিশ/চল্লিশের দশক থেকে গ্রামোফোনের ডিস্কে তাঁর সুরে অনেক গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল যূথিকা রায়ের গাওয়া—'সাঁঝের তারকা আমি'—গানটা দিয়ে, যে গান আজও রীতিমত জনপ্রিয় এবং বড় বড় শিল্পীদের গলায় এখনো এর রিমেক বাজারে বেরোচ্ছে। তাঁর গান গেয়ে, সেই চল্লিশ দশক থেকে ষাট দশক পর্যন্ত কতো যে ডাকসাইটে গায়ক-গায়িকা তৈরি হয়েছে তার হিসেব দেওয়া শক্ত। রেকর্ড ছাড়া, বাংলা-হিন্দি ছায়াছবিতে, তাঁর সুরে কত গান যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিল তারও কোন হিসেব নেই। ১৯৩৬-এ 'পণ্ডিত মশাই'-এ তাঁর প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা। ষাটের দশকে উনি

বাংলা দেশে চলে যান। তারপর নানান ব্যক্তিগত সমস্যা জর্জরিত অবস্থায় অবহেলা, অনাদর, অনটনে লোকচক্ষুর আড়ালে, ঢাকাতেই মারা যান। এককালে যিনি ছিলেন ভারতজোড়া সঙ্গীত জগতের অবিসম্বাদী প্রাণপুরুষ তাঁর এইভাবে চলে যাওয়া ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। হয়ত এই ওঁদের পরিবারের —বিধিলিপি। শিল্পীজীবনে তাঁদের যা পাবার কথা তা শেষপর্যন্ত তাঁরা পাননি। দাদা প্রোঃ বিমল দাশগুপ্ত, অনুজ সুবল দাশগুপ্ত বা সহোদরা সুধীরা সবায়ের ভাগ্য ছিল প্রায় একই রকম। তবে এদিক থেকে দেখলে ক্রীড়া জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ওঁদের মামা পঙ্কজ গুপ্ত অবশ্যই ব্যতিক্রমী। তা সে যাক গে—কমল দাশগুপ্ত সম্বন্ধে যা বলেছিলে সে কথাই বলো।

বিমান—হ্যাঁ, কমল দাশগুপ্ত যখন এইচ এম ভিতে গানের ব্যাপারে সর্বেসর্বা তখন কলম্বিয়ার প্রধান কর্তা ছিলেন এক সায়েব। তিনি একদিন এলেন পঙ্কজ মল্লিকের কাছে। বললেন—'এইচ এম ভিতে কমল দাশগুপ্ত সব দেখাশোনা করছেন। এঁদের সঙ্গে কমলবাবুর সারাজীবনের কনট্রাক্ট, উনি তো হিস্ মাস্টার্সের বাইরে কাজ করতে পারেন না। তাই কলম্বিয়ার সব ভার দায়িত্ব আপনি নিন—এই কথাই বলতে এসেছি'। পঙ্কজদাও তাঁর স্বভাব মত খুব সুন্দর করে জবাব দিয়েছিলেন —'আমারও তো বাইরে কাজ করার খুব অসুবিধে আছে। আমি নিউ থিয়েটার্সের মাইনে করা স্টাফ। নিউ থিয়েটার্সের বাইরে আমি কাজ করতে পারি না, তাছাড়া ওখানে কাজ করে আমার সময়ও নেই। ওখানে আমায় গানে সুর করতে, অর্কেস্ট্রায় কম্পোজ করতে হয়। তারপর প্রতিদিন আমাকে রিহার্স্যাল দেওয়াতে হয়, নিয়ম করে। ওটা আমার অফিসের মত, ওখানে আমায় নিয়ম মত এটেনডেন্স দিতে হয়। তাই আমার পক্ষে অন্য কোথাও কাজ করা সম্ভব নয়।' কিন্তু—পঙ্কজদা আরও বলেছিলেন—'কমলবাবু একটা কেন, উনি দশটা কোম্পানী অনায়াসে চালাতে পারবেন'।

এরপর কমল দাশগুপ্ত সম্বন্ধে যে একটা অপূর্ব মন্তব্য করেছিলেন তা, থেকে পঙ্কজদার অমন বিশাল মাপের চেহারার মত, তাঁর বিশালতর মনের পরিমাপটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উনি বলেছিলেন—'কমল ইজ এ ম্যান, হু ইজ ট্রেনার অফ দি ট্রেনার্স।'

আবার দেখ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ কি বলেছিলেন কমল দাশগুপ্ত সম্বন্ধে। উনি বলতেন, —'কমল সব তৈরি করে আর আমরা সবাই মোট বই। আমরা সব মুটে।'

আমি নিজের চোখে দেখেছি রূপবানী সিনেমাতে যূথিকা রায়ের গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে। যূথিকা রায় গান গাইছেন—কমল দাশগুপ্ত স্টেজে দাঁড়িয়ে কনডাক্ট করছেন। খানিকক্ষণ আগে থেকে গান চলছে এই অবস্থায় দেখা গেল পঙ্কজদা হলে ঢুকছেন। রবিবার সকালে রেডিওতে সঙ্গীত শিক্ষার আসর শেষ করে—এখানে আসতে তাঁর একটু দেরি হয়ে গেছে। কমলবাবু পঙ্কজদাকে দেখা মাত্র গানের মাঝপথেই —পরিতোষ শীলের ওপর ইশারায় কনডাক্ট করার ভার দিয়ে, তাড়াতাড়ি স্টেজ থেকে নেমে এলেন। পঙ্কজদার হাত ধরে, স্টেজে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

আসলে এই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালবাসা, স্বার্থলেশহীন দরদী মন—আজকাল সব যেন ফুরিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে প্রবীণ চিত্রপরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন এই সব হারিয়ে-যাওয়া মূল্যবোধের বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। পঙ্কজ মল্লিকের প্রসঙ্গ তাই উঠল। উনি আমায় বললেন যে, ষাট দশকের গোড়ায় উনি যখন খুব কম বাজেটের ছবি 'আহ্বান' তুলেছিলেন তখন উনি পঙ্কজ মল্লিককে এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনার কথা বলেছিলেন। পঙ্কজদা ভালবেসেই কাজটার ভার নিয়েছিলেন এবং সুন্দরভাবেই তা সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই ছবিতে উনি আবার গানও গেয়েছিলেন। ছবি শেষ হবার পর, যখন পঙ্কজদার কাছে পারিশ্রমিকের কথাটা তোলা হল তখন অনুজপ্রতিম অরবিন্দর ছবি বাবদ একটা পয়সাও উনি নিলেনই না বরং উল্টে প্রযোজকরা আগে নামমাত্র সামান্য কিছু যা অগ্রিম দিয়েছিলেন —পঙ্কজদা সে টাকাও জোর করে ফেরত দিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের দিনে শিল্পীদের মধ্যে এরকম সহমর্মিতা, যেন ভাবাও সম্ভব নয়। কিন্তু পঙ্কজদা— পঙ্কজদাই। আজও তাই তিনি অনেকের মনে পঙ্কজ মল্লিক হয়েই বেঁচে আছেন। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় নিজে না বললে, এমন একটা অবিশ্বাস্য মহত্ত্বের কথা হয়তো কোনও দিনই জানা যেত না।

সে যুগে শিল্পীদের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল এইরকম শ্রদ্ধার। কিছুকাল আগে কাগজওলাদের সাক্ষাৎকারে, একটা প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলুম—তখনকার শিল্পীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গান শিখতেন, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিয়ে গান করতেন। অবশ্য তার সঙ্গে প্রতিভারও দরকার হোত। সেই জায়গায় আমার মনে হয় এখনকার শিল্পীরা বুদ্ধি আর বাণিজ্য, দুটোকে এক করে গান করে। এদের প্রখর বুদ্ধি, বাণিজ্যটা ভাল বোঝে। একটা গান, আমি একবার গাইছি, তক্ষুনি সেটা সে নোটেশন করে তুলে নিচ্ছে। আর পরের দিনই গেয়ে দিচ্ছে। এটা কম কৃতিত্বের নয়। এত বুদ্ধি, যে অনেকেই টেপও করছে না, বলছে, কখন টেপ বাজিয়ে শুনব অত সময় কোথায় ? বড় জোর বলছে এখানটা আর একবার গান। সঙ্গে সঙ্গে নোটেশন করে নিচ্ছে। কালই গেয়ে দেবে ঠিকঠাক। প্রযুক্তি উন্নতি, আজকের দিনে এতটা হয়েছে যে, আমার গান মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট কোরে—'রাম, শ্যাম, যদু, মধু যে কেউ গানের কথাগুলো না বলেও, গেয়ে দিতে পারে।'

আমি একটা গান গাইলাম, মিউজিক অ্যারেঞ্জার তার অর্কেস্ট্রায় সুরটা তুলে নিলে। পরের দিন আর্টিস্ট এলেন, মিউজিকটি কি রকম হয়েছে সেই সুরটা শুনে নিয়ে, আর একবার অর্কেস্ট্রার সঙ্গে শুনতে চাইল। আমি চার লাইন করে গাইব, তারপর থেমে যাবো। আবার অন্তরাটুকু গাইব তারপর থেমে যাবো। এরপর সে আমায় বলল বিমানদা, এবার আপনি শুনুন। তবলা-টবলা সব বাজানো আছে— তবলায় যে ঠেকাটা বাজছে, তার সঙ্গে সে গাইছে। এটা কিন্তু, যাই বলো ছেলেমানুষী নয়—আমি করতে গিয়ে দেখেছি যে আমার সব এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে। আমরা তো চিরকাল গেয়েছি—আমরা গান গাইবো, আমাদের সঙ্গে তবলায় ঠেকা দেবে। কিন্তু এখন তবলা যে রিদ্‌মে বাজছে, সেই রিদ্‌মেই আগাগোড়া গানটা দিব্যি

গেয়ে যাচ্ছে। এটা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে শিল্পীর মেধার—জয়েন্ট উন্নতি। একটা গান যেন তৈরি হয়ে আছে—তার ওপর আমি দাগা বুলিয়ে চলে গেলুম। কোম্পানী গানের মিউজিক তৈরি করে রেখেছে। আমার গলা ভাল, আমার পপুলারিটি আছে, কোম্পানী তাই আমায় ডেকেছে। আমি সেই বাঁধা মিউজিকে একবার গলাটা মিলিয়ে চলে গেলুম। কয়েকটা বোতাম টিপে, একটা গান চট্ করে তৈরি হয়ে গেল। একটা গান শেখাতে গিয়ে, একবার একটু ঢিলে দিয়েছিলুম—তাতেই প্রবীণা শিল্পী আঙ্গুরবালা আমায় বলেছিলেন—'তুমি মাস্টার ফাঁকিবাজ! আর এখন শুনি শিল্পীরা বলছেন আপনি এতক্ষণ কেন রগড়াচ্ছেন ? আপনি বড় সময় নষ্ট করেন, এত করে বারবার বলার কি আছে ? তার চেয়ে বরং এই সময়ের ভেতর, আর একখানা গান তৈরি করান তো ইত্যাদি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আজকাল সিনেমায় একজনের অভিনয় আর একজন আড়াল থেকে করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এর নাম বলছে ডাবিং। আমাদের সময়ে কিন্তু এসব ভাবতে পারতাম না। প্রথম যখন প্লে-ব্যাক চালু হল, তখন আমার বাবা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন, একজন মুখের সামনে অভিনয় করছে আর অন্য একজন পেছন থেকে তার গানটা গেয়ে দিচ্ছে—এ আবার কী!

সে যুগে কেষ্টদা, পঙ্কজদা অভিনয় গানে যা করে গেছেন এমনকি বিনয় গোস্বামী বা পাহাড়ী সান্ন্যালও অভিনয়ের সঙ্গে যে গান করতেন যেমন 'আজি চাতুরি তব পড়িল ধরা' বা 'কেন পরাণ হল বাঁধন হারা' তাতেই লোকে অভ্যস্ত ছিল—শুনেও মুগ্ধ হত। অহি সান্ন্যালের মত আর্টিস্ট যিনি গান জানতেন না, তাঁকেও রীতিমত রগড়া রগড়ি করে গান শিখতে হয়েছিল রাইবাবু বা পঙ্কজদার কাছে, ছবির প্রয়োজনে।

মনে আছে মুক্তি ছবিতে পঙ্কজদার সুরে 'তারে তুই দিস্ নে ব্যথা ভুল করে' বা বিদ্যাপতি ছবিতে রাইবাবুর সুরে দেববালার সঙ্গে যে 'রাই বিনোদিনী' গেয়েছিলেন, তা শুনলেই বোঝা যাবে, কি পরিশ্রম করতে হোত গান শিখতে।

বিমান—তারপর ধরো না, প্রতিশ্রুতি ছবিতে ভারতী দেবীর কণ্ঠের সেই গান 'রাজার মেয়ে কাহার লাগি' ছবিতে, এ গানটা স্বকণ্ঠে গাইবার জন্যে ভারতীদেবীকে কি পরিশ্রম করেই না শিখতে হয়েছিল। তাই, এই সেদিনও একটা সভায়, লোকের অনুরোধে, ভারতীদি এই গানটা কেমন সুন্দর করে গেয়ে দিলেন, যার সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে সেদিন আমাকেই গাইতে হল—কালোদা আজ আর নেই বলে।

বিজ্ঞানের প্রযুক্তি তো আমরা সর্বক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছি। এই দেখ না, হারমোনিয়মেরই কতো পরিবর্তন হয়েছে। ফোল্ডিং হারমোনিয়াম হয়েছে—খটাখট্ স্কেল চেঞ্জ করা যাচ্ছে। আজকাল মেসিনে তবলা বাজছে, চাবি ঘুরিয়ে যে কোনও তাল বেছে, বাজানো যাচ্ছে। প্লাগ লাগিয়ে তানপুরা থেকে সঙ্গে সঙ্গে সুর বের করা হচ্ছে। আর তানপুরাতে সুরে বাঁধতে, আমার বাবার অন্তত মিনিট কুড়ি লেগে যেত। আমার বাবাদের সময়ে গানের আসরে, তানপুরা বেঁধে তার সঙ্গে তবলা মেলাতে,

সারেঙ্গী মেলাতে ওস্তাদদের অনেকটা সময় লাগত। আজকে দেখছি, কি সহজে সুইচ টিপেই, রেডিমেড স্টক মিউজিক বের করে, আসর জমানো হচ্ছে। অথচ তখনকার মিউজিক ডিরেক্টদের কতরকম কায়দা, পরিশ্রমই যে করতে হোত তা বলে শেষ করা যাবে না। পঙ্কজদাকে নারকোলের মালা ঠুকে, ঘোড়ার খুরের শব্দ তৈরি করতে হয়েছে ডাক্তার ছবিতে। কমল দাশগুপ্তকে ডাকতে হয়েছিল অজিত চাটুজ্যেকে। উনি হরবোলা হয়ে তুফান মেলের বাঁশির শব্দ তৈরি করেছিলেন—শেষ উত্তর ছবিতে।

রাইদাকে, চণ্ডীদাস ছবিতে ঝড়ের দৃশ্যের আওয়াজ তৈরি করতে কি যে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল তা এখন ভাবা যায় না। মুক্তি ছবিতে হাতির ডাকের সঙ্গে মিলিয়ে মিউজিক তৈরি করতে, পঙ্কজদাকে পাগলের মত মাথা খাটিয়ে ছটফট করতে হয়েছে—তবেই না বিস্ময় জাগানো, অপূর্ব সব সুর অবিস্মরণীয় হতে পেরেছে। তখন পরিশ্রম করে শিল্পীরা পেতেন অপার পরিতৃপ্তি, মনের শান্তি। আজকে শিল্পীরা, কি বলবো—এখনকার দিনে আর্টস্, সায়েন্স সব সাবজেক্ট উঠে গেছে। একটাই সাবজেক্ট আছে—শুধুই কমার্স। সৃষ্টি নেই, শুধু আছে মেশিনে উৎপাদন।

সেদিন আমায় বৌবাজারে একটা স্টুডিওতে নিয়ে গেল। ওখানে সব কিছু কম্পিউটারে হয়। আমি গান করছি—গান করতে করতে মনে হল, গলায় একটু শ্লেষ্মা উঠে এসেছে। আমি সেটাকে একটু চেপে গানটা শেষ করেছি। ভেবেছি, কেউ বুঝতে পারবে না, ঠিক ম্যানেজ করে নিয়েছি। অথচ দেখ, যে জায়গাটাতে গলা চেপে গান করেছি—ওরা ঠিক সেই জায়গাটা আমায় আলাদা করে শুনিয়ে দিল—বললে, এই জায়গায় আপনার গলায় শ্লেষ্মা এসে গিয়েছিল। আমি তো অবাক বোকা বনে গিয়েছিলুম। যন্ত্রে যা কাণ্ড হচ্ছে, এতটুকু খুঁৎও যেভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে এরপর হয়ত আমাদের আর স্টুডিওতে যেতে হবে না, গাইতেও হবে না।

ঘরে বসে শুধু মনে মনে ভাববো—আর ওরা মেশিন চালিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে, স্টুডিওতে তা গান হয়ে রেকর্ড হয়ে যাবে। কম্পিউটারের যুগে চলে এসেছি, এখন এটাকে মেনে নিতে তো হবেই।

কিন্তু একটা হল রঙতুলিতে, ক্যানভাসে আঁকা ছবি আর একটা আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ফটো। একটায় শিল্পীর প্রাণরসের প্রকাশ আর একটায় সুদক্ষ যান্ত্রিকতার নিখুঁৎ প্রতিচ্ছবি। এই দুটো কি এক ?

বিমান—না, মোটেই এক নয়। একটা গানের সঙ্গে রাজেন সরকার, গোপাল লাহিড়ী বা নৃপেন মজুমদারের ক্ল্যারিওনেট বাজনা আর তার বদলে, ইউনিভক্স বা সিন্থেসাইজারের সঙ্গত—রসের বিচারে কখনো এক হতে পারে না। মেশিনে তবলা, তানপুরা বাজিয়ে হয়ত একটা গানের রেকর্ডিং হয়ে যেতে পারে কিন্তু শিল্পীরাও বুঝে যাচ্ছে, জেনে যাচ্ছে যে, চিরস্থায়ী হবার মত গান এভাবে কখনো


জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী

হয় না—তাই তারা সেরকম করে গাইতেও পারছে না। তারা খুবই কনসাস যে তারা কোনদিন পঙ্কজ, সাইগল, হেমন্ত বা শৈলদেবী, লতা, সন্ধ্যা হতে পারবে না। কোম্পানীরাও এখন টাকা নিয়ে ক্যাসেট করে দেয়, কিন্তু সে ক্যাসেট কটা বাজারে কাটছে, তারা তার পরোয়া করে না, তবে একটু আধটু পাবলিসিটি তো হয়।

ভাবখানা এইরকম যে, আমি বিমান মুখোপাধ্যায় এবার পুজোয় আমার চারখানা ক্যাসেট বেরিয়েছে। এবার আমি অনেক সুযোগ সুবিধে পাবো, অনেক জায়গায় গান গাইবার ডাক পাবো—তাহলে টাকাপয়সাও বেশ রোজগার করব।

এর প্রেক্ষাপটে, আমার ধারণা নেই, কৃষ্ণচন্দ্র দের মত শিল্পী কটা অনুষ্ঠানে গান গেয়ে একশো টাকার মত পেয়েছেন। জ্ঞান গোঁসাই (১৯০২-১৯৪৭) তিরিশ টাকা পেলে ভাবতেন অনেক টাকা। সত্যি তখন তিরিশ টাকার অনেক মূল্য ছিল কিন্তু যতই হোক তিনলক্ষ তো নয়। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৭৭) মাত্র চারখানা রেকর্ডে আটখানা বাংলা গান গেয়েছিলেন। তাতেই উনি অমর। অথচ তাঁর গান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ১৯৩৬ সালে, পরে আর কোন রেকর্ড হয়নি। এই হল সত্যিকারের শিল্পীর পরিচয়। আজও 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর' শুনলেই লোকে বলে দেবে এটা জ্ঞান গোসাই-এর গান। কিংবা ধরো 'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়।' এও সেই জ্ঞানবাবুকে মনে পড়াবে—উনি মানুষের মনের যে সিংহাসনে বসেছিলেন সেটা যে এখনো খালি রয়ে গেছে!

আর একটা জিনিস ছিল—সেটাই বা আর কই ? শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক—একজনের প্রতি আর একজনের কি শ্রদ্ধা-সম্মান, মর্যাদা দিতে কি আন্তরিকতা।

একটা ঘটনার কথা বলি—নিউথিয়েটার্সের হয়ে তখন কচিদা, মানে সুবোধ মিত্র রাইকমল ছবি করবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। কচিদা পঙ্কজদার কাছে গেছেন। পঙ্কজদাকে অনুরোধ করছেন—এ ছবিতে আমি 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধূ' গানটা দেবার কথা ভাবছি। আমার খুব ইচ্ছে যে আপনি এই গানটা এই ছবিতে করুন। পঙ্কজদা এ ছবির সঙ্গীত পরিচালকও বটে। পঙ্কজদা রাজী নন। অনেক অনুরোধেও কচিদা, কিছুতেই পঙ্কজদাকে টলাতে পারলেন না। পঙ্কজদা বললেন—না, না। কেষ্টদা ও গান, যা করে গেছেন, এ জিনিস আমি গাইব না। ও আমি পারব না। আমি আমাকে, আ—র নিচে নামাতে পারবো না।

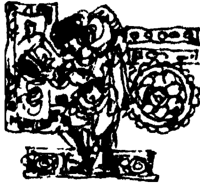
এই যে একজন শিল্পীকে বা তাঁর সৃষ্টিকে মর্যাদা দেওয়া বা সম্মান দেখানো—যা পঙ্কজ মল্লিক সেদিন অনড় থেকে দেখিয়েছিলেন—আজকালকার শিল্পীরা কি আর এসবের তোয়াক্কা করবে ? তারা নির্বিচারে বলবে—'দাও, সায়গল কবে গেয়েছিল


কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

তো কি হয়েছে, তা বলে আমি গাইব না কেন' ?

তোমার এই কথায়, এখানে পঙ্কজ মল্লিকের আর একটা কথা, আমার মনে পড়ে গেল। এই কিছুদিন আগে, রেডিওতে (এফ.এম/২—১০.০১.২০০৩) আশি বছরের প্রবীণা শিল্পী সাবিত্রী ঘোষের কথা শুনছিলুম। কথা প্রসঙ্গে উনি বলছিলেন যে গানের জগতে, শুধু হিমাংশু দত্তর নামের সঙ্গেই কেন 'সুরসাগর' উপাধিটা লেখা হয় বা অন্য যাঁরা এ উপাধি পেয়েছেন তাঁদের তো, কই এ সম্মান অভিধাটি বড় একটা ব্যবহার করতে দেখা যায় না! কোন এক সময়ে, শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে উনি কথাটা পেড়েছিলেন। তাতে, কণিকা দেবী বলেছিলেন যে পঙ্কজ মল্লিকও সুরসাগর ছিলেন এবং উনিও তা বিশেষ উল্লেখ করতেন না। তাই একবার তিনি পঙ্কজ মল্লিককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে উনি কেন এই সম্মান চিহ্নটি ব্যবহার করেন না ? এতে পঙ্কজকুমার তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন যে, 'যে উপাধিটা প্রকৃত সুরসাগর, হিমাংশু দত্তকে দেওয়া হয়েছিল—সেটা অন্য কারুর পক্ষে ব্যবহার করা আর মানায় না। সুরসাগর ওই একজনই, তাই আর কি করে.........' শ্রদ্ধার্হর প্রতি শ্রদ্ধার—এমন গভীর স্বীকৃতির নিদর্শন—দুজন শিল্পীরই মহত্বকে কি অলোকসামান্য স্তরেই না তুলে ধরেছে! তাই না ?





একাদশ পরিচ্ছেদ

আধুনিক বাংলা গানের জগতের সেকাল-একাল নিয়ে, তোমার অভিজ্ঞতার কথা, অনুভূতির কথা তো অনেকটা বললে। তবে সেই গান বাজনার কেন্দ্রস্থল, কলকাতা বেতারের নিজস্ব শিল্পী মহলের কারুর কারুর কথা একটু আধটু বলো না,—যাদের কথা এখন আর কেউ বলে না, এযুগে যাদের কেউ চেনে না বা জানে না।

বিমান—হ্যাঁ, সে রকম দু'একজনের কথা বলতে গিয়ে—প্রথমেই মনে পড়ছে নীলিমা সান্যালকে। মূলতঃ তিনি ছিলেন বেতারের ঘোষিকা তবে তিনি যে কি করতেন না তা বলা শক্ত। তিনি ভাল গান করতেন—রেডিওতে আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত নানা গানের প্রোগ্রাম প্রায়ই শোনা যেত, বেতারের নাটকে নিয়মিত অভিনয় করতেন, মহিলামহল, ছোটদের গল্পদাদুর আসর—যখন যেখানে দরকার পড়ত তখনই তাঁর ওপর অনুষ্ঠানটি চালিয়ে নেবার ভার দেওয়া হত। আর সব সময় তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ওই আসরগুলো পরিচালনা করতেন। এছাড়া নিয়ম করে বাংলা খবর পড়ার কাজও তাঁকে করতে হত। সুস্পষ্ট উচ্চারণ, সাবলীল বাচনভঙ্গির দরুণ তাঁর সংবাদ পাঠও বেশ জনপ্রিয় ছিল।

আমারও খুব মনে আছে—এইরকম ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সব কাজের কাজী সমসাময়িক কালে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছাড়া বোধহয় আর কেউ ছিলেন না। তবে বিয়ে হয়ে নীলিমা মালহোত্রাকে দিল্লিতে চলে যাবার পর কলকাতা বেতারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কমে আসছিল। তারপর তো উনি বেশিদিনি আর বাঁচলেনও না। অকালেই চলে গেলেন, হারিয়েও গেলেন।

বিমান—তখনকার সেই যুগে শুধু নীলিমা সান্যাল কেন, বেলা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ এঁরাও শুধু গান নয়—মাঝেমধ্যে অভিনয়ও করতেন—বীরেনদা, বাণীকুমারের নানা অনুষ্ঠানে। আর একজনের কথা বলি—জয়ন্ত চৌধুরী, নামকরা অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরির ছেলে। ইনিও একটামাত্র কাজ নিয়ে থাকতেন না। তবে গল্পদাদুর আসর পরিচালনা আর নাটকে অভিনয় এ দুটোই বেশি করতেন। অপূর্ব কণ্ঠস্বর ছিল। কয়েকটা ছায়াছবিতেও অভিনয় করেছিলেন। পরশুরামের বিখ্যাত 'চিকিৎসা

সঙ্কট' ছবিতে নন্দর ভূমিকায় (১৯৫৩) বা মৃণাল সেনের পুরস্কারপ্রাপ্ত 'আকালের সন্ধানে' (১৯৭৯) ছবিতে তাঁর অভিনয় খুবই প্রশংসা পেয়েছিল। তবে এবার আমি এমন একজনের কথা বলব—যাঁকে বোধ হয় কেউ মনেই করতে পারবে না। তাঁকে আমি আমাদের বাড়িতেও অনেক আসতে দেখেছি। তিনি যেমন ভাল গান গাইতেন তেমনি অসাধারণ তবলা বাজাতে পারতেন। রেডিওতে কৃষিকথার আসরে, পল্লীমঙ্গল আসরে তো প্রায়ই অংশ নিতেন। তবে কথকতার আসরে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না—যেমন বাচন, তেমনি দুর্দান্ত মুক্তকণ্ঠের গান। বাণীকুমার-পঙ্কজ মল্লিকের বেতার-বিচিত্রার অনুষ্ঠানে তিনি প্রায়শঃই গাইতেন। শ্রীমতী বিজনবালা ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে রেকর্ডেও গান গেয়েছিলেন। এঁর নাম এখন প্রায় অচেনাই মনে হবে—মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কাশী বেনারসের লোক—ছোটবেলা ওখানেই কেটেছে। সত্যিকারের গুণী মানুষ, গুণী শিল্পী। চলার পথে এমনি কতো লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। তার কিছু মনে থেকে যায়—আর কিছু এই মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মানুষ কি করে যেন হারিয়ে যান, আমরাও ভুলে যাই।

বেতারের সূত্রে আর একজনের কথা আমারও মনে পড়ছে—দ্বিজেন চৌধুরি। পুরোপুরি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মানুষ হলেও অন্যান্য জাতের গান, নজরুলের গান, আধুনিক গান, দরকারমত সবই তিনি গাইতেন। তিনি একজন অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন—সেই সঙ্গে ভাল গায়কও। অতিব্যস্ত, কাজ পাগল, সর্বদা কিছু না কিছু করছেন এমনি মানুষ। সুপ্রীতির সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করেছিলেন —একপিঠে 'আলোকের এই ঝর্না ধারায়', আর অন্য পিঠে 'তার অন্ত নাইগো যে আনন্দে'।

একটা কথা বলি। আজ কলকাতার বাজারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এত কাটতি, বিশাল বাণিজ্যিক শিল্পের মত রমরমা। পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মত রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার স্কুল, আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় এত সব হয়েছে। কিন্তু পঙ্কজ মল্লিকের মত বা পঙ্কজ মল্লিকের পরে, অরাবীন্দ্রিক উৎস থেকে উঠে এসে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসারের জন্যে দ্বিজেন চৌধুরী যা করেছেন, সেরকম আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। একথাটা আজকের দিনে অন্তত সততার সঙ্গে স্বীকার করা উচিত। অথচ আমরা দেখছি সবাই নিজের নিজের নাম, স্বার্থসিদ্ধি নিয়েই মত্ত। বাইবেলের প্যল্কে তাঁর প্রাপ্য যাতে না দিতে হয়, সেইরকম একটা মনোভাব থেকেই বোধহয়, দ্বিজেন চৌধুরির (১৯১২-১৯৮৪) নামও এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার-পুষ্ট তন্ত্রধারক ব্যবসায়ীরা, বড়ো একটা উচ্চারণ করেন না। অথচ এই কলকাতায় প্রথমে গীতবিতান সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনিও যে অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন তা যেমন ভুলেও বলা হয় না তেমনি তাঁর তৈরি, পরবর্তী রবিতীর্থ প্রতিষ্ঠানও যেভাবে তিনি আমৃত্যু আগলে রেখে, সুপরিচালনার গুণে, শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন তাও ক'বার আর বলা হয় এখানে! অন্যতম সহযোগী সুচিত্রা মিত্র, মাথার ওপর রয়েছেন বলে তবু হয়ত কখনো এক আধবার নমো নমো করে তাঁর নামটা উঠে

আসে। আমি নিজে রবিতীর্থের অনেক ছাত্রছাত্রীকে দ্বিজেন চৌধুরির কথা জিজ্ঞাসা করেছি—যেসব জবাব শুনেছি, তা না লেখাই ভাল। দীর্ঘ সুঠাম পুরুষালি চেহারা, বিরল কেশ, সবসময় ধবধবে ফরসা ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী—সিরিয়াস টাইপের একটু সোজাসুজি কথা বলার মানুষ। তাই অকারণে 'মাই ডিয়ার' বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে বিগলিত ভাব দেখানোর কোনও চেষ্টাই তাঁর ছিল না। আমি ১৯৪৫ থেকে ষাটের দশকের মাঝবরাবরের কথাই বলছি। তাঁকে অনেক দেখেছি। মানুষও এমনি বন্ধু জনোচিত ছিলেন যে বহুৎ অনুষ্ঠানে, কলেজের ফাংশানে আমরা অতি সামান্য টাকাপয়সাতেই তাঁকে আনতে পারতুম। কলেজের ফাংশনে তো উনি কখনো না বলতেন না। তখন কোন কোন অনুষ্ঠানে অনুরোধ করলে, সুচিত্রা মিত্রকেও নিয়ে আসতেন। উনি তখন রবীন্দ্রনাথের গান শেখার ব্যাপারে খুবই ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। বিয়ে-থা করেননি, রবীন্দ্রসঙ্গীতই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উপজীব্য, অথচ মজা এই যে তাঁর প্রথম রেকর্ড আধুনিক গানের। অনুপম ঘটকের সুরে 'স্বপন দেশের রাজকুমারী' আর অন্যপিঠে 'তোমার আমার মাঝখানেতে'। পরেও অবশ্য ১৯৪৪ সালে কবি অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত 'ছদ্মবেশী' ছবিতে শৈলদেবীর সঙ্গে প্লেব্যাক গেয়েছিলেন--'ফুল যদি ফুটল, অলি যদি জুটল' —যেটা সে যুগে খুব জনপ্রিয়ও হয়েছিল। এই গানের জন্যে অনেক আধুনিক গানের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের বাদ দিয়ে সুরকার শচীনদেব বর্মন দ্বিজেন চৌধুরিকে যে বেছে নিয়েছিলেন—তা থেকেই দ্বিজেন চৌধুরির নানারকম গানে দক্ষতার কথা স্বীকৃতি পেয়েছিল। শুনলে হয়ত অনেকের অবাক লাগবে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষত শিক্ষক হিসেবে যে দ্বিজেন চৌধুরির প্রধান পরিচয় এবং যাঁর অন্তত এক ডজনেরও বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করা হয়েছিল, তিনিই আবার এগারোটা ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল—'কামনা' নামে একটা ছবি, যাতে পরবর্তীকালের মহানায়ক উত্তমকুমার প্রথম পর্দায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই দুঃখ হয় তিনি কিন্তু তাঁর জীবনে বা পরবর্তীকালে সেরকম কোনও মানমর্যাদা পেলেন না। আপাদমস্তক গানে নিবেদিত প্রাণ, মানুষটি নীরবে চলে গেছেন, তারপর বিস্মৃতির অন্ধকারে নিঃশব্দে তলিয়ে গেছেন। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই মর্যাদা পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারটা অনেকগুলো সম্প্রদায়, স্বার্থ এবং গোষ্ঠীগত কারণের ওপর নির্ভর করে। সেগুলো অনেকেই জানেন এবং মানেন কিন্তু মুখ খুলে কেউ বলতে চান না। সেও ওই গোষ্ঠীগত ভ্রূকুটির ভয়ে। কাল-পঞ্জিকার দুই মেরু থেকে কয়েকটা নাম, অন্ধকার থেকে টেনে বের করলেই ব্যাপারটার যাথার্থ বোঝা যাবে। ব্যাখ্যার আর দরকার হবে না—সেকালের সেই অসিত ঘোষাল (দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল), বেলা রায় ভট্টাচার্য (একলা বসে অন্যমনে), ইন্দুলেখা ঘোষ (রোদনভরা এ বসন্ত), চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত (নিবিড় অমা তিমির), সমরেশ চৌধুরি (মোর ভাবনারে কি হাওয়ায়), অমিতা সেন (যে ছিল আমায় স্বপনচারিনী), সুজিৎ রঞ্জন রায় (যাবার বেলায় শেষ কথাটি), সুনীল রায় (একলা বসে হেরো তোমার ছবি/একী সুগন্ধ)

থেকে নিয়ে, প্রায় একালের রাজেশ্বরী দত্ত, এমনকি বলতে গেলে, পঙ্কজ মল্লিকদের পর্যন্ত কেন যে মধ্য সনাতনী প্রথায়, একঘরে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল—সেই কুটিল তর্কে, আপাতত ঢোকার প্রশ্ন নেই। কেননা, আমাদের এখনকার বিষয় আধুনিক বাংলা গানের ভুবন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভুবন নয়।

বিমান—হ্যাঁ, আমরা তাই ওইসব বিতর্কে ঢুকব না। কে মর্যাদা পেল আর কে না পেল তা নিয়ে, কোন সমালোচনা আলোচনায় যাব না। আমি বলব, আমরা যাঁদের পেয়েছি, শুধু তাঁদের নিয়ে দু'এক কথা। তাছাড়া শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীদের কথা কেন, অন্য শিল্পীদের কথাও তো এইভাবে বলে যাব।

সেদিন সুচিত্রা মিত্রর সঙ্গে আমার একটা অনুষ্ঠানে দেখা হল। আমি সুচিত্রাদিকে বললাম—'আপনার প্রথম রেকর্ড, মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান' উল্টো পিঠে 'হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়' তার লেবেলে লেখা ছিল পরিচালনা আবদুল আহাদ। আবার হেমন্তদার 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়' রেকর্ডের লেবেলেও ছিল পরিচালনা আবদুল আহাদ। তাহলে দেখুন ওইরকম একজন গুণী মানুষের নাম ক'জন আর মনে রেখেছে। অথচ আপনার ওই গান শোনার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর আমাদের একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল, তারপর আপনার 'নৃত্যের তালে তালে' বেরোবার পর থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কি রকম ভালবাসতে হয় তা বুঝলুম, শিখলুম। তবে আপনাকে একটা কথা বলি, আমি সুচিত্রাদিকে আরও বললুম, পরে আপনার নজরুলগীতিও শুনলুম। আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি ওই গানটা কি ভালই যে গেয়েছিলেন—'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ নবযুগ ওই এল ওই'।

উনি বল্লেন, আমায় এ গানটা গোপালদা (দাশগুপ্ত) শিখিয়েছিলেন। প্রকৃত জাত-শিল্পী, তাই সুচিত্রাদি সবিনয়ে স্মিত হেসেছিলেন। সুচিত্রাদি যেমন নজরুলগীতি গাইতে পারতেন তেমনি গণনাট্যের আধুনিক গান বা অতুলপ্রসাদের গানও সমান দক্ষতায় গেয়ে, সবাইকে মুগ্ধ করে ফেলতেন। আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই—সেখানে তিনি তো অতুলনীয়া স্বয়ংসিদ্ধা। কারুর কিছু বলার নেই।

এই প্রসঙ্গে মোহরদির কথাও একটু আসে। আমি যখন শান্তিনিকেতনে বছর ছয় সাত আগে, অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলাম তখন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ওপর থেকে নেমে এসে, আমার হাত ধরে, আমায় ওপরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তো অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া, ওখানে আমি সব বিষয়ে সবরকম গান গেয়েছিলাম। খুব কম লোকই জানে যে এককালে মোহরদি মাসে বারদুয়েক কলকাতায় আসতেন, গান শেখবার জন্যে। কমল দাশগুপ্তর কাছে নজরুলের গান আর প্রকাশকালী ঘোষালের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম—দুটোই বলতে গেলে নিয়মিতই নিতেন। প্রকাশকালী ঘোষাল ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য ছিলেন। তাই তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা বাংলা নানাধরনের গান কোনটাতেই কম ছিলেন না।

হ্যাঁ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক গানের কথা বা সুর তিনিই করেছিলেন।

সেগুলো খুব জনপ্রিয়ও হয়েছিল। তাছাড়া কলকাতা বেতারের রম্যগীতিতেও তিনি অনেক গান করিয়েছিলেন। বেতারজগতের পাতায়, ওইসব গানের কোন কোনটার কথা ও স্বরলিপি ছাপা হত তাতে বহুবার ওঁর নাম দেখেছি। আধুনিক বাংলা গানে তাঁর সুরের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকত যার গুণগত মান, সেসময়ের আধুনিক গানে একটা অন্য মাত্রা যোগ করত।

বিমান—ওই সময়টাতেই তো, আধুনিক গানের মান মর্যাদাও যথেষ্ট বেড়েছিল। আগে তুমি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কথা শুনেছ। আমি তাই এবার সমসাময়িক আর একজনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, তিনি হলেন শচীন গুপ্ত। শচীন গুপ্ত একসময় অনেক সাড়া জাগানো গান গেয়েছিলেন, তেমনি আবার গানের সুরও করেছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। অনেক ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। তাঁর অনেক বিখ্যাত গান ছিল যেগুলো রেডিওর অনুরোধের আসরে প্রায়ই বাজাতে হোত—

তার মধ্যে মনে পড়ে, 'বনহরিণীর চকিত চপলা আঁখি' আর 'বৃষ্টি এনে দাও' এ দুটো দারুণ জনপ্রিয় ছিল।

বিমান—তবে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটা গানে, শচীন গুপ্ত প্রথম সুর করেছিলেন ১৯৫৩ সালের পুজোর রেকর্ডে—যা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটা ছিল 'বরষপরে পুজোর ঘণ্টা বাজলোরে, ওরে মা এসেছেন ঘরে' পুজোয় সুপ্রীতি ঘোষ গেয়েছিলেন। সুপ্রীতি ঘোষের তখন যথেষ্ট নাম-টাম হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও শচীন গুপ্তর একাধিক রেকর্ড ছিল। ছায়াছবিতে প্লেব্যাকে অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলেন। বিশেষ করে মনে পড়ে অনন্যা ছবিতে কানন দেবীর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে বা দিগভ্রান্ত ছবিতে উৎপলা সেনের সঙ্গে।

তখন তো মেয়েদের মধ্যে সুপ্রীতি ছাড়া সুপ্রভা সরকার, ইলা ঘোষ, শৈল দেবী এঁদেরও খুব নামডাক, জনপ্রিয়তা ছিল, তাই না ?

বিমান—না, শৈল দেবী তখন আর নেই। উনি ১৯৪৪ সালে অকালে চলে গিয়েছিলেন।

তাহলে ওঁর কথাটাই বলো—কেননা ইতিমধ্যেই উনি বিস্মৃতদের দলে হারিয়ে গেছেন। শৈল দেবী পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ১৪/১৫ বছর বয়সে আর ১৯৪৪ সালে তিনি মারা গেলেন। এর ভেতর প্রথমে অনামা গায়িকা হিসেবে শুরু করে মাত্র আটাশ বছরে মারা যাওয়ার মানে মোটে বছর আস্টেক ছিল, তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের আয়ু। এই থেকেই বোঝা যায় কি অসাধারণ প্রতিভাময়ী শিল্পী ছিলেন শৈল দেবী। বেতার জগতের প্রচ্ছদে বার দুই তাঁর ছবি ছাপা হয়েছিল ৩০ দশকের শেষে এবং ৪০ দশকের গোড়ায়। একেবারে আমাদের বাড়ির মা-দিদি-বৌদির মত শান্ত, ঘরোয়া শ্রী, কমনীয় মুখ ঘোমটা মাথায়, কপালে বড় গোছের টিপ। মহালয়ায় রেডিওর মহিষাসুরমর্দিনীতে তখন শৈল দেবী গাইতেন 'বাজলো তোমার আলোর বেণু'। পরে এবং এখনো যে গান সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠেই আমরা


শৈল দেবী

শুনি। তবে একেবারে আদিতে, গোড়ায় গোড়ায় এ গানটা গাইতেন শ্রীমতী রাধারানী দেবী। শৈল দেবী গাইতেন মধ্যযুগে।

বিমান—শৈল দেবীর কণ্ঠস্বর ছিল বাঁশির মত সুরেলা, মিষ্টি। সামান্য তীক্ষ্ণ, নির্ঝরিনীর মত সাবলীল। কমল দাশগুপ্ত খুব সহজে বড় একটা কারুর সুখ্যাতি করতেন না। গানের ব্যাপারে উনি ভীষণ খুঁৎখুঁতে ছিলেন। তা, সেই কমল দাশগুপ্ত বলেছিলেন—'শৈলর মত গলা, খুব রেয়ার গলা।' তখনকার দিনে এখনকার মত তো নানা উন্নত ধরনের মাইক্রোফোন ছিল না। তবু তাতে শৈল দেবীর গলা খুবই, সুন্দরভাবে আসত। সে যুগে যে সব সাধারণ যন্ত্রপাতি ছিল তাতেও মনে হোত ওঁর গলার স্বর যেন মাখমের মত নরম—গলার ওঠা, নামা, সব কি মসৃণ, কোথাও কোনরকম আটকাতো না। সূক্ষ্ম কাজ, উচ্চারণ সবেতেই অদ্ভুত তৈরি।

আমি যতদূর জানি উনি ভীষ্মদেবের কাছে ক্ল্যাসিক্যাল শিখেছিলেন। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে কীর্ত্তন শিখেছেন। বড় বড় সুরকারদের পরিচালনায় বহু বাংলা ছবিতে আধুনিক গান গেয়েছেন যেমন হিমাংশু দত্ত, অনুপম ঘটক, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, কতো আর বলব। রেকর্ডিং এর ব্যাপারে চিত্ত রায়ের কাছে অনেক শিখেছেন। চিত্ত রায়ের কাছে তিনি নজরুলের গানও ভাল করে শিখেছিলেন। এই শৈল দেবীর কণ্ঠে আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত 'ঝরা পাতা গো আমি তোমারই দলে' বা 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে' শুনে সে যুগে লোকে মুগ্ধ হয়ে, বারবার শুনতে চাইত।

আর একটা জিনিস। ওঁদের সময়ে রেডিওতে বেতার-বিচিত্রা নাম দিয়ে একটা সঙ্গীতানুষ্ঠান মাসে অন্তত দু'বার প্রচারিত হত। বেশির ভাগ অনুষ্ঠানগুলো বাণীকুমারের লেখা, আর পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনায় খুব জনপ্রিয় ছিল। আর তাতে মেয়েদের মধ্যে তিনজন প্রায় বাঁধা শিল্পীর মত প্রায় সব অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নিতেন—শৈল দেবী, ইলা ঘোষ আর সুপ্রভা ঘোষ। তার মানে সারা মাস ধরে শৈল দেবীর নানা ধরনের গান রেডিওতে প্রচারিত হোত। আমি নিজে বেতারের বিভিন্ন আসরে তাঁর খেয়াল, ঠুংরি, রাগপ্রধান, কীর্ত্তন, আধুনিক কাব্যগীতি, নজরুলগীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনেছি। তাছাড়া শৈল দেবীর গান বাদ দিয়ে, বাংলা ছায়াছবির গান—তখন তো ভাবাই যেত না। তার মানে, তাঁর গানের গুণমান, বৈচিত্র্য বা জনপ্রিয়তায়—তিনি ছিলেন সত্যিকারের অদ্বিতীয়া। আসলে গীতধর্মে তিনি ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধা। সত্যিই কি সব গান! তাঁর কয়েকটা মাত্র গানের উল্লেখ—করলেই অনেকের মনে, সেই ধূসর মুগ্ধতা—সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে। আর সেগুলোর সুরকারদের নামগুলো জানলে অবাক হতে হবে। অত বড় বড় সুরকারদের সবায়ের কাছেই শৈল দেবীর কি ভীষণ কদর ছিল—'রাতের ময়ূর ছড়ালো', 'শুধু

কাঙালের মত', 'বনের কুহু কেকা সনে' (হিমাংশু দত্ত), 'মোছে কি গো পরিচয়' (চিত্ত রায়), 'বাংলার বধূ', 'বনে নয় মনে' (অনুপম ঘটক), 'নয়নে আমার বিরহ অশ্রু' (দুর্গা সেন), 'ফুল যদি ফুটল' (শচীন দেববর্মন), 'হারানো দিনের হারা হাসি যতো' (শৈলেশ দত্তগুপ্ত), 'সে তো ভাসায় ফুল জলে' (রবীন চট্টোপাধ্যায়),। এছাড়া, অবিস্মরণীয় সব নানা জাতের গান যেমন—'বরষার মেঘ নামে' (রাগপ্রধান), 'মধুমালা সেই গো' (লোকগীতি), 'অগুরু চন্দন দিয়ে' (কীর্ত্তন), 'ওগো প্রিয় তব গান' (নজরুল), 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে', 'সমুখে শান্তি পারাবার' (রবীন্দ্রসঙ্গীত) --এগুলো শুধু বহুমুখী গানের ভুবনে, শৈল দেবীর অবাধ বিচরণের উদাহরণ মাত্র। তবে তাঁকে বুঝতে, এইই, মনে হয় যথেষ্ট।

বিমান—শৈল দেবীকে অবশ্য, আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবে তাঁর মেয়ে লীনা সাহা কয়েকবার আমার কাছে এসেছিল।

তাই নাকি ? তাহলে তো এখানে আমাকে একটা অন্য গল্প—গল্প নয়, ঘটনার কথা বলতেই হচ্ছে। শৈল দেবীর মেয়ে লীনার কথা তুললে বলেই, সেই দুঃখজনক ঘটনার কথাটা মনে পড়ে গেল—

১৯৮৩-র শুরু থেকে যুগান্তরের (তখনো বাগবাজারের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা বন্ধ হয়নি) রবিবাসরীয় সাময়িকীতে, প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর সাম্য-প্রবক্তা এক খ্যাতি সম্পন্ন কবির আত্মস্মৃতি, প্রতি রবিবার ধারাবাহিকভাবে কিস্তি-কিস্তিতে বেরোচ্ছিল 'পূর্বজন্মের রাস্তা ধরে'। এটা পরে বই হয়েও বেরিয়েছিল এবং দেশ বিভাগের আগেকার, পূর্ববঙ্গের নানান অভিজ্ঞতার ব্যক্তিগত গল্প, সুখপাঠ্য রচনার গুণে বেশ সমাদৃতও হয়েছিল। প্রতি রবিবারের যুগান্তরে আমিও আগ্রহ নিয়ে লেখাটা পড়তুম এবং হয়ত উপভোগও করতুম। কিন্তু একটা কিস্তির লেখায় (২০.২.১৯৮৩) আমার প্রিয় গায়িকা, শ্রীমতী শৈল দেবীর পারিবারিক জীবন নিয়ে এমন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছিল যে, একজন বিখ্যাত কবি মানুষের পক্ষে যে এরকম লেখা সম্ভব তা দেখে রীতিমত আহত হয়েছিলুম। বিশেষ করে, বিশেষ একটি লাইনের ভাষায় এবং তথ্যে। কবি ওই লাইনে লিখেছিলেন যে 'একজন সামান্য মোটর গাড়ি চালকের স্ত্রী শৈল দেবীর গাওয়া কাবেরী নদীজলে রেকর্ডের গানটি শুনে, বাল্যকালে তিনি মুগ্ধ হতেন।'

শ্রীমতী শৈল দেবীর মত একজন অসাধারণ শিল্পীর গানের সঙ্গে তাঁর 'সামান্য মোটর গাড়ি চালক স্বামীর' কাজের কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে কি না বা তা নিয়ে এমন জঘন্য কটাক্ষে তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করা উচিৎ কি না—বিশেষ এমন একজনের দ্বারা যিনি নিজে আদৌ জানেন না যে, রেকর্ডে 'কাবেরী নদী জলে' গানটা শৈল দেবীর গাওয়াই নয়! এই প্রশ্ন তুলে আমি এক প্রতিবাদপত্র যুগান্তরে পাঠিয়েছিলুম যা ৫ই মার্চ ১৯৮৩-র কাগজে ছাপাও হয়েছিল। যদিও কবির কোনও প্রতিক্রিয়া মুদ্রিত হয়নি—২০ মার্চ ১৯৮৩-র যুগান্তরে প্রকাশিত একখানা চিঠি পড়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। প্রাসঙ্গিকবোধে সেই চিঠির কিছু কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না।

'.......পূর্বজন্মের রাস্তা ধরে নিবন্ধটিতে আমার পিতৃদেব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শৈল দেবী আমার মা, আমি তাঁর জ্যেষ্ঠা সন্তান। বলাবাহুল্য আমার পিতা মহাশয় কখনই সামান্য মোটর গাড়ির চালক ছিলেন না। তিনি পূর্বাপর ব্যাঙ্কের চাকরি করেছেন, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার এন্টালি শাখার এজেন্ট থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। নিবন্ধটি এদিক থেকে তথ্যাশ্রয়ী নয় বরং আমাদের পরিবারের পক্ষে অতীব অসম্মানজনক। ......শ্রদ্ধেয় সিতাংশু শেখর ঘোষের পত্রটিই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের পরিবারের তরফ থেকে সিতাংশু শেখর ঘোষকে ধন্যবাদ জানাই। লীনা সাহা, কলকাতা ২৯' সেই লীনা সাহার কথা, এতদিন বাদে তুমি উল্লেখ করলে বলে এত কথা মনে পড়ল। কিন্তু এর একটা অন্য তাৎপর্যও আছে—যা বিশেষ অনুধাবনের দাবী রাখে, সেটুকুও তাই এখানে বলা দরকার। কথাটা হল, আমাদের দেশে এখনো, বিশেষ গোষ্ঠী বা প্রভাবশালী মহলের পোষকতা থাকলে সাধারণ মানুষ বা শৈল দেবীর মত সুপরিচিত শিল্পী বা তাঁর পরিবারবর্গকে কত সহজে, এভাবে ছোট করা যায় এবং তা করেও সমাজে গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবীর তক্‌তে বসে —দিব্যি নাম-যশ-খাতিরও কেমন পাওয়া যায়, সেইটা দেখ। আর তাহলে আমাদের সংস্কৃতি-মন্যতার গর্বে যতই ফেটে পড়ি না কেন, তার ভেতরকার আসল চেহারাটা কিন্তু অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্যের কদাচারে কতোই না কুৎসিত। অথচ আত্মদর্শনের জন্যে আয়নার মুখোমুখি দাঁড়াতেও আমরা কি নিস্পৃহ!

বিমান—যাক গে, এ নিয়ে আমি আর কি বলব বলো। যে কথা হচ্ছিল, তখনকার দিনের একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা বেশ মজা পেতুম। লক্ষ্য করে দেখবে, যে সে সময় তিনজন তিনজন করে, একসঙ্গে এক একটা সময়ে গানের জগতে রাজত্ব করতেন। শৈল দেবী, ইলা ঘোষ, সুপ্রভা ঘোষদের আগে ছিলেন—ভীষ্মদেব চাটুজ্জে, কৃষ্ণচন্দ্র দে আর জ্ঞান গোস্বামী। তারপর এলেন পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মন আর সায়গল। এদের পরে আবার হেমন্ত, জগন্ময় আর ধনঞ্জয়। এঁদের উত্তরকালেও সেই তিনজনের হাত ধরেই আধুনিক বাংলা গানের অগ্রগতি—সতীনাথ, মানব, শ্যামল। তবে এদের আড়ালে কত শিল্পী যে অলক্ষে হারিয়ে গেছেন—তার হিসেব কেউ রাখেনি। এখানে সব নাম তো আর বলা সম্ভব নয়, তাই কয়েকজনের নাম বললেই আমার কথাটা বোধহয় বুঝবে।

প্রথমেই মনে পড়ছে সমর গুপ্ত উনি বেশ ভাল গাইতেন, বেশ নামটামও ছিল, তারপর ধরো অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়—ইনি আধুনিক, ভক্তিমূলক গান গাইতেন। এঁর একটা রেকর্ড যাতে ছিল 'যে ভালো করেছ কালী', ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হবার পরই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। আর সৌরেন রায়—তাঁর নাম একেবারে মুছে গেছে। তাঁর একটা বিখ্যাত গান ছিল 'একী স্বপ্ন শুধুই একী কল্পনা গো'।

এঁদের মধ্যে সমর গুপ্ত তো রবীন্দ্রসঙ্গীতেও নাম করেছিলেন। কলম্বিয়া রেকর্ডে ওঁর গাওয়া—'জানি হল যাবার আয়োজন' আর 'সুনীল সাগরে শ্যামল কিনারে'

বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এঁরা একেবারে প্রথম সারির জনপ্রিয় ছিলেন। বরং আমি অবাক হয়ে যাই যে যুদ্ধোত্তর কালে এমন কতো শিল্পী ছিলেন যাঁরা কলকাতার আসরে, অনুষ্ঠানে বা রেডিওতে নিয়মিত গাইতেন,—শ্রোতারাও যথেষ্ট চাইতেন অথচ মৃত্যুর পর অতি অল্পদিনের ভেতরই লোকে তাঁদের ভুলে গেল। আমার মনে হয় এটা অনেকটা কপালের ব্যাপার। অনেকের এমনটা হয় আবার কারুর কারুর হয়ত কপালগুণে, মানুষ মনে রাখে। এখানে আমার হঠাৎ মনে পড়ছে, রেডিওতে গাইতেন অনিল দাস, জটাধর পাইন, রথীন চৌধুরি, রবীন্দ্রমোহন বসু বা সুখেন্দু গোস্বামী, সত্যেন ঘোষাল। শেষের দুজন যদিও মূলত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের লোক ছিলেন—তবু এঁরা বাংলা নানান ধরনের গানও তো কম গাননি। সত্যেন ঘোষালের মেঘ রাগে বাংলা গান, 'গগনে সঘন চমকিছে দামিনী'-র যে দাপট ছিল, নজরুলের গান 'সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে' গায়নে ঠিক ততটাই মরমী আকুতি ঝরে পড়েছিল। আবার ধরো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দুই শিল্পী রথীন চট্টোপাধ্যায় বা ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বাংলা গানও তো কত গাইতেন। রথীন চট্টোপাধ্যায়-এর নজরুলগীতি 'চৈতালী চাঁদিনী রাতে' বা ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের গলায় নজরুলের 'মেঘবিহীন খর বৈশাখে'র মত গানে যে বিশেষ ভাবরূপের মাত্রা যুক্ত হয়েছিল আজকে তার কিইবা মূল্য ? কেননা তাঁদের গান আজ যেহেতু আর পাওয়া যায় না, সেইজন্য তাঁদের নামও লোকে কেউ আর বলে না বা হয়ত জানেও না।

বিমান—শুধু গাইয়ে কেন, কত সুরকারের নামও তো আমরা আজ ভুলে গেছি। যেমন একজন কালোবরণ দাস, এককালে তো কত গানেরই সুর করেছেন। আর একজন নিতাই মতিলাল। তবে বিখ্যাত 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবিটির সূত্রে কারুর কারুর হয়ত সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে ওঁকে মনে পড়তেও পারে। এমনই একজন হরিপ্রসন্ন দাস। ইনি নিমাই সন্ন্যাস বলে একটা ছবির গানে প্রথম দারুণ সুর দিয়েছিলেন। এই ছবিতে নিমাই-এর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস যা অভিনয় করেছিলেন তার জন্যে ছবিটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই সঙ্গে এর গানগুলোও লোকের যথেষ্ট ভাল লেগেছিল। হরিপ্রসন্ন একসময় রাইবাবুর সহকারী ছিলেন। কিন্তু পরে, এঁদের আর কারুরই তেমন হদিশ পাওয়া যায়নি।

আমার মনে হয় ওঁদের কালের বিরাট সব বনস্পতির ছায়ায়, যেসব ছোটখাটো গাছ-গাছালি গজিয়ে উঠেছিল তারাও ফুলফল দিয়েছিল কিন্তু বনস্পতির আড়ালে তারা আর বিশেষ বাড়তে পারেনি। তারপর চাপা পড়ে গিয়েছিল। হয়ত এইটাই প্রকৃতির ধর্ম। ব্যাপারটা কি রকম জানো ? শৈলেশ দত্তগুপ্তর সুরে জগন্ময় মিত্র গেয়েছিলেন 'ঝরা ফুলে ভরা এই যে সমাধি তল'। এই রেকর্ড শুনে আমি শৈলেশ কাকাকে (আমি ওঁকে কাকা বলতুম) বললাম—কাকা আপনি যেভাবে সুর করেছিলেন, জগন্ময়ের গানে ও-সুর, কিন্তু যেন অন্যরকম হল। উনি ধমক দিয়ে বললেন—চুপ কর্ তো, ওঁরা বড় আর্টিস্ট। আমার সুরে গান করছেন এই না কতো, তার আবার ভুল সুর, কি ঠিক সুর, হুঃ!

দুর্গা সেনও কতো বড় সুরকার ছিলেন, তাঁর কথা কেউ আজ বলে ? অনুপম ঘটককে তখন আমি পেয়েছিলুম। সেই যে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'শাপমুক্তি' ছবিতে (১৯৪০) সুপার সুপার হিট গান, দারুণ সুর করে অচেনা প্রতিভা সেনকে দিয়ে গাইয়েছিলেন 'একটি পয়সা দাও গো বাবু', কী হল তারপর ? অনেক দিন পর্যন্ত আর আমরা তাঁর কোন হদিশ পাই নি। টুকটাক দু একটা কাজ হয়ত করেছিলেন কিন্তু 'তুলসীদাস' (১৯৫০) ছবিতে নতুন করে ফিরে আসার পর সেই যে 'অগ্নিপরীক্ষা'য় (১৯৫৪) আবার দারুণ ভাবে জাঁকিয়ে বসলেন—সেটাকে বরং ব্যতিক্রমী ঘটনা বললেই হয়। সুপ্রসন্ন ভাগ্যও বটে।

কেন, এইরকম একজন, মনে হয় কালীপদ সেন। উনি তো অজস্র ছবিতে সুর করেছেন, কানন দেবীর অনেক ছবিতে কাজ করেছেন কিন্তু ক'জন তাঁর কথা জানে ?

বিমান—আরে, এই যে পঙ্কজদা। বিশাল ব্যক্তিত্ব, এককালে ভারতজোড়া বিপুল জনপ্রিয়তা। অত ভাল গান করতেন, সুর করতেন। তবু পঙ্কজদাকে আমরা যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী বলে চিহ্নিত করে রেখেছি। যেন তাঁর অন্য কোনও অবদান ছিল না। আমি তাই বারবার বলি, পঙ্কজদার গাওয়া বা তৈরি করা কত দুর্দান্ত সব আধুনিক বাংলা গান, মুছে যেতে বসেছে। এখন তো পুরনো দিনের কত গান রি-মেক হয়, কিন্তু দেখ, পঙ্কজদার কোনও গান রিমেক হয় না।

অথচ কি দারুণ সব গান পঙ্কজ মল্লিকের রয়েছে—কত রকমের সুর, কত নতুন ধরনের চিন্তা বা বৈচিত্র্যের সম্ভার। সসময় বলত কাব্যসঙ্গীত, তা সেই কাব্যসঙ্গীত পঙ্কজ মল্লিকের যে কত ছিল যা এখন শুনলেও অবাক হতে হবে। সেকালে তো লোক মুগ্ধ হতই। 'দিনগুলো মোর স্মৃতির কুসুম গাঁথি', 'অশ্রুকণার মেলা নয়নে', 'শেষ হল তোর অভিযান', 'ঘনঘন ধ্বনিছে', 'মরণরে তোর এল পাশে', 'আজি বসন্ত জাগিল', 'এসো যৌবন মদমত্তা', 'যেদিন তোমার গাইল বীণা'। আজকাল কবিদের বড় বড় কবিতাতে সুর দিয়ে গেয়ে অনেকে নতুনত্ব হয়েছে বলে ভাব দেখায়। কিন্তু পঙ্কজ মল্লিক ১৯৪০ সালে, অনেক আগেই সে কাজ করে দেখিয়ে গেছেন। কবি করুণানিধানের কবিতায় সুর করে একটা রেকর্ডের দু'পিঠ জুড়ে যে রেকর্ড ১৯৪১-এ করেছিলেন 'শেষবাসর' তার সুরবৈচিত্র্যে সে যুগে লোকে মুগ্ধ হয়েছিল। জোর দিয়ে বলতে পারি এ যুগেও সে গান শুনলে লোকে অবাক হয়ে যাবে। আর ভক্তি ভাবনার গানের সংখ্যাও তো তাঁর অনেক ছিল। লোকে যে এখন সেগুলো ভুলে গেছে বা জানে না তার কারণ গানের কোয়ালিটি নয়। আসল কারণ সে সব গান সাধারণত পাওয়া যায় না—ফলে শোনাও যায় না সেভাবে। কিন্তু এ গানগুলো শুনলে, কে না মুগ্ধ হবেন ? সে সব গানে যে বিশেষ আর্তি নিবেদনের সুর আছে—তা, যে কোনও পরিশীলিত মানসে আজকের দিনেও দাগ কাটবে—'প্রভু এই তো আশা ছিল আমার', 'প্রভু আঁধার পারাপারে', 'আজি আঁধার হইল আলা', 'বাঁশি তুই বাজা রাখাল', 'বৃন্দাবন বিলাসিনী', 'মধুর মাধুরি সনে', 'দরশন দাও মা', 'কিবা বঙ্কিম ঠাম' এমনি আরো কতো!

বিমান—আরে এইরকম হয়। আমি সন্তোষ সেনগুপ্তর কথাই না হয় এখানে একটু বলি। সন্তোষ সেনগুপ্তর কথা, আমি নানাপ্রসঙ্গে কিছু কিছু আগে বলেছি। অথচ দেখ 'জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা', এই একখানা গানেই তাঁকে সকলের মনে রাখার কথা। অথচ সন্তোষ সেনগুপ্তর (১৯০৯-১৯৮৪) মত এমন সব্যসাচী মানুষ ক'জনই বা পাওয়া যায় ? সুদক্ষ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী (অন্তত তেশইখানা রেকর্ড করেছিলেন) পাঁচখানা ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করেছিলেন। অতুলপ্রসাদ এবং আধুনিক গানেরও রেকর্ড তাঁর কম ছিল না। এ সবের ওপর গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং বিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্বভার সামলে, উনি যে ভাবে নজরুলগীতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন, নজরুলগীতির শিল্পী তৈরি করেছিলেন বা নজরুলের গানকে নতুন করে এত জনপ্রিয় করেছিলেন, সে সব মিলিয়ে দেখলে সন্তোষ সেনগুপ্তর জোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ দেখ, আজকে কি সন্তোষ সেনগুপ্তকেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে ? মৃত্যুব পর বিশ বছরও হয়নি, তাতেই তাঁর মত শিল্পী মানুষের এই অবস্থা। তাহলে অন্যদের জন্যে আক্ষেপ করে, আর কি হবে!

কিন্তু যাঁরা ধরো, নিজেদের কপালদোষে, জীবনে কোনদিনই যথাযোগ্য মান সম্মান টাকা পয়সা পেলেন না, তাঁদের কথা একটু ভাবোতো। এই চিরবঞ্চিত না-পাওয়াদের মধ্যে কারুর কথা বলতে পারো ?

বিমান—হ্যাঁ। প্রথমেই আমি বলব রঞ্জিত রায়ের কথা। তাঁর নাম অনেক লোকই জানে কিন্তু তাঁকে খুব অল্প লোকই চেনে।

বরং অনেককেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতে শুনেছি—ও আবার শিল্পী কি ? ওই যা এটা সেটা ছ্যাবলামো, কমিক গানটান করত, দুএকটা ছুটকো ছাটকা রোলে সিনেমা থিয়েটার করত। অথচ আমি ছেলেবেলায় 'রাতকানা', 'কেমন জব্দ', 'বড়বাবু', 'তরুণী', 'দস্তুরমত টকী', 'জামাইষষ্ঠী', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', সোনার সংসার, 'ইমপষ্টার' বা তারপর বড় হয়ে 'রিক্তা', 'শেষ উত্তর', 'বিদ্যাসাগর', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'ছদ্মবেশী', 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবিতে ছোট খাট ভূমিকায় দেখেছি। রেকর্ডে হাসির গান, নজরুলের হাসির গান কত শুনেছি, কিন্তু কখনো একজন প্রথম সারির শিল্পী হিসেবে খাতির পেতে দেখিনি। ভাই রঞ্জিত রায়ের (১৯০৩-১৯৫৯) আসল ছবিটা দেখতে চাইছি।

বিমান—প্রথমেই বলি উনি কিন্তু বেশ অবস্থাপন্ন জমিদার পরিবারের ছেলে। আদি বাড়ি ঢাকার ভাগ্যকুলে। কলকাতাতেই পড়াশোনা কিন্তু ছাত্রজীবন থেকে গান বাজনা, নাচ এইসবে দারুণ ঝোঁক। প্রথম জীবনে যাত্রা দলে নাচ-গান থেকে শুরু করে, ক্রমে ক্ল্যারিওনেট তবলা, হারমোনিয়াম তো বটেই—পিয়ানো বাজনাতে দুর্দান্ত দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। আগে হয়ত বলেছি—থাকতেন আমাদের বাড়ির কাছে। তবে তাঁর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে, তিনি বরাবর যে একটা মর্মভেদী রসিকতা করতেন—তা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। কেউ যদি তাঁকে ঠিকানা জিজ্ঞাসা

করত, তিনি চট্‌পট্ অম্লান বদনে বলে দিতেন—ওই ইহলোক পরলোকের বর্ডারে। তার মানে, আসলে তাঁর বাড়ি ছিল কাশী মিত্তির ঘাট স্ট্রিটে। আমাদের বাড়িতেও তাঁকে অনেক দেখেছি। আমার বাপ-জ্যাঠাদের সঙ্গে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯২৬ সালে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে প্রথম থিয়েটারে নামলেন—তারপর সবাক ছবির গোড়া থেকেই নানাভাবে জড়িয়ে পড়লেন। অভিনয় ছাড়া, বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানীতে সঙ্গীতবিভাগে কাজ করেছেন। কৌতুকগীতিতেও খুব নাম হয়েছিল। শুনলে তুমি অবাক হবে যে এই রঞ্জিত রায়ের কাছে বিলেত থেকে অফার এসেছিল ওখানে গিয়ে কাজ করবার জন্যে। এইচ এম ভিতে উনি একটা রেকর্ডে নজরুলের গান করেছিলেন আর অন্যপিঠে একটা ইংরেজি ছবির গানের কপি করে একটা গান গেয়েছিলেন—চাম চিকে, চিকে ব্যোম। অর্কেস্ট্রার সঙ্গে উনি একটানা হেসেছিলেন। সেই হাসির স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন এবং সেই নোটেশান অনুসারে ক্রমাগত তিনি হেসেছিলেন—হা হা হা হা হো হো হো হো হি হি হি হি। সেই শুনে ব্রিটিশ সিম্ফনী অর্কেস্ট্রার এক ডিরেক্টর ওঁকে বলেছিলেন—আপনি এটা কি করে করলেন! আপনি আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে চলুন। আমরা আলোচনা করব আপনি আমাদের এসব সুর তৈরির কথা বুঝিয়ে বলবেন। কিন্তু উনি গেলেন না। সবিনয়ে বললেন —আমি অতসব জানি না, আমার জ্ঞানবুদ্ধিও নেই, আমি যা কিছু করেছি, সব এক্সটেম্পোর করেছি, যা আমার মাথায় এসেছে, মনে এসেছে তাই আমি করে গেছি। আমি কারুর কাছে শিখিনি।

—তাহলে তুমি এত ভাল পিয়ানো বাজাও কি করে ?

—যা শিখেছি নিজে নিজে শিখেছি। ছোটবেলায় আমি যাত্রার দলে ছিলুম সেখানে প্র্যাকটিশ করে করে অর্গান বাজাতুম। তারপর অর্গানের স্ট্রোক ভেঙে ভেঙে পিয়ানো বাজাতে শিখেছিলুম। তারপর এইচ এম ভিতে আর্টিস্ট হিসেবে কাজ পেলুম। ওখানে তখন পিয়ানো বাজাতেন নিউম্যান সায়েব। ওখানে পিয়ানো রপ্ত করতে করতে পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করেছিলুম।

হ্যাঁ, উনি শেষকালে একজন সেরা পিয়ানো বাজিয়ে হিসেবে নাম করেছিলেন। ওঁর পিয়ানো বাজনার সঙ্গত, অনেক রেকর্ডে ছিল। এখানে আমি একটা এমন তথ্য জানাচ্ছি যা এখন আমি না বললে আর কেউ বলতে পারবে না। ব্যাপারটা হল—এইচ এম ভিতে একবার একটা অর্কেস্ট্রার রেকর্ড হয়েছিল যার একপিঠে ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত আর পরিতোষ শীল বেহালা। কমল দাশগুপ্ত এই একবারই বাদ্যযন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড করেছিলেন—এবং বাজিয়েছিলেন ম্যাণ্ডোলিন। তখন শিল্পীরা এরকম নানা বিভাগেই পারদর্শী হতেন যে জিনিসটা এখন ক্রমেই কমে এসেছে।

আবার দেখ যাত্রা, সিনেমা, থিয়েটারে অভিনয় করার পাশাপাশি সঙ্গীত পরিচালকের কাজও রঞ্জিত কাকা, অনেক ছবিতে এবং নাটকে দুয়েতেই করেছেন। এরসঙ্গে নৃত্য পরিচালকের কাজ করেছেন অনেক ছবিতে বা নাটকে। আরো বড় কথা উনি

নাচতেও পারতেন খুব ভাল। আলিবাবা নাটকে স্টেজে উনি আবদাল্লার ভূমিকায় যেরকম নাচে গানে অভিনয়ে প্রতিটি রজনী মাত করতেন, সেরকম ভাল আবদাল্লা স্টেজে নেপা বোসের (নৃপেন বসু ১৮৯৭) পর আর হয়নি। আবদাল্লা রঞ্জিত রায়ের সঙ্গে ছোট রাজলক্ষ্মী মর্জিনার, নাচগান দেখতে দর্শক ভেঙে পড়ত।

এই নেপা বোসের সঙ্গে যে মর্জিনা করতেন কুসুমকুমারী, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে সেটা একটা মাইল স্টোন। তাই এখানে ওটা উল্লেখ করতেই হল।

বিমান—নানারকম কলা কৌশলও রঞ্জিত রায়ের মাথায় খুব খেলত। এইচ এম ভির নানা রেকর্ডের জন্যে, তাঁকে মিউজিক কম্পোজ করতে হোত। তখনকার দিনে ম্যারাকাস বাজাবার লোক বেশি ছিল না। তার বদলে, রঞ্জিত রায় একটা পিচবোর্ডের বাক্সয় বিভিন্ন সাইজের গোটাকতক রাস্তার ঢিল, খোয়া রেখে এমনভাবে নানা ছন্দে নেড়ে চেড়ে আওয়াজ বের করতেন যে মাইকে তার এফেক্ট শুনে সকলে তাজ্জব হোত। ওঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতাটা তাহলে বোঝো। সেইযুগে নাচেগানে খুব জনপ্রিয় হোত। তাই এরকম রেকর্ডের লেবেলে ফলাও করে লেখা থাকত—'কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল—নৃত্য সম্বলিত' কিন্তু গানের সঙ্গে নেচে নেচে সে যুগে রেকর্ড করা তো অত সহজ ছিল না। এক্ষেত্রেও রঞ্জিত রায় দুটো ভাঁড় ভাঙা, হাতে নিয়ে ঠোকাঠুকি করে এমন একটা শব্দের অনুরণন তৈরি করলেন যে শুনলে মনে হবে যেন, গানের সঙ্গে নাচ চলছে। এইরকম কৌশলে, রঞ্জিত রায় অনেক রেকর্ডে হাতে করে ঘুঙুরটা, নাচের ছন্দে গানের সঙ্গে বাজিয়েছিলেন। আবার দেখ সিনেমার ক্ষেত্রে সে সময়কার প্রত্যেক বড় বড় পরিচালকই তাঁকে নিয়ে কাজ করেছেন। দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বসু, অমর মল্লিক, মধু বসু থেকে একালের নির্মল দে পর্যন্ত, কে নয় ?

রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের বিরাজ বৌ ছবিতে (১৯৪৬) রঞ্জিত রায়ের যে একটা গান দারুণ হিট হয়েছিল 'এই না জলের আর্শিতে তুই দেখতে পেলি কারে'—এখনকার প্রজন্ম তো এ গান শোনেই নি। তাই জানেও না। মঞ্চের অভিনয়েও শিশিরকুমার ভাদুড়ির মত মানুষ রঞ্জিত রায়ের অভিনয় এত পছন্দ করতেন যে চরিত্র বিশেষে যেমন চন্দ্রগুপ্ত নাটকে বাচালের ভূমিকায় রঞ্জিত রায় ছাড়া আর কাউকে ভাবতেও পারতেন না। নিউ থিয়েটার্সের কার্তিক চট্টোপাধ্যায় 'চোর' বলে একটা ছবি করেছিলেন। তাতে রঞ্জিত রায়ের সঙ্গে প্রথম জুটি বেঁধে, জহর রায়ও দারুণ অভিনয় করেছিলেন। ওই চোর ছবিতে রঞ্জিত রায় একটা পকেটমারের দলের ওস্তাদ হিসেবে নেচে গেয়ে ভালুক নাচিয়ে ভিড় জমাতো আর সহকারী জহর রায়, ওই ভিড়ের মধ্যে হাত সাফাই করে লোকের পকেট কাটার কাজটি করতো। কার্তিকবাবু রঞ্জিত রায়কে বলেছিলেন আমি একটা ভাল্লুক খেলানেওয়ালাকে এনে, তাকে দিয়ে ভালুক নাচাব। তোমাকে ভাল্লুকের সামনে যেতে হবে না, একটা ট্রিক সটে তোমার রোলের ব্যাপারগুলো ম্যানেজ করে নেব। এ শুনে রঞ্জিত রায় বলেছিলেন কার্তিকদা, তা হবে না। আমায় যদি এ রোল দেন

তাহলে আমি পুরো ট্রেনিং নেব, আমাকে তার বাড়িতে যেতে হবে। তারপর সত্যিকারের ভাল্লুককে পোষ মানিয়ে, তাকে আমি নাচাবো। আর আপনাকে সরাসরি সেই দৃশ্যের সট নিতে হবে। ছবিতে শেষ দৃশ্যে ছিল ভাল্লুকের সঙ্গে কোলাকুলি যাতে শেষপর্যন্ত রঞ্জিত রায় সত্যিই ভাল্লুকের সঙ্গে জড়াজড়ি, কোলাকুলি করেছিলেন। আমার বাবা বলেছিলেন রায় মশাই, ছবিটা আমি দু'বার দেখলাম। এই যে অভিনয়ের জন্যে, আপনি যখন এতটা ঝুঁকি নিলেন তখন আপনার মনে কি ভাবনা-টাবনা এসেছিল, বলুন তো।

'আমার শুধু একটাই ভাবনা মনে এসেছিল। আমি রোলটা ভাল করে করতে পারছি কিনা বা আমি ঠিকমত ভাল্লুক নাচাতে পারছি কিনা। আমি কত টাকা পেয়েছি বা লোকে হাততালি দিল কিনা—এসব কোনও কথা ভাবিনি। আমি যাত্রার দলে নাম লিখিয়ে জীবন শুরু করেছি। আদ্ধেক দিন টাকা দেয়নি—অনেকদিন প্রায় না খেয়ে বা মুড়ি বাতাসা খেয়ে দিন কাটিয়েছি'। প্রকৃত শিল্পী ছাড়া কি এমন কথা, অন্য কেউ বলতে পারে ? কিন্তু এতগুণ থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোককে শেষ জীবনে লোকরঞ্জন শাখাতে চাকরি নিতে হয়েছিল। তখনো ওখানে পঙ্কজ মল্লিক ছিলেন, চিত্ত রায় ছিলেন।

মনে হচ্ছে এতে যেন পঙ্কজ মল্লিকের হাত ছিল ?

বিমান—না, যতদূর জানি পঙ্কজদার সেরকম কিছু হাত ছিল না। আসলে, হাত ছিল ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের। এইটাই লক্ষ্য করবার ব্যাপার যে বিধান চন্দ্র রায়, তাঁর অত ব্যস্ততার মধ্যেও অন্তরে অন্তরে তিনি কিরকম গুণগ্রাহী মানুষ ছিলেন। এই বিধান রায়কেও কি আমরা চিনি ? ক'জন আর জানি যে পঙ্কজ মল্লিক সপ্তাহে একদিন বিধানবাবুর বাড়িতে গিয়ে নিয়মিত ওঁকে গান শুনিয়ে আসতেন।

হ্যাঁ—রঞ্জিত রায়, অবশ্য নিজের গুণেই চাকরিটা পেয়েছিলেন। আসলে সরকারের নিয়ম নিগড়ে, গুণী শিল্পীদের তখন পাওয়াই যেত না—তাই শেষ বয়সে নিতাই ঘটক, চিত্ত রায়, রঞ্জিত রায়দের লোকরঞ্জন শাখায় ঢুকতে অসুবিধে হয়নি—কেননা দরকারটা ছিল দু'পক্ষেরই। তবে রঞ্জিত রায় বেশিদিন ওখানে কাজ করতে পারেননি। একদিন উনি বলেছিলেন—ওঁর ওপর ওখানে খুব টরচার করা হচ্ছিল। একটা ট্যুর করে, বাইরে থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটা ট্যুরের জন্য হুকুম হল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে। এতটা ধকল তাঁর আর শরীরে কুলোচ্ছিল না। তিনি তাই পারলেন না, একরকম বাধ্য হয়েই চাকরি ছেড়ে দিলেন। বাগুইহাটিতে বাড়ি করেছিলেন। ওঁর ছেলে শ্যাম রায় ভীষণ ভাল পিয়ানো বাজাত। তবে সে রীতিমত শিখে পিয়ানো বাজাতো, বাবার মত অশিক্ষিত পটুত্বর লোক নয়। স্টার থিয়েটারে বাঁধা পিয়ানো বাজানোর চাকরি ছিল। কিন্তু হঠাৎ অকালে চলে যেতে হল। এ আঘাতে রঞ্জিত রায় দারুণ শোকে ভেঙে পড়েছিলেন। ওঁর এক মেয়ে ছবি রায়। ভাল গাইতেন। ১৯৪৬ সালের পুজোয়, বাবার সুরে তাঁর একখানা আধুনিক গানের রেকর্ডও বেরিয়েছিল। ব্যায়ামবিদ মনোতোষ রায়ের

যোগব্যায়ামাগারে, সহকারী হিসেবে উনি যোগব্যায়াম করতেন এবং শেখাতেন, কিছুকাল আগে এই ছবিদিও মারা গেছেন। রঞ্জিত রায় আর বেশিদিন বাঁচেননি। শেষের দিকে তিনি অনেকদিন অসুস্থই ছিলেন। আমি দেখেছি কোনও অনুষ্ঠানে গেলেও উনি গান গাইতে পারছেন না কিন্তু তখনো পাবলিক তাঁকে ছাড়ছে না—চেঁচাচ্ছে, আরো গান, আরো একখানা গা-ন। অনবরত হারমোনিয়াম বাজাতেন খোল বাজাতেন, তবলা বাজাতেন। কতো বাদ্যযন্ত্রই যে বাজাতে পারতেন! তাই দুঃখ হয়, কোন মূল্যায়ন হল না তাঁর। শুধু একজন হাসির গানের গায়ক হয়েই রয়ে গেলেন।

এটাই হল তাঁর সঙ্গে, তাঁর ভাগ্যের মর্মান্তিক রসিকতা—কৌতুক!

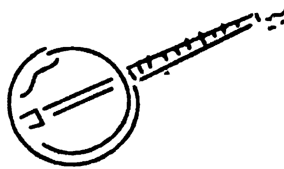
বিমান—নজরুলের ওই গানটা মনে পড়ে, 'ছেলের মুখে থুতু দিয়ে, মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া'। জীবনে এরকম অনেক দেখেছি। অনেক কথাই হয়ত বলে ফেললাম কিন্তু বাকি রয়ে গেল আরো অনেক।

আচ্ছা, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় একটা ছায়াছবিতে উনি যেন হিরোর মত মুখ্য একটা ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

বিমান—হ্যাঁ, 'স্বামীর ঘর' ছবিতে। শান্তি গুপ্তা, ওঁর বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন। এছাড়া স্টেজে 'ব্ল্যাক আউট' বলে বীরেন ভদ্রর লেখা যে নাটকটা খুব রমরম করে চলতো সেটা রেডিওতেও অনেকবার হয়েছে। রেডিওতে রঞ্জিত রায় ছাড়া আর কারুর গলা, অভিনয়—বীরেন ভদ্রর পছন্দ হোত না।

সত্যিই রঞ্জিত রায় বরাবরই ভীষণ আণ্ডার রেটেড অবহেলিত থেকে গেছেন। শুধু উপেক্ষাই পেয়েছেন। এইরকম আর একজনের কথা আমাকে খুব কষ্ট দেয়। অথচ তাঁর কথা তো মাঝে মাঝেই মনে উঁকি-ঝুকি মারে। অখিলবন্ধু ঘোষ। এই অখিলবন্ধু ঘোষও (১৯২০-১৯৮৮) তো সব রকমের গানে একেবারে চৌকশ শিল্পী। আদিতে উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে পরবর্তীকালে রাগপ্রধান, আধুনিক, নজরুলগীতি কোনটাতেই তো কম যেতেন না। রাগাশ্রয়ী গানের তালিমে, বাংলা আধুনিক গানে তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব এক মাত্রা যোগ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে প্রথম রেকর্ড 'একটি কুসুম যবে' আর 'আমার কাননে ফুটেছিল ফুল' তারপর তো স্রোতের মত। ছায়াছবিতে গান না গাইলেও এক আধবার সহকারী সুরকারের কাজ করেছেন। তাঁর গাওয়া জনপ্রিয় গানের সংখ্যা তো অনেক—পিয়াল শাখার ফাঁকে, ঐ যে আকাশের গায়, যেতে যেতে চুরি করে চায়, তোমার ভুবনে ফুলের, তিলক কামোদে কেমনে জানাবো বলো বা সুর মল্লারে বরষার মেঘ ভেসে যায় —এমনি আরো কতো। কিন্তু জীবনে কি পেলেন—মান সম্মান, অর্থ, নিরাপত্তা, প্রতিষ্ঠা ? অথচ জীবনের কি নিষ্ঠুর কৌতুক—আজ তাঁর গানের ভুবি ভুরি রি-মেক গেয়ে এবং ক্যাসেট করে আজকের গায়কদের যেবকম অর্থ খ্যাতি, তার এক শতাংশও যদি উনি জীবদ্দশায় পেতেন তাহলে হয়ত তিনি আজও আমাদের মধ্যে থেকে বাংলা গানকে আরো কতোভাবে সমৃদ্ধ করতেন।

বিমান—এই তো সেদিনের শিল্পী তার কথাই ধরো। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সবিতাব্রত দত্ত (১৯২৪-১৯৯৫)। হাইকোর্টের চাকরি বজায় রেখেও, গ্রুপ থিয়েটারের একজন পাণ্ডা, ভাল অভিনেতা কিন্তু দুর্দান্ত গাইয়ে। দরাজ, পুরুষালি গলা। বাবা ভাল বেহালা বাজাতেন, বাড়িতে গানের পরিবেশ ছিল তবে সবিতা নিয়ম করে সেভাবে গান শেখেনি। গান তার স্বভাবে ছিল। তাই অভিনয়ের থেকেও, গানেই তার বেশি খ্যাতি। তবে রূপকারের ব্যাপিকা বিদায় নাটকে তার অসাধারণ গান আর চটকদার অভিনয় অমৃতলালের বিস্মৃত নাটককে, শুধু নতুন করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে যায় নি, গায়ক অভিনেতা হিসেবে, মঞ্চে তাকে দারুণ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। সবিতাব্রতই আমার মতে, বাংলা মঞ্চের শেষতম গায়ক অভিনেতা—যার গান মাইক ছাড়াও হলের শেষ সারির দর্শক-শ্রোতাদের কানে ঠিক পৌঁছে যেত। প্রথম জীবনে 'অচলায়তন', 'রথের রাশি' প্রযোজনা করে যে সুনাম হয়েছিল তারপর পরবর্তী সময়ে 'এন্টনী কবিয়াল' নাটকে বা 'বালিকা বধূ', 'চারণ কবি মুকুন্দ দাস' ছবিতে তার গান শ্রোতাদের মাতিয়ে দিয়েছিল। ফলে স্বদেশী গান বা মুকুন্দ দাসের গানের ক্ষেত্রে তেজোদীপ্ত উদার কণ্ঠ সবিতাব্রত ছাড়া অন্য কাউকে লোকে ভাবতে পারতো না। আর গান নিয়ে এই লোকটা কেমন ছিল, জানো ? একদিন রাত ১১টার পর হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে, নিচে থেকে চেঁচাচ্ছে—বিমানবাবু, নিচে এসো। একী পাগল নাকি ? তড়িঘড়ি নেমে এলুম। সে মুকুন্দ দাসের একটা গানের সুর ঠিকঠাক করে নিতে চায়, তাই এসেছে। একটা ফাংশান সেরে, এত রাত হলেও 'চলে আসতে দ্বিধা করেনি। অতএব মাঝরাত পর্যন্ত বসে গান তুলল, তার সঙ্গে দিলখোলা মেজাজে আড্ডা, হাসি। হঠাৎ সে একদিন চলে গেল একটা শূন্যতা রেখে গেল। ওর গানের ভক্ত অনেক ছিল, ছবি মঞ্চের জগতের শিল্পীবন্ধুও কম ছিল না। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, তবু তো ১৯৬৭ সালে তাকে পুরস্কৃত করেছিল কিন্তু তারপর এই অল্প ক'বছরেই দেখ, কেমন অলক্ষে তাকে 'অল্‌সো র‍্যান-এর' দলে ফেলে দিয়েই সবাই সব কর্তব্য সেরে ফেলেছে।





একাদশ পরিচ্ছেদ

তাহলে দেখ, আমরা দুজান বুড়ো হাবড়া, এই যে অনেকদিন ধরে গানের জগতের নানা ব্যাপারে গল্প গুজব করে যাচ্ছি, গানের জগৎ মানে যে, অবিমিশ্র আনন্দের জগৎ নয়, সেই সত্যটা আমাদের আলাপ আলোচনা থেকে বারবার উঠে আসছে। এখানকার আনাচে কানাচে কত অন্ধকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, জীবনের পরতে পরতে কত দুঃখ বেদনা, হতাশা, অবিচার, বঞ্চনা বা অভাব বোধ জড়িয়ে আছে —সেসবও মনকে প্রায়শই ভারাক্রান্ত করেছে। বিষয়টা পুরনো দিনের গান, তাই তার কুশীলরাও যে হবেন সেই পুরনো যুগের—সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু ভাই, পরবর্তীকালে বা এখনকার কালে যাঁরা সেই ধারা বয়ে নিয়ে চলেছেন—যুগের হাওয়ায়, পরিবর্তিত মানসিকতায় বা কলাকৌশলের বিবর্তনে, তা সে যেভাবেই হোক—তাঁদের দিকেও তো দৃষ্টি দিতে হবে। নদীর প্রবাহের তো বিভাজন হয় না। প্রবহমান ভাবস্রোতের একই অঙ্গের তো, এক একটা সময়ে এক একটা রূপ। সেই হিসেবে, হেমন্ত-জগন্ময়-ধনঞ্জয়দের হাত থেকে রীলেরেসের ব্যাটনটা টেনে নিয়ে যাঁরা, নতুন প্রাণশক্তিতে পরবর্তী দৌড়ের পর্যায়ে এগিয়ে গেল তাদের কথা, তাহলে এবার একটু একটু করে, না হয় বলো।

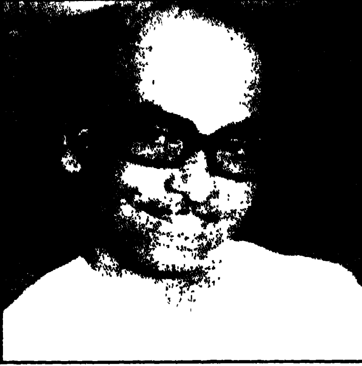
বিমান—ঠিকই তো, তাদের কথা তো অবশ্যই বলতে হবে। তাই ভাই সিতাংশু, তুমি আসবার এই একটু আগে আমার কাছে এসেছিল একটি মেয়ে, তাকে দিয়েই হেমন্ত-অনুজদের পর্বের সূচনা করি। আজ এগারোই অক্টোবর (২০০১) পুজোর আর মোটে কয়েকদিন বাকি। এইমাত্র এই শিল্পী মেয়েটি এখানে এসেছিল। অবাঙালি কিন্তু কলকাতাকে খুবই ভালবাসে, কপালে 'ক'-এর টিপ—ঊষা উত্থুপ। আমার কাছে বছর পাঁচেক আগে নজরুলের গানের ট্রেনিং নিয়েছিল, নজরুলগীতি শিখেছিল। সেই থেকে সে আমায় গুরু বলে মানে, সম্মান দেয়। প্রত্যেক পুজোয় আমায় একখানা করে ধুতি দিতে কোনদিন ভোলে না। আজও সেই ধুতিখানা দিয়ে গেল। এরকম ছাত্রী পেলে কার না আনন্দ হয়। দিশি যে গানটা দিয়ে তার নাম, এক লহমায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটা হল হিন্দি ছায়াছবি হরে রাম হরে কৃষ্ণর 'দম মারো দম।' তার পর থেকে হিন্দি, বাংলা গানের জগতে সে যেন

দম মেরে ছুটেছে। একাদিক্রমে কতো যে বাংলা গান করেছে—রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, আধুনিক। আর এখন সে শিখতে চায় পুরাতনী, রামপ্রসাদী, ভক্তিমূলক এমনি সব। তাই আমি ওকে বলছিলুম—সে যে আমাদের হেঁসেলে ঢুকে পড়েছে! তাহলে আর বাংলা গানের ভয় কি ? ছোটবেলা থেকে পুরনো রেকর্ডে গহরজানের বাংলা ভক্তিমূলক বা আসর জমানো গান শুনেছি, শান্তা আপ্তের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছি—'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে। অবাঙালিদের মুখে বাংলা গানের প্রচার অনেক বেড়েছে, প্রসার হয়েছে। অতএব কাল থেকে কালান্তরে ঊষা উত্থুপদের মত শিল্পীরাই বাংলা গানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং যাবেন। বরাবরই আমি আশাবাদী। বর্তমান প্রজন্মের একজন ডাকসাইটে শিল্পী, এই ঊষার কথা দিয়ে আমি, হেমন্ত-উত্তর কালের কথা শুরু করছি।

ঊষা যখন আমার কাছে গান শিখতে বসবে, তখন সে প্রতিটি কথার মানে, উচ্চারণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেবে, বুঝতে চাইবে। এ গানের ভাষা তার মাতৃভাষা নয় তাই বারবার প্রশ্ন করবে, নিজে উচ্চারণ করবে। খুব বুদ্ধিমতীও বটে। যেমন ধরো ওই গানটা শিখছিলো 'রুমঝুম রুমঝুম রুমঝুম ঝুম, খেজুর পাতার নূপুর পায়ে'—গানটা শুনে ঊষা আমায় বললে—দাদা, এটা তো বাংলা গান আছে তো, তাহলে এখানে উর্দু লাইন, ওয়ার্ডরা আছে কেনো ? আমি বললুম—ওটাই নজরুলের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বাংলা গানের সঙ্গে উর্দু শব্দ মিলিয়ে মিশিয়ে এক কোরে দিতেন। যখন গজল গান করতেন তখন উর্দু ছাড়া কিছু ফার্সি শব্দও মিশিয়ে দিতেন। এইভাবে প্রতিটি গানের শব্দের মানে, প্রেক্ষাপট জেনে নিয়ে, বুঝে তবে ঊষা উত্থুপ গানটা গাইবেন। এতটাই তাঁর সিনসিয়ারিটি! এত বড়, এত ব্যস্ত তবু শেখবার বেলায় সময় দিতে, তাঁর কৃপণতা নেই। আজকের দিনে এটা একটা কম কথা নয়, এটা একটা বিরাট গুণ। ঊষা রবীন্দ্রনাথের গানের ক্যাসেট করেছে, নজরুলের গানেরও করেছে। এখন আমাকে বলেছে—দাদা, পুরনো বাংলা গান, শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তিভাবের গান আমার করার খুব ইচ্ছে। আপনাকে আমায় সাহায্য করতে হবে। আমিও রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত এদের গান করাতে চাই, তাই ঊষার মত আগ্রহী ছাত্রী পেলে বড় আনন্দ হয়। বাংলা গানের ভবিষ্যৎ—আজ এদের ওপরও তাই, ভরসা করতে পারে।

এবার তাহলে ঊষার থেকে খানিকটা পিছিয়ে এসে, বাংলা গানের আমি যদি বলি নূতন যৌবনেরি দূত—সেই ব্যাটন হাতে যারা দৌড়ল, তাদের কথায় এসো।

বিমান—দেখ ভাই, বাংলা গানের জগতে এখন তো দেখি, প্রতি নিয়ত নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। নতুন শব্দ, চটকদার নামকরণ, তথাকথিত জীবনমুখীর দাপট, আবার এখন কণ্ঠসঙ্গীতের ব্যাণ্ড—নিত্য নতুন এসব দেখছি, শুনছি। কিন্তু আমি বলি, বাংলা গানে এরকম নতুন নতুন পরীক্ষার সত্যিকারের সাহসী পায়োনীয়ার, নিঃসন্দেহে সলিল চৌধুরী। এখনো সেই ঢেউ-এরই ওপর ভেসে ভেসে এদিক ওদিক কোরে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা পরীক্ষা, দাপাদাপি-ঝাঁপাঝাঁপি, যাই বলো না কেন, বেশির ভাগটাই চলছে।


সলিল চৌধুরি

সলিল চৌধুরি (১৯২২-১৯৯৫) যুবা বয়সে গণনাট্য সংঘ থেকে উঠে এসেছিলেন। সেখান থেকে পেশাদারী প্রান্তরে আসায়, তাঁর ময়দান মাঠ ঘাট গাঁয়েগঞ্জের, গণমানসের অভিজ্ঞতা বেশ কাজে লেগে গিয়েছিল। ১৯৪৮-এ প্রথম বাংলা ছবিতে সুরকারের কাজ হাতে নেন—তারপর তাঁর সুরের নানান ছন্দ, নতুনত্বের স্বাদ তাঁকে লোকপ্রিয় করে তোলে। এরপর ১৯৪৯ সালে তৈরি হল সেই 'গাঁয়ের বধূ'। গায়ক সুরকারের ইতিহাস তৈরি হল। এরপর 'রাণার', 'পালকি চলে' একের পর এক পরীক্ষার পালা। বাংলা-হিন্দি ছায়াছবি, বাংলা আধুনিক গণসঙ্গীত এবং ১৯৫৩তে এল 'দো বিঘা জমিন' ছবির গান। এবার সলিল চৌধুরি হয়ে গেলেন সারা ভারতের সলিল চৌধুরি। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল যে তাঁর এই রকম সফল পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে, তিনি দু'জন দারুণ শিল্পীকে সঙ্গে পেয়ে গিয়েছিলেন। হেমন্ত আর লতা—এই দুজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীকে না পেলে, সলিল চৌধুরির অবিরাম পরীক্ষার ফসল প্রায় রাতারাতি এমনভাবে সফল হতে পারতো কি না, জানি না। দেখেছি তো, অন্যান্য অনেক শিল্পীই সলিল চৌধুরির সুরে অনেক গান করেছেন কিন্তু হেমন্ত বা লতা, তাঁর গানকে জন-জোয়ারের স্রোতে, যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন, অন্য কেউ যে তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেননি, তাতে তো সন্দেহ নেই। আমি এই অন্যদের যথেষ্ট সম্মান রেখেই বলছি শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বা সবিতা চৌধুরি এঁরা অনেক গানই গেয়েছেন, রীতিমত ভালও গেয়েছেন। এসব মনে রেখেও আমার বক্তব্য হচ্ছে—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই দু'জন শিল্পী, সলিল চৌধুরির প্রথম জীবনে তাঁর গানকে জনপ্রিয়তার শিখরে তুলে ধরার ব্যাপারে অন্যতম স্তম্ভের মত সকলকে ছাপিয়ে, সত্যিকারের পাকাপোক্ত প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গেয়েছিলেন 'ঝনন ঝনন বাজে,' সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন—'যা রে যা উড়ে যা' এসব গানও সলিল চৌধুরির গানকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করেছে কিন্তু সলিল চৌধুরির গানের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, মন কাড়া দোলা, তা এই দুজনের গানে যেন বিশেষ করে ফুটে ওঠে। এদিক থেকে দেখলে, সলিল চৌধুরি যখন সবে শুরু করেছেন, ঠিক সেই সময়ে হেমন্ত বা লতার সঙ্গে যোগাযোগটা যেন সলিলবাবুর সৌভাগ্যই বলতে হবে। আর তাই মনে হয়, সলিলবাবুর গানের সঙ্গে হেমন্ত ও লতার নামও জড়িয়ে মিশে, একসঙ্গে তিনজনই মানুষের মনে বেঁচে থাকবেন। আর একটা কথাও বলা দরকার। ওই সময় ঘটনাক্রমে যাঁরা সলিলবাবুর সহকর্মী শিল্পী ছিলেন তাঁরাও প্রত্যেকে, স্ব-স্ব বিষয়ে অত্যন্ত গুণী ছিলেন, স্বভাবতই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে, এঁদের ওপর সলিলবাবুর প্রভাব থাকলেও এঁরা কিন্তু সেই দুর্দ্ধর্ষ

প্রভাব কাটিয়ে অনেক সাহসী কাজও করতে পেরেছেন। তাঁদের মধ্যে আমি নাম বলবো—অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, রতু মুখোপাধ্যায় বা সুধীন দাশগুপ্ত। আমি আগে যা বললুম, এরা প্রত্যেকেই সলিল প্রভাবমুক্ত হয়ে, যে যার নিজস্ব ভাবনা, ঢং অনুযায়ী অনেক কাজ করেছে। এ কম প্রশংসার নয়। ব্যাপারটা কি রকম তা বোঝাবার জন্যে আমি এখানে একটা ঘটনার কথা হয়ত প্রথম তোমায় জানাচ্ছি। অভিজিৎ আমার বিশেষ বন্ধু তাই প্রাসঙ্গিক বোধে কথাটা আজ না বলে পারলুম না। সলিল চৌধুরির ওই 'রাণার', 'পালকী চলে'র রমরমা-বাজারে শ্যামল মিত্তিরের একটা গান দারুণ হিট হয়ে গেল—'ছিপখান তিন দাঁড়'। লোকে ভেবেছিল এটা সলিল চৌধুরির সুর। কিন্তু না, সত্যেন দত্তর এই বিখ্যাত কবিতার সুর করেছিল অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন সবাই জানল যে এটা অভিজিতের করা তখন আবার অনেকে বলেছিল সলিলের 'পালকী চলে' শুনে, তারই সুরে প্রভাবিত হয়ে, অভিজিৎ এই সুরটা করেছে। অর্থাৎ সলিলের সুর থেকেই যেন অভিজিৎ এটা তৈরি করেছে। কিন্তু আমি নিজে ভাল করে জানি, 'ছিপখান তিন দাঁড়' গানটার সুর অভিজিৎ, পালকী চলের অনেক আগে তৈরি করেছিল কিন্তু গানটা সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের সুযোগ সুবিধে, নানাকারণে হয়ে ওঠেনি। তাই বাজারে আসেনি। শেষপর্যন্ত যখন সেটা রেকর্ড হয়ে বাজারে এল, ততদিনে ঘটনাচক্রে পালকী চলে প্রকাশিত হয়ে আগেই বাজার মাৎ করে ফেলেছে। তার মানে আমি বলতে চাইছি যে অভিজিৎ, পালকী চলের সুরে প্রভাবান্বিত না হয়ে, বরং তার অনেক আগেই, 'ছিপখান তিন দাঁড়'-এর মত দারুণ সুর, সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি চেতনার প্রবল আবেগ থেকে, একেবারে নিজস্ব ঢং-এ সৃষ্টি করেছিল।

তবে এটাও ঠিক যে, আমরা যাকে গুরু-শিষ্য পরম্পরা বলি তার প্রভাবে কখনো হয়ত গুরু বা শিষ্যর রচনা, একটার সঙ্গে আর একটা একাকার হয়ে, অনেক ক্ষেত্রে ভুল সঙ্কেত দিতে পারে আর তার ফলে অনেকে তা ভুল করে অন্যরকম ভাবতেও পারে। কিন্তু, তা বলে কেউ যে নিজস্ব মননে, প্রভাবমুক্ত ঢং-এ কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না—এরকম কথা বলার কোন যুক্তি আছে বলে, আমি মনে করি না। অভিজিতের ছিপখান তিন দাঁড়-এর এই উদাহরণটা আমার কাছে রয়েছে বলে, এত জোর দিয়ে অভিজিতের কথাটা আমি বলে ফেললুম।

তবে সলিল চৌধুরির আমলে, সলিলের প্রভাবমুক্ত আরো দু'একজনের কথা আমি জানি। তাদের কথাও তাই এখানে একটু বলতে হবে।

এঁদের একজন নচিকেতা ঘোষ আর আরেকজন সুধীন দাশগুপ্ত। তবে এদের সময়ের আগেকার কালের, আরো কয়েকজনের কথা মনে ভিড় করছে যাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে, সত্যিই বাংলা গানে ভিন্ন স্বাদের নতুন কিছু মাত্রা যোগ করেছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের কথাও একটু-আধটু বলতে হবে যেমন অনিল বাগচী, রবীন চট্টোপাধ্যায় বা রাজেন সরকার বা আরো কেউ কেউ—যদিও সবার কথা এখানে হয়ত বলা সম্ভব হবে না। কিন্তু সলিলের সমসাময়িক


নচিকেতা ঘোষ

যুগের যাঁরা, নিজস্ব স্বকীয়তার গুণে, সুরকার হিসেবে আলাদা ছাপ ফেলেছিলেন তাদের মধ্যে, প্রথমেই ধরো না নচিকেতা ঘোষের কথা। সত্যিই ইনি একজন অসাধারণ সুরকার ছিলেন।নিজে একজন দুর্দান্ত তবলা-বাদক, সর্বদাই তাঁর নজর থাকত নানারকম ছন্দে তালে নতুন রকমের সুর করা। কিছু ছড়ার টুকরো-টাকরা মিলিয়ে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা, হেমন্তদার গাওয়া 'মেঘ কালো আঁধার কালো' এই অনবদ্য গানটা শুনলেই সুরকার নচিকেতার সুরের মেজাজটা কিরকম আলাদা জাতীয়, তা বোঝা যাবে।

আসলে :কতা (১৯২৪-১৯৭৬) নিজেই আলাদা জাতের মানুষ সেই অল্পবয়েস থেকেই। ডাক্তারী পড়ার মাঝপথে সব ছেড়েছুড়ে, যে ছেলে অনিশ্চিত গানের জগতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে তো আলাদা করে ভাবতেই হবে। অনাথনাথ বসু, অনিল ভট্টাচার্য বা ওস্তাদ লতাফৎ হোসেনের কাছে তাঁর গানবাজনার ভিতটা বেশ শক্ত করেই তৈরি হয়েছিল। প্রথম গানের রেকর্ড করেছিলেন নিজের সুরে, এটাও ছিল এক একক স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারপর তো অজস্র ছবিতে, রেকর্ডে, ছোটদের জন্যে তৈরি ছড়া জাতীয় বা অন্যান্য বহুগানে, তাঁর সুর—নবনবরূপে সবাইকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁকে হারিয়ে আধুনিক বাংলা গানকে এক বিশেষ প্রতিভার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হতে হল।

সুধীন দাশগুপ্তও (১৯৩০-১৯৮২) অনেকটা এইরকম। প্রায় সব্যসাচী বললেও হয়। সুরকার, পিয়ানো, মাউথ-অর্গানে পারদর্শী, সেতার-হারমোনিয়ামে ওস্তাদ—এককালে তিনবার রাজ্য ব্যাডমিন্টনের চাম্পিয়ন। এর ওপর লণ্ডনের রয়াল কলেজ অফ মিউজিক থেকে মাস্টার ডিগ্রিধারী। ১৯৫৩ তাঁর সুরে প্রথম রেকর্ড হয়—গেয়েছিলেন বেচু দত্ত। চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনার শুরু ১৯৫৩তে। ছায়াচিত্রে বা বেসিক রেকর্ডে তাঁর সুর করা হিট গানের সংখ্যা এত বেশি যে দু'চারটে উল্লেখ করলেই সুধীন দাশগুপ্তর ব্যতিক্রমী গুরুত্বটি বোঝা যাবে। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'বাঁশ বাগানের মাথার ওপর', সন্ধ্যার 'থৈ থৈ শাওন এল ওই', গীতা দত্তর 'কাঁচের চুড়ির ছটা', মান্না দের 'ওগো তোমার শেষ বিচারের', 'মনরে আমার শুনলি না বারণ' এমনি অনেক। প্রতিটি গানের সুরের চরিত্র এতই আলাদা যে তা থেকেই সুধীন দাশগুপ্তকে যেন আলাদা করে মনে রাখতে হয়।

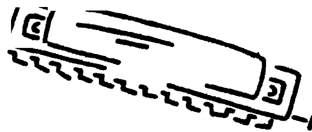
বিমান--এঁদের সঙ্গেই এসে পড়েন—অনিল বাগচী আর রবীন চট্টোপাধ্যায়। এঁরা দুজন বাংলা ছায়াছবিতে এমন কিছু কাজ করেছেন যা অবিস্মরণীয়। যখন নচিকেতা, সুধীন দাশগুপ্ত, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরিদের মত এক ঝাঁক সুরকারদের দারুণ রমরমা, তখন কিছুটা মধ্যবর্তীকালের অনিল বাগচী (১৯০৭-১৯৭৭) হঠাৎ এন্টনী ফিরিঙ্গীতে অসাধারণ সব গান তৈরি করে, সকলকে চমকে দিলেন। বাংলা গানের জগতে আবার যেন তিনি নতুন করে ফিরে এলেন। এটা ১৯৬৭ সালের কথা, তারপর এই ২০০২ সালেও তাঁর গানের কদর কমেনি।

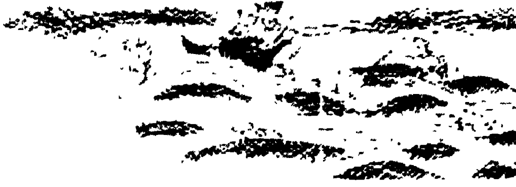
আমার তো অনিল বাগচীর কথা উঠলেই সেই 'কবি'র (১৯৪৯) 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে' মনে পড়ে যায়।

বিমান—অনিল বাগচী যখন 'কবি' করছেন সেই চল্লিশের দশক যেন অন্য একটা যুগ ছিল। আমি বলছি এই প্রতিভাবান সুরকাররা, যুগের সঙ্গে সঙ্গে সবাই সুরেরও পরিবর্তন করে নিয়েছেন। অনিল বাগচীর সন্ধি, কবি এসব ছবির গান নিয়ে তো নতুন করে বলবার কিছু নেই। রবীন মজুমদার তো কবির গান গেয়েই কবি রবীন মজুমদার হয়ে গিয়েছিলেন এককালে। এর অনেক দিন পরে অনিল বাগচী আবার নতুন করে ফিরে এলেন গিরিশচন্দ্র, রানী রাসমনি এসব ছবিতে অনবদ্য সব গান তৈরি করে। মনে হল, এ অনিল বাগচী যেন অন্যরকম নতুন।

এইরকম রবীন চট্টোপাধ্যায়ও কতোবার, কতোভাবে নিজেকে পাল্টেছেন। ১৯৪৮-এর সমাপিকা ছবির 'মানুষের মনে ভোর', 'প্রতিমা দিয়ে কী দেবতা' বা 'সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে' থেকে পঞ্চাশ দশকের পথে হোল দেরী ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'এ শুধু গানের দিন' গানটার সুর ও বিশেষ করে তার অর্কেস্ট্রার কম্পোজিশন যে কোত্থেকে কোথায় এসেছে, তা যেন অনেকটা অলৌকিক। পরিবর্তনটা এতই আমূল যে ভাবা যায় না। সুচিত্রা-উত্তমের কথা উঠলে তাই, এসময় থেকে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের নাম আপনা থেকেই এসে যায়—কেননা নতুন করে পাল্টে তখন রবীন চট্টোপাধ্যায় এতটাই নিজেকে, আধুনিক করে ফেলেছিলেন। উত্তমের গানে যেমন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে আসতে হয় তেমনি, রবীন চট্টোপাধ্যায়কেও আনতে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একজন আদ্যন্ত গান বাজনার মানুষের কথা বলা দরকার—রাজেন সরকার। উনি যদিও বেসিক্যালি একজন মস্ত বড় ক্ল্যারিওনেট শিল্পী, উনি একজন গুণী সুরকারও বটে। উনি অনেক ছবিতে সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করেছেন, যেমন—দস্যুমোহন, ঢুলি প্রভৃতি। তবে ঢুলিতে উনি যে অনবদ্য সুর করেছিলেন, তা চিরকালের অন্যতম সেরা সঙ্গীতের স্বীকৃতি পেয়েছে। ছায়াছবিতে রাগাশ্রিত গানের ব্যবহার কতটা যে সুপ্রযুক্ত হয়েছে--তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ ছবিতে রাজেন সরকার ভালভাবেই রেখেছেন। ঢুলির 'ত্রিনয়নী দুর্গা', 'এই যমুনারি তীর', 'নিঙাড়িয়া নীল শাড়ি'—এসব গান ইতিমধ্যেই চিরকালীন সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে। এছাড়া, বেশ কিছু বেসিক রেকর্ডেও, রাজেন সরকারের সুর করা গান আছে। এইরকম একটা বেসিক রেকর্ডে, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, রাজেন সরকারের সুরে একটা বাংলা কাওয়ালী দারুণ গেয়েছিলেন—দীনে যে দয়া করে, লোকে তার নাম করে—তাহারে রাজা বলে, দুনিয়া সেলাম করে।





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিমান—এইবারে আমি একটু লাফিয়ে, এখনকার যুগে চলে আসতে চাইছি। এখনকার যুগের সম্বন্ধে, ভাই, দুচার কথা বলব। আমাদের যুগে, মানে চল্লিশ পঞ্চাশের দশক, ষাট-সত্তর দশক পর্যন্ত আমরা গানের জগতের যে সব কুশীলব পেতাম সাধারণভাবে তাদের কেউ গীতিকার, কেউ ছিলেন সুরকার বা কেউ শুধু শিল্পীই। তার মানে কেউ একজন তাঁর একটা চর্চা নিয়েই মোটামুটি লেগে থাকতেন। পঞ্চাশের দশক থেকে আবার একাধারে লেখেন এবং সুর করেন এমন লোক আসতে শুরু করেছিলেন। তারপর দেখতে পেলাম এমন একটা সময় এল যখন, যিনি গায়ক তিনি নিজেই গীতিকার, সুরকার অর্থাৎ যাকে আজকালকার ভাষায় বলে থ্রি-ইন-ওয়ান। এখনকার, এই যুগটাতে এই জিনিসটা খুব প্রকট হয়ে দেখা যাচ্ছে। এতে ভাল হয়ত কোথাও একটু আধটু হয়েছে কিন্তু ভাই, কিছু কিছু অসুবিধেও যে হয়নি, তা নয়।

এসব নিয়ে গল্পের শেষ নেই, কথার পাহাড় জমে আছে। সব কথা তো বলা শেষ হবে না, তা সম্ভবও নয়। তবু সে সব পুরনো দিনের জমানো কথা,অতীত স্মৃতি, যতটা পারি বলে যাওয়া দরকার। কেননা ওইসব ফেলে আসা যুগের স্মরণীয় গুণীজনদের কাজকে যেমন আমরা ফেলে দিতে পারি না তেমনি তাঁদের জীবনের নানা ওঠা পড়ার কাহিনীর ভেতর, কোথায় কোন ইতিহাসের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে যা ভবিষ্যতে হয়ত দরকার হতে পারে—তাও আগে থেকে বলতে পারি না। তাই ধুয়ে মুছে, একেবারে হারিয়ে যাবার আগে যেটুকু পারি, ধরে রাখতে চাই। দুর্গা পুজোর আর ক'দিন বাকি, ঢাকে কাঠি পড়েছে। শুনছি আগমনীর পদশব্দ, উৎসব উল্লাসের কলরব আর উপলব্ধি করছি বিসর্জনের অনিবার্য সঙ্কেত —শূন্য ভেল মন্দির, শূন্যভেল দশদিক। আমি আজ সেই শূন্যপানে চেয়ে বসে আছি। এতদিন, এতকথার পর আজ ভাবছি আমার নিজস্ব দু'একটা ব্যক্তিগত কথা বলি। তুমি আমায় বলতে দেবে, রোকো রোকো করে থামাবে না।

না, না---তা কেন, তুমি তোমার নিজস্ব মনের ভাবনা, সব বলবে—তোমার আমার

এই আলাপচারি তো সবটাই আমাদের ব্যক্তিগত ভেতরের কথা। মন খুলে বলবে।

বিমান—দেখ, এই আমি এখানে বসে বসে কথা বলছি। আর আমার সামনে আমার দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু সিতাংশু শেখর ঘোষ বসে রয়েছে। সে আমার ভেতরের যত ভাবনাচিন্তা, আশা নিরাশা, কথার ভার থেকে, আমাকে মুক্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে বলে, আমি বেঁচে গেছি। কেননা আমার মত নিরবসর আর অবসরে অলস লোক, খুম কম আছে। এ দুটি গুণ স্বীকার করতে আমার একটুও দ্বিধা নেই। আমার ভেতর যে এত বড়, এত রকম কাহিনী আছে, সেটাও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ও বের করছে। আমি চোখের সামনে দেখেছি, ফুড কর্পোরেশনে গুদোমে লরীতে, ঠেসে ঠেসে মাল তোলা হয়েছে আর কিছু লোক, বোমা মেরে, বস্তা থেকে চাল-গম বার করে নিচ্ছে। সিতাংশুও সেইরকম আমার পেটে বোমা মেরে মেরে, আমার জমানো কথা, একটু একটু কোরে, বার করে নিচ্ছে।

এই ক'দিন আগে দূরদর্শন আমার একটা ছোট সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিল। তাতে আমায় ওরা প্রশ্ন করেছিল শারদীয় পুজোর গান বলে যে একটা জিনিস আমরা শুনি, এটা কতদিনের ? আমি বললুম—আমার বাবার মুখে শুনেছি, এসব অনেকদিনের। তবে আমি যা হিসেবটা পেয়েছি সেই অনুসারে ওটা ধরা যেতে পারে ১৯২৮। ওই বছরে এইচ এম ভি শারদীয় পুজোর গানের যে বুকলেট বের করেছিল সেটা আমার বাবা আমায় দিয়ে গেছেন। এটা আমার জন্মেরও আগেকার যেহেতু ৩০/৩১ সালে আমার জন্ম। ১৯৩২, ৩৩, ৩৪ বা ৩৫ সালের বুকলেটেও ওইসব বছরের বহু বিখ্যাত গানের উল্লেখ দেখেছি। ধরো না, ১৯৩৪ সালের বিখ্যাত গান মৃণালকান্তির 'বল রে জবা বল' ওই বছরের বুকলেটে দেখেছি, ভাবো তো সেই গান আজও কত জনপ্রিয়। এই পুজোর গানের বুকলেটে আঙুরবালা, কে মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ইন্দুবালা এঁদের গানের সঙ্গে ছবিও দেখেছি। তার মানে পুজোর সময়ে, পুজোর গান যে একটা বিশেষ গান—এটা আমরা সেই ১৯২৮ সালের বুকলেটটাকে ধরে, বিবেচনা করে, সেই হিসেব অনুযায়ী বলছি।

তবে ১৯২৮ সালকে যদি শারদীয় পুজোর গানের ল্যাণ্ডমার্ক হিসেবে ধরতে হয়, তাহলে আমার একটা ব্যক্তিগত কথা এখানে বলতে হবে।

বিমান—না, না ল্যাণ্ডমার্ক নয়। ল্যাণ্ডমার্ক একদম নয়। আমি বলছি আমার চেতনা বা আমার জ্ঞানে যেটুকু জানি, যাকে তুমি আমার অভিজ্ঞতা বলতে পারো তাকে আমি মোটেই ল্যাণ্ডমার্ক বলব না। দেখ আমার বাবার জন্ম ১৯০৪ সালে আর আমার ঠাকুরদাদা মারা গেছেন ১৯১৬ সালে। তা আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি ওই সময়েও তাঁরা পুজোর গান শুনতেন।

তাহলে ওই সময় পুজোর গান বেরোত ? মানে, ওই নাম নিয়ে ?

বিমান—হ্যাঁ শারদীয় পুজোর গান—নাম নিয়েই বেরুত। তবে তখন তো অত বিজ্ঞাপনের যুগ ছিল না—'পুজোর গান' নাম দিয়ে বুকলেটও বেরুত না। তাই এইসব নামটামের প্রচার ছিল না, লোকের কথাবার্তাতেও এসব নাম শোনা যেত

না বা ছড়াতো না। তবে মুখে মুখে পুজোর গান কথাটা বেশ চলত। আরে, আমার ঠাকুরমা-রাও খবর করতেন—হ্যাঁ রে, পুজোর নতুন গান কি বেরুলো ?

আমি আমার ঠাকুমাদের অভিজ্ঞতার কথা একটু বলি। আমার দুই ঠাকুমা ছিলেন —একজন আমার প্রত্যক্ষ ঠাকুমা, মানে আমার বাবার মা। আর একজন আমার বাবার পিসীমা যাকে আমরা ছোট্ ঠাকুমা বলতুম। আমার ঠাকুমার নাম ছিল নগেন্দ্রবালা দেবী আর ছোট্ ঠাকুমার নাম ছিল মানময়ী দেবী। তাঁরা কিন্তু খুব গানের পাগল ছিলেন। তাঁদের মুখ দিয়ে রেকর্ড উচ্চারণ বেরুত না—ওঁরা বলতেন, রেকট। সেই উত্তর কলকাতার পাড়ার ভেতরে, রেকর্ড তখন বাড়িতে বাড়িতে ফেরি করা হোত। আমার মনে আছে, পুজোর সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর, চকচকে পেতলের চোঙাওলা একটা গ্রামোফোন মেসিন, একটা মুটে মাথায় নিয়ে পায়ে পায়ে হাঁটছে আর তার পেছনে একটা ঠেলা গাড়িতে মানে পেরাম্বুলেটরের মত ছোট একটা গাড়িতে, দু'দশ বাক্স টাটকা নতুন রেকর্ড সাজিয়ে ফেরিওয়ালা গোছের একজন লোক হেঁকে হেঁকে গলিতে গলিতে ঘুরছে। তাদের সেই আওয়াজের কি জাদু—রেকর্ড নেবেন বাবু, রেকর্ড, রেকর্ড বিক্রী আছে। শারদীয়া পুজোর নতুন রেকর্ড! পাড়ার বৌ ঝি গিন্নীদের কি উৎসাহ, কিন্তু কর্তাদেরও আগ্রহ কম দেখা যেত না। তাই দিব্যি টাটকা রেকর্ড বিক্রী হয়ে যেত। ঠাকুমাদের সময়ে, ধরো মোটামুটি ১৮৯৮ থেকে ১৯০৬/৭ সাল পর্যন্ত, এরকম রেওয়াজ যথেষ্টই ছিল।

বাঃ, তুমি যে ওই ১৯২৮ সাল থেকে এইচ এম ভি'র শারদীয় গানের বুকলেটের কথা বললে ওটা আমার কাছে অন্তত খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

বিমান—কেন ? কী ব্যাপার বলো তো—

আরে, ওটা একটু ব্যক্তিগত ব্যাপার। ১৯২৮ আমার জন্ম সাল।

বিমান—হাঃ হাঃ। তার মানে আমি তোমার থেকে বছর দুয়েকের ছোট। তবে দেখ, ১৮৯৮ থেকে ১৯০৬/৭ সাল পর্যন্ত উত্তর কলকাতায় এই রেকর্ড ফেরি বেশ চালু ছিল!

কিন্তু ওই রেকর্ড—ফিরির ডাকটার কথা আগে শুনিনি, বোধহয় রাধাপ্রসাদ গুপ্তের কলকাতার ফিরিওলার ডাক বইটাতেও দেখিনি।

বিমান—আমি তো সেইজন্যেই বলে দিচ্ছি। যাই হোক, রেকর্ডের কাটতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড বানানোর কলা কৌশলেও পরিবর্তন হচ্ছিল। চল্লিশের দশকের শেষাশেষি পর্যন্ত কোন ছায়াছবির গান রেকর্ড করতে হলে, আবার স্টুডিওতে বসে নতুন করে গেয়ে—রেকর্ডে তুলতে হত। সাউণ্ড ট্র্যাক থেকে সরাসরি রেকর্ড করার কলাকৌশল তখন রপ্ত হয়নি। তারপরে যখন এই পদ্ধতি চালু হল তখন বিজ্ঞাপন বেরোতে লাগল—'রেকর্ডেড ফ্রম অরিজিন্যাল সাউণ্ড ট্র্যাক!' নতুন এই পদ্ধতিটিই এরপর থেকে চালু হয়ে গেল। আগে মোমের ওপর রেকর্ড হোত, হাত মেসিন চালিয়ে। তারপর একসময় থেকে বুকলেটে ছাপা হতে শুরু হল—'ইলেকট্রিক্যাল রেকর্ডিং।' এখন আমরা দেখছি কম্পিউটার—যাতে সব কাজ কি

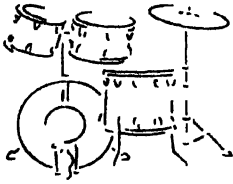
সহজে হয়ে যাচ্ছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমরা খুবই ভাগ্যবান। আমরা গানের কত পরিবর্তনই না দেখলাম, ক'জনের এই সুযোগ হয় ? শিল্পীদের গায়কীর অনেক পরিবর্তন দেখলাম। যান্ত্রিক পরিবর্তন, মিডিয়ার পরিবর্তন, প্রয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন অর্থাৎ আর্টস্ আর সায়েন্স দু'য়েরই দারুণ পরিবর্তন।

আমরা যখন রেকর্ড করতে গেছি—আগাগোড়া গানটি ঠিক গাইলাম, শেষ লাইনে এসে একটা ভুল হয়ে গেল। ব্যস্ আবার প্রথম থেকে গাইতে হোত। তার ওপর ওপরওলা, কর্তাব্যক্তিদের কি গালাগাল খেতে হোত—তুমি কী হে, একটা ওয়াক্স নষ্ট করলে ? তারপর আমরা যখন রেকর্ডিং ট্রেনিং-এর কাজে এসে গেছি তখন টেপ-এর ওপর রেকর্ডিং করার পালা শুরু হয়েছে। সেটা যুদ্ধোত্তর কালে। এইসব সুবিধে পেয়ে এখন সবাই গান তোলে, কিন্তু শেখে না কেউ। তখনকার সঙ্গীত পরিচালকরা, শিল্পীদের দিয়ে রিহার্স্যাল দেওয়াতো। এক একটা গান, হয়ত, এক মাসেরও বেশি রিহার্স্যাল দিতে হোত। অফিসে সময় বাঁধা থাকবে তার ভেতরে, অর্কেস্ট্রার সঙ্গে গানের মহলা দিতে হবে। যাকে বলে, কলে দম দিয়ে, এক নাগাড়ে দম বন্ধ করে গানটাকে তৈরি করতে হবে। কিন্তু এই রকমটাই তখন স্বাভাবিক বলে ধরা হোত।

আমার পরম সৌভাগ্য, আমি এত পরিবর্তনের সাক্ষী হতে পেরেছি। একটা গান —কানন, ইন্দুবালা, আঙুরবালা থেকে শুরু করে করে আমার হাতে পূরবী দত্ত, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মাধুরি চট্টোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লারা দীর্ঘদিন রিহার্স্যাল দিয়ে করেছে। আবার পরে, একটা সময়ে হৈমন্তী নোটেশন করল, টেপ করল তারপর চলে যাবার আগে বলে গেল, আমি কালপরশু প্র্যাকটিস করে এসে আপনাকে শুনিয়ে যাব। এটাও একরকমের পরিবর্তন। কিন্তু এখনকার শিল্পীরা আরো স্মার্ট। কয়েকবার গানটা শুনে নিয়েই বলে—'হয়ে গেছে।' আসলে নোটেশনও হয়ে গেছে। গেয়ে শোনানোর তোয়াক্কাই করে না। আমি বলি একবার গা। তখন কিন্তু সত্যিই গেয়ে দিয়ে চলে গেল। ওদের নোটেশনের জ্ঞান রীতিমত ভাল। নোটেশন নিয়ে গান শুনে, তারপর তা দ্রুত তৈরি কোরে—দু'দিনেই স্টুডিওতে রেকর্ড কোরে ফেলতে পারে।

জেটের যুগে, জেটের সঙ্গেও বোধহয় ওরা তাল মেলাতে পারে। একী চাট্টিখানি কথা!





চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বিমান—আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি। তবে আমার বলা, বোধহয় আর ফুরোবে না—'আপনাকে এই জানা আমার ফুরোবে না।'

নতুন যুগের এক ঝাঁক শিল্পী, নতুন একটা ধারা নিয়ে এগিয়ে এল—বাংলা গানের তাবৎ ধারাকে, একেবারে ভেঙে, তছনছ করে দিলে। এরা কিন্তু আমি বলি যথেষ্ট ক্ষমতা নিয়েই এসেছে। এদের গলার সুর, বলার ভঙ্গি, গাওয়ার ঢং অনেকে হয়ত, পছন্দ করছে না। আমাকে অনেকে বলেছে বাংলা গানে এত হিন্দি কথা, ইংরেজি শব্দ কেন ? গদ্য মত গান—এগুলো হচ্ছেটা কী ? আমি জবাব দিই যুগটা অন্য, যুগটা বদলে গেছে। একসময় আমরা কিছু সাজ পোশাককে ক্লাউনের সাজ বলতাম—যেমন ধরো, পরলাম ফুল প্যান্ট গায়ে দিলাম পাঞ্জাবী, পায়ে স্যাণ্ডাল চটি। তখন সার্কাসের ক্লাউনরা এরকম সাজতো। তাই ফুলপ্যান্ট পরলে তখন কোর্ট সার্ট টাই পরতে হোত। ফুলপ্যান্টের সঙ্গে পাঞ্জাবী পরলে, কেউ না কেউ বলত কীরে তুই ক্লাউন সেজেছিস কেন ? এখন কিন্তু এইটাই খুব অ্যারিস্টোক্রাটদের সাজ। আমাদের সময়ে গেঞ্জী পরে, কোন লোকের বাড়ি বা সভায় যাওয়া খুব লজ্জা বা নিন্দের ব্যাপার ছিল। এখন কিন্তু গেঞ্জী পরে, বড় বড় লোকেরা বড় বড় জায়গায় যাচ্ছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন। আর একটা যুগের ঢেউ লেগেছে—এখন সভ্যভব্য হয়ে, বসে বসে গান গাওয়া উঠে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হেঁটে চলে কিংবা দৌড়-ঝাঁপ, দুলে দুলে গান গাওয়াটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হারমোনিয়াম বাদ, বহু আসরে তবলাও থাকে না। তার বদলে নানারকম বিদেশ উদ্ভূত যন্ত্রপাতির ভিড়। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও সেগুলো সাদরে গ্রহণ করেছে। আমাদের মত যাদের বেলা একটু গড়িয়ে গেছে তারা এসব চটকদার বাজনাবাদ্যি, মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। কিছু লোক আবার, যেমন আমি, এগুলো মেনে নিয়েছি। একটা সময় ছিল যখন কিছু কিছু লোক, পঙ্কজবাবু, হেমন্তবাবুর গানকেও বলত— ও আবার গান নাকি। ও সব প্যানপ্যানানি ন্যাকামি। অথচ মজা এই যে —এতদিন বাদে মানে ধরো ষাট বছর পরে সেই পঙ্কজ হেমন্ত, জগন্ময়রা সব

অবিস্মরণীয়দের দলে ঠাঁই পেয়ে গেছেন। এটাও কিন্তু আরেক কালের অন্য মানুষরা করেছেন যারা কাল থেকে কালান্তরে ঘুরে ফিরে আসেন বা একযুগ থেকে আরেক যুগে এসে, যাঁদের মন বদলে যায়, রুচি বা অনুভবও নতুন করে চেনার গভীরে ডুব দিতে চায়।

আমার বাবা বলতেন ঝড় আসা খুব ভাল। অনেক কিছু হয়ত ওলোট পালোট হয়, ভেঙে যায় কিন্তু তারপর আবার প্রশান্তির পরিবেশ ফিরে আসে। তাতে আবার নতুন রচনার জমি তৈরি হয়ে যায়। তাতে নতুন করে ফুল ফোটে, নতুন অনুরাগ সব বিরাগকে সরিয়ে দেয়—অনুকরণ, অনুসরণ তা সে যে পথেই হোক না কেন। যোগাযোগ ছবিতে, প্রেমেন্দ্র মিত্রর সেই গানটা প্রায়ই মনে এসে পড়ে।

'অলি যতো জুটবে জানি—সবাই তারা রসিক নয়,
মধুর মরণ কেউ বা জানে—কেউবা শুধু হুলই বয়।।'

মধুর জন্যেই সকলে ছুটে আসে কিন্তু অনেকে আবার হুল ফোটাবার জন্যেই ছটফট করে।

সবাই-এর সব কাজ যে ভালো হচ্ছে, গ্রহণযোগ্য হচ্ছে বা হবে তা কোনও কালেই হয় না। সব দশকেই প্রচুর গান তৈরি হয়েছে কিন্তু সব গানই কি রসোত্তীর্ণ হয়েছে, না, লোকের মনে চিরস্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছে ? হয়ত কালোত্তীর্ণ হয়েছে বড় জোর, দশভাগ আর বাকি নব্বই ভাগই ঝরে গেছে। কতো গাইয়েই তো এসেছেন, চলে গেছেন। ক'জনের নাম আর মনে থাকে! ধরো না, সুধীন চট্টোপাধ্যায়ের নাম—বরং ওঁর ছেলে, সুমনের এখন অনেক নামডাক। তাও তো মাত্র দু'চার বছর আগে ওকে নিয়ে যেরকম হৈচৈ দেখেছি এরই মধ্যে তা অনেকটাই ঝিমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ জীবনমুখী বলে একটা হাওয়া উঠল তারপর নিমেষেই তা উড়ে গেল। এখন তো গুমোট।

আরে, জীবন বাদ দিয়ে কি কখনো গান হয় ? বাইশ বছরের কবি সেই ১৮৮৩ সালে লিখেছিলেন—'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে ......হৃদয় আমার আকুল হল, নয়ন আমার মুদে এল রে—কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে।' মিশ্র কালেংড়া সুরও করেছিলেন তাতে। তা, এটা কি জীবনের বাইরের গান ? এরও অনেক বছর পরে ওই শতাব্দীতেই, কলকাতার আর এক কবি-গায়ক আড় খেমটায় গান তৈরি করেছিলেন—'হয় যদি আজ এমন উপকার তবে কেনা হই তোমার/গাছতলা সার করে, আছি অকূল পাথার। এসেছি বিদ্যার আশে, রাখো যদি নিজ বাসে, আশার আশে থাকি পাশে—বাসেতে তোমার। ইনি অ-বিদগ্ধ গোপাল উড়ে।' আবার দেখ, ১৯৩৮-এ অজয় ভট্টাচার্য, তিমিরবরণ, পঙ্কজ মল্লিকের তৈরি গান, সেকালের বাজার মাৎ করেছিল, আর এই ২০০২ সালেও, মাঝে মাঝেই রেডিওতে শুনি 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কি রে!' তাহলে একালের সংজ্ঞা অনুসারে, এগুলোকে এখন আর জীবনমুখী বলা যাবে না। তাহলে কিন্তু প্রশ্ন, এত ঢাকঢোল পেটানো ওই এক আধ বছর আগেকার জীবনমুখী গানগুলো, এই ক'দিনেই আর কেউ মনে করতে পারছে না কেন ?

হ্যাঁ কথা হচ্ছিল সুধীন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। তখনকার দিনে ওঁর অনেক গান বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল—ভুলে যেও মোর গান, ফেলে দাও প্রিয় বাসি বাসরের মালা, চাঁদেরে স্মরিয়া শিউলি কহিছে যাই, কিংবা গরমিল ছবিতে প্লেব্যাকে বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রাণী রায়ের সঙ্গে একসঙ্গে গাওয়া 'দোলে পিয়াল শাখে।' অথচ এখন ওর নাম কখনো সখনো হয়ত উল্লেখ করা হয় সুমন চট্টোপাধ্যায় মানে সুমন কবীরের, বাবা বলে। তাই না ?

বিমান—বেচু দত্ত, বীণা চৌধুরির কথা আগেই বলেছি। দুঃখের কথা কিছু দিন আগে একজনকে শৈল দেবীর নাম বললাম। তাঁর নির্বিকার মুখটা দেখেই বুঝে ফেললাম এ নামটা তাঁর শোনা নেই। ইলা ঘোষের নাম বলতে তিনি অবাক, জিজ্ঞাসা করলেন উনি কি গান গাইতেন ? প্লেব্যাক করতেন ? কই কখনো তো শুনিনি। এমনকি রবীন মজুমদারের নাম বলতে বললেন, হ্যাঁ সেই, এই কি গো শেষ দানের রবীন মজুমদার না ? অতএব, দেখছ তো, কেউ কাউকে মনে রাখে না। এই যে আমি এত কথা বলছি, তুমি লিখবে, এটা কজনই বা পড়বে ?

তবে নথিটা অন্ততঃ রাখা থাকবে ভবিষ্যতে কারুর দরকার হলে বা ইচ্ছে হলে পাতা উল্টে, একটু আধটু অন্তত, জানতে পারবে। সে রকম এক আধজনও তো থাকবে।

বিমান—তা হয়ত থাকতেও পারে। দেখ, আমার থেকে একটু বড়, আমার অগ্রজস্থানীয় তুমি, আমার অনেক ছোট গৌরাঙ্গ ঘোষ বা তার স্ত্রী শ্যামলী আর আমি এই তিনজনে মিলে, আমার মনে হচ্ছে একটা পাগলামি করছি। বই এর পাতায় লেখা থাকলে কীই বা আর হবে বা কোন্ কাজে লাগবে। জানো তো পঙ্কজদা তাঁর আত্মকথা লিখেছিলেন, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমন্তদা এঁরাও লিখেছিলেন। আরো অনেকে লিখেছেন বা এখনো হয়ত লিখছেন। আমি নিজে, বাজার ঢুঁড়ে ফেলে দেখেছি যে—যেটা দরকার সেটাই পাওয়া যায় না। জগন্ময়, বালসারার বই তো অনেক পরের—তাও দোকানে মেলে না। আসলে, কেউ ওসব পড়ে না, তার মানে এসব পুরনো ইতিহাস কেউ দুদিন বাদে আর জানতেও পারবে না।

আজ আমি বুড়ো হয়েছি, এখনও বেঁচে রয়েছি। আমাকে, তাই অনেকে নানা ব্যাপারে প্রশ্ন করে, বলে এটা বলুন, ওটা বলুন। অথচ ওরা জানেই না যে—পঙ্কজ মল্লিক আধুনিক গানের, বলতে গেলে একরকম ভগীরথ ছিলেন। আরে এটুকুও যারা জানে না, তারা কীইবা খোঁজ করবে বা কোথা থেকেই বা খোঁজ খবর করতে আরম্ভ করবে ?

তা কেন, পঙ্কজ মল্লিকের এই দিকটা তো আমিও জানি যে.....

বিমান—দূর, তুমি তো, কি বলব, তুমি একটা লাইব্রেরী।

আঃ, থাক, থাক আবার ওসব কথা তুলছ কেন।

বিমান—না, বলতে দাও। তুমি একজন গানের পোকা, তুমি ইংরেজি, বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী, তুমি বিজ্ঞান জানো। তোমার অতীত দিনের গানের সংগ্রহ

সেও তো বিপুল। তুমি উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতেও ছোটবেলা থেকে ঘোরাফেরা করেছ। তুমি গানবাজনার জগতের অনেক কিছু জানবে—সেটা তো স্বাভাবিক। এখন যা অবস্থা, তাতে সিতাংশু ঘোষ, তোমার উপমা কেবল তুমিই, তোমার কথা বাদ দাও।

ওরে বাবাঃ। আর নয়, আর নয় অন্য কথা বলো।

বিমান—তাই তো বলছি, রাম, শ্যাম, যদু তারা তো সিতাংশু ঘোষ নয়। অথচ তাদের নিয়েই তো আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। আমি গেলে, ছেলেমেয়েরা সব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আবদার করে, স্যার ওই গল্পটা বলুন, সেই ব্যাপারটার কথা বলুন। আমি বলি, তারা এনজয় করে। হাসে, মজা পায় কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওইটুকুই। তারা কিন্তু আসলে বেশি চায়—এখন যারা, বিজ্ঞাপন, মিডিয়ার দৌলতে চোখের সামনে আছে, তাদের কথা শুনতে। গুজবে, গল্পে তাদের আকর্ষণ অনেক বেশি। কিন্তু শৈলেশ দত্তগুপ্ত, কমল দাশগুপ্ত, কি গিরিন চক্রবর্তী বা সত্য চৌধুরির কথা বললেই তাদের উৎসাহ মিইয়ে যায়।

আমাদের দেশে, আমার মনে হয় ইতিহাসের প্রতি, বিশেষ করে সঙ্গীতের ইতিহাসের প্রতি, কারুর খুব একটা আগ্রহ নেই। রবীন্দ্র ভারতীতে যারা যায় তারা একটা তকমা বা সার্টিফিকেট পাবার জন্যেই, মূলতঃ যায়। বেকার সমস্যার যুগে তারা হয়ত ভাবল, ওখান থেকে পাশ করলে, একটা কিছু চাকরি বাকরি বোধহয় পাওয়া যাবে। এতে অন্যায়ও কিছু নেই। তাই এর জন্যে যেটুকু না করলেই নয়, দরকারমত তারা শুধু সেইটুকুই করে। আমি তাই বলছি, এতসব যা বলে লিখে রেখে গেলুম তার মূল্য কবি মোহিতলাল মজুমদার অনেকদিন আগেই হিসেব কষে বলে রেখে গিয়েছেন—আমাদের দেশে চিরকাল, কবিতার থেকে—তা, লেখার কাগজের দাম বেশি। আমাদের এই লেখার দাম, হয়ত তা-ও নয়।

অতটা নৈরাশ্যবাদী না হয়ে, এবার কিন্তু একটা বিশেষ প্রশ্ন করবার সময় হয়েছে যার জবাবটা অনেকেই শুনতে চায়।

কথাটা হল, নজরুলের গানের যে বিশেষ ধারা—মাঝখানে সবাই তা ভুলে গিয়েছিল, সেটা যেন তলিয়ে যাচ্ছিল। কিছুকাল আগে আবার যখন তা আস্তে আস্তে উঠলো তখন থেকেই একটা কথা তৈরি হল, সবাই বললে এই পুনরুদ্ধার আর পুনর্জ্জীবনের জন্যে বিমান মুখুজ্জেকেই সব কিছু ক্রেডিট দেওয়া উচিৎ। তাই কি ?

বিমান—না, না মোটেই না।

এই সঙ্গে অনেকে আরও বলছে বিমান মুখুজ্জে নজরুলের গানের ভাঁড়ারী, ওই সব আগলে রেখেছে, দরকার মত বের করে দিচ্ছে। অন্যদিকে কেউ কেউ আবার ভ্রূ-কুঁচকোচ্ছে, বলছে কেন, উনি তো কখনো নজরুলের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে, তাঁর ঘনিষ্ঠতা পাননি, কিছু শিখে নেবার সুযোগও পাননি। উনি তো তাঁর বাবার

কাছ থেকে, তৃতীয় পক্ষ হিসেবে যা পাবার, যতটা পাবার, মাত্র তাই পেয়েছেন। তাই যদি হয়, তাহলে উনি কি করে ভাঁড়ারী হলেন ? এই যে সব নানারকমের প্রশ্ন, নানান মানুষের কাছ থেকে প্রায়শঃই শুনতে পাই কিংবা ধরো, নজরুলের ব্যাপারে অনেক কিছু না জানার কারণে, সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহলের দরুণ যে সব জিজ্ঞাসা ছটফট করে, সে সবের উত্তর দেওয়া বা সর্ব কৌতূহল নিরসনের দায় কিন্তু তোমার ওপরই পড়ে। সেইজন্যে এই নিয়ে কিছু বলবে কি ?

বিমান—হ্যাঁ, আমি কৌতূহল নিরসন করেই বলছি—যে আমি নজরুলকে যখন দেখেছি, তখন উনি সম্পূর্ণ অসুস্থ। এর আগে, ছোটবেলায় একবার রঙমহল থিয়েটারে একটা অনুষ্ঠানে, ওঁকে একবারই দেখেছি। উনি 'হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল 'মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গাইছেন—মাথায় খুব বড় বড় বাবরির মত চুল, মাথায় টুপি। আমার সেই দৃশ্যটা এখনো মনে আছে—আমার তখন মোটে ৫/৬ বছর বয়েস। আমি—ওপরে, যেখানে লেডীজরা বসতেন, সেখানে মা, জ্যেঠিমা —এঁদের কোলে বসে দূর থেকে নজরুলকে দেখেছিলুম। তারপর যখন আমি তাঁকে দেখলুম তখন তিনি সম্পূর্ণ অসুস্থ। এবার মাথায় বিরাট টাক, একটা হাঁটু খাড়া, মুড়ে বসে আছেন। কারুর দিকে তাকাচ্ছেন না, মুখে কোনও ভাব, এক্সপ্রেশান নেই, হাতে এলোমেলো কতকগুলো কাগজ আছে—তবে যেমন শোনা যেত, আমি কিন্তু তাঁকে ছিঁড়তে দেখিনি। আমি প্রতিবছর ওঁর জন্মদিনে একবার করে যেতাম। কিন্তু শেষের দিকে একবার আমার বাবা-ই বললেন, 'ওটা দেখতে যেও না। ওটা যেন তোমাদের সঙ দেখতে যাওয়া। একটা অসুস্থ মানুষ'! বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। এইরকম জন্মদিনে, একবার দেখেছিলুম কবি ভয়ানক রেগে গিয়েছিলেন। সেবার অত্যধিক ভিড় হয়েছিল লোকের চাপে দমবন্ধ হবার মত পরিস্থিতিতে তিনি গোঁ গোঁ করে একটা আওয়াজ করছিলেন। কাজেই তারপর থেকে আর আমি যাইনি। আরও পরে তো ওঁকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হল ক্রীস্টোফার রোডের বাড়ি থেকে। ওঁর ছেলেরা অবশ্য এখানেই থেকে গেল। আমার সঙ্গে এখনও ওদের যোগাযোগ রয়েছে। কল্যাণীর সঙ্গে, তার ছেলেদের সঙ্গে এবং সুবর্ণ কাজী, নজরুলের এক ভাই-এর নাতি, যে কিছুকাল আগে রাতভোর নজরুল নাম দিয়ে একটা জমজমাট অনুষ্ঠান করেছিল। দু'একদিন আগেও আমার কাছে এসেছিল এই বাড়িতে ঘণ্টা দুয়েক ধরে গল্প করল, সুন্দর গান গাইল। নজরুলের দুই ছেলে সানি, নিনি এদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল। মজার কথা এই যে ওদের দু'জনকে আমি তুই বলতুম আবার ওদের আণ্ডারে আমি কাজও করেছি। কাজী সব্যসাচীর তত্ত্বাবধানে বিদ্রোহী নজরুল বলে একটা ডকুমেন্টারী হয়েছিল। তাতে সব্যসাচী অনেকগুলো আবৃত্তি করেছিল আর গান গেয়েছিলুম আমি, ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় আর বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই মিলে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিল কাজী অনিরুদ্ধ। এখানে দেখ, ডাক্তার অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের কথাটা প্রসঙ্গ সূত্রে এসে পড়ল।

ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৮৩) নজরুলের গান সব থেকে বেশি

শিখেছিলেন রেকর্ড থেকে শুনে। তবে পরে অবশ্য শ্রীমতী আঙুরবালা-ইন্দুবালা এই দুজনের খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এবং এঁদের কাছ থেকে অনেক গান সংগ্রহ করেছিলেন এবং শিখেছিলেন। ইন্দুবালা তো সামনে বসিয়ে ওঁকে অনেক দেখিয়ে টেখিয়ে দিতেন। তাছাড়া সঙ্গীতরসজ্ঞ পরিবারে দাদা শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ঘরোয়া ভাবেও শিখেছিলেন।

তোমার কাছেও কি অঞ্জলি ট্রেনিং নিয়েছিলেন ?

বিমান—হ্যাঁ, আমার কাছেও অঞ্জলি ট্রেনিং নিয়েছিল। আমার সঙ্গে অঞ্জলির খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। আমরা একসঙ্গে সত্তরের দশকটা পুরো কাজ করেছি। অঞ্জলি খুব বড় ডাক্তার ছিলেন। এ পি জি হাউসে ওঁর চেম্বার ছিল। অঞ্জলি নিজের হাতে আঙুরবালার টিউমার অপারেশন করেছিলেন।

ওঁর অনেক গুণ ছিল। ডাক্তারীতে লণ্ডনের রয়াল কলেজের এম আর সি ও জি। তিনবার টেবিল টেনিসে চাম্পিয়ান আবার অত ভাল নজরুলের গানের গায়িকা। ওঁর দাদা শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় নামকরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গাইয়ে ছিলেন, থাকতেন রানাঘাটে। ওখানে নগেন্দ্র ভট্টাচার্য সেকালের এক গুণী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর নামের স্মৃতিতে প্রতিবছর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর বসত। সেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরিমণ্ডলে ঘোরাফেরা করার সূত্রে, আমার সঙ্গে শিবকুমারের খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। বাংলা টপ্পা তাঁর গলায় দারুণ খুলত। ওঁর গাওয়া নিধুবাবুর টপ্পা, 'প্রেম করা হল একী দায়', যে শুনেছে সেই মজেছে। দুঃখের কথা উনিও অকালে চলে গেলেন। যাই হোক, একথা থাক, এখন আবার একটা প্রশ্ন উঠছে। তুমি তোমার বাবার কাছে নজরুলের গান শিখেছিলে, একথা নানাক্ষেত্রে, অনেকবার বলেছ। তাহলে জিজ্ঞাস্য তোমার বাবা, কিভাবে নজরুলের কাছ থেকে অত গান পেলেন বা শিখেছিলেন ?

বিমান—আবার বলছি নজরুল ইসলামের কাছ থেকে আমার বাবা বেশ কিছু গান শিখেছেন। আমার বাবা তো বরাবর অ্যামেচার ছিলেন। তখন চীৎপুরের বিষ্ণুভবনে, এইচ এম ভির রিহার্স্যাল রুমে নজরুলের বেশিরভাগ সময় কাটত। আগে বলেছি তুলসী লাহিড়ীর ভাই গোপাল লাহিড়ী, সেকালের একজন অগ্রগণ্য ক্ল্যারিওনেট শিল্পী হিসেবে গ্রামোফোন কোম্পানীতে মাস্ মাইনের স্থায়ী, নিয়মিত চাকুরে ছিলেন। তিনি আবার ছিলেন আমার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সূত্রে বাবা নিয়মিত ওখানে আড্ডা দিতে যেতেন—আর তাই থেকে, নজরুলের সঙ্গে বাবার খুব আলাপ পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। আবার মেগাফোনেও নজরুল নিয়মিত যেতেন এবং ওখানেও আমার বাবা নিয়মিত যেতেন। ফলে নজরুলের সঙ্গে বাবা এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন যে বাবার পকেটে একটা বোম্বাই সাইজের বাক্সের মত পানের ডিবে, সব সময় পানের খিলি ভর্তি রাখতে হোত। কেননা যে কোনও মুহূর্তে নজরুল হয়ত হাত বাড়িয়ে বলে বসবেন—কি মুখুজ্জে মশাই, আপনার সেটা কোথায় গেল ? বের করুন আপনার ওই পানের তোরঙ্গটা একটু বার

করুন। হাঃ হাঃ...। নজরুল এইভাবেই তাঁর দিলখোলা বন্ধুত্বের দাবী যখন তখন পেশ করতেন।

তোমার বাবাও তাহলে নজরুলের কাছ থেকে অতসব গান শুনে শিখে নিতেন এবং পরে তা মনে রাখতে পারতেন! এ বড় কম কথা নয়। তাহলে আবার আমার প্রশ্ন, তোমার যা দুর্দান্ত স্মৃতিশক্তি, সেটা কি তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছ ?

বিমান—বাবার স্মৃতিশক্তি প্রায় অসম্ভব, অবিশ্বাস্য রকমের বেশি ছিল। বরং বলতে পারো আমি তার কিছুটা, একটুখানি হয়ত পেয়েছি। তবে বাবার তুলনায় কিছু নয়। বাবা যেমন অভিনয় করতেন তেমনি ভাল গান গাইতে পারতেন, তবলাতেও সেইরকম হাত ছিল। পিয়ানো তো খুবই ভাল বাজাতেন, হাতে এমন স্পীড ছিল যে, বাজানোর সময় হাতের আঙুল প্রায় দেখাই যেত না। আমি ছেলেবেলায় এমনি অনেককে দেখেছি। তাঁরা প্রায় সবাই এত অসাধারণ যে নিজেকে তাদের তুলনায় কি যে ছোট মনে হয়, তা বলে বোঝাতে পারব না। আমাদের বাড়িতে 'জঙ্গ' কাকা বলে একজন আসতেন তাঁর নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ধনী, হরেন শীলের সভাসদ, বিদূষকও বলতে পারো—প্রচণ্ড মদ্যপান করতেন। এই মানুষ আবার যা দুর্দান্ত ম্যাজিক দেখাতেন যে মাথা খারাপ হয়ে যেত। নেমন্তন্ন বাড়িতে তখনকার দিনে, প্রায়ই একটা জিনিস ঘটতো। গোনাগুনতি হিসেব ছাড়িয়ে অনেক বেশি লোক এসে পড়ল, মাছটাছ কম পড়ে যাবার মত অবস্থা। তা, দুটো ছেলে সাইকেল নিয়ে ছোট্ ছোট্-সারারাত বাজার খোলা থাকত তখন। বাড়তি মাছ কিনে আনতে হবে। তারপর কিনে আনলে তো কুটে বেছে ধুয়ে রান্না করতে হবে—তবে লোককে পাতে বসানো যাবে। সে যুগে এস্টিমেটের বাইরে হামেশাই লোক বেশি হয়ে যেত। তখন আসলে আক্ষরিক অর্থে সপরিবারে নেমন্তন্ন খেতে আসার একটা সামাজিক রেওয়াজ ছিল। কেউ কিছু মনে করত না। তাই এরকম হঠাৎ হঠাৎ বিপত্তির জন্যে, লোকে মনে মনে প্রস্তুতও থাকত। বরযাত্রীরাও যেন তাদের পাড়াশুদ্ধ এসে গেছে, তাদের তো খাতির যত্ন করে খেতে বসাতে হবে। নিজেদের বাড়ির আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিতরা না হয় পরে বসবে তাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে, হয়ত একটু দেরিই হয়ে যাবে। আমাদের পাড়ার ভুবন ঘোষের বাড়িতে মেয়ের বিয়ে। বরযাত্রীরা, নিজেদের নিমন্ত্রিতরা সব মিলে দেখা যাচ্ছে, অনেক বেশি লোক হয়ে গেছে। বাজার থেকে বাড়তি মাছটাছ আনানো হয়েছে, রান্না চেপেছে তবে রান্নার সময়টা তো দিতে হবে। তাই খেতে বসাতে একটু ধানাই পানাই হচ্ছে। সেকালে আর একটা ব্যাপার ছিল। ছুতোনাতা করে, বরযাত্রীরা বড্ড গণ্ডগোল পাকাত, তুলকালাম কাণ্ড বাধাতো। কেউ তাদের বিশেষ কিছু বলতে সাহস করত না পাছে বিয়েটা পণ্ড করে দেয়।

তা, এখানেও তারা চেঁচামেচি জুড়ে দিল—খেতে এত দেরি কেন ? ওরে, রান্না হয় নি নাকি ? চল্ চল আমরা কি ভিখিরী নাকি ?

হঠাৎ জঈ কাকা খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন, বললেন—কি, কী হয়েছে ? বরযাত্রীরা এত চেঁচাচ্ছ কেন ? ঠিক আছে, আমায় এক জোড়া তাস দে তো, দ্যাখ না সব ঠিক করে দিচ্ছি।

উনি সঙ্গে সঙ্গে, তাস নিয়ে ম্যাজিক শুরু করে দিলেন। তার মধ্যে আবার ভেন্ট্রিকুইলিজম্, যাতে অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে অভিনয় করে হরবোলা খেলা দেখানো হয়, তা দেখিয়ে এক দণ্ডের মধ্যে সকলকে খিদে তেষ্টা ভুলিয়ে দিলেন। খেলার মধ্যে একজন এসে বললে সবাই চলুন এবার, পাতা হয়ে গেছে এদিকে এর মধ্যে ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেছে।

সবাই যেন একসঙ্গে বলে উঠল, না না এখন নয়, এই তো সবে এগারোটা বাজছে আর একটু ম্যাজিক হোক, আমরা পরে খাব'খন।

তাহলে বোঝো, আর্টিস্ট কত রকমের হয়। জঈ কাকা মানে ওই মৃত্যুঞ্জয় চাটুজ্জেরাও অন্য ধরনের শিল্পী ছিলেন। এত মানুষকে আনন্দ দিয়ে যারা মুগ্ধ করে রাখতে পারে তারা আর্টিস্ট নয়তো কী ? আবার দেখেছি, এই মৃত্যুঞ্জয় কাকা এক সময়ে, মাঝে মাঝে, বাবার কাছে আসতেন—একটা টাকা দিবি! ওঃ এ কী ভাবা যায়। কতো গুণী যে এইরকম হারিয়ে গেছেন। এঁর গুরু ছিলেন হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইনিও হরবোলা ছিলেন। আবার হাসির গানের বড় গাইয়ে, হাসির গানের রেকর্ডও ছিল।

হ্যাঁ, 'আজকে মাসের পয়লা' খুব বিখ্যাত হয়েছিল। আর একটা দারুণ গান ছিল 'মাছ ভাজা আমার মুখেতে রোচে না চপ কাটলেট ফেলিয়া'।

বিমান—মাঝে মাঝে প্রফেসর ব্যাঙো নাম দিয়ে এসব গান গাইতেন। একবার ওই মাছভাজা চপকাটলেটের গানটাতে এমন তান করে গেয়েছিলেন যে ফৈয়াজ খাঁ ওকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন। বলেছিলেন তোমার এত প্রতিভা, তুমি এইভাবে নষ্ট করছো ?

আরে শিশির ভাদুড়ির কথাই ধরো না। এখন কত সব লম্বা চওড়া কথা শোনা যায় কিন্তু বলো তো শিশির ভাদুড়ির মত অভিনেতা, আমাদের কাছ থেকে কিই বা পেয়েছেন ?

আমার মনে হয় তখন না-পাবার দিন ছিল। তাই না-পাওয়া নিয়ে কেউ ভাবতো না।

বিমান—এটা সিতাংশু ঘোষই বলতে পারে। সত্যিই তখন, পাওনার দিকে শিল্পীদের ততো নজর থাকত না। শিল্পের দিকেই মন থাকতো। আমার বাবা একটা কথা খুব বলতেন—কারুর কাছ থেকে কিছু নিলে, যেভাবেই হোক তার রিটার্ন দেবে। তাই যারা তোমায়, পয়সা দিয়ে গান করাবে, চেষ্টা করবে তারা যেন হতাশ না হয়, মনঃক্ষুণ্ণ না হয়। বাবার আর একটা কথাও আমার কাছে আজ খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়। উনি বলেছিলেন, আমরা স্বাধীন হয়েছি (বাবা ১৯৬৭ সালে

মারা যান) কিন্তু স্বাধীনতার এই পনেরো বছর পরেও আমরা কেন বিলিতি জিনিস ফেলে দিশী জিনিস নিই না ? আসলে আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, ওরা যদি একটাকা দাম নেয় তাহলে তার বদলে, অন্তত একটাকা এক আনা মূল্যের জিনিস দেবে। তার মানে দিশী জিনিসের মূল্যমানে, লোকের এখনো সেই বিশ্বাস, তৈরি হয় নি। এর জন্যে ব্যবসার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল 'গুড উইল' যার জন্যে বাজারে ব্যবসাদারদের মধ্যে এই গুডউইলও যথেষ্ট চড়া দামে কেনা বেচা হয়। তা এই গানবাজনা শিল্প সংস্কৃতির জগতেও এই গুডউইলের যথেষ্ট দাম। এই কথারই রকমফের—ইন্দুমা বলতেন, 'বাবা সহবত শেখো, তোমার গানে, ব্যবহারে যেন তোমার বিনয় ফুটে ওঠে। প্রণাম ফুটে ওঠে, মানুষ এবং দেবতাও যেন তুষ্ট হন। কে তোমায় বাহবা দিচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে—সেদিকে তাকিও না, ওসবে মন দিও না। কেষ্টবাবুর গান অত মধুর ছিল কেন জানো ? উনি চোখে দেখতে পেতেন না তাই ওঁর সব গান এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতো। মন দশ জায়গায় ভাগ হোত না'।

এইসব কথার তখন সেভাবে মানে বুঝিনি। সত্যিই কৃষ্ণচন্দ্রের গান এত জনপ্রিয় ছিল। তাঁর একটা গান, লোকে দশবার শুনেও এনকোর দিত কেন ? আসলে তাঁর সব একাগ্রতা ছিল এক জায়গায়। আর, আমরা তো চারদিকে তাকাতুম। আমার দিকে লোকে বাহবা দিচ্ছে কি না, আমার গান লোকে শুনছে কিনা বা আমিই ঠিক ঠিক গাইতে পারছি কিনা বা জামাটা ঠিক আছে কিনা—আমাদের একাগ্রতা সব ভাগ হয়ে এইসবে ছড়িয়ে রয়েছে। তখন আর একটা জিনিস ছিল না। এখন যেমন সব সময় আমাদের, আমি-আমি। আগে, সবাই গুরুর কথা বলে, তাঁকে স্মরণ করেই গান গাইত। অতএব গানও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেইরকম হচ্ছে। দুদিন পরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, লোকে ভুলে যাচ্ছে।

এইসব শুনে শুনে আমার অন্য একটা বিষয়ের কথা মনে হচ্ছে। আমরা এতদিন ধরে পুরনো আমলের গান, তখনকার শিল্পী তাদের দুঃখ বেদনা, হারিয়ে যাওয়ার কথা অনেক শুনলুম। সব কিছুর মূল কথা যেন ভুলে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়ার খেদ। সেক্ষেত্রে জানতে ইচ্ছে করে এই চিরকালের সমস্যাকে রোধ করার জন্যে ভবিষ্যতের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখতে, কোনদিন কি কিছু ব্যবস্থা নেওযা হয়েছিল বা কেউ চেষ্টা করেছিল ? সাধারণভাবে তো জানা যে, সঙ্গীত সম্পদকে সংরক্ষণের কাজে রেকর্ড, টেপ, বিজ্ঞানের এসব অবদান না পেলে আমরা তো চিরকালের মত সব কিছু হারাতুম। অতএব সংরক্ষণের যে প্রচেষ্টা আমাদের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যকে অনেকাংশে বাঁচাতে পেরেছে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকলে, সংরক্ষণের প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতেও সাহায্য হতে পারে। আমি এই নিয়ে খুঁজে পেতে যা পেয়েছি সেটা এইখানে একটু বলব কি ?

বিমান—দেখ ভাই, পুরনো দিনের বাংলা গান ও তার শিল্পীদের নিয়ে আমাদের এত ভাবনা চিন্তা। সে সব হারিয়ে যাচ্ছে বলে শুধু হায় হায় না করে, বরং সে সব

সংরক্ষণের ইতিহাসটাকে জানতে পারলে, তবু হয়ত কিছু প্রাসঙ্গিক উৎসাহ পাওয়া যাবে। অতএব বলো না!

আমি সাল ধরে ধরে কালানুক্রমিক যতটা পারি সংরক্ষণ প্রচেষ্টার একটা সূচী তৈরি করছি। সুদূর প্রাচীন কালে গান ধরে রাখার কোনও উপায় ছিল না, তখন লোকের মুখে মুখে পরম্পরাক্রমে সে গানের ধারা বহে যেত। তাই মূল আদি জিনিসটা ঠিক বজায় থাকতো না, কথা বদলে যেত, সুর তাল বদলে যেত। একটা সময়ের পর চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যেত। কিন্তু ১৮৯৪ সাল থেকে এই ছবিটা পাল্টাতে শুরু করে। সেটা এখানে বললে হয়ত বোরিং লাগবে তাই ওটা লিখে তোমায় দিচ্ছি—পরে দেখে নিও (পরিশিষ্টতে থাকবে)। এবার তাহলে যে কথাটা হচ্ছিল তাতেই ফিরে যাই। কথাটা হচ্ছে, ধরো এই পাঁচ সাত দশ বছর আগেও তুমি গানটান যথেষ্টই গেয়েছ। যথেষ্ট পরিশ্রম করেছ। এখনকার থেকে হয়তো আরো ভালই গাইতে—

বিমান—তাতো বটেই। তখন বয়স কম ছিল, শরীরও অনেক ভাল ছিল—

অথচ তখন তোমায় কেউ সেভাবে মূল্য দেয়নি, বলতে গেলে কিছুই পাওনি। আর আজকে গোটা বাংলাতে, সেরকম কোন লোকও নেই। এখন তোমাকে ছাড়া কোনো বাংলা গানের অনুষ্ঠান হয় না বা করাও যায় না।

বিমান—না, না তা কেন, কত আসর তো আকছার হচ্ছে।

না, আমি তা বলছি না। বলছি প্রবীণ যাঁরা অনেক গান শুনেছেন, গান বাজনা প্রকৃত অর্থে বোঝেন, তাঁরা বলেন বিমান মুখুজ্জেকে ডাকো, ওকে না হলে হবে না। ফলে এই অল্পদিনের ভেতর, তোমার এখন নাইবার খাবার সময় নেই। উদয় অস্ত গান নিয়ে পড়ে আছ, খাটছ। এই দুটো জীবনের মাঝখানের দূরত্ব এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু এ দুটো জীবনের পার্থক্য, এখন অনেক হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি এই তফাৎটা তোমায় আলাদা মর্যাদা, মানসম্মান, শ্রদ্ধা এনে দিয়েছে। তাই খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে এই যে দু'রকম জীবনের আলাদা স্বাদ—এটা কি রকম উপভোগ করছ ?

বিমান—দেখ, তখন বয়স কম ছিল, একটা তো কুঁড়ি ছিলাম। তাই তখন ফুল হয়ে ফোটার আগ্রহ ছিল। আর এখন ফুল হয়ে ফুটে ভাবছি, এখন ঝরে পড়তে হবে।

তবে ফুলের যে গন্ধটা ছড়িয়ে দিচ্ছ, তা যে নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছে না, তাতেই আমাদের আনন্দ। কিন্তু আর একটা কথা মনে হচ্ছে। আমরা দুটো বুড়ো এতক্ষণ ধরে যে দিনগুলো চলে গেছে সেদিনকার গান, সেদিনের শিল্পীদের অনেক গুণগান করে ফেললুম। কিন্তু এটা যে নিছক কোন স্মৃতিপীড়ার ক্লান্তিকর চর্বিতচর্বন নয়, তার একটু ব্যাখ্যা করে, ভারমুক্ত হতে চাই। দেখ ভাই, একজন আর্টিস্ট যখন, জীবনের একটা ছবি আঁকে, তখন ছবিটা যথার্থ প্রাণবন্ত হচ্ছে কিনা, তা দেখতে হয়। ইজেলের ফ্রেম থেকে, বারবার অনেকটা দূরে পিছিয়ে এসে, অনেকটা দূরথেকে,

ছবিটাকে দেখে আমার ক্যানভাসের কাছে ফিরে যেতে হয়। তা নাহলে ছবিটা প্রকৃত ছবি হয় না। তার সত্যিকারের রূপ চোখে ধরা পড়ে না। জীবন-দর্শনের ছবিতেও এটাই নিয়ম। আমরা আমাদের বাংলা গানের জগৎটাকেও অমনি করে দেখি, মনের মত করে সাজাই, কেননা তাকে আঁকড়ে ধরতেও চাই। তাই একবার দূর থেকে দেখি, আবার কাছে ফিরে যাই। জীবনের ছবি দেখতে হলে এটাই যে নিয়ম সেটা নতুনদের একটু বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে। তাই না ? বুড়োদের নষ্টালজিয়া বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলে ঠিক হবে না।

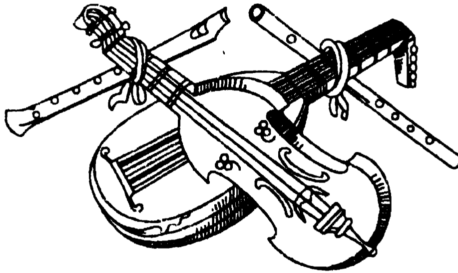
বিমান—এখনকার শিল্পীদের যে আমি কি ভালবাসি, তা কি আর বলব। তারাও তো আমাকে কতো সম্মান করে। আমার যে এত সৌভাগ্য হবে, তা আমি কিন্তু কুড়ি বছর আগে ভাবিনি। তখন যাঁরা গান করেছেন, তাঁরা কেউ আমার দাদা, কেউ আমার সমসাময়িক, কেউ বা আমার গুরু। তখন কোথাও যেন আমার একটু সঙ্কোচ ছিল। আর এখন যারা গাইছে, কেউ আমায় পুত্রপ্রতিম যেমন শ্যামল মিত্তিরের ছেলে, মানব মুখুজ্জের মেয়ে, সুমিত্রা সেনের মেয়ে, নির্মলেন্দুর ছেলে। ওরা কেউ আমায় কাকু বলে, কেউ দাদু আবার কেউ কেউ দাদাও বলে। তা, আমি বলি একী রে, তোর বাবাও দাদা বলত আর তুইও দাদা বলছিস! এই যে ভালবাসা পেয়েছি, এতেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে। এমনকি, বাকি বকেয়া শুদ্ধু যা পাবার তাও এখন সব পেয়ে গেছি। তাই শেষবেলায় কি আর বলবো—সেই রবীন্দ্রনাথেরই কথা বলে, তাহলে আপাতত শেষ করি ঃ

'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।'

ঠিক আছে। এখানেই তাহলে সেকালের কবিওয়ালারা, যা বলে তাঁদের গাওনা শেষ করতেন, সে কথাটা অনুসরণ করে, আমাদের কথার পালাও, ঊর্ধবাহু হয়ে তাহলে এখানেই শেষ করি—.

এই পর্যন্ত, হলেম ক্ষান্ত—বাবু মহাশয়,

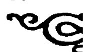
(এবার) বদন ভরে সবাই বলো—'বাংলা গানের জয়।।'





পরিশিষ্ট

বিমান মুখোপাধ্যায়ের গান



ভারতী ঃ ৪৫ বি.আর.টি-২১৬
রচনা ও সুর ঃ বিমান মুখোপাধ্যায়
কণ্ঠশিল্পী ঃ পদ্মরেণু চট্টোপাধ্যায়
স্বরলিপি ঃ দিলীপ বসু
(ভাতখণ্ড পদ্ধতি অনুসারে)

বাহিরে বাদল কাঁদে—মনে কাঁদে ফাল্গুন
বলো তো এ মন নিয়ে কি করি এখন।
এখন নাকি ওগো ভরা শ্রাবণ
সবার মনে ভয় আসবে প্লাবন
আমারি ভরসা যদি নেভে এই মন।
তার কঠিন চোখে আমি কতোবার
মেঘের আনাগোনা দেখেছি
সে মেঘে বাদল নাই, বিজলী জ্বালায় শুধু জ্বলেছি।
দুকূল ভাঙানো এই বন্যা ধারায় এ মন আমার
আজ ভেসে যেতে চায়,
বুঝব কোনটা ভাল দহন না মরণ।

কাহারবা

প ধ্র প ধ্র | ম গরে গ ম | ম ধ নি সাঁ | নি্রধ সাঁনি্র ধ্র প
বা হি রে বা | দ ऽল কাঁ দে | ম নে কাঁ দে | ফাऽ ऽল গু ন

প সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁরে গরে নি্র ধ | ধ নি্র ধ নি্র | পনি্র সাঁনি্র ধ্র ধ্র
ব ল তো এ | মऽ ऽন নি য়ে | কি ऽ ক রি | এऽ ऽऽ খ ন

সাঁগ রে সাঁনি্র নি্র | রেসাঁ নি্র প ম | প নি্র সাঁ গ | গম রেগ ম ম
এऽ খ ऽন না | কিऽ ऽ ও গো | ভ ऽ রা ऽ | শ্রাऽ ऽऽ ব ন

বিমানে বিমানে আলোকের গানে

সা মগ্‌ গ্‌ গ্‌ | গ্‌রে মগ্‌ গ্‌ গ্‌ | রে সা নি্‌ — | সারে মগ্‌ রে সা
স বাS র ম | নেS SS ভ য় | আ স বে S | প্লাS SS ব ন

প সানি্‌ নি্‌ সানি্‌ | নি্‌প প ম ম | প নি্‌ সা গ্‌ | গ্‌ — সানি্‌ পপ
আ মাS রি ভS | রS সা য দি | নি ভে এ ই | ম S SS Sন

প ।
তা র

ধ্‌ সা সা সা | সা ধ রে সা | ধ্‌ পম প — | প ধ্‌ সা ধ্‌
ক ঠি নি চো | খে S আ মি | ক তS বা র | মে ঘে র আ

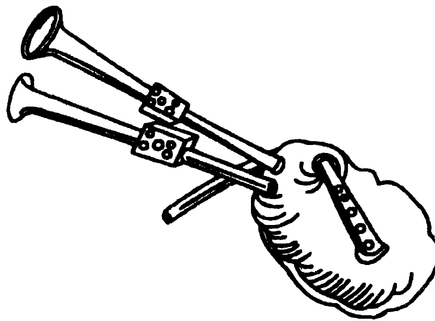
প — ম রে | প প ম — | ম প ধ সা | সা সা সা সা
না S গো না | দে খে ছি S | সে মে ঘে বা | দ ল না ই

সা রেস রে সা | ধ্‌ ধ্‌ প মরে | প প ম — | — — — —
বি জS লী জ্বা | লা য় শু ধুS | জ্ব লে ছি S | S S S S

সাগ্‌ রে সানি্‌ নি্‌ | রেসা নি্‌ প ম | প নি্‌ সা গ | গম রেগ ম ম
দুS কৃ Sল ভা | ঙাS নো এ ই | ব S ন্যা S | ধাS SS রা য়

সা মগ্‌ গ্‌ গ্‌ | গ্‌রে মগ্‌ গ্‌ গ্‌ | রে সা নি্‌ নি্‌ | সারে মগ্‌ রে সা
এ মS ন আ | মাS Sর আ জ | ভে সে S যে | তেS SS চা য়

পসা নি সা নি্‌ | প প ম ম | প নি্‌ সা গ্‌ | গ্‌ গ্‌ সানি পপ
বুঝ ব S কো | ন টা ভা ল | দ হ ন না | ম র SS Sণ



ভারতী ঃ ৪৫ বি.আর.টি-২১৬
রচনা, সুর ও কণ্ঠশিল্পী ঃ বিমান মুখোপাধ্যায়
স্বরলিপি ঃ দিলীপ বসু

যা চেয়েছি মাগো দাও দাও বলে
তার চেয়ে বেশি দিয়েছ।
আমি শুধু তোমার, দেখাটি চেয়েছি
ডেকে তুমি কাছে নিয়েছ,
তার চেয়ে বেশি দিয়েছ।।
তুমি দিলে স্নেহ মমতা প্রাণের
কতো না বুঝায়ে বলেছ
(আমি) না শুনে সে কথা, দিছি শুধু ব্যথা
হাসিমুখে তুমি সয়েছ
তার চেয়ে বেশি দিয়েছ।।
বিপদে পড়িয়া তোমারে স্মরিয়া
যখনি ডেকেছি এসেছ
আমি ভুলে থাকি, তুমি তো ভোলো না
কেন ভাল মোরে বেসেছ ?
তার চেয়ে বেশি দিয়েছ।।

দাদ্‌রা

সা	ন্রি	সা	গ্	গ্	ম	প (ম)	প	পধ্	মপ	প	প
যা	চে	য়ে	ছি	মা	গো	দা	ও	দাS	Sও	ব	লে
গ্	ম	প	ন্রি	ন্রি	ন্রি	ন্রিসা	ন্রিসান্রি	ধ	প	—	—
তা	র	চে	য়ে	বে	শী	দিS	SSS	য়ে	ছো	S	S
(প) ম	প	ন্রি	ন্রি	ন্রি	ন্রিন্রি	নি	র্সা	র্সা	ন্রির্সান্রি	ধ	প
আ	মি	শু	ধু	তো	মার	দে	খা	টি	চেSS	য়ে	ছি
প	প	প	ধ্	প	মপ	গ	—	প	ম	—	গ্
ডে	কে	তু	মি	কা	ছেS	নি	S	য়ে	ছো	S	S
প	প	প	ম	মধ	প	মগ্	মগ্	রে	সা	—	—
তা	র	চে	য়ে	বেS	শি	দিS	SS	য়ে	ছে	S	Sছ ॥

প প প | ম গ্ ম | প পনি্ নি | নি র্সা র্সা
তু মি দি | লে স্নে হ | ম মs তা | প্রা নে র
প ম
আ মি

র্সা র্সাগ্ র্গ্ | র্রে র্সা র্রের্সা | নি নি র্সানি | র্রের্সা নি্ প
ক তs না | বু ঝা য়েs | ব লে ছোs | ss মা গো

প নি্ নি্ | নি্ নি্ নি্ | নি্ র্সা র্সা | নি্র্সানি্ ধ প
নী শু নে | সে ক থা | দি ছি শু | ধুss ব্য থা

প প প | ধ্ প মপ | গ — প | ম — গ্
হা সি মু | খে তু মিs | স s য়ে | ছো s s

প প প | ম মধ প | মগ্ মগ্ রে | সা — —
তা র চে | য়ে বেs শি | দিs ss য়ে | ছো s s

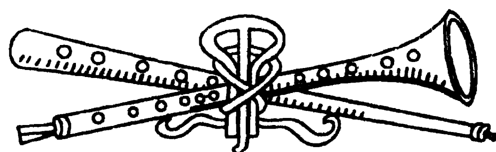
প প প | ম গ্ ম | প পনি নি | নি র্সা র্সা
বি প দে | প ড়ি য়া | তো মাs রে | স্ম রি য়া

র্সা র্সাগ্ র্গ্ | র্রে র্সা র্রের্সা | নি নি র্সানি | র্রের্সা র্সা —
য খs নি | ডে কে ছিs | এ সে ছোs | ss s s

পম পনি্ নি | নি্ নি্ নি্ | নি্ র্সা র্সা | নি্র্সানি্ ধ প
আs মিs ভু | লে থা কি | তু মি তো | ভোss লো না

প প প | ধ্ প মপ | গ — প | ম — গ্
কে ন ভা | ল মো রেs | বে s সে | ছো s s

প প প | ম মধ প | মগ্ মগ্ রে | সা — —
তা র চে | য়ে বেs শি | দিs ss য়ে | ছো s s



বিমান মুখোপাধ্যায়ের পুরাতনী গান

রচনা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র (মৃণালিনী উপন্যাসের গান ১৮৬৯)
সুর ঃ ব্রজেন গাঙ্গুলী
স্বরলিপি ঃ দিলীপ বসু

সাধের তরণী আমার, কে দিল তরঙ্গে;
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে।
ভাসল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
(এখন) গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ
কূল ত্যাজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে।
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি সাজাইয়া দিনু তরী
সে কভু না দিল পদ, তরণীর অঙ্গে।

তাল-দাদ্‌রা

প প প | — প নি | ধ পম গরে | গ — গ
সা ধে র | ঽ ত র | ণী ঽঽ আঽ | সা ঽ র

সাগ সাগ মপ | ধপ মগ ম | রে — সা | — — —
কেদি লোঽ ঽঽ | ঽঽ ঽঽ ত | র ঽ ঙ্গে | ঽ ঽ ঽ ॥

প ধ নির্সা | ধনির্সা র্সা র্সা | র্সা — নির্সা | পর্সা নির্রে র্সাগ
কে আ ছে | ঽঽঽ কা ন্ডা | রী ঽ ঽঽ | ঽঽ ঽঽ ঽঽ

র্রের্সা নির্সা ধ | প — — | গ প প | ধ ধ ধ
ঽঽ ঽঽ হে | নো ঽ ঽ | কে যা ই | বে স ঙ্গে

— র্ম ম | গ রেগ রেসা | সাগ সাগ মপ | ধপ মগ ম
ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽঽ ঽঽ | কেদি লোঽ ঽঽ | ঽঽ ঽঽ ত

রে — সা | — — — | |
র ঽ ঙ্গে | ঽ ঽ ঽ | |

[সা সা — র্রের্ম]

গ্‌ গ্‌ ম নি্‌ ধ্‌ ধ্‌ নি্‌ সা র্সা — র্সা
ভা স লো ত ऽ রী ऽ স কা ऽ ল

[রেঁ র্সা — — র্সা]

নি্‌র্সা গ্‌রে্‌ গ্‌রে্‌ | র্সা — র্সা | নি্‌ নি্‌ র্সা | র্সা রে্‌ র্সানি্‌
বেঽ ঽঽ ঽঽ | লা ঽ য় | ভা বি লা | ম এ ঽঽ

নি্‌ পানি্‌ র্সারে্‌ | র্সানি্‌ রে্‌ র্সানি্‌ | ধ্‌ প — | — — —
জ লোঽ ঽঽ | ঽঽ ঽ ঽঽ | খে লা ঽ | ঽ ঽ ঽ

প প প | — প প | পধ্‌ র্সানি র্সা | ধ্‌ প —
ম ধু র | ঽ ব হি | বেঽ ঽঽ ঽ | বা য়ু

গ্‌ প প | ধ্‌ ধ্‌ ধ্‌ | ম ম গ্‌ | রেগ্‌ রে্‌ সা
ভে সে যা | বো র ঙ্গে | ঽ ঽ ঽ | ঽঽ ঽ ঽ

সা সা সা | গ্‌ গ্‌ গ্‌ | — রে গ্‌ | — গ্‌ গ্‌
গ গ নে | গ র জে | ঽ ঘ ন | ঽ ব হে

গ্‌রে ম ম | ম ম গ | স — গ্‌ | গ্‌ গ্‌ গ্‌
খঽ ঽ র | স মী র | ন ঽ কু | ল ত্য জি

রে গ্‌ গ্‌ | রে গ্‌রে মগ্‌ | রে্‌সা সা সা | সারে্‌ গ্‌ম ম
এ লা ম | কে নোঽ ঽঽ | ঽঽ ম রি | তেঽ ঽঽ আ

রে্‌ — — | সা — — |
ত ঽ ঽ | ঙ্কে ঽ ঽ |

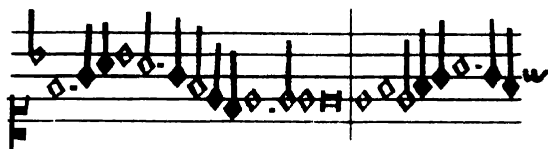
গ্‌ ম নি্‌ | ধ্‌ — নি্‌ নি্‌ | র্সা র্সা র্গ্‌ | রে্‌ র্সা —
যা হা রে | ঽ ঽ কাণ্‌ | ডা রী ঽ | ক রি ঽ

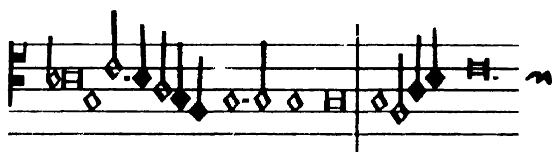
[র্গ্‌ র্গ্‌ রে্‌সা | রেঁ — র্সানি্‌ | — — র্সা | র্সা র্সারে্‌ র্ম
নি্‌ নি্‌ র্সা | র্সা রে্‌ র্সানি্‌ | নি্‌ পানি্‌ র্সারে্‌ | র্সানি্‌ রে্‌ র্সানি্‌
ভা সা ই | য়া ঽ ঽঽ | ছি নুঽ ঽঽ | ঽঽ ঽ ঽঽ

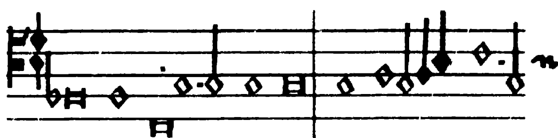
রে সাঁ —] | | [গপঁ ধনি পনি | ধ প —
ধ প — | — — — | প ধ প | ক ভু s]
ত রী s | s s s | সে ক ভু | s s s

গ প পধ | নি ধ নি | ধ প ধ | পম — —
দি ল নাs | s s ss | প দ s | ss s s

গ প প | ধ ধ ধ | মঁ ম গ | রেগ রে সা
সে ত রী | র অ ঙ্গে | s s s | ss s s







বিমানে বিমানে আলোকের গানে

রচনা ঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ (বিল্বমঙ্গল নাটকে পাগলিনীর গান-১৮৮৬)
স্বরলিপি ঃ দিলীপ বসু

যাই গো, ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।
আমার প্রাণ কেমন করে, আমার মন কেমন করে।।
ও সে একলা কালা কদমতলায়
দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যতো বাঁশরি বাজায়, তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশি ডাকে উভরায়।
আমি না গেলে সে, কেঁদে কেঁদে
চলে যাবে মন ভরে।

দাদ্‌রা

প ধ পধ | নির্রের্সা নি ধ | প ধ প | মপ ম গম |
যা ই গোS | SSS ও ই | বা জা য় | বাঁS শী SS |

প প প | নি ধ নি | র্সানি র্রের্সা — | নিধ নি ধপ |
প্রা ণ কে | ম ন ক | রেS SS S | গোS S SS ||

র্সা র্সা
আ মার

র্সা র্রে র্রে | র্রে র্রে — | র্রে র্রে র্রের্গ | র্রের্গ র্পর্ম র্গর্রে
প্রা ন কে | ম ন S | ক রে আS | মাS SS Sর

নি নি র্সা | র্সা র্রে র্গর্রে | র্সা র্সানি র্রের্সা | নিধ নি ধপ
ম ন কে | ম S Sন | ক রেS SS | SS S SS

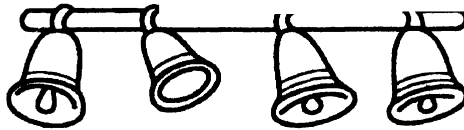
র্সা নি
ও সে

র্সা র্রে প | — র্রে র্রে | র্রে র্রে র্গ | র্রের্গ র্পর্স র্গর্রে
এ ক লা | S কা লা | ক দ ম | তS SS লায়

র্রে র্গ র্রে | র্সা নি ধ | নি নি র্রে | (র্সা) র্সা নি
দা ড়ি য়ে | আ ছে আ | মা র ত | রে ও সে

সা রে প | — র্রে র্রে | র্রে র্রে র্গ | র্গর্রের্সানি র্ধানর্রের্গ র্মর্মর্গর্রে
এ ক লা | S কা লা | ক দ ম | তSSS SSSS SলাSS

রে	গ	রেঁ	সাঁ	নি	ধ	নি	নি	রেঁ	(সাঁ)	নিধ	ধপ
দাঁ	ড়ি	য়ে	আ	ছে	আ	মা	র	ত	রে	SS	SS
											মম
											যত
ম	ম	—	পধ	সাঁ	নি়	ধ	—	—	ধ	ধ	নি়
বাঁ	শ	S	রীS	S	বা	জা	S	S	য়	ত	ত
প	ধ	—	পধ	নি়সাঁ	নি	সাঁ	—	—	সাঁ	সাঁ	নি
প	থ	S	পাS	SS	নে	চা			য়	ও	ই
সাঁ	সাঁ	রে	রেঁ	রেঁ	—	—	—	গঁ	রেঁ	সাঁ	নি
পা	গ	ল	বাঁ	শী	S	S	S	ভা	ক্	উ	ভ
সাঁ	—	—	সাঁ	সাঁ	নি	সাঁ	সাঁ	রেঁ	রেঁ	রেঁ	—
রা	S	S	য়	ও	ই	পা	গ	ল	বাঁ	শী	S
গঁমঁ	—	গঁ	রেঁ	সাঁ	নি	সাঁ	—	—	সাঁ	সাঁ	নি
SS	S	ডা	কে	উ	ভ	রা	S	S	য়	আ	সি
সাঁ	রেঁ	রেঁ	রেঁ	রেঁ	—	রেঁ	—	গঁ	রেঁগঁ	পঁমঁ	গঁরেঁ
না	S	গে	লে	সে	S	কে	S	দে	কেS	SS	দেS
গাঁ	রেঁ	সাঁ	নি	ধ	নি	রেঁ	সাঁনি	রেঁসাঁ	নি়ধ	নি়	ধপ
চ	লে	যা	বে	মা	ন	ক	রেS	SS	SS	S	SS



কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ বিমান মুখোপাধ্যায়
শিল্পী ঃ ইন্দ্রানী সেন
ক্যাসেট ঃ ৪৫ টি. কে ৫৫৯১

ওগো সুরের রাজা
তোমার সুরের পূজায়, করো মোরে পূজারিনী।
তোমার গানের ইন্দ্রসভাতে, আমি হব ইন্দ্রানী।।
ভাঙো ভাঙো নীরবতা
একলা বসে শুনবো তোমার
যে বাঁশীর মনের কথা গানের সুরে, বয়ে যাবে প্রাণে
সুরের সুরধুনী।।
কতবার ভাবি তোমার মত গান গাই
তুমি না শেখালে, কি কোরে বল
কণ্ঠে যে সুর পাই।
বিরহ মিলন যে গানে যায় হারিয়ে
সুখ আর দুখ মুখোমুখি থাকে দাঁড়িয়ে
যে গান আমার ছুঁয়ে রবে ওগো
তোমার চরণ খানি।
আমি হব ইন্দ্রানী।

বিমান মুখোপাধ্যায়ের স্ব-হস্তে লিখিত স্বরলিপি

প্রথম পাতা

প্রথম পাতার শেষ অংশ

[illegible]

আমি হব ইন্দ্রাণী সাহিত্যে হই রে

কথা ও সুর: বিমান মুখোপাধ্যায়

শিল্পী: ইন্দ্রাণী সেন

ওগো, সুরের রাজা, — —
তোমার সুরের রাজ্যে, কবে জেগে সুরনারী
তোমার গানের ছন্দে নাচাতে আমি হব ইন্দ্রাণী ||
ডাকো, ডাকো মোরে ডাক
সকাল হতে শুনেছি তোমার
বাঁশীর মধুর কথা,
যে সাগরের সুরে, যারা পেতে প্রাণে
সুরের সুরধ্বনি ||
কত না ডাকে তোমার মত গান গাই,
তুমি না শেখালে, কি করে বল,
কণ্ঠে যে সুর পাই।
বিরহ, মিলন যে সাথে রয় থামিয়ে
সুখ আর দুখ ছায়া মিলি থাকে দাঁড়িয়ে
যে গান আমার হয়ে কাঁদে উঠে
তোমার প্রেম সাথী ||
আমি হব ইন্দ্রাণী ||
ক্যাসেট নং ৭৫ TR ৫৫৭৭

NAZRULGEETI : MUSIC DIRECTION : SRI BIMAN MUKHOPADHYAY

AAOHO DHARANI			
AAIO	ANASUA MUKHERJEE	HTCS 2691	1987
BROJE AABAR			
AASBE PHIRE	ANASUA MUKHERJEE	HTCS2732	1988
EKDAAU PHULE ORE	ANASUA MUKHERJEE	HTCS 2732	1988
ESO BONDHU			
PHIRE ESO	ANASUA MUKHERJEE	HTCS 2732	1988
HEMANTIKA			
ESO ESO	ANASUA MUKHERJEE	HTCS 2732	1988
KUL RAKHO			
NA RAKHO	ANASUA MUKHERJEE	HTCS 2691	1987
MAMO MAANAS			
MADHABILATAR			
KUNJE	ANASUA MUKHERJEE	HTCS 2691	1987
MEGHER HINDOLA	ANASUA MUKHERJEE	HTCS 2732	1988
ORE DEKE DE DELO	ANASUA MUKHERJEE	HTCS 2691	1987
PALASH MANJARI			
PARA YE DE LO	ANASUA MUKHERJEE	HTCS 2691	1987
SEOIN NISHITHE			
MOR KAANE KAANE	ANASUA MUKHERJEE	HTCS 2691	1987
AMAR DESHER			
MAATI	ANASHUMAN ROY	SPHOS 23026	1984
AMRA SHAKTI			
AMRA BAL	ANGSHUMAN ROY	SPHOS 23027	1984
CHALCHALCHAL	ANGSHUMAN ROY	SPHOS 23028	1984
DURGAM GIRI			
KANTAR MORU	ANGSHUMAN ROY	SPHOS 23029	1984
GANGA SINDHU			
NARMADA	ANGSHUMAN ROY	SPHOS 23030	1984
JAATER NAAME			
BAJJATI SAB	ANGSHUMAN ROY	SPHOS 23031	1984
JAGO ANASHAN			
BONDI	ANGSHUMAN ROY	SPHOS 23032	1984
JAGO NAARI JAGO	ANGSHUMAN ROY	SPHOS 23033	1984
MORA JHANJAR			
MATO UDDAAM	ANGSHUMAN ROY	SPHOS 23034	1984

TORA SAB JOYADHWANI KAR	ANGSHUMAN ROY	SPHOS 23035	1984
AKASHE BHORER TARA	ANJALI MUKHERJEE	S/SLDE 108	1977
BRAJA GOPI KHELE HORI	ANJALI MUKHERJEE	S/SLDE 108	1977
KABERI NODIJALE	ANJALI MUKHERJEE	S/7LPE 186	1980
NEELAMBARI SARI PORI	ANJALI MUKHERJEE	S/7LPE 186	1980
SNIGDHA SHYAM BENI BARNA	ANJALI MUKHERJEE	S/SLDE 108	1977
TORA DEKHE JA AMINA MAYER KOLE	ANJALI MUKHERJEE	S/SLDE 108	1977
AAHAR DEBEN TINI	ANUP GHOSAL	ECSD 2630	1981
AAMAR BHUBAN KAAN PETE ROY	ANUP GHOS	STHVS 24265	1981
AAMAR GHARER MALIN DEEPAALOKE	ANUP GHOSAL	S/7LPE 104	1974
AAMAY JARA DEI MA BYA THA	ANUP GHOSAL	STHVS 24348	1992
AAMI CHAND NOHI ABHISHAP	ANUP GHOSAL	ECSD 41519	1983
AAMI KUL CHHERE CHOLILAM BHESE	ANUP GHOSAI	PSLP 1518	1985
AANDHARER ELOKESH	ANUP GHOSAL	S/45NLP 2016	1979
AANMONE JAL NITE	ANUP GHOSAL	7EPE 3089	1975
AASHE KE ATITHI	ANUP GHOSAL	PSLP 1518	1985
AASLO JAKHAN PHULER PHAGUN	ANUP GHOSAL	PSLP 1518	1985
AAY MA UMA RAKHBO EBAR	ANUP GHOSAL	STHVS 24348	1992
AKASHE AAJ CHHARIYE DILAM	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1977
ALLAH RASUL JAPER GUNE	ANUP GHOSAL	ECSD 41519	1983
AMAR AACHHE EI KA KHANI GAAN	ANUP GHOSAL	PSLP 1518	1985
AMAR DEYA BYATHA BHOLO	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1977
AMAR KALO MEYE	ANUP GHOSAL	PSLP 1518	1985
AMAR KALO MEYER PAYER TALAY	ANUP GHOSAL	STHVS 24348	1992
AMAR SAMPAN JATRI	ANUP GHOSAL	S/45NLP 2016	1979
AMAR SHYAMA MAYER KOLE CHARE	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1977
AMARE CHOKH ISHARAY	ANUP GHOSAL	PSLP 1518	1985

AMI CHIRATARE DURE CHOLE JABO	ANUP GHOSAL	7EPE 3089	1975
AMI JODI ARAB HOTAM	ANUP GHOSAL	S/7LPE 141	1976
ANTARE TUMI AACHHO CHIRADIN	ANUP GHOSA	PSLP 1518	1985
BAL RE JABA BAL	ANUP GHOSAL	STHVS 24346	1992
BASANTA MUKHAR AAJI	ANUP GHOSAL	STHVS 24265	1991
BHIRU E MONER KALI	ANUP GHOSAL	STHVS 24265	1991
BHOR HOLO OTH JAG MUSAFIR	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1977
BIRAHER NISHI KICHHUTE AAR	ANUP GHOSAL	ECSD 2630	1981
BRAJA GOPI KHELE HORI	ANUP GHOSAL	S/7LPE 185	1980
BUKE TOMAR NAI BA PELAM	ANUP GHOSAL	S/7LPE 185	1980
BULBULI NIRAB NARGIS BONE	ANUP GHOSAL	S/45NLP 2016	1979
CHAND HERICHHE CHAND MUKH TAR	ANUP GHOSAL	7EPE 3089	1975
CHHALA CHHALA NAYANE MOR PANE	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1977
CHHANDER BANYA HORINI ANANYA	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1986
CHHARITE PARAN NAHI CHAY	ANUP GHOSAL	STHVS 24265	1991
CHHARO CHHARO AANCHAL BANDHU	ANUP CHOSAL	S/7LPE 104	1974
CHIRADIN KAHARO SAMAAN NAAHI JAY	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1986
DEKHE JA RE RUDRANI MA	ANUP GHOSAL	STHVS 24348	1992
DHALA DHALA TABO NAYAN KAMAL	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1986
E KUL BHANGE O KUL GARE	ANIUP GHOSAL	ECSD 2555	1976
EBAR NABIN MANTRE	ANUP GHOSAL	STHVS 24348	1992
EK DAALI PHULE ORE SAJABO	ANUP GHOSAL	STHVS 24265	1991
ELO OI PURNA SHASHI	ANUP GHOSAL	S/7LPE 185	1980
GAGANE PABANE AAJI	ANUP GHOSAL	PSLP 1518	1985
GANGA SINCHU NARMACA	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1977

GANGE JOAR ELO PHIRE	ANUP GHOSAL	S/7LPE 170	1978
GOTHER RAKHAL BOLE DE RE	ANUP GHOSAL	PSLP 1518	1985
GUNJAMALA GALE	ANUP GHOSAL	S/7LPE 170	1978
HE CHIRA SUNDAR	ANUP GHOSAL	PSLP 1518	1985
JAA TER NAAME BAJJA TI SAB	ANUP GHOSAL	ECSD 2630	1981
JANAM JANAM TABO TARE KANDIBO	ANUP GHOSAL	ECSD 2630	1981
JHARA PHUL DALE	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1987
JHILER JALE KE BHASALO	ANUP GHOSAL	S/45NLP 2016	1979
JOY BIGALITO KARUNARUPINI	ANUP GHOSAL	PSLP 1518	1985
KAABAAR JOARETE TUMI	ANUP GHOSAL	S/7LPE 185	1980
KAAU MEKHE JYOTI DHEKE	ANUP GHOSAL	ECSD 2630	1981
KE TUMI CURER SAATHI	ANUP GHOSAL	STHVS 24265	1991
KI HABE JANIYA BALO	ANUP GHOSAL	STHVS 24265	1991
KON MARAMEER MARAM BYA THA	ANUP GHOSAL	PSLP 1518	1985
KUMKUM AABIR PHAGER	ANUP GHOSAL	STHVS 24265	1991
LAAILI TOMAR ESECHHE	ANUP GHOSAL	S/7LPE 185	1980
MA GO CHINMOYEE RUP DHORE	ANUP GHOSAL	STHVS 24348	1992
MADHABILA TAR AAJI MILAN	ANUP GHOSAL	S/7LPE 104	1974
MADHUR NUPUR RUMU JHUMU BAJE	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1977
MAHAKAALER KOLE	ANUP GHOSAL	STHVS 24348	1992
MALAR DORE BENDHONAKO	ANUP GHOSAL	S/7LPE 141	1976
MAMO MADHUR MINA TI SHUNO	ANUP GHOSAL	S/7LPE 141	1976
MEGH BIHIN KHARA BOISHAKHE	ANUP GHOSAL	S/7LPE 170	1978
MEGH MEDUR BARASHAY	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1976
MEGHE MEGHE ANDHA ASEEM AKASH	ANUP GHOSAL	S/7LPE 104	1974
MLAN ALOKE PHUTLI KENO	ANUP GHOSAL	S/7LPE 104	1974

MONE PARE AAJ	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1987
MOR NA MITITE ASHA	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1987
MOR PRIYA HABE ESO RANI	ANUP GHOSAL	STHVS 24265	1991
NAAHI KEHO MOR BYATHAR SMTHI	ANUP GHOSAL	ECSD 2630	1981
NAHE NAHE PRIYO E NOY ANKHIJAL	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1987
NAI CHINILE AMAY TUMI	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1977
NISHI BHOR HOLO JAGIYA	ANUP GHOSAL	STHVS 24265	1991
NODIR NMM SOI ANJANA	ANUP GHOSAL	ECSD 2630	1981
O MA KAALI SEJE PHIRU GHARE	ANUP GHOSAL	STHVS 24348	1992
ORE HULO RE TUI	ANUP GHOSAL		1974
PALASH PHULER GELAS BHORI	ANUP GHOSAL	S/7LPE 141	1976
PASHANER BHANGALE GHUM	ANUP GHOSAL	ECSD 41519	1983
PIU PIU BIRAHI PAPIYA	ANUP GHOSAL	S/7LPE 185	1980
'RAHI RAHI KENO SEI MUKH PARE MONE	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1986
RESHMI CHURIR SHINJINITE	ANUP GHOSAL	STHVC 24465	1991
RIM JHIM RIM JHIM JHIM	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1988
RUMJHUM JHUM JHUM NUPUR	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1987
SAKARUNA NAYANE CHAHO	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1976
SANDHYA MALATI JABE	ANUP GHOSAL	ECSD 2555	1976
SANJHER PAKHIRA PHIRILO KULAY	ANUP GHOSAL	ECSD 2630	1981
SHIUU TALAY BHOR BELAY	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1986
SHMASHAN KALIR NAAM SHUNE	ANUP GHOSAL	S/7LPE 170	1978
SHMAASHANE JAGICHHE SHYAMA	ANUP GHOSAL	7EPE 3089	1975
SHUNYA E BUKE PAKHI MOR	ANUP GHOSAL	S/7LPE 141	1976
SHYAMA NAAMER BHELAAY CHARE	ANUP GHOSAL	STHVS 24348	1992

SWAPNE DAKHI EKTI NATUN GHAR	ANUP GHOSAL	S/7LPE 141	1976
TOMAR MAHABISWEE KICHHU	ANUP GHOSAL	ECSD 41519	1983
TOMARI AANKHIR MA TO	ANUP GHOSAL	S/7LPE 104	1974
TUMI AAGHAT DIYE MON PHERARE	ANUP GHOSAL	PSLP 1620	1986
TUMI PROBHA TER SAKARUN BHOIRABI	ANUP GHOSAL	S/7LPE 170	1978
TUMI SHUNITE CHEYONA	ANUP GHOSAL	S/7LPE 170	1978
AAJ SAKAALE	HAIMANTI SUKLA	STHVS 24349	1992
ACHENA SURE	HAIMANTI SUKLA	HTC 2652	1986
BHOLO BHOLO	HAIMANTI SUKLA	STHVS 24349	1992
EKHONO OTHENI CHAND	HAIMANTI SUKLA	STHVS 24349	1992
ESO CHIRAJANAMER SAA THI	HAIMANTI SUKLA	STHVS 24349	1992
ESO PRIYO AARO KACHHE	HAIMANTI SUKLA	HTC 2652	1986
GABHIR RAA TE JAAGI	HAIMANTI SUKLA	STHVS 24349	1992
GAHIN RMTE GHUM	HAIMANTI SUKLA	HTC 2652	1986
JENO PHIRE NA JAAY	HAIMANTI SUKLA	STHVS 24349	1986
MEGH MEDUR	HAIMANTI SUKLA	HTC 2652	1992
MUKHE KENO NAAHI BALO	HAIMANTI SUKLA	STHVS 24349	1986
NISHI NA POHAATE	HAIMANTI SUKLA	HTC 2652	1992
NISHI NIJHUM	HAIMANTI SUKLA	HTC 2652	1986
PARADESHI BONDHU	HAIMANTI SUKLA	HTC 2652	1986
PATHAHARA PAKHI KENDE PHIRI EKA	HAIMANTI SUKLA	HTC 2652	1986
MOR PROTHAM MONER MUKUL	HAIMANTI SUKLA	STHVS 24349	1986
SAHASA KI GOLM BANDHALE	HAIMANTI SUKLA	HTC 2652	1992
SANDHYAMALATI JABE	HAIMANTI SUKLA	HTC 2652	1986
AADARA GARA GARA	INDRANI SEN	STHVS 842460	1988
AAJ SHRABANER LAGHU MEGHER SATHI	INDRANI SEN	STHVS 842248	1990
AAMI KUL CHHERE CHOULAM	INDRANI SEN	STHVS 842233	1989
AANMONE JAL NITE	INDRANI SEN	ECSD 41519	1983
AASIBE TUMI JANI PRIYO	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
AASILE KE ATITHI			

SANJHE	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
AASILE KE GO			
BIDESHI	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
AMAR GAHIN			
JALER NODI	INDRANI SEN	ECSD 2649	1982
ANKHI TOLO ANKHI			
TOLO NA	INDRANI SEN	STHVS 842214	1982
ANTAR MEIN			
TUM BASE	INDRANI SEN	STHVS 843409	1992
BADAL BAAYE MOR	INDRANI SEN	STHVS 842248	1990
BASANTA MUKHAR			
AAJI	INDRANI SEN	STHVS 842248	1990
BHAGA MON AAR			
JORA NAAHI JAY	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
BHOLO PRIYO			
BHOLO AMARI	INDRANI SEN	STHVS 842248	1990
BHOR HOLO			
DOR KHOLO	INDRANI SEN	STHVS 842460	1988
BHORER HAOWA ELE	INDRANI SEN	STHVS 842361	1993
BHORIYA PARAN			
SHUNITECHHI GAAN	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
MOR BHULIBAR			
SADHANAY	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
BIRAHER			
GULBAAGE MOR	INDRANI SEN	STHVS 842214	1986
BONE CHALE			
BONOMAALI	INDRANI SEN	ECSD 41519	1983
BULBULI NIRAB			
NARGISBONE	INDRANI SEN	STHVS 842233	1989
CHANDER MATO			
NEERABE ESO			
PRIYO	INDRANI SEN	STHVS 842361	1993
DAKKHINA			
SAMEERAN SAATHE	INDRANI SEN	STHVS 842248	1990
DOLA LAAGILO			
DAKHINAAR BONE	INDRANI SEN	STHVS 842233	1989
DULE AALO			
SHATADAL	INDRANI SEN		1982
E GHANAGHOR			
RAATE	INDRANI SEN	STHVS 842361	1993
EKHONO OTHENI			
CHAND	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
ESO BONDHU			
PHIRE ESO	INDRANI SEN	STHVS 842248	1990
ESO SHARAD			
PRATER PATHIK	INDRANI SEN	STHVS 842361	1993
GAGANE KRISHNA			
MEGH DOLE	INDRANI SEN	STHVS 842233	1989
GOTHER RAKHAL	INDRANI SEN	STHVS 842460	1988

GUL.e-MEHFIL YEH	INDRANI SEN	STHVS 843414	1992
HAM EK SHAKH KE	INDRANI SEN	STHVS 843412	1992
HAMRI GAHRI			
NADYA PAANI	INDRANI SEN	STHVS 843411	1992
HARANO HIYAR			
NIKUNJAPATHE	INDRANI SEN	STHVS 842214	1986
HORIR RANG			
LAAGE AAJI	INDRANI SEN	STHVS 842460	1988
JAGO KRISHNAKALI	INDRANI SEN	STHVS 842248	1990
JAL KI DEVI KHELE	INDRANI SEN	STHVS 843417	1992
JANAM JANAM TABO			
TARE KANDIBO	INDRANI SEN	STHVS 842214	1986
JHARA PHUL DALE	INDRANI SEN	STHVS 842460	1988
JINKI MAIN PAYAL	INDRANI SEN	STHVS 843410	1992
JODI RADHA			
HOTE SHYAM	INDRANI SEN	STHVS 842233	1989
KABA JIYARAT			
RAIN MEN TU	INDRANI SEN	STHVS 843416	1992
KE DILO			
KHONPAATE	INDRANI SEN	ECSD 41519	1983
KE TUMI			
DURER SAATHI	INDRANI SEN	STHVS 842214	1986
KENO KANDE PARAN	INDRANI SEN	STHVS 842361	1993
KUMKUM ABIR	INDRANI SEN	ECSD 2649	1982
MOR BHULIBAR			
SADHANAY	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
MOR NA MITITE			
ASHA	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
NAHE NAHE PRIYO			
E NOY ANKHIJAL	INDRANI SEN	STHVS 842460	1988
NAINA NEER GAGAR	INDRANI SEN	STHVS 843413	1992
O MA DANUJDALANI			
MAHASHAKTI	INDRANI SEN	STHVS 842460	1988
OI RANGA MAA TIR			
PATHE LO	INDRANI SEN	STHVS 842460	1988
OR NISHITH SAMADHI			
BHANGIYO NA	INDRANI SEN	STHVS 842248	1990
PARDESHI MEGH	INDRANI SEN	STHVS 843415	1992
PA THAHARA PAKHI			
KENDE PHIRI EKA	INDRANI SEN	STHVS 842233	1989
PIU PIU BIRAHI	INDRANI SEN	STHVS 843417	1992
POUSH ELO GO	INDRANI SEN	STHVS 842233	1989
PRIYOTAMO			
HE BIDAY	INDRANI SEN	STHVS 842460	1988
PROBHAT-			
BEENATABOBAJE	INDRANI SEN	STHVS 842233	1989
RANGILA AAPANI			
RADHA	INDRANI SEN	STHVS 842248	1990
RUMJHUM JHUM			

RUMJHUM	INDRANI SEN	STHVS 842361	1993
SEDINO			
BOLECHHILE	INDRANI SEN	STHVS 842248	1990
SHUKNO PATAR			
NUPUR PAYE	INDRANI SEN	STHVS 842233	1989
SWAPANE ESO			
NIRAJANE	INDRANI SEN	STHVS 842214	1986
SWAPNE DEKHI EKTI			
NA TUN GHAR	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
TABO			
CHARANPRAANTE	INDRANI SEN	ECSD 41519	1983
TABO GAANER			
BHAASHAY	INDRANI SEN	STHVS 842460	1988
TOMAR MAHABISWE			
KICHHU HARAY NA	INDRANI SEN	STHVS 842233	1989
TOMAR MONE			
PHUTBE JABE	INDRANI SEN	STHVS 842277	1991
TUMI AMAR			
SAKAALBELAR SUR	INDRANI SEN	STHVS 842361	1993
TUMI KI DAKHINA			
PABAN	INDRANI SEN	STHVS 842361	1993
CHIRADIN KAHARO			
SAMAAN NAAHI JAY	MAHESHRANJAN SHOME	STHVS 23166	1992
GAGANE KRISHNA			
MEGH DOLE	MAHESHRANJAN SHOME	STHVS 23166	1992
GOTHER RAKHAL	MAHESHRANJAN SHOME	STHVS 23166	1992
HEY MADHAB,			
HEY MADHAB	MAHESHRANJAN SHOME	STHVS 23166	1992
JOY BRAHMA VIDYA			
SHIV SARASWATI	MAHESHRANJAN SHOME	STHVS 23166	1992
KI DIYE PUJIBO			
BHAGABAN	MAHESHRANJAN SHOME	STHVS 23166	1992
KRISHNA KRISHNA			
BAL RASANA	MAHESHRANJAN SHOME	STHVS 23166	1992
SHY AM SUNDAR			
GIRIDHARI	MAHESHRANJAN SHOME	STHVS 23166	1992
AMAR BHANGA NAAYER			
BOITHA THELE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24146	1989
AMI BAUL HOLAM	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24146	1989
BAKUL CHAMPAR BONE	MANABENDR MUKHERJEE	ECSD 2630	1981
DHEERE JAY PHIRE			
PHIRE CHAY	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2630	1981
MADHABILATAR			
AAJI MILAN	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2630	1981
PATHIK BANDHU ESO	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2630	1981
TEMANI CHAHIYA			
AACHHE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2630	1981
AADHKHANA CHAND			
HASICHHE AKASHE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1990

AAJ BAADE KAAL AASBE KINA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
AAJ SUDINER AASLO USHA	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 140	1976
AAJI GAANE GAANE	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
AAJI MILAN BASAR PRIYA	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2030	1980
AAJI NANDALAL MUKHACHANDRA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1987
MJKE DOLER HINDOLAY	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 181	19 79
AAJKE GAANER BAAN ESECHHE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24266	1991
AAKUL HOLI KENO	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
AAMAR AACHHE ASEEM AKASH	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1990
AMMI PROBHAATI TARA PURBAACHALE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24266	1991
AAMI SUNDAR NOHI JANI HE BANDHU	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24266	1991
MR ANUNAY KORIBE NA KEHO	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
AARO NUTAN NUTANA TARA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
AAY MA UMA	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1984
ACHENA SURE AJANA PATHIK	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24266	1991
AMAR AAR KONO GUN NEI	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2006	1978
AMAR BIJAN GHARE	MANABENDRA MUKHERJEE	7EPE 3087	1975
AMAR DUKHER BANDHU	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 189	1981
AMAR HRIDAY ADHIK RANGA	MANABENDRA MUKHERJEE	ECLP 41508	1984
AMAR NAYANE KRISHNA NAY ANTARA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1987
AMAAR NAYANE NAYAN RAKHI	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NPL 2030	1980
AMAR SHYAMLABARAN BANGLAMYER	MANABENDRA MUKHERJEE	PSIP 1647	1988
AMI CHIRA TARE DURE CHOLE JABO	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 842214	1986
AMI NATUN KORE GORBO THAKUR	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2006	1978
ANDHAKAARE ESE TUMI	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2630	1981
ANEK CHHILO BALAR	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
ANEK KATHA BALAR MAJHE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24266	1991

ANKHI BAARI ANKHITE THAK (DUET)	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 842214	1986
ANKHI TOIO ANKHJ TOIO NA	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
ASEEM AKASH	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24146	1989
BADHU TOMAR AMAR EJ JE BIRAHA	MANABENDRA MUKHERJEE	S7LPE 105	1974
BAJE NA BANSARI	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPI 189	1981
BANAHARINIRE TABO BANKA AANKHIR	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 105	1974
BANSHI BAJABE KABE	MANABANDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2006	1978
BASANTI RANG SARI PORE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1990
BHALOBASAR CHHALE AAMAY	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1990
BHANGA MON AAR JORA NAHI CHAY	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 181	1979
BHARAT SHMASHAN HOLO MA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
BHARATLAKSHMI MA AAY PHIRE	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
BHENGONA BHENGONA BONDHU	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
BHUL KORECHHI O MA SHYAMA	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1984
BHULE JEO BHULE JEO SEDIN	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1990
BIRAHA ASHRU-SAYARE	MANABENDRA MUKHERJEE		1982
BONDHU DEKHLE TOMAY	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24146	1989
BONE JAAY ANANDADULAL	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1987
BONE MOR PHUTECHHE HENA	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1990
BRITHA TUI KAHAR PARE	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
BROJE AABAR AASBE PHIRE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24146	1989
BYATHAR UPARE BANDHU	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41519	1983
CHANDER PEYALATE AAJI	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
DAAL MELO PATRA MELO	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24146	1989
DAO DAO DARASHAN	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	19 87
DHALA DHALA TABO NAYAN KAMAL	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2031	1980
DUDHE AALTAY RANG			

JENO TAAR	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
DUPUR BELA			
TE EKLA PATHE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24266	1991
DUR PROBASE			
PRAN KANDE	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 181	1979
E GHANA GHOR RAATE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
E GHOR SHRABAN			
NISHI KAA TE KEMONE	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
EKTUKHANI DAO			
ABASAR	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 189	19 81
ESO ESO PAHARI			
JHARNA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1991
ESO NUPUR BAJAIYA			
JAMUNA NACHAIY	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24266	1987
ESO PRIYO			
AARO KACHHE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2649	1974
FSO PRIYOTAMO			
ESO PRANE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24193	1990
GAAHO NAAM ABIRAAM	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1987
GHUMAO DEKHITE			
ESECHHI	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 140	1976
HAARIYE GECHHE			
BROJER KANAI	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1987
HAAY PALASHI	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
HE GOBINDA RAKHO			
CHARANE	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2006	1978
HE MADHAB.			
HE MADHAB	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2006	1978
HOIMANTKA ESO ESO	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 181	1979
HUL PHUTIYE			
GELE SHUDHU	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 105	1974
JABAR BELAY			
PHELE JEYO	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2030	1980
JAGO JAGO SHANKHA			
CHAKRA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1987
JAGO JOGMAYA			
JAGO MRINMOYEE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1984
JANANI MOR			
JANMABHUMI	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
JANI AMAR SADHANA			
NAAI	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2630	1981
JAO MEGHDUT DIYO			
PRIYAR HAATE	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 181	1979
JASNE MA PHRE			
JASNE JANANI	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2006	1978
JHAANDA UNCHA			
RAHE HAMARA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
JHUMKO LATAR			
CHIKAN PATAY	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 842214	1986

JOY BRAHMABIDYA			
SHIV SARASWATI	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41519	1983
JUIN KUNJE			
BONOBHOMARA	MANABENDRA MUKHERJEF	S/45NLP 2030	1980
KACHHE AMAR			
NAAIBA ELE	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
KALANKA AAR			
JOCHHANAY	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1990
KAR MANJIR RINI			
JHINI BAJE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
KATO KATHA CHHILO			
TOMAY BOLITE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24266	1991
KEMONE KOHIBO PRIYO	MANABENDRA MUKHERJEE	SI 7LPE 189	1981
KENDE JAAY			
DAKHIN HAOWA	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2030	1980
KENO PHOTE KENO			
KUSUM JHARE JAY	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7EPE 3376	1982
KOKIL SADHILI KI BAAD	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
KON ATEETER AANDHAR	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
KOTHAY GELI MA			
GO AMAR	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1984
KRISHNA KRISHNA			
BAL RASANA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1987
O KULBHANGA NODI RE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24146	1989
MA GO AMI MANDOMOTI	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1984
MA HOBI NA MEYE HOBI	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1984
MA TOR NAMERI			
KABACH DOLE	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2006	1978
MADIR AABESHE			
KE CHALE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24266	1991
MAGO CHINMOYEE			
RUP DHORE	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2006	1978
MALA GANTHA SHESH			
NA HOTEI	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7EPE 3376	1982
MANABATAHEEN			
BHARAT SHMASANE	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
MARAM KA THA			
SOI MARAME GELO MOR	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
MITILO NA SADH			
BHALOBASIYA TOMAY	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
MONE RAKHAR DIN			
GIYECHHE	MANABENDRA MUKHERJEE	S/ 7LPE 189	1981
MOR BHULIBAR			
SADHANAY	MANABENDRA MUKHERJEE	ECLP 2545	1975
MOR PRIYA			
HABE ESO RANI	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 84221	1986
NAAHI BHOY			
NAAHI BHOY	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1987
NAYAN BHARA			

JAL GO TOMAR NAYANE TOMAR	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 84221	1986
BHERRU MADHURIR NIRANDHA MEGHE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 2426E	1991
MEGHE ANDHA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1987
O DUKHER BONDHU RE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 2414	1989
O MA KAALI SEJE PHIRLI GHARE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1984
O MA TOR BHUBANE JWALE ETO AALO	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1984
OI KAJAL KAALO CHOKH	MANABENDRA MUKHERJEE		1989
PALASH MANJARI PARAYE	MANABENDRA MUKHERJEE	7EPE 3087	1975
PARAJANAME JODI AASI E DHARAY	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
PATHE KI DEKHLE JETE	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24146	1989
PATHIK OGO CHOLTE PATHE	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 140	1976
PHIRIYA JODI SE AASE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2630	1981
PIYA GECHHE KABE PARADESH	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
PRODIP NIBHA YE DAO	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 105	1974
RASAGHANASHYAM KALYAN SUNDAR	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41519	1983
SAAMYER GAAN GAAI	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
SAANJHER AANCHALE ROHILO JE	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7EPE 3376	1982
SAAT BHAI CHAMPA JAGORE	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
SADH JAGE MONE PARAJANAME	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 105	1974
SAGAR HOTE CHURI	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 189	1981
SANDHYA GODHULI LAGANE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2649	1976
SEDIN ABHMB GHUCHBE KI MOR	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24193	1990
SEDIN CHHILO KI GODHULI-LAGAN	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2030	1980
SEDINO PROBHA TE RAA TUL SHOBHA TE	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
SEI PURANO SURE ABAR	MANABENDRA MUKHERJEE	7EPE 3087	1975
SHAON RAA TE JODI	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 842214	1986
SURE O BAANIR MALA DIYE	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41519	1983
SWADESH AMAR JANINA	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
SWAPAN BILASE CHAND JABE HASE	MANABENDRA MUKHERJEE		1977
SWAPANE ESECHHILO MRIDUBHASINI	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 140	1976

SWAPNE DEKHECHHI			
BHARAT JANANI	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
THAAK SUNDAR			
BHUL AMAR	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1990
TIMIR BIDAARI			
ALAKH BIHAARI	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1619	1987
TOMAR AKASHE			
UTHECHHINU CHAND	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7EPE 3376	1982
TOMAR KUSUM BONE	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1517	1985
TOMAREI AAMI			
CHAHIYACHHI PRIYO	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 2556	1977
TRISHITA AKASH			
KANPE RE	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 181	1979
TUI PASHAN GIRIR			
MEYE HOLI	MANABENDRA MUKHERJEE	ECSD 41550	1984
TUMI AMAY BHALOBASO	MANABENDRA MUKHERJEE	S/7LPE 140	1976
TUMI BHORER			
SISIR HOYE	MANABENDRA MUKHERJEE	S/45NLP 2030	1980
UDAAR BHARAT			
SAKAL MANAE	MANABENDRA MUKHERJEE	PSLP 1647	1988
UPAL NURIR			
KANKAN CHURI	MANABENDRA MUKHERJEE	STHVS 24146	1989
CHAMPA PARUL			
JUTHI TAGAR	MIRA DUTTA ROY	SEDE 3068	1973
MUKHE KENO			
NAAHI BALO	MIRA DUTTA ROY	SEDE 3068	1973
PIU PIU BOLE PAPIYA	MIRA DUTTA ROY	SEDE 3087	1974
RESHMI CHURIR			
SHINJINITE	MIRA DUTTA ROY	SEDE 3068	1974
BALO NA BALO			
NA OLO SOI	MIRA DUTTA ROY	7EPE 3130	1976
GAGANE KRISHNA			
MEGH DOLE	MIRA DUTTA ROY	7EPE 3168	1977
GOTHER RAKHAL			
BOLE DE RE	MIRA DUTTA ROY	7EPE 3130	1976
TOMAREI AAMI			
CHAHIYACHHI PRIYO	MIRA DUTTA ROY		1977
AASILE E BHANGA			
GHARE	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
AASLO JAKHAN			
PHULER PHAGUN	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
AMARE CHOKH			
ISHARAY	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
BARNACHORA			
THAKUR ELO	NABANITA CHAKRABORTY	S/7EPE 3483	1985
BHULI KEMONE	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
CHANDER PIYALATE			
AAJI	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
E KI SURE TUMI			

GAAN SHONALE	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
E KON MADHUR			
SHARAB DILE	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
ELO SHYAMAL KISHORE	NABANITA CHAKRABORTY		1985
BEDONAR BEDITALE	NABANITA CHAKRABORTY	HTCS 2608	1985
HE MADHAB,			
HE MADHAB	NABANITA CHAKRABORTY		1985
HE PARTHASARATHI			
BAJAO	NABANITA CHAKRABORTY		1985
JAGATER NATH	NABANITA CHAKRABORTY		1985
JHARLO JE PHUL			
PHOTAR AAGE	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
KHELICHHO E			
BISWA LOYE	NABANITA CHAKRABORTY	HTCS 2608	1985
KUL RAKHO NA RAKHO	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
MAHAKAALER KOLE ESE	NABANITA CHAKRABORTY	HTCS 2608	1985
ORE NEEL JAMUNAR JAL	NABANITA CHAKRABORTY	S/7EPE 3483	1985
PASHANER BHANGALE			
GHUM	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
PHIRIYA JODI SE AASE	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
RADHA TULASI	NABANITA CHAKRABORTY	HTCS 2608	1985
TOMAR MAHABISWE			
KICHHU	NABANITA CHAKRABORTY	S/7EPE 3483	1985
TUMI AMAY BHALOBASO	NABANITA CHAKRABORTY	PSLP 1577	1986
TUMI SARAJIBAN			
DUKKHA DILE	NABANITA CHAKRABORTY	HTCS 2608	1985
AAMAY JARA DEI			
MA BYATHA	NIRMAL MUKHERJEE		1982
AMAR AAR KONO			
GUN NEI	NIRMAL MUKHERJEE	S/SEDE 3177	1982
BARSHA GELO			
AASHWIN ELO	NIRMAL MUKHERJEE		1982
OMA KAALI SEJE	NIRMAL MUKHERJEE		1982
BONE CHALE			
BONOMAALI	NISHITH ROY	SEDE 3096	1974
ELO OI BONANTE			
PAGAL BASANTA	NISHITH ROY	SEDE 3096	1974
ELO OI PURNASHASHI	NISHITH ROY	SEDE 3068	1973
PALASH PHULER			
GELAS BHORI	NISHITH ROY	SEDE 3068	1973
AAR KA TO GAAN			
GAIBO BALO	NISHITH ROY	7EPE 3130	1976
EKI SURE TUMI			
GAAN SHONALE	NISHITH ROY	7EE 3168	1977
OR NISHITH SAMADHI			
BHANGIYO NA	NISHITH ROY	7EPE 3168	1977
TUI KAU MEKHE			
JYOTI DHEKE	NISHITH ROY	7EPE 3130	1976
AAJO PHOTENI			

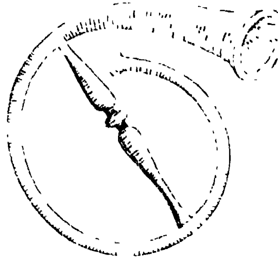
MAMO KUNJE	PURABI DUTTA	SEDE 3096	1974
CHHANDER BANYA			
HORINI ANANYA	PURABI DUTTA	SED 3096	1974
PARAJANAME DEKHA			
HABE PRIYO	PURABI DUTTA	S/7LPE 123	1975
SAKHI BANDHOLO			
BANDHOLO	PURABI DUTTA	S/7LPE 123	1975
AAMAR AAPANAAR			
CHEYE AAPAN	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842409	1983
AAR KATO GAAN			
GAAIBO BALO	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842406	1983
DE DOL DE DOL	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842407	1983
GABHIR RAATE JAAGI	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842408	1983
GAGANE KRISHNA			
MEGH DOLE	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842404	1983
HOLUD GANDAR PHUL	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842414	1983
HORIR RANG			
LAAGE AAJI	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842411	1983
JANAM JANAM GELO	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842410	1983
MA BOLE JATO			
DEKECHHI	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842413	1983
MAMO MANAS MADHABI	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842412	1983
SWAPAN JAKHAN			
BHANGBE TOMAR	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842403	1983
TUMI MR EKTI			
DIN THAKO	SANDHYA MUKHERJEI	STHVS 842405	1983
AAMI NA TUN			
KORE GARBO	SIPRA BOSE		1992
BONOHORINIRE TABO	SIPRA BOSE		1992
E KON MADHUR			
SHARAB DILE	SIPRA BOSE	STHVS 24351	1992
ESO PRIYO MRO			
KAACHHE	SIPRA BOSE		1992
JENO PHIRE NMHI JAY	SIPRA BOSE		1992
SAKHI BALO OKE			
SORE JETE BAL	SIPRA BOSE		1992
SEDIN CHHILO KI	SIPRA BOSE		1992
SWAPANE ESO			
NIRAJANE	SIPRA BOSE		1992
AAJ SHEPHALIR			
GAAYE HOLUD	SUMITRA MUKHERJEE	S/7LPE 123	1975
JABE BHORER			
KUNDAKALI	SUMITRA MUKHERJEE	S/7LPE 123	1975
AAJI E SHRABAN NISHI	SUMITRA ROY	SEDE 3096	1974
ELO SHYAMAL KISHORE	SUMITRA ROY	7EPE 3032	1976
KATO SE JANAM			
KATO SE LOK	SUMITRA ROY	7EPE 3032	1976
KE TUMI DURER SAATHI	SUMITRA ROY	SEDE 3093	1974

এইচ এম ভি ছাড়াও বিমান মুখোপাধ্যায়ের ট্রেনিং-এ বিভিন্ন কোম্পানী থেকে প্রকাশিত রেকর্ডের সংখ্যাও অনেক।

উদাহরণ স্বরূপ তার সামান্য কিছু রেকর্ডের নমুনার ইঙ্গিত নীচে দেওয়া হল :

ইনরেকো	এল. পি	পূরবী দত্ত	সেদিন নিশীথে মোর গানে/আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়
,,	ঈ পি	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	পুস্তকে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য
,,	ঈ পি	সনৎ সিংহ	ঐ
,,	,,	জয়ন্তী সেন	মোর ঘুম ঘোরে/ওগো সুন্দর আমায়
	,,	শক্তি ঠাকুর	ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি/সৃজন কোরে প্রভু মোরে
মেগাফোন	,,	গোপা কাঞ্জিলাল	বুকে তোমার নাইবা/সাগর হতে চুরি
ভারতী মিউজিক	এস পি	পদ্মরেণু মুখোপাধ্যায়	বাহিরে বাদল কাঁদে/আমার চন্দ্রমল্লিকা
ইণ্ডিয়া পলিডর	এল পি	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বাগবাজারের গান (নজরুল)
হিন্দুস্থান	,,	,,	ভোলো প্রিয় ভোলো (নজরুল)
	ঈ পি	গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	আসল যখন ফুলের ফাগুন/ তুমি আঘাত দিয়ে (নজরুল)
ইউ ডি আই	ক্যাসেট UDMC 2015/98	অনুভা ঘোষ	ছয় ঋতু বারো মাস্যা

বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে দূরদর্শনে ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত, বিমান মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পুরনো দিনের গান' বিষয়ক ২১টি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।



বাংলা গানের চলচ্ছবি
সেযুগ থেকে এযুগ
একনজরে



ক

ষষ্ঠ শতাব্দী

গুপ্ত সাম্রাজ্য ভাঙনের পর ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে পূর্বভারতে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, অসম এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে, স্বাধীন গৌড় গড়ে উঠেছিল। মুর্শিদাবাদের কাছে কর্ণসুবর্ণ ছিল রাজধানী।

দ্বাদশ শতাব্দী

মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে গৌড়ের নতুন রাজধানী হল মালদহে। রাজা লক্ষ্মণ সেনের নামে কিছুদিন গৌড়ের নাম হয়েছিল লক্ষ্মনাবতী। দ্বাদশ শতাব্দীরে পাল রাজাদের সময় থেকে বাঙালির সংস্কৃতি নানাভাবে সংগঠিত হতে শুরু হয়। দেবপালের সময়ে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত-দোঁহা জাতীয় গানের উৎস। বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বৌদ্ধ চর্যাপদের উজ্জ্বল উপস্থিতি এ যুগেই। এবং এখান থেকেই প্রথম বাংলার শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল ও সহজিয়া ভাবধারায় গানের সূত্র পাওয়া যায়।

কিন্তু রাগরাগিনী আশ্রিত কোন গান নয়—মনের সহজাত, আবেগের ধ্বনি প্রকাশ জাতীয় বিভিন্ন গীতরীতিকে, অনেক আগে থাকতে বলা হোত 'প্রবন্ধ।' তখন প্রবন্ধ ছিল তিন রকম—সূড়, আলি এবং বিপ্রকীর্ণ। এগুলো নানা ছন্দে, তালে, রীতিমত লম্বা ধরনের হত বলে অনেকক্ষণ ধরে গাওয়া হত। এর মধ্যে আলি জাতীয় প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল ২৪। এর একটি খুব চলত—পঞ্চতালেশ্বর। পঞ্চতালেশ্বর থেকে হল পঞ্চালি, যা একাদশ-চর্তুর্দশ শতাব্দীতেও খুব চলত।

কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের গীতগোবিন্দই তখনকার গীতরূপে অনেক কিছু সংযুক্ত করল—যার মধ্যে রাগ, তাল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া গোপীচন্দ্র,

গোরক্ষনাথের গান, ময়নামতীর গান এই শতাব্দীতে নতুন গানের আবহ সৃষ্টি করল।

চতুর্দশ শতাব্দী

চণ্ডীদালের পদাবলী মানবিক ভাবধারায় নতুন দিগন্ত খুলে দিল। একাধিক নামের বিতর্কিত অস্তিত্ব সত্ত্বেও চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদাবলীর জন্মখণ্ড, দানখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড গাইতে গাইতে তিনি প্রেমসাধনার নতুন গীতধারা যে মানুষের মধ্যে প্রবর্তন করেছিলেন—সেকথা বহুবিদিত। কিন্তু যে কথা লোকের বিশেষ জানা নেই তাহল এই গীতি কবিতার প্রস্রবনে চণ্ডীদাস -প্রিয়া রামীরও বহু চমৎকার স্বরচিত কবিতাবলীর অবদান ছিল

'তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর

খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা জগৎ দেখি আঁধার।'

পঞ্চদশ শতাব্দী

বিদ্যাপতির পদাবলী। চৈতন্যদেবের (জন্ম ১৪৮৬) ভক্তিরসে, চৈতন্য সংকীর্তন নগরে নগরে মানুষকে গানে মাতালো। পাঁচালী গানেও নানা প্রকারভেদের সৃষ্টি হল—শনি পাঁচালি, ষষ্ঠী পাঁচালি, লক্ষ্মী পাঁচালি ইত্যাদি। এবং এই সৃষ্টিসুখের আনন্দে নবনব পদ কর্তারা অসংখ্য গান রচনা করলেন। এই সমসাময়িক কালে অন্তত ১৬৫জন পদকর্তার রচিত গানের বিপুল সম্ভার—বিস্ময় জাগায়।

ষোড়শ শতাব্দী

আকবরের রাজসভায় মিঞা তানসেনের ধ্রুপদী গীতধারার ক্রম বিস্তার। ফলে বাংলা গানেও শাস্ত্রীয় প্রভাব বিশেষ করে বাঁকুড়ায় সেনী-ঘরানার বিকাশ। কৃষ্ণনগরে, ঢাকায়, নদীয়া, চুঁচুড়া, চন্দননগর অঞ্চলে বঙ্গীয় গীত-চর্চার প্রসার।

অষ্টাদশ শতাব্দী

নবাবী যুগ এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কাল ঃ বিভিন্ন পদকর্তাকৃত পদাবলী সংকলন গ্রন্থের প্রথম আবির্ভাব। যেমন, গীতিকল্পতরু (বৈষ্ণবদাস) গীতিচিন্তামনি (হরিবল্লভ) গীত চন্দ্রোদয় (নরহরি চক্রবর্তী) পদকল্পলতিকা (গৌরীমোহন দাস) ইত্যাদি। এই পদসংগ্রহ বিন্যাসের সামান্য একটু করে নমুনা দেওয়া হল পদকল্পলতিকা থেকে

মুরলী শিক্ষা

ক) কামোদ। বহুদিনের সাধ আছে হরি, বাজাইব মোহন মুরলী. ...

খ) কানেড়া। মুরলী করাও উপদেশ। যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ........

গ) কামোদ। প্রেমরঙ্গে শ্যামঅঙ্গে হেলাইয়া। মুরলী পুরয় রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া.......

ঘ) বেহাগ। আজু কে গো মুরলী বাজায়। এত কভু নহে শ্যাম রায়.......

পদকর্তা—ক) বৃন্দাবন দাস খ) জ্ঞান দাস গ) শিবানন্দ ঘ) চণ্ডীদাস

মনে রাখা দরকার যে পুরনো দিনের বাংলা গান বা পুরনো কলকাতার বাংলা গান গ্রামীণ এবং নাগরিক—দুরকম মূল্যবোধ এবং উপাদানের সাহায্যেই গড়ে উঠেছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল কীর্তন, পাঁচালি, যাত্রা কথকতায় দেবতার মানবায়নের সহজ প্রতিচ্ছবি, বাউল, মুর্শিদা, দেহতত্ত্বের গানে গুরুবাদের প্রতি মজ্জাগত বিশ্বাস। রাধাকৃষ্ণ আয়ান কুটীলার জটীলতার পরকীয়ার তৃষাগ্নি। বা আগমনী, বিজয়ার গানে মা-মেয়ের অপত্য অনুরণণ।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে কথকতা, মঙ্গলকাব্য গীতি—এসবের মাধ্যমে বাংলা গানের ভাবপরিবর্তনের সঙ্গে রূপান্তর হতে সুরু করল।

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান থেকে বৈষ্ণব কীর্তনিয়া, শান্তিপুর নদীয়া থেকে খেউড় বা সাধারণভাবে শাক্তসঙ্গীত ছড়িয়ে পড়তে লাগল—

খ

১৭১২ ● ভারতচন্দ্রের জন্ম—১৭৫২তে বিদ্যাসুন্দরের গান বাঙালিকে মাতিয়ে দিল।

১৭২০ ● রামপ্রসাদ সেনের জন্ম। ভক্তিভাবের আবেগে শ্যামাবিষয়ক গান রচনা ও গেয়ে গেয়ে তা ছড়িয়ে দিলেন। ১৭৫৮তে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১০০ বিঘা নিস্কর জমি দিয়ে রামপ্রসাদের সৃষ্টিকে সাম্মানিক স্বীকৃতি দিলেন। এছাড়াও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিসেমশাই শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছেয় ও উৎসাহে 'কালীকীর্তন' লেখা ও প্রচার সুরু করলেন রামপ্রসাদ। এবং রামপ্রসাদী গানের প্রসাদে তাঁর খ্যাতি ও গান দুইই বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠল। এসময় অপত্য বাসনা ও বাৎসল্য রসের আগমনী গান বাঙালি জীবনের এক নতুন সংযোজন ঃ গার্হস্থ্য মানসে এমনভাবে গানের অনুপ্রবেশ আগে হয়নি; 'উমা আমার এসেছিল। স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্যরূপিনী কোথায় লুকাল।' কৃষ্ণ বিষয়ক গানেও এই ভাব আরোপিত হল ঃ

'শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ, অঞ্চল ধরি কাঁদে—জননী, দে ননী-বোলে।'

এ বিষয়ে দীনেশ চন্দ্র সেনের তথ্যপুষ্ট সিদ্ধান্ত—'রামপ্রসাদই আগমনী গানের প্রথম কবি।' রাজ্যেশ্বর মিত্রের লেখা থেকে আরও জানা যায়, মুর্শিদাবাদ থেকে গঙ্গাপথে কলকাতা যাবার পথে নবাব সিরাজদ্দৌলা একবার হালিশহর ঘাটে, ঘটনাচক্রে রামপ্রসাদের শ্যামাবিষয়ক গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর রামপ্রসাদ একখানি করে ধ্রুপদ কাওয়ালি ও গজল শুনিয়ে নবাবকে অবাক করে দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে এ সময় বাংলার গায়ে-গঞ্জেও ধ্রুপদ, কাওয়ালি বা গজল একটু আধটু ঢুকে পড়েছে।

১৭৪১ ● বর্গীর হাঙ্গামার যুগে হুগলীর চাপ্তা গ্রামে রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবুর জন্ম)। বাল্যাবস্থায় ইংরিজি, সংস্কৃত, ফার্সী শেখার ফলে তার লেখা আর গানের ভেতর দিয়ে সুরুচি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন তৈরি হয়েছিল। এরপর চাকরি সূত্রে

ছাপরায় থাকাকালীন (১৮ বছর) মুসলমান ওস্তাদের কাছে টপ্পার স্বাদ পান ও মজে যান। কিন্তু একটা সময় ওস্তাদজী ছাত্রের কৃশলতা লক্ষ্য করে তালিমে রাশ টানলেন ফলে নিধুবাবুর কলকাতা প্রত্যাবর্তন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গীতের অনেক সংগ্রহও এনেছিলেন। তার জেদ চেপেছিল—পশ্চিমী শোরি মিঞার টপ্পাকে বাংলা গানে রূপান্তরিত করবেন ও বাংলা টপ্পা সৃষ্টি করবেন। এবং তিনি তা করেছিলেন আমৃত্যু ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত। নবযুগের উন্মেষ হচ্ছে, ইংরিজি শিক্ষা সংস্কৃতির আলোয় এদেশের কলার্চর্চা পরিশীলিত হতে শুরু করেছে। তখন মহার্ষি দেবেন্দ্রনাথ ২২ বছরের যুবক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বয়স উনিশ, মধুসূদনের পনেরো, ঈশ্বর গুপ্তের আটাশ আর বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃক্রোড়ে একবছরের শিশু।

১৭৫৭ ● পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৬০ ● ভারতচন্দ্রের জীবনাবসান। বিদ্যাসুন্দরের নানারূপে প্রচার—বিভিন্ন জনের লেখায়, যাত্রাপালার প্রসারে রঙ্গরস চটুলতায় বাংলা গানের মজা, জনমনকে আকৃষ্ট করল। এরপর এক এক করে অনেকেই বাংলা গানের প্রসারে স্বাক্ষর রাখলেন ঃ

১৭৭২ ● কালনার কমলাকান্ত ভট্টাচার্য বহু শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনী গানের স্রষ্টা আজও জনপ্রিয় যার অন্যতম—মজল মোর মন ভ্রমরা। সদানন্দময়ী কালী ইত্যাদি।

১৭৮৬ ● শালকিয়ায় জন্ম রাম বসুর। ভবানী বেজে, নীলু ঠাকুর প্রমুখ কবিয়ালদের দলে গাওনা ছাড়াও কৃষ্ণবিষয়ক বা শ্যামাবিষয়ক অনেক গান লিখেছেন এবং গেয়েছেন—বিশেষ করে বিরহের কারুণ্য তার গানে অন্য ভাবের সঞ্চার করেছিল।

১৭৯৯ ● এছাড়াও রামদুলাল রায়, রঘুনাথ রায়, ১৭৯৯ পর্যন্ত বাংলা গানের প্রসারে অনেক অবদান রেখেছেন। সমকালীন কবিওয়ালাদের নানা ভাবতরঙ্গের গানে বাঙালি গানের বৈচিত্র্যে নতুন ঢেউ লেগেছিল। যেমন এন্টনি ফিরিঙ্গী (১৭৮০), হরুঠাকুর (১৮১৩) হরুঠাকুরের শিষ্য ভোলা ময়রা, চন্দননগরের নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (১৭৫১), কৃষ্ণ মুচি, ভবানী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, গোরক্ষনাথ, মসাইঠাকুর, মধুসূদন কিন্নর, গদাধর মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বরী, গোঁজলা গুঁই (প্রথম কবিয়াল) ইত্যাদি। এঁদের কয়েকজনের গানের সামান্য এক কুচি নমুনা দেওয়া হল, বাংলা দানের ঐতিহ্যের প্রাথমিক রূপটি বুঝে নেবার উদ্দেশ্যেঃ রাম বসু—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভঙ্গে রাধিকা—'দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না/তুমি চক্ষুমুদে আমায় দুঃখ দিও না।'

আবার অনুপ্রাসেও দারুণ—'এত ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছ/শ্রীমতীর কুঞ্জে, গুনগুন স্বরে কেন অলি, শ্রীরাধার শ্রী পদেগুঞ্জে।'

হরুঠাকুর—'হরিনাম লইতে অলস হোয়ো না, রসনা যা হবার তাই হবে/ঐহিকের সুখ হল না বলে কি, কেউ দেখে তরী ডুবাবে।'

এন্টনী ফিরিঙ্গী—এর গানের ভাষায় এমন অভিরূপের প্রকাশ থাকতো—যা, সে যুগের লৌকিক গানে সচরাচর দেখা যেত না।

'খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই/শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে কোনও শুনি নাই'

বা 'এই বাংলায় বাঙালির বেশে আনন্দেতে আছি/হয়ে ঠাকরে সিংহের বাপের জামাই কুর্তিটি ছেড়েছি।'

প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল ঠাকুর সিংহের গাওনাতে তাঁকে দেওয়া বিশ্রী গালাগালের উত্তরে, ঠাকুর সিংহকে যেখানে পাল্টা 'শালা' বলে গালাগাল দেবার উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে উদ্দিষ্ট অর্থে যেভাবে সুরুচির আশ্রয়ে, সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তাতে একজন ফিরিঙ্গী সায়েবের সূক্ষ্ম ভাষাজ্ঞানে মুগ্ধ হতে হয়।

গোঁজলা গুঁই—'তোমাতে আমাতে একই কায়া/আমি স্নেহ প্রাণ, তুমি লো ছায়া/আমি মহাপ্রাণী, তুমি গো মায়া।'

ভোলা ময়রা—'আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, বাগবাজারে রই/আমি যদি সে ভোলানাথ হই/তোরা সবাই বিল্বদলে, আমায় পূজলি কই ?'

নানা কারণে এ পংক্তিটি আজও সমান জীবন্ত!

গ

১৮ শতকের থেকে ১৯ শতকের গোড়ায়

কবিগান, যাত্রাগানের উচ্ছ্বাসে বাংলা গানে একটা উতরোল অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

পূর্ববঙ্গের রামঠাকুর—তার রচনা, ভীষণ জনপ্রিয় 'সখি সংবাদে'র একটি গানের একটু নমুনা ঃ (চিতান) 'শ্যাম আমার আশা পেয়ে, সখিগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী/যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিত জল-আশায়/কুঞ্জসাজায় তেম্নি, কমলিনী।'

পরমানন্দ অধিকারীর শ্রীকৃষ্ণযাত্রা, লোচন অধিরারীর অক্রূর সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস, জয়চাঁদ অধিকারীর রামযাত্রা, ফরাসডাঙার গুরুপ্রসাদ বল্লভের চণ্ডীযাত্রা, বর্ধমানের লাউসেন বড়ালের মনসার ভাসান ইত্যাদি। তবে অনেকের মতে এই গীতিকাব্য রচনার শীর্ষে ছিলেন পদকর্তা কৃষ্ণকমল গোস্বামী (জন্ম ১৮১০-ভাজনঘাটে)। তাঁর 'রাই উন্মাদিনী' বা 'স্বপ্নবিলাসের গান'—তখনকার সঙ্গীতচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ সুদূর ঢাকা শহরের পথের বৈরাগী বা ছোটো ছেলেমেয়েদের মুখেও অনবরতই শোনা যেত। বড় গোঁসাই (এই নামেই লোকে তাঁকে চিনতো)-এর স্বপ্নবিলাসের গানে যে কি মধুর রস তার একটুখানি ঃ

'এঘর হতে, ওঘর থেকে অঞ্চল ধরি সাথে/বল্‌তো দেমা ননী খেতে/সে ননী গো রইল পড়ে—অবনীতে।' এই সঙ্গে ছিল চৈত্রমাসে গাজনের গান। তবে এ বিষয়ে নীলকমল দাসের গান বাংলা গানের আর একটি লৌকিক ধারা।

১৭৭০-১৭৯০ ● পলাশী যুদ্ধোত্তর কালে, নবমুন্সী মহারাজ নবকৃষ্ণের রঙ্গসভায় আখড়াই গানের একটা নব্য প্রমোদ কালচার গড়ে উঠেছিল। নদীয়া, হাওড়া,

বর্ধমান, হুগলীর বোস্টম বাবাজী এবং রাইকিশোরী সেবাদাসীদের বিভিন্ন আখড়া থেকে, প্রধানত কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করে—আখড়াই গানের উদ্ভব হল। এতেও দুই দলের গানের লড়াই হোত। এ গানের বৈশিষ্ট্য হল—স্তবকে স্তবকে এর বাণী ও সুর কয়েকটা নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত হত। প্যাটার্নও থাকত মোটামুটি একরকম, বাঁধা ধরা। প্রথমে মঙ্গলগীতি, পরে সখি সংবাদ, তারপর মান ও শেষে, মিলন গাওয়া হোত। স্তবকগুলো ভাগ হোত চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, ডালফুকা, মেলতা, মহড়া, সোয়ারী—এইসব গেয়ে গেয়ে ফের, মেলতা, মহড়া গেয়ে গান শেষ হোত। এমনি একটা গানের সামান্য নমুনা ঃ (চিতেন)—আচম্বিতে একি প্রাণ, সই, সই—করি দরশন

(পরচিতেন)—আমিও নারী, চিনতে নারি/কে ও-নারী, না-জানি বিবরণ।

(ফুকা)—কিবা কামিনী হাস্যানন, লাজে পূর্ণশশী, মেঘে অদর্শন

(ডবলফুকা)—কটিতে কেশরী, মানে হার/কিবা পীনোচ্চ কুচাকার এমন নারী বুঝি, নাই আর। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধনী, জমিদার, রাজারাজড়ারা ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। একই সঙ্গে এর বিকৃত সংস্করণ তৈরি হয়েছিল—অশিক্ষিত, চাষাভূষো গরীব মানুষদের জন্যে তরজার লড়াই। আর একটা কথা. আঠারো শতকের শেষ থেকে আখড়াই গান, যন্ত্র সঙ্গীতের সহযোগে গাওয়া শুরু হয়েছিল। তাতে মুখ্য ভূমিকা ছিল, নিধুবাবুর আত্মীয়, কুলুই, চন্দ্র সেনের। খেউড় গানের সংস্কার, যন্ত্রসঙ্গীতের আবহ, রাগাশ্রিত সুর—আখড়াই গানকে অন্য এক স্তরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এর জন্যে কুলুই চন্দ্র সেনকে স্মরণ করতেই হয়।

ঘ

উনবিংশ শতাব্দী

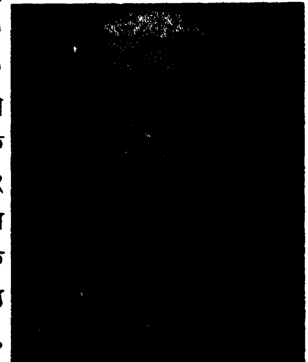
১৮০৪ ● দাশরথি রায় (১৮০৪-১৮৫৭)। এ যুগের সর্বাগ্রগণ্য সঙ্গীত নায়ক। পলাশী যুদ্ধ (১৭৫৭) থেকে আরম্ভ করে. সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭) এই একশো বছরের, বাংলা গানের চর্চায়, দাশরথি মুখ্য চরিত্র। নীলকুঠির কেরানীগিরি দিয়ে শুরু। তারপর পল্লীরমনী আকা-বাঈ-এর কবির দলে, দাশরথি গান লেখার কাজ পেলেন। লেখার সঙ্গে গান বাঁধা। বাড়িতে বকাবকিতে, অশ্লীল খেউড়ের মজা ছেড়ে, পাঁচালিতে হাতে দিলেন। অজস্র পাঁচালির গান ছাড়া, শ্যামা বিষয়ক গানও অনেক। পাঁচালির শুদ্ধনাম পঞ্চালী। সঙ্গীতের গীতরূপকে সে কালে প্রবন্ধ বলা হোত। সেই প্রবন্ধ, ধরা হোত সূড়, আলি এবং বিপ্রকীর্ণ। আলি জাতীয় গানের নানা তাল। আবার তাল ছাড়া, আলাপের ঢং বেশ বিস্তারিত। দাশরথির প্রধান কৃতিত্ব তিনি সেই গানকে কাব্যগুণে অনেক সুষমা দিয়েছিলেন এবং পাঁচালির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও, রাগসঙ্গীতের আধারে সাজাতে পেরেছিলেন। শ্রীধর যেমন কথকতায় টপ্পার আঙ্গিক এনেছিলেন, দাশরথিও তেমনি পাঁচালিতে টপ্পার সম্ভোগ

মুদ্রিত করেছিলেন। পাঁচালি গান বাঁধবার সময়, বহুগান তিনি যৎ তালে বেঁধেছিলেন। লোকের এত পছন্দ হয়ে গেল যে—ওঁর নামটাও বদলে হল যোতো-দাশু। তাঁর প্রিয় রাগ ছিল ললিত, বিভাস, সিন্ধুভৈরবী। তাল বেশির ভাগ, যৎ বা ঝাঁপতালে হোত। শ্যামা বিষয়ক গানেও তিনি বাঙালির মন জয় করে ফেলেছিলেন। তার একটা তো একবিংশ শতাব্দীতেও সমান জনপ্রিয়—'দোষ কারো নয় গো মা।' সমসাময়িককালের গায়ক, গীতিকার কালী মির্জার (কালী দাস চট্টোপাধ্যায়ের, ১৭৫০-১৮২০) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কুড়ি বছর বয়সে, সংস্কৃত এবং সঙ্গীত দুটোই শেখেন কাশীতে, পরে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে, আরো শেখার জন্যে তিনি লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে দীর্ঘদিন তালিম নেন। ৩২ বছর বয়সে, দেশে ফিরে সর্বতোভাবে গানে সঙ্গীত চর্চায়, মগ্ন হয়ে পড়েন। শোনা যায় রামমোহন রায় নাকি, কোনও সময়ে এঁর কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাঠ নিতেন।

এ সময়ের আর একজন গুণী শিল্পী মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৮-১৯০৫)। গোয়ালিয়র ঘরানার ধ্রুপদ শেখার জন্যে উনি গোয়ালিয়রে অনেকদিন শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। পাঞ্জাবী টপ্পাও (শোরী মিঞা, হামেদুল প্রভৃতি) তিনি পশ্চিম থেকে শিখে আসেন। অমিয় সান্যাল লিখেছেন—'বাংলা টপ্পা ও টপ-খেয়ালে, তাঁর ছিল চরম ঔৎকর্ষ।' পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশীর রামকুমার মিশ্র এবং শিউ সহায়েরর কাছে ওঁর পশ্চিমা টপ্পা শেখার সুযোগ হয়েছিল।

মনে রাখতে হবে যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সঙ্গীত নির্মাণের আন্দোলনের প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম রাধামোহন সেন। পার্শী সঙ্গীতকোষ অবলম্বনে, বাংলা ভাষায় প্রথম সঙ্গীত কোষ 'সঙ্গীত তরঙ্গ' গ্রন্থটি ১৮১৮ সালে উনি প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় এইটিই, ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রথম আকর গ্রন্থ। এবং এর পথ ধরে সঙ্গীততত্ত্ব বা গানের ব্যবহারিক পদ্ধতির ব্যাপারে নানা গবেষণা, ভাবনাচিন্তা খুব স্পষ্ট করে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

১৮৪৩ ● কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম প্রকাশিত হল। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-৯৩) এবং রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের (১৮৪০-১৯১৪) অবদানে এই প্রকাশনা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া শৌরীন্দ্র মোহন বঙ্গদেশে, প্রথম একটি মিউজিক অ্যাকাডেমির সূচনা করেন (১৮৮১)। কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতের বাদন-স্বাতন্ত্র্য পদ্ধতিগত পন্থায় শেখার গুরুত্ব তিনিই সকলকে বুঝিয়েছিলেন। এখান থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু গ্রন্থ যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : সঙ্গীত সার (১৮৬৯) যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা (১৮৭২), কণ্ঠকৌমুদী (১৮৭৫) ও গীত গোবিন্দের স্বরলিপি



শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর

গ্রন্থ (১৮৭১), মৃদঙ্গ-মঞ্জরী (১৯৭৩)। তবে শৌরীন্দ্র মোহনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় লেখা, তার যন্ত্রকোষ (১৮৭৫) এবং ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অফ মিউজিক (১৮৯৬)।

তা ছাড়া, দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, ঠাকুর বাড়ির (রবীন্দ্রনাথকে বাদ রেখে) দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ বা গণেন্দ্রনাথ—যেমন বাংলা গানের প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তেমনি, নিজ-নিজ প্রবণতা অনুসারে গীতিকার, সুরকার, গায়ক হিসাবে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ইতিহাসের চেতনা থেকে। অতীত ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার বা নবজন্মের রেনেসাঁস দিয়ে এ যুগটা চিহ্নিত। এই বিচারে, বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি বিশেষ করে, বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সকলের আগে স্মরণীয়—কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)।

পথিকৃত হিসেবে, ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ তিনিই প্রথম নিজের উদ্যোগে বাংলার প্রাচীন গীতিকারদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করার পথ দেখান। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামনিধি গুপ্ত এবং সম্ভবমত সব কবিগানওয়ালাদের জীবন, রচনা ও বিবরণ প্রথম সংকলিত করে, বিলোপমুখী ঐতিহ্য, সংরক্ষণের অভূতপূর্ব নিদর্শন রেখেছিলেন।

প্রভাকর সম্পাদক এবং ব্যঙ্গকবি হিসেবে বিখ্যাত গুপ্তকবি—নানাজাতীয় অজস্র গানেরও তিনি রচয়িতা। কবি, হাফ আখড়াই ছাড়াও আগমনী, প্রেমসঙ্গীতও উনি অনেক লিখেছেন—যার জন্যে বাংলা গানের জগতেও তাঁর স্থান, স্বীকৃতি যোগ্য।

প্রায় সমকালীন আর একজন, দুর্গাদাস লাহিড়ীর কথায় 'সঙ্গীতে ও কবিত্বে প্রকৃতই অলৌকিক'—বাঁশবেড়িয়ার শ্রীধর কথক (জ ১৮১৬) বংশগত পেশাদারী কথকতার সূত্রে, তার গান দিয়ে লোককে সম্মোহিত করে রাখতেন। বিশেষ তাঁর টপ্পাঙ্গের গানের জন্যে সেকালে তাঁকে লোকে বলত, দ্বিতীয় শোরী মিঞা। তাঁর রচিত কৃষ্ণ বিষয়ক বা শ্যামা বিষয়ক অনেক গান তো আছেই কিন্তু বাংলা, হিন্দী, আরবি এবং ফার্সী ভাষায় তাঁর রচিত টপ্পা গানের সংখ্যাও কম নয়। তবে প্রচারের অভাবে বা আর্থিক প্রতিপত্তিহীনতার কারণে—তাঁর অনেক গান নিধুবাবু বা অন্যান্যদের নামে চলে গেছে যার কিছু কিছু উত্তরকালে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর ১৬৯টি সংগৃহীত গানের বেশির ভাগই প্রেমবিষয়ক, যার অন্ততঃ একটা তো এখনো লোকের মুখে মুখে ফেরে—'ভালবাসিবে বলে, ভালবাসিনে/আমার সে ভালবাসা—তোমা বই জানিনে।'

প্রায় একই সময়ে (১৮৩৫-৫৮) উৎকলবাসী, কলকাতার এক ফেরিওয়ালা মানুষ, বৌবাজারের সঙ্গীতপ্রিয় মতিলাল পরিবারের কর্তাদের নজরে পড়ার ফলে, প্রকৃতিদত্ত দারুণ সুকণ্ঠের কারণে, যাত্রাগানের দলে ঢুকে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গোপাল-উড়ে নামেই তিনি প্রসিদ্ধি পান। পরে, দুই ঘনিষ্ঠ সাগরেদ কৈলাশ বারুই আর শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এমন অনেক মজাদার গান (যাতে থাকত আদিরসের মাত্রাধিক্য) বেঁধেছিলেন যা গাঁয়ে-গঞ্জে, হাটেবাজারে গোপাল উড়েকে ভীষণ জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। এর ফলে গোপালের দলের

যাত্রাগানেরও খুব চাহিদা বেড়েছিল। গোপালের বিদ্যাসুন্দর পালা, তার আড়খেমটা গানের মজা বাঙালির মনকে মাত করে দিয়েছিল।

এই মজার কারিকুরি একটু লক্ষ্যণীয়।

একতালের রূপান্তর অথবা দাদরার রকমফের করে আড়খেমটায় যে একটু তালের মজা লাগত, তাতেই গোপাল যাত্রার জয়যাত্রা নিরঙ্কুশ হয়েছিল। আড়খেমটার আড়ি বলতে যেটুকু বোঝায়, তা হচ্ছে—গানটার ধরতাই এর সময়, ঠিক প্রথম মাত্রায় না ধরে, দুটো মাত্রা ছেড়ে তৃতীয় মাত্রায় ধরা এবং মাঝে মাঝে আড়ির সৃষ্টি হয়ে লাগসই ছন্দবৈচিত্র্য, শ্রোতাদের মেজাজে দোল লাগাত। একটুকরো প্রাচীন গানের সামান্য একটু তুলে ধরলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে ঃ

০ ০ শূ । ণ্য প্রা ণে। চ লে ০ । গে ল ০

০ ০ ন। য় নে তার্। অ ০ শ্রু। জ ল ০

রবীন্দ্রনাথও এর আকর্ষণ এড়াতে পারেননি। তাঁর 'হেলাফেলা সারা বেলা' বা 'দুজনে দেখা হল' বা আরো অনেক গান, কবির হাতের ছোঁয়ায় যেন আরো উত্তরণে অনুপম হয়ে উঠেছে।

৬

ক) এইভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা কেন্দ্রিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নির্ভর গান বাজনা বা বাংলা গানের চর্চাকে যাঁরা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ আশুতোষ দেব (সাতু/ছাতুবাবু-সেতার), গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ দত্ত (বড়িষা), ধীরাজ (পক্ষীগীতি নায়ক), নবীন গোস্বামী (সেতার), প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সেতার), রামচন্দ্র শীল (চুঁচুড়া), রাধিকা প্রসাদ দত্ত, রামকানাই মুখোপাধ্যায়, রামদাস গোস্বামী (শ্রীরামপুর) রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমান), রূপচাঁদ পক্ষী, শ্রীনাথবাবু (হুগলী-সেতার), শিবচন্দ্র পাল (সেতার)। মৃদঙ্গবাদক—রাম চক্রবর্তী, কেশব মিত্র, উমেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

খ) কীর্তন গানের ক্ষেত্রে—নরোত্তম ঠাকুরের গরান হাটা ধারা ছাড়াও মনোহর শাহী ধারা, ঠুংরি আঙ্গিকের রেনেটি ধারা, ময়নাডাল ধারা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

গ) এছাড়া ছিল বাংলা গানের আর এক উজ্জ্বল ধারা—ব্রহ্মসঙ্গীত, সম্ভবতঃ রাজা রামমোহন রায় যার স্রষ্টা।

ঘ) ধর্ম ও ভক্তিভাবের গানে পরমানন্দ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এঁদেরও অবদান কম ছিল না।

ঙ) এইসঙ্গে ওঠে ঢপ-কীর্তনের কথা। রূপচাঁদ অধিকারী, রাধারমন বাউল, মধুকিন্নর (মধুকান), গোয়াবাগানের পান্নাময়ী—এ গানের পরিবেশনে এঁরাই ছিলেন সামনের সারিতে।

চ) সামাজিক সংস্কার বিষয়ক গান রচনায় নেমেছিলেন—দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি (১৮৪৪-১৮৯৮), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), আনন্দ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০), অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), প্যারীমোহন গুপ্ত (১৮৩৫-১৮৭৬), মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯২২)—সামাজিক দায়বদ্ধতার সমীক্ষণ এঁদের গানের বৈশিষ্ট্য, যা উপযুক্ত স্বীকৃতির দাবী রাখে।

চ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গান বিষয়ে নয়া চেতনা ও প্রয়োগ চিন্তা ঃ

১) নতুন যুগের ভাব অনুযায়ী গান লেখা—ভাষাও ভাব, দু'য়েতেই। নানান গীতিরীতি অনুসারে বৈচিত্র্যের সন্ধান—যা থেকে খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা প্রভৃতির প্রচলন ও চর্চা। নতুন তাল এর উদ্ভাবনা (যেমন মধ্যমান, বাংলা একতাল, আড়া, পোস্তা প্রভৃতি)



দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আ-কার মাতৃক স্বরলিপির উদ্ভাবক

২) বিদেশী সুরের আমদানী, বাংলা গানে হার্মনি, অপেরার প্রচলন

৩) দেশবিদেশের স্বরলিপি অনুশীলন এবং সরল ও সুলভ দিশী স্বরলিপির উদ্ভাবন ও প্রচার। অর্কেষ্ট্রা বা বৃন্দবাদন রচনার সুরু।

বাংলায় আকার মাত্রিক স্বরলিপির প্রথম পদক্ষেপ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (অক্টোবর ১৮৬৯) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আ-কার মাত্রিক স্বরলিপির প্রথম প্রকাশ। পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিমার্জন। ১৮৫৮, ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী নাটক অভিনয়ে, অর্কেস্ট্রা প্রবর্তনের প্রথম প্রয়াস—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পালের সুররচনায়। ১৮৬৭, ৫ই জানুয়ারি ঠাকুর বাড়িতে, নব নাটক অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক পরিণত অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করেন।

৪) বিভিন্ন ভাষায় রচিত সঙ্গীত বিষয়ে কোষগ্রন্থ সমূহর (যা পাওয়া যাবে) বাংলায় অনুবাদ। ভারতীয় এবং বিদেশী সঙ্গীতের ইতিহাস রচনা

৫) পূর্বতন গীতিকার ও গায়কদের জীবনী রচনা ও প্রচলিত/প্রাপ্তব্য গানের সংকলন প্রকাশ।

৬) সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সঙ্গীত শিক্ষার প্রসার ঘটানো,

৭) ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের ইতিহাস, প্রয়োগকলার কালানুক্রমিক বিবরণ রচনা ও ইংরিজি অনুবাদে দেশেবিদেশে প্রচার।

ছ

উপরোক্ত চিন্তা-পরিকল্পনার প্রায়োগিক কার্যক্রম ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অনুক্রম ঃ



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

- ১৮১৮ ● সঙ্গীততরঙ্গ (প্রথম সঙ্গীত বিষয়কগ্রন্থ বাংলায়)—রাধামোহন সেন
- ১৮২১ ● ব্রহ্মসঙ্গীত (ব্রহ্মসঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ)—রামমোহন রায়
- ১৮২৪ ● মাইকেল মধুসূদনের জন্ম—ভবিষ্যতের গীতিকার
- ১৮৩৫ ● দাশরথির পাঁচালি (সংকলন)—দাশরথি রায়
- ১৮৩৭ ● গীতরত্ন (ঐ)—নিধুবাবু রামনিধি গুপ্ত
- ১৮৩৮ ● ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম—ভবিষ্যতের গীতিকার ও বন্দেমাতরম্ স্রষ্টা
- ১৮৩৯ ● পরমার্থ সঙ্গীতসার সঙ্গী—কমলাকান্ত (ভট্টাচার্য্য)
- ১৮৪২ ● সঙ্গীত মনোরঞ্জন—যদুনাথ ঘোষ রচিত
- ১৮৪৫ ● সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম—কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর প্রণীত
- ১৮৪৫ ● সঙ্গীত রসমাধুরি—জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিক প্রণীত



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- ১৮৬৭ ● বঙ্গৈকতান—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
- ১৮৬৮ ● Hindusthan Air arranged for Piano forte প্রকাশ
- ১৮৬৮ ● সঙ্গীতশিক্ষা গ্রন্থ প্রকাশ
- ১৮৬৯ ● গীতাঙ্কুর—প্যারিচাঁদ মিত্র রচিত
- ১৮৭০ ● সঙ্গীত চিত্তসন্তোষ (প্রথম বাংলাভাষায় প্রকাশিত সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকা) সম্পাদক—উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
- ১৮৭২ ● সঙ্গীত সমালোচনী (শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মিউজিক অ্যাকাডেমির মুখপত্র) সম্পাদক—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী
- ১৮৭৩ ● সেতার শিক্ষা—গদাধর চট্টোপাধ্যায়
- ১৮৭৪ ● গীতহার—গদাধর চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৭ ● আমেরিকায় ফনোগ্রাফ আবিষ্কার। প্রথম পরীক্ষামূলক রেকর্ডিং-এ আবিষ্কারক এডিসনের স্বকণ্ঠের একটু ছড়াগান—'মেরি হ্যাড্ এ লিটল ল্যাম্ব।'

১৮৭৭ ● প্রাচীন করিসংগ্রহ (গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)ও গীত রত্নমালা (অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়) প্রকাশিত।

১৮৭৮ ● ফনোগ্রাফ যন্ত্রের পেটেন্ট নিয়ে এডিসন, আবিষ্কারের স্বীকৃতি পেলেন।

১৮৮১ ● বেল ওটেনটার মোমের সিলিন্ড্রিক্যাল রেকর্ড তৈরির প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলেন।

১৮৮৫ ● সঙ্গীত সার সংগ্রহ—মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

১৮৮৫ ● গীতসূত্র সার—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮৫ ● পদরত্নাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

১৮৮৬ ● কমলাকান্ত পদাবলী—শ্রীকান্ত মল্লিক

১৮৮৭ ● সঙ্গীত কল্পতরু—বৈষ্ণবচরণ বসাক ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত

১৮৮৭ ● গীতাবলী—বৈষ্ণবচরণ বসাক

১৮৮৮ ● জার্মান বিজ্ঞানী এমিল বার্লিনার দ্বারা ডিস্ক রেকর্ড তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার/গ্রামোফোন শব্দটির জন্ম।

১৮৮৮ ● আন্তর্জাতিক ব্যবহারিক স্বীকৃতি চালু হল গ্রামোফোন শব্দটির।

১৮৮৮ ● ভারতীয় মুক্তাবলী (নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়) ও মনোমোহন গীতাবলী (মনমোহন বসু) প্রকাশিত

১৮৯০ ● সাধক সঙ্গীত—কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত

১৮৯১ ● মজলিশ—দুর্গাদাস দে লিখিত

১৮৯৪ ● ওয়াশিংটনে গ্রামোফোন কোং প্রথম হার্ড প্রেসড রবারের ৭ইঞ্চি চাকতি রেকর্ড বের করল। দু মিনিট বাজবে দাম ৫০ সেন্ট। অল্পদিনের মধ্যে বার্লিনার গালার রেকর্ড বানালেন।

১৮৯৪ ● *৫ই সেপ্টেম্বরে লেখা এক চিঠিতে **স্বামী বিবেকানন্দ** আমেরিকা থেকে বন্ধু মন্মথ নাথ ভট্টাচার্যকে জানাচ্ছেন যে তিনি ক্ষেত্রির মহারাজকে একটি ফোনোগ্রাফ উপহার পাঠাচ্ছেন। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দই ভারতভূমিতে, সম্ভবত প্রথম ফোনোগ্রাফ প্রবর্তন করেন।*

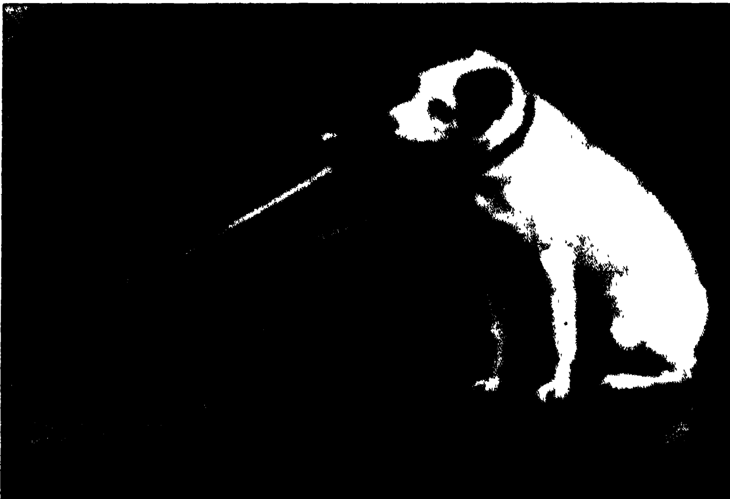
১৮৯৪ ● গুপ্তরত্নোদ্ধার—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

১৮৯৫ ● রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী—রামপ্রসাদ সেন

১৮৯৬ ● সঙ্গীত কোষ—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১৮৯৬ ● বিশ্বসঙ্গীত—বৈষ্ণব বরণ বসাক সংকলিত

- ১৮৯৬ ● গীতরত্নমালা—অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় সংকলন গ্রন্থ
- ১৮৯৬ ● এডিসনের দম দেওয়া স্প্রিংচালিত ফোনোগ্রাফ বাজারে বেরুল দাম ২০ ডলার
- ১৮৯৬ ● *২৪শে মাঘ ১৩০২ ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে খামখেয়ালী সভার সূচনা ও সেই সভায় সদ্য কেনা ফোনোগ্রাফ যন্ত্র শ্রবণের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ কর্তা রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ।*
- ১৮৯৭ ● বীণাবাদিনী পত্রিকা এবং 'স্বরলিপি গীতিমালা' জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ডোয়ার্কিন হারমোনিয়ম কোম্পানীর মালিক দ্বারকানাথ ঘোষের বদান্যতায়।
- ১৮৯৮ ● প্রীতিগীতি (মূলতঃ প্রেমসঙ্গীত সংকলন)—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
- ১৮৯৮ ● গীতাবলী—কাশীপ্রসাদ ঘোষ
- ১৮৯৮ ● ইংলণ্ডে, এমিল বার্লিনার এবং ব্যারি ওয়েন নতুন কোম্পানী খুললেন এপ্রিল মাসে, নাম হল—দি গ্রামোফোন কোং লিমিটেড, কারখানা খোলা হল হ্যানোভারে। এখান থেকে ছাপা গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডের লেবেলে, ছবি থাকত ডানা গুটিয়ে বসে থাকা এক নগ্ন পরী।
- ১৮৯৮ ● রবীন্দ্রনাথ হেমেন্দ্র বসুর চোঙা রেকর্ডে, স্ব-সুরারোপিত বন্দেমাতরম গান ও সোনার তরী কবিতা আবৃত্তি রেকর্ড করেছিলেন।
- ১৮৯৯ ● ফ্রান্সিস বারউডের আঁকা, গ্রামোফোনের গান শুনছে ফক্স টেরিয়ার কুকুর ছবিটি ১০০ পাউণ্ডে কিনে, গ্রামোফোন কোং নতুন রেকর্ডের লেবেলে ছাপিয়ে হিজ মাস্টারস ভয়েস এর বিখ্যাত প্রতীক চিহ্নটি চালু করল।)



১৮৯৯ ● হেমেন্দ্রনাথ বসু, এডিসন সাহেবের কাছ থেকে C///6 নম্বরযুক্ত ফোনোগ্রাফ মেসিন কিনে আনিয়ে, শব্দ রেকর্ডিং এর কলাকৌশল আয়ত্ত করলেন। শুরু হল বোসেস রেকর্ডের যুগ।

১৮৯৯ ● রবীন্দ্রনাথ প্রথম হেমেন বোসের চোঙা রেকর্ডে বন্দেমাতরম গান রেকর্ড করলেন।

জ


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯০০ ● **রবীন্দ্রনাথ** (৩৯)—গগন ছাড়া যাঁকে ধরা যাবে না—বাংলা গানে তাঁর অলৌকিক প্রভাবকে সর্বময় স্বীকৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সমুদ্রকে বর্তমান আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।


দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (৩৭)—বাংলা গানের একজন মৌলিক কম্পোজার হিসেবে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি অবিস্মরণীয়। মোটামুটি ২৩০টি গানের গীতিকার ও সুরস্রষ্টা—নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

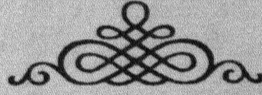
রজনীকান্ত সেন (৩৫)—ভক্তিরসের আত্ম নিবেদনে তাঁর গানের আবেদন করুণ-রঙিন ভাবের দিশারী। মোট ২৬৫টি গানের মধ্যে নানা রসের অনুগত সমর্পণ বা হাস্য কৌতুক ব্যঙ্গ—সবই আজও মানুষের মনকে নাড়া দেয়।


রজনীকান্ত সেন

অতুলপ্রসাদ সেন (২৯)—প্রধানত বিষাদের কবি-গীতিকার। সুরেও জীবনের গভীরতর বেদনা, অশ্রুর ছোঁয়া। কিছু বিখ্যাত জাতীয় ভাবধারা গান সমেত তাঁর সুরারোপিত ২০৭টি গান সুখে দুখে বাঙালি মনকে কাঁদায়।

এই তিনজনের রচনা সুর এমনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে সব গানেই তাঁদের ব্যক্তিত্বের এবং প্রতিভার স্বাক্ষর সহজেই স্রষ্টাদের মানুষের মনে স্পষ্ট করে চিনিয়ে দেয়। এঁদের নিজস্ব ধারার গান—সূর্যের আলোর মত, বাংলা গানকে আলোকিত করেছিল।

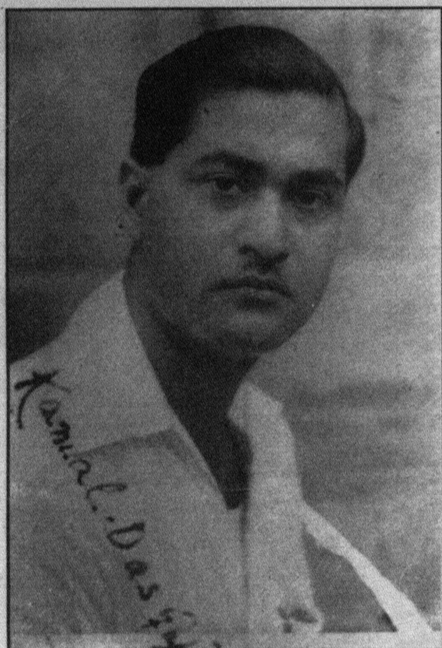

অতুলপ্রসাদ সেন



সুবল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

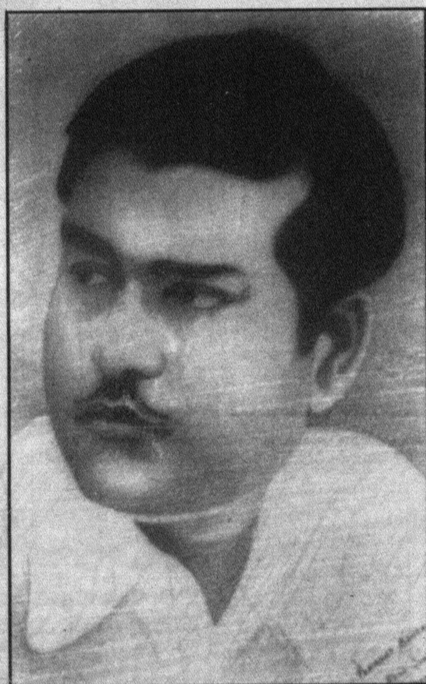
(১৯০৪-১৯৬৭)

'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম'



কমল দাসগুপ্ত

'দি ট্রেনার অফ ট্রেনার্স'



সুবল দাসগুপ্ত

'সব্যসাচী সুরস্রষ্টা'



আঙ্গুরবালা

'শেষ রেকর্ডিং-এ বিমান মুখোপাধ্যায় (বাঁ-ধারে হারমোনিয়ামে)-এর প্রশিক্ষণে'



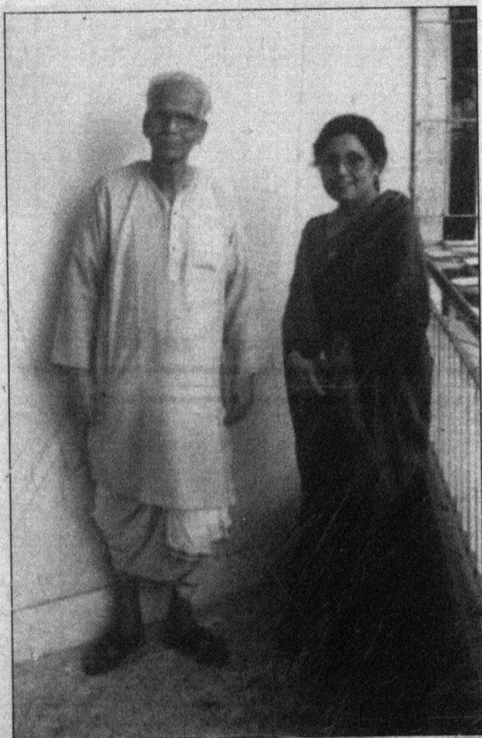
অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—বিমান মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে (বাঁ দিকে)



সন্তোষ গাঙ্গুলী
প্রথম চলার দিন থেকেই
পরম শুভানুধ্যায়ী



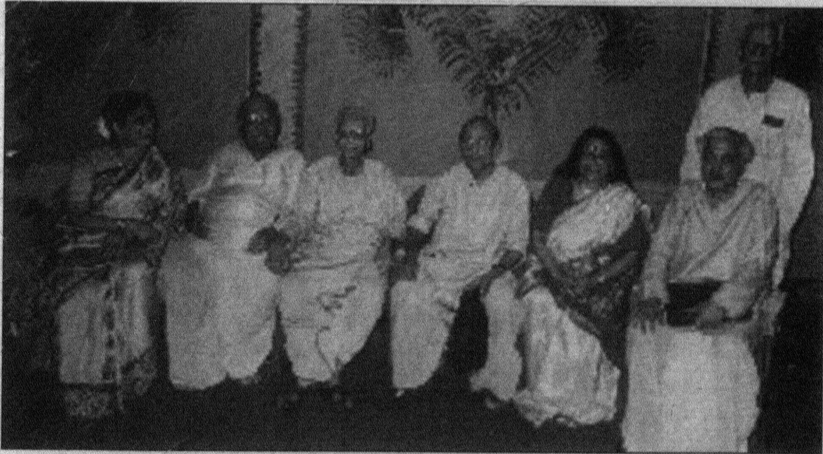
হিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (গাঙ্গুলী)
কানাডা প্রবাসিনী সবচেয়ে
পুরাতন ছাত্রী—একান্ত-আপন



পরমসুহৃদ

ভি. বালসারার সঙ্গে

'মেরে প্যার মুঝে লোটা দো'



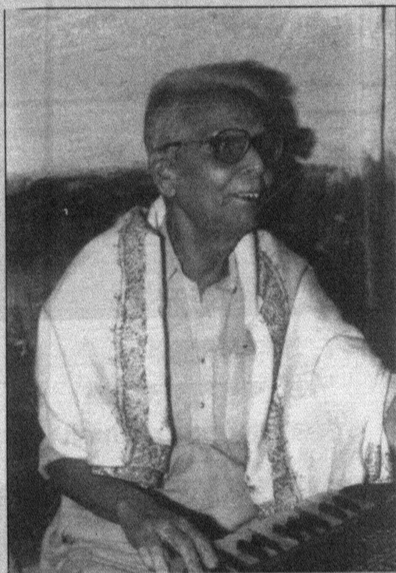
গুণীজনের সান্নিধ্যে

(বাঁ-দিক থেকে উপবিষ্ট) কল্যাণী কাজী, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিমান মুখোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়



মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

গানে গানে বন্ধন



গানে গানে যাঁর ইন্দ্রধনু



কন্যাসমা ছাত্রী ইন্দ্রানী সেনের সঙ্গে গুরু বিমান মুখোপাধ্যায়



বিমানে বিমানে আলোকের গানে



সুরে সুরে অন্তরঙ্গ

বিমান মুখোপাধ্যায়, সিতাংশু শেখর ঘোষ

বিমান মুখোপাধ্যায়

শ্যামাসংগীত

BRT 108

কথা—ধীরেন চট্টোপাধ্যায় সুর—সুবল মুখোপাধ্যায়



(১)

কালী বলে ডাকবো না আর
ডাকবো এবার কালা বলে।
ডেকে ডেকে হলাম সারা
সারা জনম মলাম জ্বলে।

তুই যদি মা হান্‌লি হেলা
তোর তরে কেন অশ্রু ফেলা
কাঁদবো এবার কালার তরে
পূজব নয়ন জলে॥

তোর কাছে আর আসবো না মা
শ্যামের ঘরে যাবো শ্যামা।
গোকুলেতে রইবো প'ড়ে
অভয় চরণ শরণ ক'রে
কালা যদি করে হেলা
যাবো রসাতলে॥

(২)

রঙ্গ বোঝা ভার মাগো তোর
লীলা বোঝা ভার,
কারে তুই দেখাস আলো
কারেও বা আঁধার।
কারে তুই রাখিস্ কোলে
কারেও আবার থাকিস ভুলে
ভবের মেলা মায়ার খেলা
চল্‌ছে অনিবার॥

কখনও দেখি মা তুই
ভয়ঙ্করী সর্বনাশী
ভয়ে দূরে স'রে গিয়ে
দেখি মা তোর মধুর হাসি।

কভু পদতলে পতি
কভু পতিব্রতা সতী
কোলে নিয়ে ঘুম পাড়া মা
চাইনা কিছু আর॥

শিল্পীর পূর্ব প্রকাশিত রেকর্ড

যা চেয়েছি মাগো ;
কৃষ্ণরূপে দাঁড়াও কালী ;

ভক্তিগীতি

BRT 104

ভারতী রেকর্ড পুস্তিকার একটি পাতা (১৯৩০)
বিমান মুখোপাধ্যায়ের গান

গ

চ

ছ

জ

ত

ল

শ

স